বেদান্ত চর্চার যে নূতন আগ্রহ দেখা যায়, তার পশ্চাতে স্বামী বিবেকানন্দের প্রচার-সাফল্যের প্রেরণাও কম ছিল না। রামমোহন প্রচলিত হিন্দুধর্মের বহু কুসংস্কারকে আঘাত করেছিলেন এবং ধর্মের ক্ষেত্রে অন্ধ বিশ্বাসকে দূর করতে তাঁর আন্দোলন কিছুটা সাহায্য করেছিল। তবে রামমোহনের ধর্মের মূলকথা—'একেশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজা বর্জন' বাংলাদেশের হিন্দুসমাজ আজ পর্যন্ত গ্রহণ করেনি, বহু দেবদেবীর উপাসনা ও মূর্তিপূজা আজও এ সমাজে প্রায় পূর্বের মতই প্রচলিত।

বৃহত্তর হিন্দুসমাজের কথা বাদ দিলেও রামমোহনের ধর্মবিশ্বাস যে তাঁর অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীকেও বিশেষ প্রভাবিত করেছিল, এ কথা মনে করা যায় না। রামমোহনের পত্নীদের ধর্মবিশ্বাস কি ছিল, তা জানবার কোন উপায় আজ আর নেই। কিন্তু তাঁর পুত্র রাধাপ্রসাদ যে তাঁর জীবদ্দশাতেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর দুর্গোৎসবে যোগদান করতেন, তা আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী থেকে জানতে পারি। রামমোহনের আর এক পুত্র রমাপ্রসাদ ব্রাহ্মসমাজের অছি নিযুক্ত হয়েও মাতৃশ্রাদ্ধে পৌত্তলিকতার চরম করেছিলেন—'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় তার কৌতুকপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে। রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরও যে ব্রাহ্মধর্ম ভাল বুঝতেন না, সে কথা দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'রামমোহন-স্মৃতিকথা'য় স্বীকার করেছেন।[১]

দেবেন্দ্রনাথ অতিরিক্ত ব্রহ্মচিন্তা করলে তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধি কমে যাবে, এ ভয় দ্বারকানাথের যথেষ্ট ছিল। রামমোহনের অপর এক বন্ধু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠাকাল হতেই তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, কিন্তু তিনি ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন সংশয়বাদী এবং রামমোহন এজন্য তাঁকে 'rustic philosopher' আখ্যা দিয়েছিলেন। রামমোহনের অন্যতম শিষ্য নন্দকিশোর বসু বাহ্য আচার-আচরণে বৈষ্ণব ছিলেন, একথা তাঁর পুত্র রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' হতে আমরা জানতে পারি। রামমোহন যাঁদের উপর ব্রাহ্ম-সমাজের পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন তাঁরাও কতদূর তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মজীবনী'র একস্থানে লিখেছেন, 'আবার এক সময় দেখি যে সেই ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের অবতার হওয়ার বিষয় প্রতিপন্ন করিতেছেন। . আমি বেদী হইতে অবতারবাদের বর্ণনা নিবারণ করিলাম।' (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২৬)

যে দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের মৃতপ্রায় ব্রাহ্মসমাজকে পুনর্জীবন দান করেন, তাঁর ধর্মবিশ্বাসও যে রামমোহনের ধর্মবিশ্বাস হতে কিছুটা স্বতন্ত্র ছিল, একথা সর্বজনবিদিত। দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের অদ্বৈতবাদকে গ্রহণ করতে পারেননি এবং খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্রের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। মোটের উপর একথা স্বীকার করতেই হবে যে রামমোহনের ব্রাহ্ম আন্দোলন কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের ইংরেজী-শিক্ষিত নূতন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র অংশকে প্রভাবিত করেছিল এবং এই সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যেও এই আন্দোলনের প্রভাব ছিল নিতান্তই অগভীর। পরোক্ষভাবে এই আন্দোলন বরং হিন্দুসমাজকেই সাহায্য করেছিল ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণের প্রবণতাকে রোধ ক'রে।

[১] Rammohon Roy by Debendra Nath Tagore, in 'The Father of Modern India'—Rammohon Roy Centenary Celebration Volume.

রামমোহনের ব্রাহ্ম আন্দোলনের এই সীমাবদ্ধ প্রভাবের কারণ বিশ্লেষণ করলে অবশ্য প্রথমেই এর জন্য দায়ী করতে হবে হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতা বা স্থিতিস্থাপকতাকে। হিন্দুসমাজ কোন দিনই যুগধর্মকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে স্থির থাকতে পারেনি, রামমোহনের বহু আদর্শকেই সে ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করেছে। কিন্তু তাঁর ধর্ম-আন্দোলনের দুটি মূল কথা—একেশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজা-বর্জন—সে আজ পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনের ফলে এ সম্ভাবনার সামান্য অবশেষটুকুও বিলুপ্ত হয়। এ থেকে অবশ্য এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না যে হিন্দুসমাজ একেশ্বরবাদ ও নিরাকার-উপাসনার বিরোধী। হিন্দুধর্মে অধিকারীভেদে উপাসনা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত আদর্শ। তাই মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাধকের জন্য একেশ্বরবাদ ও নিরাকার-উপাসনার বিধান দিয়ে সমাজের সাধারণ লোকের জন্য হিন্দুধর্ম রুচিভেদে বহু দেবদেবীর পূজা ও সাকার-উপাসনার উপযোগিতা স্বীকার করে। হিন্দুধর্মের দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে রামমোহনের মতবাদকে একদেশদর্শী বলেই মনে হবে, কারণ সমাজের সব শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন মিটাবার ব্যবস্থা এতে নেই। ব্রাহ্ম আন্দোলনের এই সঙ্কীর্ণতা রামমোহনের পরবর্তী যুগে আরও বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে যে দলাদলির সৃষ্টি হয়—সমাজের জনপ্রিয়তা-নাশের তাই মূল কারণ।

কিন্তু হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতা ছাড়াও রামমোহনের আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার আরও অনেক কারণ ছিল। রামমোহনের জীবনে উপদেশ ও আচরণের অসঙ্গতি—এ আন্দোলনের দুর্বলতার অন্যতম প্রধান কারণ। ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ ও বিষয়াসক্ত আচরণ—দুএর মধ্যে বিরাট ব্যবধান, এরূপ ক্ষেত্রে উপদেশ কখনও কার্যকরী হয় না।

আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য রামমোহন অনেক সময় কুলার্ণব-ও মহানির্বাণ-তন্ত্রের উক্তি উদ্ধৃত করেন। আশ্চর্যের বিষয় রামমোহন পৌরাণিক হিন্দুধর্মকে হিন্দুসমাজের সমস্ত কুসংস্কার ও জড়তার মূল কারণ বলে নির্দেশ করেন, কিন্তু বামাচারী তান্ত্রিক সাধকরা বাংলায় যে ব্যভিচারের প্লাবন ঘটিয়েছিলেন, তার নিন্দা কোথাও করেননি। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর প্রভাবে রামমোহন যে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পরবর্তী কালে দিল্লী শহরে হরিহরানন্দের এক শিষ্য সুখানন্দ স্বামীর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় হয়। সুখানন্দ স্বামী তাঁকে বলেছিলেন, আমি এবং রামমোহন উভয়েই হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য, রামমোহন রায় আমার মতন তান্ত্রিক ব্রহ্মাবধূত ছিলেন।[২]

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় ভাগে (প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ১৬৪) লিখেছেন,—'তিনি (রামমোহন) তান্ত্রিক শিক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণ করেন, তান্ত্রিক আচারও স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তান্ত্রিক চরম মতবাদও অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে উহাই দেশের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু তন্ত্রের প্রতি বৈষ্ণব ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রগাঢ় বিদ্বেষ দেখিয়া তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের নামোল্লেখ করেন নাই।' যাই হোক রামমোহনের ব্যক্তিগত জীবনে গভীর একাগ্র অধ্যাত্মসাধনার বিশেষ কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। রামমোহনের দেশবাসীরা যে তাঁকে সহজে বুঝতে পারেননি, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। রামমোহনের দু'একটি আচরণ যে সত্যই প্রহেলিকাময়, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

২ দেবেন্দ্রনাথের স্বরচিত জীবনচরিত, দ্বিতীয় সংস্করণ পৃঃ ১২২।

যে বেদান্ত শাস্ত্রের প্রচার তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা স্পষ্ট ছিল না। ১৮২৩ খৃঃ ১১ই ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত এক পত্রে তিনি সরকারী অর্থে বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা দেবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এই পত্রে তিনি বলেন :

Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines, which teach them to believe that all visible things have no real existence, that as father, brother &c, have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better ৩

রামমোহনের মুখে এই যুক্তি সত্যই বিস্ময়কর, বিশেষতঃ যখন আমরা স্মরণ করি যে তিনি ঠিক এই যুক্তিই খণ্ডন করেছিলেন তাঁর ১৮১৫ খৃঃ প্রকাশিত 'বেদান্ত-গ্রন্থে'র ভূমিকায়। শেষোক্ত স্থানে তিনি লিখেছেন :

যদি কহ, সর্বত্র ব্রহ্মজ্ঞান করিলে ভেদজ্ঞান আর ভক্ষ্যাভক্ষ্যের জ্ঞান কেন থাকিবেক, তাহার উত্তর এই যে লোকযাত্রা নির্বাহ নিমিত্ত পূর্ব পূর্ব ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় চক্ষুকর্ণহস্তাদির কর্ম চক্ষুকর্ণহস্তাদি দ্বারা অবশ্য করিতে হয় এবং পুত্রের সহিত পিতার কর্ম, পিতার সহিত পুত্রের ধর্ম আচরণ করিতে হইবেক। যেহেতু এ সকল নিয়মের কর্তা ব্রহ্ম হয়েন, যেমন দশজন ভ্রমবিশিষ্ট মনুষ্যের মধ্যে একজন অভ্রান্ত যদি কালক্ষেপ করিতে চাহে, সেই ভ্রমবিশিষ্ট লোকসকলের অভিপ্রায়ে দেহযাত্রার নির্বাহার্থ লৌকিক আচরণ করিবেক।৪

পরপর উদ্ধৃত এই দুটি রচনা একই ব্যক্তির, এ কথা বিশ্বাস করা সত্যই কঠিন। আমহার্স্টকে লিখিত পত্রে রামমোহন অবশ্য তাঁর দেশবাসীর উন্নতির জন্যই ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হোক—এই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, কিন্তু তার জন্য বেদান্তের মহিমা এতদূর খর্ব করা তাঁর মতো বেদান্তবাদীর পক্ষে কতদূর ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল? সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হলেও এ ব্যাপারে তিনি যে পথ গ্রহণ করেছিলেন, তাতে তাঁর অসঙ্গতির পরিচয় পাওয়া যায়।

রামমোহনের আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার আর একটি প্রধান কারণ ছিল এই যে তাঁর ধর্মবিশ্বাস ছিল প্রায় সম্পূর্ণভাবে যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যুক্তিবাদ মুষ্টিমেয় চিন্তাশীল ব্যক্তির মস্তিষ্কের ধর্ম, অগণিত জনসাধারণের হৃদয়ের ধর্ম তা হতে পারে না। পরবর্তীকালে এই সত্য উপলব্ধি করেই বোধ হয় কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতারা ব্রাহ্ম আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার জন্য নগর-সংকীর্তন প্রভৃতির আয়োজন করেছিলেন। রামমোহনের মধ্যে প্রকৃত ধর্মগুরুর হৃদয়ের উত্তাপ আমরা লক্ষ্য করি না, লক্ষ্য করি শুধু দার্শনিকের চিন্তাশীলতা। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে যথার্থই বলেছেন :

There was more of the spirit of a cautious philosopher than of the consuming fire of a prophet in him.

স্ট্যাণ্ডফোর্ড আর্নটের উক্তি সত্য হ'লে রামমোহন নিজেও শেষ জীবনে যুক্তিবাদের উপর আস্থা কিছুটা হারিয়েছিলেন। যুক্তিবাদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতাও রামমোহনের আন্দোলনকে কিছুটা দুর্বল ক'রে দিয়েছিল। শাস্ত্রজ্ঞানী রামমোহন বহু দেবদেবীর পূজা ও মূর্তিপূজাকে নিম্নস্তরের অধিকারীর উপযুক্ত বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং তার ফলে নিরাকার-উপাসনার পক্ষে তাঁর যুক্তি সাধারণ লোকের কাছে আর তত প্রবল মনে হয়নি।

৩ রাজনারায়ণ বসু : হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত। দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত—পৃঃ ১০।

৪ রামমোহন গ্রন্থাবলী, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ বেদান্ত-গ্রন্থের ভূমিকা : পৃঃ ৫—৬।

উপরের আলোচনা হতে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—ধর্মসংস্কারক হিসাবে রামমোহনের প্রকৃত স্থান তাহলে কোথায়? রামমোহনের জীবনীকার শ্রীমতী কলেট অবশ্য বলেছেন:

He was above all and beneath all a religious personality. The many and far-reaching manifestations of his prolific energy were forthputtings of one purpose. The root of his life was religion

পরবর্তীকালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও কলেটের এই উক্তির সমর্থন করেছেন।[৫]

কিন্তু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এই মত আদৌ বিচারসহ নয়। রামমোহন মূলতঃ ছিলেন মানবিকতাবোধ-সম্পন্ন দার্শনিক। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্ তাঁকে 'The first really earnest investigator in the science of comparative theology' বলে অভিহিত করেছেন। রামমোহনের জীবনের বহু বিচিত্র রূপের মধ্যে তাঁর এই মানবিকতাবোধ-সম্পন্ন দার্শনিকের রূপটিই বোধ হয় একমাত্র যথার্থ রূপ, কিন্তু ধর্মগুরু বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি রামমোহন আদৌ তা ছিলেন না। প্রাচীন কালের কথা বাদ দিলেও মধ্যযুগের ভারতবর্ষে রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য প্রমুখ যে সব ধর্মগুরু আবির্ভূত হয়েছিলেন, জনচিত্তের উপর তাঁদের প্রভাব অধিকতর। রামমোহনের জীবনে ধর্মসংস্কার একটি গৌণ উদ্দেশ্য ছিল বলেই মনে হয়, তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সমাজ-সংস্কার। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন যে এদেশে সমাজের সঙ্গে ধর্মের যোগ এত নিবিড় যে সমাজ সংস্কার করতে হ'লে তার ভিত্তিস্থানীয় ধর্মকেও কিছু পরিবর্তন করতে হবে। রামমোহনের এই মনোভাবের কথা তাঁর প্রায় সমসাময়িক কিশোরী চাঁদ মিত্র ১৮৪৫ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে 'ক্যাল্‌কাটা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন,

He was a religious Benthamite and estimated the different creeds, existing in the world, according to his notion of their *truth or falsehood, but* his *notion of* their utility, according to their tendency to promote the maximization of human happiness and the minimization of human misery.

অর্থাৎ, রামমোহন বিভিন্ন ধর্মের মূল্য নিরূপণ করতেন তাদের অন্তর্নিহিত সত্যাসত্য বিচার ক'রে নয়, সমাজের সুখবৃদ্ধির পক্ষে তারা কতদূর সহায়ক হবে সেই বিচার ক'রে। রামমোহন নিজেও ১৮২৮ খৃঃ ১৮ই জানুআরিতে লিখিত এক পত্রে বলেছেন: প্রচলিত হিন্দুধর্ম, বিশেষতঃ জাতিভেদ-প্রথা এবং আচার-বাহুল্য তাঁর দেশ-বাসীর রাজনৈতিক উন্নতিসাধনের পক্ষে প্রধান অন্তরায় এবং অন্ততঃ তাদের রাজনৈতিক উন্নতি এবং সামাজিক সুখের জন্যই প্রচলিত ধর্মব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন করা প্রয়োজন।—

"It is, I think, necessary that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort."[৬]

সমাজ-সংস্কারক হিসাবে, রাজনৈতিক চিন্তানায়ক হিসাবে, বাংলা গদ্যের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে ইতিহাসে রামমোহনের স্থান সুনির্ধারিত। রামমোহনের বহুমুখী প্রতিভাকে স্বীকার ক'রে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিককে এ কথা বলতেই হবে যে ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর কীর্তি অনুরূপ নয়। রামমোহনের মত যুক্তিবাদীর বিচার যুক্তির সাহায্যেই সম্পন্ন হওয়া উচিত, উচ্ছ্বাসের সাহায্যে নয়।

৫ Vide Introduction to the Second Edition of the English works of Raja Rammohun Roy, published by the Panini Press, Allahabad in 1906.

৬ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যসাধক চরিতমালা—১৬, পৃঃ ১১৫।

শ্রীমধ্বাচার্য ও তাঁহার সম্প্রদায়

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

[গতমাসে এই প্রসঙ্গে মধ্বমত ও মধ্বসম্প্রদায়ের চারজন সাধকের কথা আলোচিত হইয়াছে, এখানে আরও ছয়জনের কথা বলা হইতেছে। উঃ সঃ]

(৫) কনকদাস

কনকদাস নীচবংশসম্ভূত ছিলেন এবং ব্যাসরায় ব্রাহ্মণগণের প্রবল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁকে 'তীর্থ' পুণ্যজলক্ষেপে 'দাসকূটে'র অন্তর্ভুক্ত করেন। কনকদাসও ১৫২৫ খৃঃ দীক্ষার দিন থেকে নিজের সুদীর্ঘ ৯১ বৎসরব্যাপী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মাধ্ব-ধর্মের পরিপুষ্টি সাধন ক'রে গেছেন।

তাঁর রচিত 'নরসিংহ-স্তোত্র', 'মোহন-তরঙ্গিণী', 'রামধ্যানমন্ত্র', 'হরিভক্তি-সার', 'নলচরিতে' প্রভৃতি ভক্তিধর্মের উপাদেয় কন্নড় গ্রন্থ।

কনকদাস উডুপির কৃষ্ণ-মন্দিরে প্রবেশাধিকার লাভ করতে না পেরে একটি ছোট জানালার ভেতর দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন করেন। কনকদাস এই খিড়কীর মধ্য দিয়ে দেখেছিলেন বলে এখনও এই জানালা বা খিড়কীকে 'কনক-খিড়কী' বলা হয়।

কনকদাস মনকে উপদেশ দিয়ে এক স্থানে বলছেন: মন। তুমি ভাল ক'রে বোঝ। অচিরেই ভগবান্ তোমার উদ্ধার সাধন করবেন। পাষাণময় পর্বতাগ্রে গর্ত খুঁড়ে, জলের বাঁধ বেঁধে কে প্রবর্ধমান বৃক্ষসমূহকে নিরন্তর রক্ষা করছেন? এত রঙে বিভূষিত ক'রে কে ময়ূরের সৃষ্টি করেছেন? মিষ্টভাষী শুকের দেহে সবুজের মায়া কে মাখিয়ে দিল? যে ভগবান্ প্রস্তরের মধ্যে জন্মপরিগ্রহশীল ভেকের জন্য পর্যন্ত খাদ্য প্রস্তুত ক'রে রাখেন, তিনি কি তোমাকে কখন ভুলবেন? অচিরেই আদিকেশব তোমায় রক্ষা করবেন।

স্বকৃত 'হরিভক্তিসার' নামক কন্নড়-গ্রন্থের একটি সঙ্গীতে তিনি বলেছেন: ভগবন্। তুমি নিজের অশেষ বৈভব হেতু মদোদ্ধত হয়ে যদি দরিদ্রের দিকে না তাকাও, তা হ'লে আশ্রয়হীনের যে আশ্রয় থাকে না। সে কি তোমার করা উচিত?

বর্ণপ্রথার যাঁরা পক্ষপাতী, তাঁদের প্রতি তিনি কটূক্তি করেছেন, একটি সঙ্গীতে তিনি বলছেন: এই পৃথিবী 'বর্ণ, বর্ণ' করে অনর্থক কোলাহল করছে। ধর্মপরায়ণদের আবার বর্ণ কি? কর্দমজাত পদ্ম দিয়ে কি নারায়ণের পূজা হচ্ছে না? গো-শরীরজাত দুগ্ধ কি ভূ-সুরেরা পান করছে না? কস্তুরীমৃগের অঙ্গ-মলজাত কস্তুরী নিয়ে দেবতারাও অঙ্গ বিলেপন করেন। নারায়ণের জাতি কি? পার্বতীনাথের জাতিই বা কি? আত্মা, জীব এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়েরই বা কি জাতি? আদিকেশব যখন তুষ্ট হন, তখন জাতি থাকে কোথায়?'

(৬) বাদিরাজতীর্থ (সোদেবাজক)

১৪০২ শকে (খৃঃ ১৪৮০) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর পাঁচ বৎসর পূর্বে বাদিরাজতীর্থ মাঙ্গালোর জেলায় প্রাদুর্ভূত হন। তাঁর মাতাপিতার নাম গৌরম্মা ও রামভট্ট। তাঁর পূজ্য দেবতা হয়বদন। প্রথিত আছে যে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং তাঁর রচিত 'তীর্থ-প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থ তত্ত্ব ও তথ্যের দিক থেকে অতি উচ্চাঙ্গের।

মধ্বসম্প্রদায়ে মধ্বাচার্যের পরেই বাদিরাজের[১] স্থান বললে অত্যুক্তি হয় না। মাধ্বেরা বিশ্বাস করেন যে বায়ুর অবতার হনুমান, ভীমসেন এবং মধ্বাচার্যের মতো পরের কল্পে বাদিরাজই বায়ুর অবতার হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন।

বাদিরাজ অতি উচ্চ শ্রেণীর সংস্কৃত ও কন্নড ভাষাকবি ছিলেন। বহু সুলাদি [ছন্দোবিশেষ] এবং ভক্তিমূলক সঙ্গীত ব্যতীত তিনি বাইশখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। সংস্কৃতে (১) গুরুবাজীয় সুধা টিপ্পনী (২) তত্ত্ব-প্রকাশিকা, (৩) তাৎপর্য-নির্ণয়-টীকা, (৪) তন্ত্রসারটীকা, (৫) ভগবদ্গীতা-টিপ্পনী, (৬) তীর্থ-প্রবন্ধ, (৭) মহাভারত-টিপ্পনী, (৮) রুক্মিণীশ-বিজয়, (৯) গুর্বর্থদীপিকা, (১০) প্রমেয়-সংগ্রহ, (১১) যুক্তিমল্লিকা, (১২) সরসভারতী-বিলাস, (১৩) পাষণ্ড-মত-খণ্ডন, (১৪) একাদশী-নির্ণয়, (১৫) সঙ্কল্প-পদ্ধতি, (১৬) পঞ্চাশৎ-স্তোত্র-সংগ্রহ॥ কন্নড ভাষায়—(১) কন্নড-তাৎপর্য-নির্ণয়, (২) বৈকুণ্ঠ-বর্ণনে, (৩) গুপ্ত-ক্রিয়া, (৪) লক্ষ্মী শোভন, (৫) স্বপ্নগদ্য, (৬) ভ্রমর গীতা—এতদ্ব্যতীত সুলাদি ও ভক্তিমূলক গান। এ ছাড়াও বাদিরাজ অস্পৃশ্যদের নিমিত্ত 'তুলু' ভাষায় গান লিখেছিলেন, যা এখনও পর্যন্ত গাওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে বাদিরাজের প্রশংসনীয় সমাজ-সেবার উল্লেখ ও এখানে অবশ্য করণীয়। তিনিই উত্তর ও দক্ষিণ কন্নড়ের সকল সুবর্ণ বণিককে বৈষ্ণবধর্মে আকৃষ্ট করেছিলেন। তাঁরা এখনও পর্যন্ত স্বাদি মঠের আশ্রিত।

১২০ বৎসর বয়সে ১৬০০ খৃঃ তিনি দেহ রক্ষা করেন। অত্যন্ত সুখের বিষয়, জীবদ্দশায় তিনি চূড়ান্ত সম্মান লাভ ক'রে গেছেন।

অন্যান্য হরিদাস কবিদের মতো, বাদিরাজও সংসারের অনিত্যতা, চারিত্রিক অভ্যুন্নতি, নীতি-পরায়ণতা, নাম-মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয়ে বহু কথা বলেছেন। তবে মাধ্ব-ধর্মের উপর তিনি যে রকম জোর দিয়েছেন, অত জোরের সঙ্গে মাধ্ব-ধর্মের চরম উৎকর্ষের কথা আর কেউ বলেননি। একটি সঙ্গীতে তিনি বলেছেন:

মাধ্ব ধর্মই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম তা প্রমাণ করার জন্য আমি কোন্ শপথ গ্রহণ ক'রব? হে মানব! এ বিষয়ে সকল বিদ্বজ্জন এক মত। গুরু মধ্বাচার্যের মতই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে তুলসী নিয়ে কি আমি প্রতিজ্ঞা ক'রব? অন্য ধর্মসমূহ যে বেদ-বিরুদ্ধ, তা প্রমাণ করার জন্য আমি কি সমুদ্র পার হবো? ভাগবত শাস্ত্রই যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র, তা প্রমাণের জন্য আমি কি অত্যন্ত ভারী কোন জিনিস উত্তোলন ক'রব? ভাগবতকে ঘৃণা করলে তার জন্য যে নরক সুনির্দিষ্ট, সেটি প্রমাণ করার জন্য আমি কি পর্বতের উপর থেকে গড়িয়ে প'ড়ব? দেব-সমূহের মধ্যে বিষ্ণুদেবতাই যে প্রধান, তা কি বেদ ও আগম শাস্ত্রকে দিয়ে বলাতে হবে? মোক্ষ লাভের নিমিত্ত তারতম্যই[২] যে শ্রেষ্ঠ পন্থা, সেটি প্রমাণ করার জন্য কি আমি বিষমতম বিষ পান ক'রব? হরিবাসর বা একাদশী এবং তার পরের দিনের মত যে দিন নেই, সেটি প্রমাণ করার জন্য আমি কি একটি ধাবমান কালসর্পকে ধরে নিয়ে আসব? মানব-জীবন সংরক্ষক যে আনন্দতীর্থ বা মধ্ব, সেটি প্রমাণ করার জন্য কি আমি গায়ে আগুন ধরিয়ে দেব? অত্যুদার হয়বদন যে সর্বগুণ-বিমণ্ডিত, সেটি প্রমাণ করার জন্য কি আমি আকাশবাণীর আশ্রয় গ্রহণ ক'রব?

১ মধ্বাচার্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুতীর্থের মঠনিবাসী বাগীশতীর্থের শিষ্য, প্রবাদ ইনি ব্যাসরায়েরও শিষ্য।

২ মধ্বের মতে পঞ্চবিধ ভেদ অনাদি ও নিত্য, যথা: জীবেশ্বর, জড়েশ্বর, জীবভেদ, জড়জীবভেদ এবং জড়ভেদ। জীব-ভেদের মধ্যে আবার জীবে জীবে প্রভূত তারতম্য। এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করবার বাসনা রইল।

(৭) বিজয়দাস

১৬৮৭ খৃঃ বিজয়দাস জন্ম পরিগ্রহ করেন তুঙ্গ-ভদ্রা তীরস্থ রাইচুড় জেলার চিকনপরচি গ্রামে। ১৭৫৫ খৃঃ ৬৮ বৎসর বয়সে তিনি দেহ রক্ষা করেন। বিজয়দাসের তিন শিষ্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন—ভাগন্না (গোপালদাস), তিম্মন্না এবং মোহন্না। বিজয়দাস তাঁদের ভক্তিমান্ ভাগন্না, শক্তিমান্ তিম্মন্না এবং চালাক মোহন্না নামে অভিহিত করতেন। রচনার পরিমাণের দিক থেকে বিজয়দাসকেই পুরন্দরদাসের পরে স্থান দিতে হয়।

বিষয়ের বৈচিত্র্যে, ভাবের গাম্ভীর্যে, ভাষার সারল্যে ও রচনার পারিপাট্যে বিজয়দাসের রচনা কন্নড় ভাষার এক অতি অভ্যুন্নত স্থান অধিকার ক'রে আছে।

বিজয়দাস একটি কবিতায় বলছেন যে তিনি ভগবানকে দেখতে চাচ্ছেন না, চাচ্ছেন ভক্ত-গণকে দেখতে : আহা! আমি এখানে তোমাকে দেখতে আসিনি, এসেছি ভক্তগণের পাদপদ্ম দর্শন করতে। তুমি যখন সর্বত্রই বিদ্যমান, তখন তোমাকে দেখবার জন্য এই বিশেষ স্থানে আগমনের কি প্রয়োজন? ডাকলেই যখন তুমি ছুটে আস, তখন তোমাকে দেখবার জন্য আমার এতদূরে ছুটে আসার কি প্রয়োজন? তোমার শরণাগত যাঁরা, তাঁরা তো তোমাকে সর্বত্রই দেখতে পান। সুন্দর! জ্ঞানীদের মনোভূমিতে তুমি নিরন্তর নৃত্য কর। কিন্তু তোমার ভক্ত-গণের সাক্ষাৎ পাওয়াই যে দুর্ঘট ব্যাপার।

ভগবানের নিকট ভক্তি ভিক্ষা ক'রে বিজয়-দাস বলছেন : শুধু এইটুকু কর যেন আমি মধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে থাকতে পারি। অন্য মত-প্রদর্শিত পথ যেন আমি ভুলে যাই। তুমি আমাকে সজ্জনসঙ্গে রাখ, সংসার-পাশবিনাশী তোমার নামামৃত-প্রসাদ আমাকে দান কর।

(৮) গোপালদাস

গোপালদাস (ভাগন্নাদাস) শক ১৬৫০ বা ১৭১৭ খৃঃ রাইচুড জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। দাসপ্পা, সীনপ্পা এবং রঙ্গপ্পা নামক তাঁর তিন ভাইও দাসকূটে যোগদান করেন। মধ্বাচার্যের তাৎপর্য-নির্ণয় গ্রন্থের দত্ত-কর্তৃত্ব খণ্ডন-লক্ষণ অনুসারে ত্রিবিধ জীবের (সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস) ভগবদ্দত্ত স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে 'হঠবাদ' নামক একটি গ্রন্থ গোপালদাস রচনা ক'রে গেছেন। কথোপ-কথনের আকারে গ্রন্থটি রচিত। দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্রৌপদী এবং পরে ভীমসেন কথোপকথনে রত। যুধিষ্ঠির ক্ষমার পক্ষপাতী, এবং দ্রৌপদী ও ভীমসেন যুদ্ধকর্মের পক্ষপাতী। ধর্মরাজের মতে সমস্ত জগৎ ক্ষমাগুণের উপর বিধৃত এবং এই ক্ষমাগুণ বিশ্বেশ্বরেরই শক্তিপুষ্ট। নারায়ণ বিশ্বের নিমিত্ত (efficient) কারণ বলে জীবের যাবতীয় কর্ম তাঁর অধীন এবং তাঁরই প্রেরণাবলে সম্পাদিত হয়। ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত মানুষের স্বাধীনভাবে কোনও কাজ করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু দ্রৌপদী এবং পরে ভীমসেন বলছেন যে তাঁরা দত্ত-কর্তৃত্ব শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। জীব ভগবানের দেওয়া শক্তি পাওয়ার পর নিজের বিবেচনানুসারে সেই শক্তি প্রয়োগ করবেন। তা না হ'লে মানুষের কর্ম এবং কর্মপ্রসূত ফল সবই ভগবানের উপর আরোপ করতে হয়। কিন্তু তা ন্যায়-সঙ্গত নয়।

(৯) জগন্নাথদাস

জগন্নাথদাস শক ১৬৪৯ বা ১৭২৭ খৃঃ রাইচুড় জেলার ব্যাসবট্টি গ্রামে এক কুলকর্ণি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শক ১৭৩১ বা ১৮০৯ খৃঃ তিনি ধরাধাম ত্যাগ করেন।

জগন্নাথদাস সংস্কৃত এবং কন্নড় উভয় ভাষাতেই তাঁর রচনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

আধ্যাত্মিক সঙ্গীত ও তত্ত্বসূবালি ব্যতীত হরি-কথামৃতসার তাঁর অতি উপাদেয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মাধ্ব দর্শন অতি সুন্দরভাবে কন্নড ভাষায় বিবৃত হয়েছে। মহীশূরের টিপু সুলতানের প্রধান মন্ত্রী পূর্ণয্যা তাঁর বিশেষ গুণমুগ্ধ ছিলেন।

প্রবাদ অনুসারে ইনি একবার যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হন। গুরু বিজয়দাস গোপালদাসকে আদেশ দেন, তিনি যেন তাঁর জীবন থেকে ৪০ বৎসর আয়ুষ্কাল জগন্নাথদাসকে দেন। গোপাল দাস তদনুসারে তাঁকে আয়ু দান করেন।[৩]

খ্রীষ্টানদিগের পক্ষে যেমন বাইবেল, মাধ্বগণের কাছে জগন্নাথদাসের 'হরিকথামৃতসার'ও তাই। কন্নড ভাষায় ভামিনী ষটপদী ছন্দে ৩৩টি সন্ধিতে রচিত এই গ্রন্থ মাধ্ব সম্প্রদায়ের সকলেরই নিত্য পূজ্য ও নিত্য পাঠ্য, এই গ্রন্থের শেষ সন্ধিটি জগন্নাথদাসের শিষ্য শ্রীদ বিট্‌ঠল রচনা করেন। ভগবৎ-প্রসাদ, ভগবানের সর্বব্যাপিত্ব, আত্মসমর্পণ, ধ্যান, নাম-মাহাত্ম্য দত্ত-স্বাতন্ত্র্য, ক্রীড়াবিলাস, বন্ধ-মোক্ষ, তারতম্যবাদ, দুঃখনিবারণ, অপরোক্ষ জ্ঞান প্রভৃতি সর্ব বিষয়ের আলোচনা এই গ্রন্থে রয়েছে।

তারতম্যবাদ প্রসঙ্গে জীবের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জগন্নাথদাস বলেছেন: দেবতা, ঋষি, প্রেত-গণ ও শ্রেষ্ঠ মানবেরা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, সাধারণ মানুষেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর, অসুর, দৈত্য, অধম মানব—এরা তৃতীয় শ্রেণীর। এই সকল প্রাণী এই জগতে এবং পরলোকে পরমাত্মা এবং নিজেদের থেকেও সর্বদা স্বতন্ত্র থাকে।

(১০) নারী কবি হেলবনকট্টি গিরিয়ম্মা

দাসকূটের নারী কবি ভীমব্বা, রামেশ্বর অব্বনবক্ক (গলগলি পবিবাবের) এবং হেলবন-কট্টি রঙ্গ-গিরিয়ম্মা—এই তিন জনের মধ্যে শেষোক্ত কবিই শ্রেষ্ঠা। সৌভাগ্যক্রমে দাক্ষিণাত্যে কন্নডভাষায় হোন্নম্মা, মহাদেবিয়ক্কা, শৃঙ্গারম্মা, মালয়ালমে কুট্টিক্কুঞ্ঞ্ তকচ্চি, তামিলে অব্বার ও অণ্ডাল, তেলুগুতে মেমল্লা প্রভৃতি বহু নারী কবি জন্মগ্রহণ ক'রে দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব-ধর্ম সম্প্রসারণের বিশেষ সহায়তা করেছেন।

হেলবনকট্টি গিরিয়ম্মা গোপালদাস এবং রাঘবেন্দ্রস্বামি-মঠের সুমতীন্দ্র যতির সমসাময়িক ছিলেন। বহু আধ্যাত্মিক সঙ্গীত ব্যতীত ইনি 'চন্দ্রহাস', 'সীতাকল্যাণ কথে' এবং 'উদ্দালিকন কথে' নামক গ্রন্থও রচনা করেছেন।[৪]

ভক্তবৎসল হরিকে সম্বোধন করে নারী কবি এক স্থানে বলছেন, 'আমার প্রতি তুমি দয়া প্রদর্শন কর না কেন? সংসার-সমুদ্রে আমাকে ত্যাগ করা কি তোমার উচিত? আমাকে কূলে নিয়ে চল। তুমি ছাড়া আমাকে আর কে রক্ষা করবে? তুমিই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ, তোমার যশের পরিধি নেই। সেই তোমার ক্রোধ, দেখ না তুমি কোনও দোষ। হে রঙ্গ। তুমি দরিদ্র-বান্ধব। দ্রৌপদীর সম্মান তুমিই রক্ষা করেছিলে। হে নাথ। তুমি আমাকে রক্ষা কর।'

নিরন্তর মনঃসংযমের চেষ্টা করেও অসমর্থা হয়ে কবি মনকে সম্বোধন ক'রে বলছেন: 'হে মন। তুমি এত চঞ্চল হলে কেন, দুষ্টুমি ত্যাগ কর। সদ্বিবেচনা ত্যাগ ক'রে তুমি সংসার মায়ায় বদ্ধ হয়ে কষ্ট পেও না। ধনদৌলতের আসক্তিতে প্রপীড়িত হয়ো না। ভগবানকে স্মরণ কর। এই দেহ শাশ্বত নয়। মন।

৩ এই প্রসঙ্গে উডুপি শ্রীকৃষ্ণ প্রেস থেকে পবজ্জে গুরু রাও কর্তৃক প্রকাশিত 'জগন্নাথদাসরে কীর্তনেগলু' নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। কলমদানির 'জগন্নাথদাসর চরিত্রে' গ্রন্থও দ্রষ্টব্য।

৪ বাঙ্গালোর থেকে প্রকাশিত দেশপাণ্ডে রামরাও সংশোধিত 'গিরিয়ম্মনবর চরিত্রে' নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

যমযন্ত্রণার অধীন হয়ো না। 'তোমার, আমার' পদবাচ্য বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ কর। তোমার হওয়া উচিত ফলাভ্যন্তরস্থ বীজের মতো। মন, তুমি পরের দোষগুণের দিকে না তাকিয়ে নিজের দিকে তাকাও। মন, এই শরীরের রঙ তো উডুম্বর ফলের রঙের মত। মন! ভগবৎ-সেবা কর এবং হৃদয়ের সমস্ত আনন্দ উজাড় ক'রে দিয়ে তুমি মুক্তি কামনা কর।

গিরিয়ম্মার ব্যক্তিগত জীবন ছিল অতি পবিত্র। কথিত আছে—যদিও তিনি বিবাহ করেছিলেন, তাঁর স্বামী তিপ্প আরসা তাঁর সঙ্গে রাত্রে দেখা করতে এলেই শয্যায় একটি কৃষ্ণ সর্প দেখতে পেতেন। ফলে তাঁর স্বামী দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। হেব্বনকট্টিতে অবস্থিত মন্দিরে তিনি রঙ্গ এবং লিঙ্গ উভয়েরই উপাসনা করতেন। কথিত আছে যে এইখানেই গোপাল-দাসের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়।

সম্প্রদায়ের দিক থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদের সঙ্গে মধ্ব-দর্শনের ভেদবাদের পার্থক্য বিস্তর। দাসকূট কবিগণ ভগবানকে মাতা, পিতা, ভ্রাতা বলে সম্বোধন করেছেন, সে ভাবেই তাঁর প্রতি হৃদয়ের আকুতি জানাচ্ছেন—কিন্তু কোথাও প্রিয়া-প্রিয়ের মধুর ভাব ফুটে ওঠেনি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন মধুরভাবেরই তো পূর্ণ উৎসারণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে মাধ্ব ধর্ম ও দর্শনের তুলনামূলক সমালোচনা অত্যন্ত অপেক্ষিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্র-দায়ের কবি ও লেখকদের কণ্ঠধ্বনি মাধ্ব সম্প্রদায়ের কবিগণের কণ্ঠেও বেশ শোনা যায়। সেই জন্যই এই প্রয়োজনের গুরুত্ব অধিক-তর অনুভব করি। মাধ্ব সম্প্রদায়ের অধিকাংশ গ্রন্থ কন্নড়ভাষায় লিখিত বলে এই গুরু দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করবেন, তাঁর কন্নড়-ভাষায়ও পটুত্ব বিশেষ প্রয়োজন।

মাধ্ব সম্প্রদায়ের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্র-দায়ের বিশেষ মিল এই যে উভয় সম্প্রদায়ই দেশীয় ভাষার মাধ্যমে ধর্ম ও দর্শন প্রচার করে-ছেন, নারীদের কোন ধর্মাধিকার থেকে বঞ্চিত করেননি, তদুপরি ধর্মের রাজ্যে বর্ণপ্রথা অস্বীকার ক'রে উভয় সম্প্রদায়ই ধর্ম সমাজে মিলনের ক্ষেত্র প্রশস্ততর ক'রে তুলেছেন। কিন্তু দর্শনবাদে মাধ্ব দর্শন ভেদের পর ভেদের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে মাধ্বাচার্যগণও পরমত আক্রমণে বদ্ধপরিকর। বাদিরাজের মতো মহাপণ্ডিতও 'পাষণ্ডমত-দলন' গ্রন্থ লিখেছেন। অন্য দিকে তাঁদের বিরুদ্ধ-বাদীরা মাধ্ব-মুখভঙ্গ, মধ্বমুখমর্দন প্রভৃতি গ্রন্থ লিখে তাঁদের আবার কটূক্তি করেছেন। মাধ্বদের আক্রমণ শাঙ্করদের উপরেই সমধিক।

সাধনমার্গ—ভক্তিই হোক্ আর জ্ঞানই হোক্—তাতে সর্বদা ত্যাগ ও বৈরাগ্য, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি সমভাবে অপেক্ষিত। বেদান্তসারের টীকাকার রামতীর্থ যতি বলেছেন, 'চিত্তশুদ্ধেঃ পরমপ্রয়োজনত্বং পরম্পরয়া মোক্ষসাধনত্বাৎ'। সাধনমার্গে দেহসুখ ত্যাগ, দেহ-বিস্মৃতি অবশ্য-ম্ভাবী। গোপীগণের দৃষ্টান্ত থেকে দেখতে পাই তাঁরা সর্ব জাগতিক স্মৃতি থেকে বহু দূরে সরে গেছেন—

'বিক্রেতুকামা কিল গোপকন্যা
মুরারিপাদার্পিতচিত্তবৃত্তিঃ।
দধ্যাদিকং মোহবশাদ্ অবোচদ্
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥'

মোক্ষপথানুসরণে পার্থক্য প্রতীতি হয় ভক্তিমার্গীদের সবিশেষ পথাবলম্বনে, এবং জ্ঞানকর্মীদের নির্বিশেষ সংচিন্তনে—নিদিধ্যাসনে বা সবিশেষ পথ অবলম্বনে। এই শেষোক্ত বিষয়

নিয়ে যত মনোমালিন্য। মানুষের ভিন্ন রুচি থাকবেই। মস্তিষ্কপ্রধান ব্যক্তি জ্ঞানের দিকে এবং হৃদয়প্রধান ব্যক্তি ভক্তির দিকে ঝুঁকবে—এটি স্বাভাবিক। তা নিয়ে কোলাহল ও অশান্তির সৃষ্টি করলে ধর্মজগতের নিবিষ্ট দর্শক যাঁরা, তাঁদের ভীতি উৎপাদন করা হয় মাত্র। লাভ তো কিছুই নেই। বরফ ও বরফগলা জলের মতো এর পার্থক্যই বা কতটুকু? গীতাভূষণ-ভাষ্যে বলদেব বিদ্যাভূষণ কি সুন্দর কথাই বলেছেন—'উচ্যতে, জ্ঞানমেব কিঞ্চিদ্ বিশেষাদ্ ভক্তিরিতি। নির্ণিমেষবীক্ষণ-কটাক্ষবীক্ষণবদনয়োরন্তরম্'—জ্ঞান ও ভক্তি, যেন অনিমেষ দেখা ও কটাক্ষে দেখা।

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ 'প্রীতি-সন্দর্ভে' বলেছেন,—'তচ্চ পরমতত্ত্বং দ্বিধাবির্ভবতি, অস্পষ্ট-বিশেষত্বেন স্পষ্ট-স্বরূপভূতবিশেষত্বেন চ'। তাঁর মতে ব্রহ্মাণ্ড অস্পষ্ট বিশেষ পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের উপায় জ্ঞান এবং ভগবদাখ্য স্পষ্ট বিশেষ পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের উপায় ভক্তি। সহস্রারে যিনি, হৃৎপদ্মেও তিনি। সহস্রারে যিনি নির্গুণ, হৃদয়ে তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ইষ্ট।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্ত দার্শনিকদের এই উক্তি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং সর্বজনগ্রাহ্য। মুক্তির উপায় কেবল একটি, আর কিছুই নেই—এ কোন কাজের কথা নয়। এ বিষয়ে মধুসূদন সরস্বতীর জীবনাদর্শ এক অপূর্ব সমন্বয়ের সন্ধান দেয়। অত বড় বৈদান্তিক—লিখলেন 'অদ্বৈতসিদ্ধিঃ', ব্রহ্মের নির্গুণত্ব, নিরাকারত্ব সবই সংস্থাপন ক'রে সঙ্গে সঙ্গেই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলছেন: আমার ঘনশ্যাম বংশীবদন পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণ থেকে পরতত্ত্ব আমি আর কিছুই জানিনে।

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ।
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বং ন জানে॥

এই লেখকই একাধারে ভক্তি-রসায়ন-গ্রন্থে 'ভক্তি'র প্রতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির বিরোধ তিনি মোটেই স্বীকার করেননি। সেইজন্যই তিনি বলতে পেরেছিলেন, সব বিধি-নিষেধকে একটি কথায় বলে দেওয়া যায়:

স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব বিধিনিষেধাঃ স্যুঃ এতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

—অর্থাৎ সতত ভগবান্‌কে স্মরণ করবে, তাঁকে কখনও ভুলবেন না, এই একমাত্র বিধি-নিষেধ, অন্য সব বিধি-নিষেধ এরই কিঙ্কর।

জয়ন্তভট্ট নৈয়ায়িক—সব কিছু কুটি কুটি বিশ্লেষণ ক'রে তারপর তিনি কোন কথা বলেন। তিনি তাঁর 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থে বলছেন:

যে চ বেদবিদামগ্র্যাঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদয়ঃ।
প্রমাণমনুমন্যন্তে তেঽপি শৈবাদি-দর্শনম্॥
পাঞ্চরাত্রেঽপি তেনৈব প্রামাণ্যমুপবর্ণিতম্।
অপ্রামাণ্যনিমিত্তং হি নাস্তি তত্রাপি কিঞ্চন॥

গ্রন্থের শেষে আরও একটু অগ্রসর হয়ে তিনি বলেছেন: বহবো হ্যপায়াঃ একত্র তে শ্রেয়সি সংপতন্তি সিন্ধৌ প্রবাহা ইব জাহ্নবীয়াঃ॥

ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত, ভাববন্যাবিপ্লুত, অণুপরমাণু-প্রকোপ-ত্রস্ত বর্তমান জগতে ধর্ম ও দর্শন শান্তির একমাত্র উৎস। এই উৎসের নীর ব্রহ্মকমণ্ডলু-বাহী জাহ্নবী-তোয়ধারার মত শীতল ও কূটতর্ক-দাবাগ্নিজ্বালা-রহিত হয়ে জগদ্‌জনের ব্যামোহ-গ্রস্ত চিত্তে অনিবার্য শান্তি আনয়ন করুক—এই প্রার্থনা।

চন্দ্রলোকে জনসভা

[দার্শনিকের স্বপ্নদর্শন]

ডক্টর শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দেব

লাইকাকে নিয়ে 'রাশ্যান স্পুটনিকে'র চন্দ্রলোক অভিযানের রোমাঞ্চকর সংবাদ প্রচারিত হবার কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি—যার ভাল ব্যাখ্যা এখনও খুঁজে পাইনি। সর্বদাই তরুণ-পোষণ ও তোষণে ব্যস্ত থাকায় কালিকলমের আঁচড়ে সেই স্বপ্নের একটা চলনসই ছবি আঁকবার সুযোগও তখন জোটেনি। অনলস, দীর্ঘসূত্রী ও অনর্থক অতিব্যস্ততার ফাঁকে যে কাহিনীর স্মৃতি মনের কোণে আবছায়ার মতো মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে, তাকে আজ সত্যি সত্যি কালিকলমের বন্ধন স্বীকার করতে হ'ল।

এই স্বপ্নদর্শনের দিনকয়েক আগে এক বিদ্বজ্জন-সমাবেশে 'দর্শনের প্রয়োজনীয়তা' নিয়ে এক বিতর্ক হয়—যার সঙ্গে আমার স্বপ্নের কিছু অব্যক্ত যোগসূত্র থাকা অসম্ভব নয়। সে বিতর্কে আমি অ'দা-নুন খেয়ে দর্শনের পক্ষ সমর্থন করি, কারণ আমার ক্ষুদ্র জীবনের অজস্র অকৃতকার্যতার ভেতর সাফল্যের যে কণিকা লুকিয়ে আছে তার আসল হ'ল 'দর্শন', বাকীটুকু হ'ল তারই সুদ।

তবে আসলের চেয়ে সুদের উপর বেশী আসক্তি রেখে দুটোকেই না হারাতে হয়, এই ভয়েই এই দর্শন-বিতৃষ্ণার যুগেও দর্শনকে ধরে আছি আঁকড়ে। এই অতি-আসক্তির ফলে যে বাক্‌চাতুরী দেখিয়েছিলাম, তার চাপেই বোধ হয় সেদিনের বিতর্ক-সভায় আমাদের পক্ষই হয়েছিল জয়ী। সে সভায় এক প্রবীণ অধ্যাপক ছিলেন বিরোধী দলের নেতা। বাক্যের তুবড়ী রচনা ক'রে আমাকে নাজেহাল করার চেষ্টা তিনি কম করেননি। হঠাৎ দর্শনের নিরর্থকতা প্রমাণ করবার আগ্রহাতিশয্যে তিনি শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে আমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বাঁকা হাসি হেসে বললেন, "এই যে দেখছেন ডক্টর দেব, একজন বড় ('বড' কথাটি বক্তার উক্তি থেকে উদ্ধৃত। পাঠকের মনে রাখা উচিত বিতর্ক-সভায় বিরোধী দলের কাউকে বড় বলা হয় ছোট অর্থে) দার্শনিক, তাঁকে যদি লাইকার সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয় স্পুটনিকে ক'রে চন্দ্র-লোকে, তবে তাঁর দশা কি হবে?" তার এই চটকদার, চমকপ্রদ উক্তি শুনে মনে হ'ল দর্শনের সাফল্যের সঙ্গে এই অঘটন-ঘটনের নিকট যোগ যদি সত্যি থাকে, তবে তার ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারাচ্ছন্ন তা বলা বাহুল্য। নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার। তবে খুবই আশার কথা এই যে জাগ্রত চেতনায় যে অসম্ভব সম্ভব হয়নি, স্বপ্ন-মানসে তার আংশিক সত্যের হয়েছে অনুভূতি। এতেই ইউক্লিডের উপপাদ্যগুলোর মতো প্রমাণিত হয়ে গেছে যে বাস্তব জীবনে দর্শনের যতই পরাভব ও পরাজয় হোক না কেন, স্বপ্ন-জীবনে তার একাধিপত্য অনস্বীকার্য।

হঠাৎ গভীর রাত্রে হল-ক্যান্টিনের জমাট আসর ও তার নিত্য সহচর অনবরত শব্দের গোলাবর্ষী রেডিও-র স্মৃতি গেল মুছে। সুষুপ্তির ভিতর স্বপ্নের স্বাতন্ত্র্য-লোকে হঠাৎ হ'ল প্রবেশ। যা দেখলাম তার সঙ্গে আজকের দিনের চাঞ্চল্য-কর শ্লোগান-সাইরেনের কোনও যোগ নেই। তথাপি তা অতি বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। হঠাৎ সাদা চোখে দেখতে পেলাম স্পুটনিকে ক'রে

মুহূর্তে অবলীলাক্রমে হাজির হয়ে গেছি চন্দ্রলোকে, বন্ধুবর লাইকা সঙ্গে নেই। ডারুইনের নীতির ঈষৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ অনুসারে লাইকার সঙ্গে আমার প্রাচীন পুরুষানুক্রমিক অনাবিল প্রেমের সম্পর্ক স্মরণ করেই হয়তো প্রবীণ অধ্যাপক বিতর্ক-সভায় তার সঙ্গে আমার সংযোগ-স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। ডারুইনের নীতি সম্ভবতঃ চন্দ্রলোকে অচল। কাজেই অতি যুক্তিসঙ্গত ভাবেই সেখানে আমার একাকী আবির্ভাব।

ছোট বেলা থেকেই ধর্ম ও দর্শনের পুঁথিতে চন্দ্রলোকের কথা পড়ে আসছি। হিন্দুদের পরলোকের কাহিনীতে মৃত্যুর পর পুণ্যবলে চন্দ্রলোকে যাওয়ার কথা আছে। কিন্তু এমন সশরীরে চন্দ্রলোকে যাওয়া বিজ্ঞানের আশীর্বাদেই সম্ভব হ'ল—তবে যা দেখলাম সেটা বৈজ্ঞানিক চন্দ্রলোক না আধ্যাত্মিক চন্দ্রলোক, তা আজও ঠিক করতে পারিনি। আমার চন্দ্রলোক অভিযানের প্রেরণা সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিক, তবে আমার স্বপ্নমানসে চন্দ্রলোকের যে রূপায়ণ হয়েছিল তার উপাদান সম্ভবতঃ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক, বিজ্ঞানের চন্দ্রলোক মোটেই সুদৃশ্য বা রমণীয় নয়। বঙ্কিমচন্দ্র সে জন্যই বলেছেন—চাঁদের সঙ্গে সুন্দর মুখের তুলনা যাঁরা করেন, তাঁরা জানেন না সে উপমা যদি আক্ষরিক অর্থে সত্য হয় তবে তার ফল কি ভয়ানক ও ভয়াবহ। আমার স্বপ্নের চন্দ্রলোক সত্যি খুব মনোরম, মনোহারী, শান্ত, স্নিগ্ধ ও সুন্দর। একবার দেখলে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না।

হঠাৎ দেখি—নেমে পড়েছি চন্দ্রলোকের সেই শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর ও স্বস্তিকর আবহাওয়ায়। সামনে দেখি এক বিরাট জনসভা। সভা সামনে দেখা আমার পক্ষে খুব স্বাভাবিক—তার সঙ্গে আমার একটা নিকট যোগ নিশ্চয়ই আছে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি আবাল্যজড়িত। মহাভারত আলোচনা ক'রে আমি জানতে পেরেছি যে আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো সভাপর্ব ও গদাপর্বের অপূর্ব সমন্বয়, এই দুই পর্বে যাঁরা বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন তাঁদের চরম পরিণতি বনপর্বে ও স্বর্গারোহণ-পর্বে। পৃথিবীর প্রাত্যহিক জীবনের কাদামাটির সঙ্গে ভাল ক'রে যোগ রাখা তাদের পক্ষে অসম্ভব। যাই হোক, এখন সে আলোচনা মুলতবী রেখে চন্দ্রলোকের সভার কথাই বলি। সেই সভায় পৌরোহিত্য করছেন দেখতে পেলাম মহাভাগবত এক ভিক্ষু, তাঁর জ্যোতির্ময় কান্তি, গৈরিক বসন, শান্ত গাম্ভীর্য ও অচঞ্চল প্রসন্ন হাস্য সেই বিরাট জনসমুদ্র থেকে তাঁকে অতি স্বাভাবিক ভাবেই ক'রে রেখেছে পৃথক ও স্বতন্ত্র। ভূতলে গিরিশৃঙ্গের মতো তাঁর চিন্তা জন-মানসের বহু ঊর্ধ্বে।

সে সভার আলোচ্য বিষয়: পৃথিবীতে স্পুটনিক আবিষ্কার ও চন্দ্রলোকে তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া। নানা বক্তার বক্তৃতা শুনে মনে হ'ল পৃথিবীতে স্পুটনিক আবিষ্কারে চন্দ্রলোকের নেতারা ভীত, সন্ত্রস্ত ও বিচলিত। তাদের বক্তব্যের সারমর্ম: চন্দ্রলোকে খাদ্যসঙ্কট নেই। পৃথিবীর জনসংখ্যা অনবরত বেড়েই চলেছে। কাজেই সেখানে খাদ্যসঙ্কট ক্রমবর্ধমান, এ দুরবস্থা অপরিহার্য। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে স্পুটনিক আবিষ্কারের ফলে চন্দ্রলোকে পড়বে পৃথিবীর মানুষের লোলুপ দৃষ্টি ও তাতে হবে সেখানকার শান্তি-ভঙ্গ। যে বাস্তুহারা-সমস্যায় পৃথিবী জর্জরিত—পৃথিবীর মানুষের সংস্পর্শে চন্দ্রলোকেও সে সমস্যার দেখা দেবে। এই ভাবে সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উদ্দেশ্যেই তাঁরা তাঁদের দিশারী ভিক্ষুর পৌরোহিত্যে করেছেন এই বিরাট সভার আয়োজন।

ভয়, নৈরাশ্য ও মানসিক চাঞ্চল্যের যে

আবহাওয়া বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতায় সৃষ্টি হয়েছিল, সভার পুরোহিত শান্তচিত্ত ভিক্ষু যে মুহূর্তে সবার সামনে তাঁর বহুবাঞ্ছিত ভাষণ দেবার জন্য দাঁড়ালেন, অমনি যেন তা চলে গেল। চন্দ্রলোকের গণমানসের এমন আকস্মিক পরিবর্তন দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম ও মনে পড়ল মহাকবি কালিদাসের উক্তি—"চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে", সমস্ত সভা যেন রঙের তুলিতে আঁকা ছবির মতো নিস্পন্দ ও নিশ্চল।

সমাহিতচিত্ত ভিক্ষু শান্তকণ্ঠে বললেন: পৃথিবীর মানুষের উপর তোমাদের ঈর্ষা অযৌক্তিক ও অবাঞ্ছনীয়। তোমরা চন্দ্রলোকবাসী পৃথিবীর মানুষের মতো নানা সংঘর্ষের দ্বারা জর্জরিত নও সত্য, কিন্তু পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকেই—বিশ্বের এক মহাসত্য তোমাদের শিখতে হবে। সে সত্য হচ্ছে বিশ্বের সর্ব জীবের একত্ব। বেদ, বাইবেল, কোরান, ও জেন্দাবেস্তায় যুগ যুগ ধরে এই তত্ত্ব পৃথিবীর মহামানবেরা করেছেন প্রচার। তোমরা চন্দ্রলোকবাসী সে সত্যের খবর রাখ না। স্পুটনিক আবিষ্কারের ফলে সে সত্য হৃদয়ঙ্গম করবার, জীবনে রূপায়িত করবার নূতন প্রেরণা পাবে পৃথিবীর মানুষ ও তাদের সংস্পর্শে এসে সমস্ত বিশ্বের অধিবাসী।

মনুষ্যলোকে অতি প্রাচীন যুগে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য খুব জোরের সঙ্গে গার্গীকে বলেছিলেন, এই অবিনাশী ও অক্ষর তত্ত্বকে না জেনে যে যজ্ঞ-তপস্যাদি করে, তার সমস্তই নিষ্ফল, সে তত্ত্বসুখসম্ভোগ-বঞ্চিত কৃপণ। মনুষ্যলোকে বিজ্ঞানের বিরাট জনকল্যাণ-যজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে আজ হতে চলেছে নিষ্ফল। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বিজ্ঞানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রে সেই মহাযজ্ঞকে সাফল্যমণ্ডিত করাই আজকের দিনে মনুষ্যলোকবাসী ও চন্দ্রলোকবাসী উভয়েরই অপরিহার্য কর্তব্য। তাতেই দূরীভূত হবে সবার জীবনের দৈন্য, নৈরাশ্য ও কার্পণ্য।

চন্দ্রলোকবাসী বন্ধুগণ, পৃথিবীর মানুষ চন্দ্রলোকের উপর হামলা করবে—এই আশঙ্কা অমূলক। বিজ্ঞানের দৌলতে পৃথিবীর মানুষ আজ বেশ বুঝতে আরম্ভ করেছে যে যুদ্ধের ফল অতি ভয়াবহ। বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত মারণাস্ত্র যুদ্ধে ব্যবহৃত হ'লে সমস্ত মানুষজাতির সত্তা পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যেতে পারে, একথা পৃথিবীর অনেক মনীষী আজ প্রাণে প্রাণে অনুভব করছেন। সেজন্যই পৃথিবীতে আজ শান্তিপ্রতিষ্ঠার প্রভূত চেষ্টা। সঙ্কীর্ণতা—তা প্রাদেশিকই হোক, অর্থনৈতিকই হোক, রাজনৈতিকই হোক, আর তথাকথিত ধর্মীয়ই হোক—মানুষের মনে বিদ্বেষ জাগিয়ে তাকে করে যুদ্ধোন্মুখ। যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম ভেবে মানুষ আজ তার উল্টোপথে চলতে আরম্ভ করেছে। আজ তাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীরা সারা জগতের মানুষের কল্যাণমূলক জীবন-দর্শন, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতি আবিষ্কারে ও জীবনে তার প্রয়োগের চেষ্টায় তৎপর। চন্দ্রলোক ও মনুষ্যলোকের ভেতর স্পুটনিক মারফত যে যোগসূত্র আজ স্থাপিত হ'ল, তাতে এই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা চন্দ্রলোক থেকেও হবে বিলুপ্ত এবং পৃথিবীতে যেমন বহু শতকের ভ্রান্ত চেষ্টার পর জনগণের ব্যাপক ও সামগ্রিক কল্যাণকেই করা হচ্ছে সমস্ত সংস্কার প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য, চন্দ্রলোকেও হবে তার পুনরাবৃত্তি।

পৃথিবীর মানুষেরও এতে হবে বিশেষ মঙ্গল। কারণ তারা এতকাল শুধু পৃথিবীর কথাই ভেবেছে। চন্দ্রলোকের সংস্পর্শে এসে সারা জগতের সকল জীবের কল্যাণ সম্বন্ধে তারা হবে সজাগ ও সচেতন।

আড়াই হাজার বছর আগে পৃথিবীরই এক মহামানব তথাগত বুদ্ধ প্রচার করেছেন 'সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু'—সব প্রাণী সুখী হোক। * * *

এমন সময় ঘরের ছিটকিনি না-লাগানো কাচের জানালা বাতাসে দেয়ালে লেগে হ'ল খট খট শব্দ, আর ঘুম গেল ভেঙে। স্বপ্নমঙ্গলের এমন অপ্রত্যাশিত অবসানে স্পুটনিকে ক'রে পৃথিবীতে ফিরে আসার লোভনীয় অভিজ্ঞতা থেকে হলাম বঞ্চিত। দেখি সেই পুরানো ঘরে ভাঙা খাটে আছি শুয়ে, আর গভীর রাতের অন্ধকারে বিজলীবাতির ক্রমবর্ধমান আলোতে চোখের সামনে 'জগন্নাথ-হলে'র ত্রিতল প্রাসাদ তার সুপ্তিময় যুবশক্তি নিয়ে করছে জলজল।

মনোবিশ্লেষণের নিয়মে প্রগতিপন্থীরা আমার এই স্বপ্নের পেছনে অবচেতন মনের কোন্ অবদমিত ইচ্ছার অভিব্যক্তি আবিষ্কার করবেন, তা জানি না, তবে আন্তরিক ও অকপট প্রার্থনা—আমার স্বপ্নলোকের আদর্শ জীবলোকে মূর্ত ও বাস্তব হয়ে উঠুক।

মুরলীধর

[ইন্দিরাদেবীর মীরাভজনের অনুবাদ]

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বাজায় মুরলী সে, সখী, বাজায়—
মধুর আলাপনে মুরছনায়!

বাঁশির তান শুনি' ওঠে গো গুনগুনি' কুঞ্জবন তারি সুরে উছল।
যখন দেয় তাল গোপাল— প্রতি তাল ওঠে গো দুলি', কাঁপে ধরণীতল,

মধুর আলাপনে মুরছনায়
বাজায় মুরলী সে যবে বাজায়।

শুনি' সে-মধুতান বিভোর মনপ্রাণ, হারাই জ্ঞান, তনু আবেশে ছায়,
লুপ্ত হয় পলে ভুবন, যায় গ'লে লজ্জা কুল মান তার নেশায়,

প্রেমের অপরূপ মধুরিমায়
বাজায় মুরলী, সে যবে বাজায়!

তোমারে জানি শ্যাম দোদুল অভিরাম, অতুল চিরসাথী হে গুণধাম!
তোমারে চিনি প্রাণে কৃপাল অভিধানে গোপাল ব্রজবাল তোমার নাম।

শরণ মীরা চায় কমল-পায়
বাজায় মুরলী—সে যবে বাজায়!

চৈতন্যচরিতামৃত-কাব্যপরিচয়

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমদনমোহন গোস্বামী

প্রাক্-চৈতন্য যুগে শ্রীকৃষ্ণলীলারসাস্বাদনের দুইটি ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। একটি ধারায় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও ভগবত্তার উপর এবং অপর ধারায় বৃন্দাবন-লীলার অন্তর্গত শৃঙ্গার-রসবর্ণনার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ধারার কবি মালাধর বসু প্রভৃতি এবং জয়দেব ও বিদ্যাপতি প্রভৃতি দ্বিতীয় ধারাকে অনুবর্তন করিয়াছেন।

বৈষ্ণবধর্মের উৎস অনুসন্ধান করিতে গেলে বেদান্তসূত্রে পৌঁছিতে হয়। মূল বেদান্তে ও বৈষ্ণব মতবাদে কোন বিরোধ নাই। 'বৈষ্ণব' শব্দটি বেদোক্ত 'বিষ্ণু' ['ব্যাপ্নোতি বিশ্বম্ ইতি বিষ্ণুঃ']-শব্দ বা তদাখ্য দেবতা হইতে আসিয়াছে। বেদে বহুশঃ সূর্যের পরিবর্তে 'বিষ্ণু' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্', 'বিষ্ণুঃ ত্রিবিক্রমঃ' ইত্যাদি। যাগযজ্ঞপ্রধান বৈদিক ধর্মে ভক্তিপ্রধান বৈষ্ণব ধর্মের উল্লেখ নাই। তবে উপনিষদে বৈষ্ণব ধর্মের কৃপা বা প্রপত্তির আভাস পাওয়া যায়। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—বৈষ্ণব দর্শন গঠনের মূলেও উপনিষদের এই ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে।

কৃষ্ণ, নারায়ণ, বাসুদেব প্রভৃতির উপাসকদিগকে বৈষ্ণব বলা হইয়া থাকে। এই বিভিন্ন দেবতা কখনও স্বতন্ত্র, কখনও বা মিলিত ভাবে বিবর্তনের ধারায় কৃষ্ণের একত্বে উপনীত হইয়াছেন। যেমন, পাণিনি [খৃঃ পূঃ ৫ শতক] বাসুদেব শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, হেলিওডোরার গরুড়-স্তম্ভে বাসুদেব-কৃষ্ণের উল্লেখ আছে কচিৎ কারণবারি-শায়ী নারায়ণ বাসুদেবের সহিত এক হইয়া গিয়াছেন। বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহের অর্থ হইতেছে বিষ্ণু চারিরূপের প্রকাশ মাত্র: বাসুদেব পরমপুরুষ, সঙ্কর্ষণ জীবাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, প্রদ্যুম্ন মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অনিরুদ্ধ চৈতন্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

পুনশ্চ, মহাভারতের কৃষ্ণ বাসুদেব-কৃষ্ণ। মহাভারতে অনুল্লিখিত বৃন্দাবন-লীলার গোপাল-কৃষ্ণও বাসুদেব-কৃষ্ণ। পরবর্তী কালে এই দুই কৃষ্ণ মিলিয়া গিয়াছেন। ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে অবশ্য গোপাল-কৃষ্ণের উল্লেখ রহিয়াছে। ভাগবতের বহুস্থানে দ্রাবিড় দেশের বৈষ্ণব ধর্মের কথা পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ দ্রাবিড়ের বিষ্ণুভক্ত আলোয়ার-সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হইবার পূর্বেই আবির্ভূত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের উপর দ্রাবিড়ধর্মের ভক্তিপ্রভাব আছে এবং ইহাতে কৃষ্ণলীলা ব্যতীত ভারতীয় প্রধান দার্শনিক মতবাদসমূহ ও বিবিধ উপাসনাপদ্ধতির সার-সঙ্কলনও রহিয়াছে। দ্বৈতমতবাদীদিগের প্রধান অবলম্বন ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপ শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ গ্রন্থকর্তাগণ তাঁহাদিগের গ্রন্থসমূহে সমর্থক ভাগবতশ্লোক প্রায়শই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বৈষ্ণব দর্শনের প্রধান আচার্য শ্রীরামানুজাচার্য, জীবাত্মা, ব্রহ্ম ও জগতের সম্পর্ক লইয়াই ইহার সহিত অদ্বৈতবাদ বা শঙ্করাচার্য-মতের বিরোধ। চতুর্বিধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই ['শ্রী' (রামানুজ), 'সনক' (নিম্বার্ক), 'রুদ্র' (বিষ্ণুস্বামী), 'মাধ্ব' (মধ্বাচার্য)] মূল কথা একটি—'ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে'। নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী পরমাত্মা ও ষড়ৈশ্বর্যময় সগুণ ভগবান্ পরমতত্ত্বের ত্রিবিধ রূপ। ব্রহ্মের স্বরূপও প্রকারভেদে ত্রিবিধ: সৎ [= সন্ধিনী, জীবশক্তি,

তটস্থা শক্তি], চিৎ [=সম্বিৎ, পরাশক্তি, অন্ত-রঙ্গা শক্তি], আনন্দ [হ্লাদিনী, মায়াশক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি]। বৈষ্ণবদিগের রাধাকৃষ্ণের লীলা-স্থল বন-বৃন্দাবন কিংবা মনোবৃন্দাবন অপেক্ষা নিত্য-বৃন্দাবন প্রকৃত—সেখানে 'রসো বৈ সঃ' 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' আস্বাদক, শ্রীরাধা হ্লাদিনী শক্তি আস্বাদ্য। মাধুর্যপূর্ণ রাধাপ্রেমই বৈষ্ণব ধর্মের সাধ্যসার। এই সাধ্যসার লাভের উপায় যথাক্রমে স্বধর্মাচরণ, কৃষ্ণে ফলার্পণ, স্বধর্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি, জ্ঞানশূন্যা ভক্তি ও প্রেমভক্তি। স্বধর্মাচরণ ও জ্ঞানমিশ্রাভক্তি হইতেছে বৈধী ভক্তি। রস অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের স্বরূপাস্বাদনের প্রকারও পাঁচটি : শান্ত [=কৃষ্ণপ্রেম ও তৃষ্ণা-ত্যাগ], দাস্য [=শান্ত+সেবা], সখ্য [=শান্ত +দাস্য+অসম্ভ্রম], বাৎসল্য [=শান্ত+দাস্য+ সখ্য+মমতা], মধুর [=শান্ত+দাস্য+সখ্য+ বাৎসল্য+আত্মদান]। মধুররসযুক্ত গোপীপ্রেমই বৈষ্ণব দর্শনের সাধ্যসাররূপ রাধাপ্রেম। বৈষ্ণব দর্শনের মুক্তি [সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য, স্বারূপ্য] হইতেছে রাধাকৃষ্ণের নিত্য সহচর হওয়াতে।

চৈতন্য-পরবর্তী যুগে প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের কিছু বিশেষত্ব আছে। পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে কংসাদি অসুরগণকে বিনাশ করিবার জন্য নারায়ণ কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে প্রেমময় জগৎপাতা সমদর্শী ভগবানের পক্ষে কাহারও বধের জন্য রূপ পরিগ্রহ করা যুক্তিযুক্ত নহে। কৃষ্ণাবতারের মূল কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' পাইতেছি :

পূর্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলা শাস্ত্রেতে প্রচারে॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম নহে ভারহরণ।
স্থিতিকর্তা বিষ্ণু করেন জগৎপালন॥

আনুষঙ্গ কর্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস-নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ করুণ পরম।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥

রূপগোস্বামীর কড়চা হইতেও কৃষ্ণাবতারের এই অভিনব হেতু দুইটির প্রেমরসাস্বাদন ও রাগানুগাভক্তি-প্রচার সন্ধান মিলিতেছে :

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

—শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাধুর্য, রাধার প্রণয়মহিমা ও রাধানুভূত কৃষ্ণমিলনানন্দ, এই ত্রিবিধ সুখাস্বাদনের জন্য 'অন্তঃ কৃষ্ণ বহির্গৌর' শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাবের প্রাধান্য প্রাক্-চৈতন্যযুগে ছিল, চৈতন্য-পরবর্তী যুগে দেখা দিয়াছিল মাধুর্য-ভাব। শ্রীচৈতন্যের অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ কেবল নামসঙ্কীর্তন করা—'চৈতন্য-ভাগবতে'র এই মত 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' সমর্থিত হয় নাই। কারণ পুরী অথবা বৃন্দাবনে চৈতন্য-দেব সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব পরবর্তীকালে প্রচারিত হইয়াছিল, বৃন্দাবন দাস তাহার সহিত পরিচিত ছিলেন না। তাই 'চৈতন্যভাগবতে'র অধ্যায়-বিভাগের বেলাতেও 'চরিতামৃতে'র সহিত পার্থক্য নজরে পড়ে।—

কলিযুগে ধর্ম হয় হরিসঙ্কীর্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥
আদিখণ্ডে প্রধানতঃ বিদ্যার বিলাস।
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের কীর্তন প্রকাশ॥
শেষখণ্ডে সন্ন্যাসী-রূপে নীলাচলে স্থিতি।
নিত্যানন্দ স্থানে সমর্পিয়া গৌড়ক্ষিতি॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে :

অবতার প্রভু প্রচারিলা সঙ্কীর্তন।
এহো বাহ্য হেতু পূর্বে করিয়াছি সূচন॥
অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ।
রসিকশেখর কৃষ্ণ সেই কার্য নিজ॥

'চৈতন্যভাগবতে'র আদিখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের গয়াগমন পর্যন্ত 'আদিলীলা' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু 'চরিতামৃতে' সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত ২৪ বৎসর লীলাই আদিলীলা। পরবর্তী ছয় বৎসর তাঁহার নানা স্থান পর্যটনের লীলাই মধ্যলীলা এবং শেষে নীলাচলে অবস্থিতি-কালের (১৮ বৎসর) লীলা অন্ত্যলীলা। সুতরাং দেখা যাইতেছে রাগানুগা-ভক্তিধর্মী দুই মহাগ্রন্থের অধ্যায়-বিভাগের ব্যাপারেও বিশেষ অসামঞ্জস্য বিদ্যমান।

শ্রীচৈতন্যকে অবতার বলিয়া স্বীকার করার নিমিত্তই তাঁহার ভক্তবৃন্দ তদীয় জীবনবৃত্তান্তকে ঈশ্বরের লীলারূপে লিখিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব চরিতকারগণের এই প্রশংসার যোগ্য শুভ চেষ্টার ফলে আমরা শ্রীচৈতন্যদেব এবং অপরাপর ব্যক্তির জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছি। তথাপি অনেক তথ্যই অলব্ধ রহিয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের ব্যাপার। যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব মানব-সংস্কৃতিতে আধুনিক যুগের বিশিষ্ট মনোভাব, মানবিকতার সুপ্রভাত সূচনা করে। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া ইহারই উজান-ভাঁটি বঙ্গসাহিত্যের প্রবাহের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙ্গালা দেশে একটি অপূর্ব পরিবর্তন আসিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই অবতার বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার চরিতকথা অবলম্বন করিয়াই বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম আধুনিকতার সূত্রপাত হইয়াছিল। তাঁহারই জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যে মানবিক চেতনা আসিল এবং 'কলিযুগ সর্বযুগসার' বলিয়া অভিনন্দিত হইল। শ্রীচৈতন্যের সর্বপ্রথম জীবনীকাব্য তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মানুচর মুরারিগুপ্ত কর্তৃক বিরচিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত'। চৈতন্যজীবনীসম্পর্কিত প্রাচীনতম এই গ্রন্থটি 'মুরারিগুপ্তের কড়চা' নামেই প্রসিদ্ধ। কাব্যটি সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশকে রচিত হইয়া থাকিবে। চৈতন্যচরিত সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় রচনা জনৈক বঙ্গদেশীয় বিপ্র-বিরচিত অধুনা-লুপ্ত একটি নাটক। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' ইহার নান্দীশ্লোকটি মাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। তৎপরবর্তী রচনা কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেনের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' (১৫৭২ খৃঃ) ও 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্য (১৫৪২ খৃঃ)। স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা একটি স্বতন্ত্র নিবন্ধ, ইহার মধ্যে শ্রীচৈতন্যের মাহাত্ম্যসূচক কয়েকটি শ্লোক লিখিত হইয়াছে। রঘুনাথদাস-বিরচিত 'গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষঃ' সংস্কৃতে বিরচিত স্তোত্র। বাসুদেব ঘোষ ও তদীয় ভ্রাতৃযুগল গোবিন্দ ঘোষ ও মাধব ঘোষ, নরহরি সরকার এবং পরমানন্দ গুপ্ত—শ্রীচৈতন্যের এই কয়জন মুখ্য অনুচর তাঁহার জীবনবৃত্তান্তকে কেন্দ্র করিয়া কতিপয় পদ রচনা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে এইগুলিই বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনী।

কাব্যে বিরচিত সর্বপ্রথম বাঙ্গালা চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ হইতেছে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' [রচনাকাল আনুমানিক ১৫৭৬ খৃঃ বা কিছু পূর্বে]। এই গ্রন্থের উল্লেখ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' ও জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' রহিয়াছে। চৈতন্যজীবনী-কাব্য হিসাবে প্রথম নাম করিতে হয় বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', লোচনের গ্রন্থ রসাত্মক রচনা হিসাবে

মূল্যবান্ হইলেও জীবনী হিসাবে মূল্যহীন, জয়ানন্দের রচনা জনশ্রুতি ও অবাস্তব কাহিনীর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত (১৮৯৫ খৃঃ) নিবন্ধটি নিতান্তই অর্বাচীন, ইহাকে শ্রীচৈতন্যজীবনীর প্রামাণ্য দলিল মনে করিবার কোন যুক্তি নাই।

সর্বাপেক্ষা সুলিখিত ও প্রামাণ্য চৈতন্য-জীবনী-সংক্রান্ত গ্রন্থ হইতেছে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত'। সমস্ত চরিত-কথাগুলির মধ্যে কেবল ইহার মধ্যেই শ্রীচৈতন্য-দেবের অন্তিম দ্বাদশ বৎসরের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা, জীবনীগ্রন্থ-হিসাবে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য-সম্ভার, রঘুনাথ দাসগোস্বামী ও স্বরূপ দামোদর প্রভৃতির নিকট হইতে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য ও দার্শনিক তত্ত্ব ইত্যাদির যথাযথ বিন্যাস—এই গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বৈষ্ণব-সমাজ এই গ্রন্থটির অত্যন্ত সমাদর করিয়া থাকেন। গ্রন্থটির একটি টীকা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে। টীকাকার বৈষ্ণব দার্শনিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে প্রচলিত রচনা তিনটি—'চৈতন্যচরিতামৃত', 'গোবিন্দলীলামৃত' (সংস্কৃত) মহাকাব্য ও বিল্বমঙ্গল ঠাকুর প্রণীত 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থের টীকা 'সারঙ্গরঙ্গদা'। কোন রচনাতেই লিপিকাল-জ্ঞাপক কোন শ্লোক যুক্ত হয় নাই। 'চৈতন্যচরিতামৃত' তিনটি ভাগে বিভক্ত: আদিলীলা, পরিচ্ছেদ-সংখ্যা ১৭, ১-১২ পরিচ্ছেদ মুখবন্ধ ও অবশিষ্টাংশ চৈতন্য-দেবের নবদ্বীপ-লীলাবর্ণন। মধ্যলীলা, পরিচ্ছেদ-সংখ্যা ২৫, বৃন্দাবন হইতে মহাপ্রভুর নীলাচল প্রত্যাগমন পর্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। অন্ত্যলীলা, পরিচ্ছেদ-সংখ্যা ২০, মহাপ্রভুর তিরোধান ব্যতীত শেষ জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের ছন্দ মূলতঃ ত্রিপদী ও পয়ার, গান করিবার বিশিষ্ট অংশগুলি 'যথা রাগঃ' বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রতিটি লীলার শেষে বঙ্গসাহিত্যে সুবিরল একটি পরিচ্ছেদসূচী [অনুবাদ] প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থটি পুরাতন বাঙ্গালা ভাষাতে বিরচিত, উদ্ধৃতি-বহুল, কিন্তু দুর্বোধ্য নহে। এই গ্রন্থে চণ্ডীদাস, মালাধর বসু ও বৃন্দাবন দাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' বৃন্দাবন দাসের পূর্বসূরিত্ব স্বীকার করিয়াও কবি যাহা রচনা করিয়া গেলেন, তাহা অচিন্তিত-পূর্ব। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর চৈতন্যের রাঢ় ভ্রমণ ও শান্তিপুরে আগমনের বৃত্তান্ত সম্বন্ধে 'চৈতন্য-চরিতামৃত' ও 'চৈতন্য-ভাগবতে'র মধ্যে অনৈক্য দেখা যায়, এক্ষেত্রে কবিরাজ গোস্বামীর বিবৃতিকে ঐতিহাসিক মূল্য দিতে হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর নামে একাধিক ব্যক্তির রচনা চলিয়া গিয়াছে। সাধন-সম্পর্কিত বিবিধ আকৃতির কতকগুলি নিবন্ধের (যথা, স্বরূপবর্ণন, আত্ম-জিজ্ঞাসা, রত্নসার ইত্যাদি) আত্মপরিচয় অংশে রচয়িতৃগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামের 'কণ্ঠুকমুড়ি' দিয়াছেন, আবার কখনও বা কেহ আপনাকে কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য [যথা, সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ের কবি মুকুন্দদাস] বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত লেখার সহিত কবিরাজের কোনই সম্বন্ধ নাই। 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র অপব্যাখ্যাও যে হয় নাই, এমন নহে। অকিঞ্চনদাসের 'বিবর্তবিলাস' নামক গ্রন্থটি তাহারই প্রমাণ দেয়। ইহাতে 'চরিতা-মৃতে'র প্রতি জীবগোস্বামীর বিরাগ-বিষয়ক গোটা কত কাহিনী রহিয়াছে।

কবিরাজ গোস্বামীর রচনাবলীর—বিশেষতঃ চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখ, উদ্ধৃতি, ব্যাখ্যা ও প্রভাব খৃষ্টীয় ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতকে

বিরচিত বহু গ্রন্থে পড়িয়াছে। যেমন, ষোড়শ শতকের রচনা—ঈশাননাগর-কৃত 'অদ্বৈত-বিলাস', লোকনাথ দাসের 'সীতাচরিত্র', বিষ্ণুদাস আচার্যের 'সীতাগুণকদম্ব', কবিশেখর-রচিত 'অষ্টপ্রহরীয়া পদাবলী', নন্দকিশোর দাসের 'রসকলিকা', সপ্তদশ শতকের লেখা—রাজবল্লভের 'মুরলীবিলাস', যদুনন্দন দাসের 'গোবিন্দ-লীলামৃত' কাব্য, মনোহর রায়ের 'দিনমণি-চন্দ্রোদয়', অষ্টাদশ শতকের রচনা—কবিচন্দ্রের 'ভাগবতামৃত', কৃষ্ণদাসের 'চমৎকারচন্দ্রিকা', নীলাম্বরদাসের 'সংগৃহীতসুধাসার', প্রেমদাসের 'বংশীশিক্ষা' প্রভৃতি।[১]

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষার্ধে বিরচিত 'ভুবনমঙ্গল' নামে একটি চৈতন্যচরিত-কাব্যের খণ্ডিত পুঁথি মিলিয়াছে। পুঁথিটির রচয়িতা নিত্যানন্দ প্রভুর অনুচর ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য চূড়ামণি দাস।

'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ ও গ্রন্থকার উভয়ের কালনির্ণয় সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে বিস্তর মতানৈক্য বর্তমান। ৺জগবন্ধু ভদ্রের মতে কবির জীবৎকাল ১৪১৮ শক—১৫০৪ শক [১৪৯৬ খৃঃ—১৫৮২ খৃঃ], পিতা ভগীরথ, মাতা সুনন্দা, ভ্রাতা শ্যামদাস, জাতি বৈদ্য ['গৌরপদতরঙ্গিনী'-র উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য]। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ হইতে জানা যায় কবির বাসভূমি নৈহাটির নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম। নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে (স্বপ্নে, 'প্রেমবিলাস'-এর মতে সাক্ষাৎ) কবি ব্রজে আসিয়া রূপ-সনাতনের আশীর্বাদ লাভ করিয়া রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মহান্তদিগের আগ্রহে তিনি শ্রীচৈতন্যের শেষলীলা বর্ণনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বৃন্দাবনদাসের আজ্ঞাও পাইয়াছিলেন এবং চরিতামৃতের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন সাক্ষাৎদ্রষ্টা ব্যক্তির নিকট হইতে। ইঁহাদিগের মধ্যে রঘুনাথ ও স্বরূপ-দামোদরের নাম উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিকতায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিবার অবকাশ কবিরাজ গোস্বামী রাখেন নাই। বীর হাম্বিরের রাজত্বকালে পুঁথি-লুটের কাহিনী আদৌ ঘটিয়াছিল কিনা, এই বিষয়ে গুণিজনের সন্দেহের সম্পূর্ণ নিরসন হয় নাই।

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র রচনাকাল গ্রন্থকর্তার ন্যায়ই অজ্ঞাত। এই বিষয়ে পরিগৃহীত মতানুসারে গ্রন্থের রচনাকাল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের মধ্যবর্তী সময়ে। পুঁথি ও অধিকাংশ মুদ্রিত সংস্করণের একটি পুষ্পিকা-শ্লোক লইয়া গোলযোগ ঘটিয়াছে অনেক। সেই শ্লোকটি এই :—

'শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ [পাঠান্তর : 'শাকেঽগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ'] জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্যেঽহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥'

প্রথম পাঠানুসারে রচনাকাল হয় জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা পঞ্চমী রবিবার ১৫৩৭শক = ১৬১৫ খৃঃ, দ্বিতীয় পাঠানুসারে রচনাকাল ১৫০৩ শক = ১৫৮১ খৃঃ। রচনাস্থল বৃন্দাবন, কবি নিশ্চয়ই প্রৌঢ়। অবশ্য 'বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির' কবির বৈষ্ণব-জনোচিত দীনতা, চরিতামৃত-রচনা শক্তিহীনের কর্ম নয়। কাব্যরচনাকালে রঘুনাথ দাস, বৃন্দাবন দাস, শিবানন্দ চক্রবর্তী, সনাতন গোস্বামী [তিরোভাবকাল ১৫৫৪ খৃঃ] প্রভৃতি জীবিত ছিলেন। জীবগোস্বামীর 'গোপালচম্পূ' [রচনা-সমাপ্তিকাল ১৫৯২ খৃঃ] কাব্যের পত্তনের কথা কবিরাজের জ্ঞাত ছিল। পূর্বোক্ত শ্লোকটি কোন পুঁথি অনুলিখনের কালজ্ঞাপক শ্লোকমাত্র, ইহা অবিসংবাদিত ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। পাঠান্তরের শকাব্দের সহিত মাস ও তিথির

১ ঐতিহাসিক তথ্যগুলি ডাঃ সুকুমার সেন প্রণীত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম সং. ১ম খণ্ড) হইতে গৃহীত

মিল থাকিলেও বার মেলে না। কবির বৃন্দাবন-বাস সনাতনের তিরোভাবের পরে নিশ্চয় নহে, কারণ কবি রূপ-সনাতনের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং ১৬১৫ খৃঃ রচনাকাল হইতে পারে না। কৃষ্ণদাস কবিরাজের কোন রচনাতেই কোন কালজ্ঞাপক শ্লোক যুক্ত হইতে দেখা যায় না। সুবৃহৎ কাব্য 'গোপালচম্পূ'র রচনা-সমাপ্তিকালও চরিতামৃতের পূর্ববর্তিত্বের পক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ নহে। পুষ্পিকা-শ্লোক-গুলি অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত, অনুলেখকদিগের কীর্তি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বীয় গুরুর নাম কোথাও করেন নাই, কেবল বলিয়াছেন তিনি চৈতন্যের একজন প্রধান অনুচর ছিলেন, কিন্তু সাধারণ ধারণা তিনি রঘুনাথ দাসের শিষ্য ছিলেন। কবির স্বীকৃতি :

'শ্রীরূপসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
* * *
যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিঞে আমি তাঁহার প্রকাশ।'

অনেকে অনুমান করেন কবির গুরু ছিলেন স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু।

রাধাকৃষ্ণলীলা-সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্র গৌড়। কবিরাজ গোস্বামীর কাব্য চৈতন্য-জীবনী, তৎপ্রবর্তিত ধর্মমত, বৈষ্ণবদর্শন ও রসশাস্ত্রের 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া' বা বিশ্বকোষ। দুস্তর তত্ত্বসমুদ্রে 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র তরণী ভক্তজনের ও অনুসন্ধিৎসুর পরম নির্ভর। পাণ্ডিত্যের সহিত কবিত্বের এইরূপ সহজ মিলন যথার্থই দুর্লভ। সত্যই 'চৈতন্য-লীলামৃতসিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান'॥

ভাষা ও ভাব

ডাঃ শ্রীশচীন সেনগুপ্ত

ভাষা বলে : ওগো ভাব,
ভাবিছ কি বসি ?
হের আমি 'কৃষ্ণ' নাম
করি দিবানিশি॥

ভাব বলে : ওগো ভাষা
কথা মোর কই ?
'কৃষ্ণের' প্রেমেতে আমি
সদা মগ্ন রই।

ঢুলিছে রাধা-শ্যাম

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী, কাব্যশ্রী

ঝুলন-দোলনায়   ঢুলিছে রাধা-শ্যাম !
ভুবন ভ'রি জাগে   মধুর রূপ ঠাম।
যেন রে মেঘ 'পরি   বিজুলী রূপ ভ'রি
কনক হাসি-ছটা   ঝকিছে অভিরাম।
ঝুলন-দোলনায়   ঢুলিছে রাধা-শ্যাম।

ঢুলিছে শিখী-চূড়া   মাধব-শিরোশোভা,
ঢুলিছে পীত-বাস,   হয়েছে মনোলোভা।
শ্রীকবে বাজে বাঁশী,   অধরে মধু-হাসি,
পরাণ ভুলে যায়   হেরি সে প্রাণারাম।
ঝুলন-দোলনায়   ঢুলিছে রাধা-শ্যাম।

কানন-ফুলে গাঁথা   মালিকা দোলে গলে,
অযুত নভ তারা   মাণিক হ'য়ে জ্বলে।
ঢুলিছে রাঙাপদ-   বিকচ-কোকনদ,
ঢুলিছে মুখখানি   যেন রে শশী-দাম।
ঝুলন-দোলনায়   ঢুলিছে রাধা-শ্যাম।

ঢুলিছে পাশে রাধা   উপমা নাহি আব।
কষিত হেম যেন   তনুর দ্যুতি তার।
বলয়-কঙ্কণ   বাজিছে কনকন,
ধ্বনিছে নিরবধি   শ্যামেরি মধু নাম।
ঝুলন-দোলনায়   ঢুলিছে রাধা-শ্যাম !

বিরহে জর-জর   বেদনা-ভরা-বুক,
খুঁজিয়া পেল আজি   গভীরতম সুখ !
যে নদী ছিল দূরে,   সে আজি মধু সুরে,
সাগরে ধেয়ে এসে   ঢুলিছে অবিরাম !
ঝুলন-দোলনায়   ঢুলিছে রাধা-শ্যাম।

বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন

[প্রথম প্রস্তাব]

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ দেহরক্ষা করার পর আজ পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল অতিক্রান্ত হয়েছে। এই পঞ্চাশ বৎসর কাল ধরে তাঁর সম্বন্ধে অবিরাম বহুবিধ আলোচনা হয়েছে, দেশে বিদেশে বহু মনীষী এই কার্য সম্পন্ন করেছেন। সেই সকল আলোচনা হতে বিশ শতকের মধ্যপাদের মানুষ আমরা এই জেনেছি যে নতুন যুগে ভারতবর্ষে জাতীয় জীবন পুনর্গঠনে অন্যতম প্রধান শক্তি ছিলেন বিবেকানন্দ, আর সমগ্র বিশ্বের ধর্ম-দর্শন-সংক্রান্ত চিন্তাধারায় তাঁর নব-বেদান্তবাদ এক অমূল্য অবদান। সংক্ষেপে তিনি জাতীয় জাগরণের গুরু, স্বদেশপ্রেমিকদের সেনাপতি, বেদান্ত-ধর্মের নির্ভীক ও শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা—তাঁর এই পরিচয়ই আমরা এতাবৎ কাল পেয়েছি। উনিশ শতকের শেষ দশ বৎসর ছিল তাঁর কার্যকাল। সে এক মহাযুগ-সন্ধিক্ষণ, সেই সময় ভারতের সুপ্রাচীন সমাজ-জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন পূর্ণ গতিবেগ প্রাপ্ত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন। স্বাধীনতা-সংগ্রাম তখন কিভাবে, কোন্ পথে আরম্ভ হবে—তার অপেক্ষায় ছিল। বিবেকানন্দের আবির্ভাব সেই দৃষ্টির বাধা দূর ক'রে দিল, সৈনিকেরা পথটিকে আবিষ্কার ক'রে নিলেন। তার পর সেই আন্দোলনে পরোক্ষভাবে কেন্দ্রশক্তিরূপে কাজ করেন বিবেকানন্দ; স্বাধীনতা-সংগ্রামের লক্ষ লক্ষ সৈনিক তাঁর জীবন, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মোৎসর্গ করেছেন। তখনকার সমাজ জীবনের প্রতিক্ষেত্রে পরিবর্তন ও উন্নতি রূপ পেয়েছে তাঁর বাণী থেকে। এ কথা সে যুগের মনীষী কর্মী ও একালের ঐতিহাসিকেরা—সকলেই স্বীকার করেছেন।

কিন্তু, সেই জাতীয় জাগরণের প্রথম প্রভাত ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের মুহূর্ত আজ অতিক্রান্ত। সমাজ-জীবন কালবশে আমূল রূপান্তরিত হয়েছে, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামও শেষ হয়েছে। অর্থাৎ তখনকার অধিকাংশ সমস্যাই আজ আর নেই। আমাদের জাতীয় জীবনে আজ নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। শুধু ভারতেই নয়, সমগ্র পৃথিবীতে সমাজ সভ্যতার যে পরিণতি ঘটছে তা উনিশ শতকের শেষপাদেও সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। নানা পরিবর্তন সমাজের রূপান্তর সাধন করেছে, রূপান্তরিত হয়েছে আমাদের মূল্যবোধ। পূর্ব যুগের জীবন-মূল্য আমরা পরীক্ষা ক'রে দেখছি, তার অনেক কিছুই পরিত্যাগ করতে হবে, অনেক কিছুই আজ আমরা মানব-জীবন-দর্শনে শেষ কথা নয় বলে জেনেছি। বিশ শতকের এই মধ্যপাদে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে এক শতাব্দী কাল মধ্যে আমরা সহস্র বৎসরে সম্ভাব্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছি। যন্ত্র-আবিষ্কার ও যন্ত্র-প্রয়োগ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে, এবং এরই বিপুল প্রভাব সমাজ-মানসের উপর আজ দেখা যাচ্ছে।

এই যুগের জীবন-দর্শনের রচয়িতা কে? এ কথা চিন্তা ক'রে দেখতে গেলে যুগসন্ধিক্ষণের স্বামী বিবেকানন্দের দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গত যুগের উপর তাঁর আধিপত্য নিয়ে আমাদের আলোচনা ব্যাপৃত ছিল বলে

এ ভ্রান্ত ধারণা অনেকেরই মনে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে যে বাংলায় তথা ভারতে বিবেকানন্দ-যুগের অবসান হয়েছে। অনেক যশস্বী সমাজ-তত্ত্ববিদও এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েছেন।[১] কিন্তু, যুগান্তরের অধিনায়ক-রূপেই যে বিবেকানন্দের আবির্ভাব—আগামী কালের সেই স্রষ্টার দিকে আমরা আশাপথ চেয়ে বসে আছি, সে কথা উপলব্ধির দিন আজ এসেছে। এতকাল বিশেষ কারও নজরে পড়েনি যে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দেরও একটি সমাজ-দর্শন আছে—এতকাল আমরা তা প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে এসেছি। অবশ্য এ উপেক্ষা ইচ্ছাকৃত নয়, কালান্তরের পূর্বে নবযুগ-সৃষ্টিকারী দর্শন-চিন্তা লোকমনের আয়ত্ত-সাধ্য ছিল না বলেই এটা ঘটেছে। কালের পরিবর্তন আজ আমাদের দৃষ্টির বাধা অপসারিত করেছে, তাঁর প্রতি কথা, তাঁর বক্তৃতাবলীর প্রতি ছত্রে ছত্রে আজ আমরা নতুন পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি।

অবশ্য এর থেকে যেন কেউ একথা না মনে করেন যে সমাজ-তত্ত্ব রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি সযত্ন প্রয়াসে মার্কসীয় দর্শনের মতো একখানি সমাজ-দর্শন রচনা করেছেন। স্বল্পকাল-ব্যাপী কর্মজীবনে তাঁর সে সময় ছিল না, আর বসে বসে থীসিস্ রচনাও তাঁর কাজ ছিল না। তিনি এসেছিলেন এক জীবন্ত প্রেরণা হয়ে, জলন্ত সূর্যের মতো সক্রিয় শক্তিরূপে। তাঁর স্বল্পকালব্যাপী জীবন একটি নিদ্রিত মহাজাতির ঘুম ভাঙাতে ও গৌরবময় ঐতিহ্যের পথে পুনর্বার গতিবেগ সঞ্চার করতে এবং বিশ্ব-মানব-সভ্যতাকে অদূর ভবিষ্যতে আসন্ন সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের জন্য গঠনমূলক কাজ করতেই ব্যয়িত হয়েছিল। কিন্তু মানব-সমাজ পুনর্গঠনে সক্রিয় ভূমিকা যাঁর ছিল, তাঁর সমাজ-গঠনের মূল প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, বিবর্তনের বিধিনিয়ম সব কিছু সম্বন্ধেই সুস্পষ্ট ধারণা গঠন করতে হয়েছিল। তাঁর সেই সকল চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে আছে তাঁর আট খণ্ডে সম্পূর্ণ রচনাবলীর অন্তর্গত বিভিন্ন বক্তৃতায় ও রচনায়। বেশীর ভাগ বক্তৃতাগুলি পূর্ব-পরিকল্পিত নয়, প্রস্তুত-না-করা (extempore) বক্তৃতা বলেই জীবনীকারেরা বলেন। কিন্তু, আশ্চর্যের কথা এই যে তাঁর সমাজ-চিন্তা মোটেই এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত বা অসম্পূর্ণ নয়, তা রীতিমতো সুসম্বদ্ধ ও সুগঠিত এবং এর ভিত্তি ইতিহাস বিজ্ঞান সমাজ-তত্ত্ব ও গভীর প্রজ্ঞালব্ধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর এই সকল চিন্তাধারার মধ্যে কোন অসঙ্গতি বা অযৌক্তিকতা স্থান পায়নি। তবে হয়তো অনেক কথাই সূত্রাকারে আছে, যা ভাষ্যকারের অপেক্ষা রাখে। আরও লক্ষণীয় এই যে এ সমাজ-দর্শন আদৌ অবাস্তব আদর্শবাদ নয়, তাঁর অনেক সিদ্ধান্ত পূর্ববর্তী ইতিহাস-সম্মত, কিছু পরবর্তী ইতিহাস সত্য বলে প্রমাণিত করেছে, কিছু উত্তরকালের সমাজ-তত্ত্ববিদেরা স্বতন্ত্র গবেষণা দ্বারা বহু আয়াসে সত্য প্রমাণ করেছেন। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টির প্রমাণ এইখানে। এজন্য তাঁর সমাজ-দর্শনের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের কোন কোন সমাজ-তত্ত্ববিদের চিন্তার সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। এজন্য এঁদের মধ্যে যাঁরা তাঁর পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক তাঁদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত, একথাও অনেকে বলেন। কিন্তু, পরবর্তীকালের সমাজশাস্ত্রীদের মধ্যে অনেকে যাঁরা নতুন তত্ত্ব বা তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন, তাঁরাও অনেকেই তাঁর মতকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, দেখা যায়। পূর্ববর্তীদের মধ্যে কঁতে ফিক্‌টে, হার্ডার, মার্কস্-এঙ্গেলস্, প্রিন্স ক্রেপোট-কিন প্রভৃতি ও পরবর্তীদের মধ্যে টয়েনবী

(১) বিনয় ঘোষ—বাংলার নবজাগৃতি।

সোরোকিন প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন গবেষক, লেখক এতাবৎ কাল আগ্রহ দেখাননি বলে অনেক ভুল ধারণা, অনেক হাস্যকর ভ্রান্ত মতের সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে একটি প্রচলিত ভ্রান্ত মত: তাঁর ধর্মচিন্তার জন্য বেদান্ত-দর্শন ও শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তিনি ঋণী, কিন্তু তাঁর সমাজ-চিন্তার জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে ইওরোপীয় চিন্তানায়কদের কাছে ঋণী। এবং এই প্রকল্প হতে কেউ কেউ এই অভিমত দিয়েছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণরূপ 'মধ্যযুগীয়' প্রভাবের মধ্যে তিনি যদি না পড়তেন তাহলেই তিনি তাঁর চিন্তাধারায় ও কার্যকলাপে প্রগতিশীলতার পরিচয় দিতে পারতেন, দেশ ও সমাজের উপকারে লাগতেন। এ মত এমনই হাস্যকর যে এ নিয়ে আমাদের আলোচনা ক'রে সময় অপচয় অনুচিত হবে। বিবেকানন্দরূপ শক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণ গঠন করেছেন, এ কথা বিবেকানন্দের নিজের। সেই বিরাট অধ্যাত্ম-সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত বিবেকানন্দ, তাঁরই অপরদিক—সমাজ-সংসারের সক্রিয় গঠন-শক্তি, যেমন সূর্যের তেজকণায় সঞ্জীবিত পৃথিবীর প্রাণলীলার চাঞ্চল্য সেই সৌর-শক্তির রূপান্তর মাত্র। রামকৃষ্ণের সমন্বয়-বাণীর ধারক, বাহক ও পালক বিবেকানন্দ বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার হতে গ্রহণ করেছেন প্রত্যেক যুক্তিসহ তত্ত্বকে, স্থান দিয়েছেন নিজের সুবিশাল চিন্তাধারায়।

বিবেকানন্দের সমাজ-চিন্তার দিকে প্রকৃষ্ট ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ভারতীয় সমাজ-তত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার তিনি তাঁর 'Creative India'-য় 'Vivekananda as an World-conquerer' এবং 'Ramakrishna the Prophet of the young and the new' শিরোনামায় দুটি নিবন্ধে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এই দর্শনের সঙ্গে। সেখানে তিনি এই নূতন সমাজ-দর্শনের মূল্য নির্ধারণ করবার প্রয়াসও পেয়েছেন। তিনি উক্ত আলোচনার শেষে বলছেন:

> Altogether as embodying, the syntaesis of the positive and idealistic, Ramakrishna has furnished the young and the new with the tremendous psychology of world conquest, of supremacy over the bounds of nature, of emancipation from the fetters of society. And it is under the inspiration of this synthesis that an India of secular activities and cultural adventure, an India of material prosperity and idealistic social service—has been absorbing the interest of constructive thinkers and statesmen of young India. (Creative India—pg 696)

—অর্থাৎ আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয়ের প্রতিমূর্তি রামকৃষ্ণ বর্তমান যুগের নব্যপন্থীদের ও তরুণ সম্প্রদায়ের মনে বিশ্বজয়ের মনোভাব জাগ্রত করেছেন। প্রকৃতির বন্ধন ছিন্ন করতে, সমাজের অন্যায় বন্ধন ভেঙে ফেলতে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে তাঁর বাণী—উদ্বুদ্ধ করছে ভাবতে আর্থিক উন্নতি ও সেবা-ধর্মের সমন্বয় সাধন করতে। পরিষ্কাররূপে এই কথা-কয়টির মধ্যে আমরা বিবেকানন্দ কর্তৃক ব্যক্ত ও রামকৃষ্ণে মূর্ত নতুন সমাজ-দর্শনের পরিচয় পাচ্ছি।

> From the days of Mahenjo Daro culture of the Indus valley to the neo-Vedantic positivism of the Gangetic delta of to day, world culture and humanity have been experiencing the 'charaiveti' (march on) of Hindu energism It is but the five thousand year old Indian tradition of 'Digvijaya'—world conquest and elevation of the most diverse races and classes to soul-entrancing ideals and activities that Vivekananda and after him the Swamis of the Ramakrishna order have been pursuing under modern condition, thereby exhibiting the vitality and strenuousness of Hindu humanism and spirituality.

অর্থাৎ সিন্ধু উপত্যকার মহেঞ্জোদারো সভ্যতার কাল থেকে বর্তমান যুগের গাঙ্গেয় বদ্বীপের নব বৈদান্তিক বাস্তববাদের কাল পর্যন্ত বিশ্ব-সভ্যতা ও মানবজাতি হিন্দু শক্তিবাদের

একই বাণী—'চরৈবেতি' লাভ করেছে। সেই পাঁচ হাজার বছরের পুরানো জগজ্জয়ের সে ঐতিহ্য এবং বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন শ্রেণীকে স্ব স্ব ভাবে আত্মমুক্তির আদর্শে ও কর্মে জাগ্রত করবার যে ধর্ম তাইই বিবেকানন্দ ও তাঁর অনুগামী সন্ন্যাসিগণ অনুসরণ করেছেন তাঁদের কর্মপন্থায়। এর দ্বারা হিন্দু মানবতা ও আধ্যাত্মিকতার শক্তি ও সামর্থ্যের নতুন প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শনের মূলকথা এই 'চরৈবেতি' বাণী। মানুষ অগ্রসর হয়ে যায়, তাই সমাজের পরিবর্তন ঘটে। গতি ও পরিবর্তন প্রাণধর্মের পরিচায়ক। সে সময় সাধারণের এই মহা বিভ্রান্তিকর ধারণা মনে দৃঢ় সন্নিবদ্ধ হয়েছিল যে সমাজ অপরিবর্তনীয়। সমাজ অপরিবর্তনীয়, এ অযৌক্তিক কথা, প্রাচ্যদেশে তাঁর প্রথম বক্তৃতায় বিবেকানন্দ বলছেন :

Customs of one age, of one yuga, have not been the customs of another and as yuga comes after yuga, they will still have to change.

অর্থাৎ এক যুগের প্রথা আর এক যুগের প্রথা নয় এবং যুগের পর যুগ যখন আসে, তখন সেই সব প্রথার রূপান্তর ঘটে। কিন্তু আবার তিনি বলছেন :

We know that in our books, a clear distinction is made between two sets of truth—the one set is that which abides for ever, being built upon the nature of man, on nature of the soul, the soul's relation to God, perfection and so on. there are principle of cosmology of the infinitude of creation, on more correctly speaking—projection, the wonderful law of cyclical procession, and so on , these are principles founded upon universal laws in nature. The other set comprises the minor laws, which guides the working of our everyday life Even in our nation the minor laws have been changing all the time
(Complete works—Vol III—pg. 112)

অর্থাৎ আমরা জানি যে আমাদের শাস্ত্রে দুটি সত্যের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। প্রথম হচ্ছে যা অপরিবর্তনীয় শাশ্বত সত্য—জীবের প্রকৃতি, আত্মার স্বরূপ, জীবাত্মা ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ, পূর্ণতা ইত্যাদি সম্পর্কিত , এই অনন্ত সৃষ্টির রহস্য এই বিশ্ব-প্রকৃতি যার প্রয়োগমাত্র, চক্রাকারে যা পরিবর্তনশীলতার অপূর্ব নিয়মের অধীন, ইত্যাদি , এগুলি প্রকৃতির সর্বজনীন বিধির উপর ভিত্তি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। অপর যে সত্য তা অগৌণ নিয়মের সমষ্টি, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবন চালিত করে। আমাদের এই জাতিরও এই সকল অগৌণ নিয়ম সমস্ত সময়ই পরিবর্তিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এই অপরিবর্তনীয়ের মধ্যে যে পরিবর্তন তাই বিবেকানন্দের তত্ত্বের মূল কথা। কিন্তু এ তত্ত্ব আধুনিক অনেক প্রসিদ্ধ সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌দের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের বিপরীত। কার্ল মার্কস্ বলেন পরিবর্তনীয়তাই সমগ্র বিশ্বের ও সৃষ্টির মূল তত্ত্ব, অপরিবর্তনীয় এখানে কোন কিছুই নেই। এখানেই এই দুই আধুনিক চিন্তাবীরের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্যের আরম্ভ। উভয়ের সমাজ-চিন্তায় এই দার্শনিক চিন্তার প্রভাব প'ড়ে উভয়কে এই বিভিন্নমুখী পন্থায় সমাজ-সভ্যতার সঙ্কটের পথ নির্ধারণে নিযুক্ত করেছে। এবং সমাজ-সভ্যতার বিবর্তনের ধারা , সমাজ-জীবনের উদ্দেশ্য, আদর্শ, লক্ষ্য—এ সব কিছু সম্বন্ধে তাঁদের ভিন্ন আদর্শের অভিমুখী করেছে। অনিত্যের মধ্যে নিত্যের অবস্থিতিতে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য চিন্তা চেষ্টা ধ্যান-ধারণা সব কিছুই পালটে যায়, কাজে কাজেই পালটে যায় সমাজ-সভ্যতার গতি-বিকাশের সম্বন্ধে ধারণারও।

বিবেকানন্দ যে প্রাত্যহিক জীবনের অগৌণ বিধির কথা বলেছেন তা পরিবর্তনশীল, কেন এ কথা বললেন—এ প্রশ্ন উঠতে পারে। এ সকল যে পরিবর্তনশীল, তা আমরা নিত্য চোখে দেখতে পাই, কিন্তু 'কেন ?' এই হ'ল প্রশ্ন। প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের শাশ্বত সত্য সম্বন্ধে ধারণা

অস্বচ্ছ, আমরা যে জীবন যাপন করি, তা শাশ্বত-সত্য উপলব্ধির ভিত্তিতে গড়ে তুলতে আমরা পারি না, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা সমাজবদ্ধ হয়েছি এবং সমাজ-জীবন পরিচালনা করবার প্রয়াস পাচ্ছি। কিন্তু মর-জগতে ক্ষণস্থায়ী বস্তু নিয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিপূর্ণরূপে এবং আজীবন সমানভাবে আমাদের যে অসাধ্য প্রয়াস তা অবশ্যই সফল হয় না। এই বিধানের রূপ তাই বারে বারে বদলায়। সামাজিক নিয়ম কানুন প্রথা সবই তাই বারবার বদলায়, এক যুগে যা ভাল তা আর এক যুগে ভাল নয়। কারণ সমাজ-সংগঠনের বিভিন্ন মৌল উপাদানের কোন একটিতে হয়তো পরিবর্তন হয়েছে, ফলে সমাজের নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি, শৃঙ্খলা-বিধি, জীবন-যাত্রাপ্রণালী, মূল্যবোধ সবই বদলায়। কিন্তু মূল্যায়ন দণ্ড যেটি তার পরিবর্তন ঘটে না, তার ভিত্তি মানব প্রকৃতি, জীব, ঈশ্বর, আত্মার-স্বরূপ, সৃষ্টির মূল রহস্য, আর তার অনন্ত চক্রাকারে বিবর্তনশীল প্রক্ষেপ এই বিশ্ব জগৎ—এই সব শাশ্বত সত্যের উপলব্ধির উপর। এই মূল্যায়ন দণ্ডটি বারবার মহাপুরুষেরা, শাস্ত্রকারেরা, আইন-রচয়িতারা গঠন করবার প্রয়াস করেন নতুন ক'রে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-জীবনে আর্থিক পরিবর্তনের সঙ্গে আমরা সচেতন প্রয়াস করি কোনও বাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি সমাজে উপস্থাপন করতে। সেইজন্য, বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে দেখা যায় যে বিবেকানন্দ-বিবৃত সত্য এবং পরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনীয় সত্য সম্বন্ধে যে ধারণা তার সম্যক্ পরিচয় না গ্রহণ করলে সমাজ-জীবন ও তার মূল সক্রিয় মৌল উপাদানগুলি আমাদের কাছে অন্ধ অনায়ত্ত শক্তিরূপে প্রতিভাত হয়। মানুষ আর্থিক শক্তিরই হাতে অন্ধ ক্রীড়নক মাত্র, এ ভ্রান্তিমূলক ধারণা সমাজ-তত্ত্বে এই কারণেই প্রবেশ করেছে। আর্থিক শক্তি সমাজ-জীবনের অন্যতম মৌল উপাদান এবং পরিবর্তনের ব্যাপারে অন্যতম সক্রিয় শক্তি, তা বলে মানুষ তার অন্ধ দাস নয়। আমরা তার সঙ্গে আমাদের সচেতন প্রয়াস সংযুক্ত ক'রে তাকে নানারূপ ডৌল দিতে পারি। তাছাড়া, মানুষের অধ্যাত্ম ও ধর্ম-চিন্তা, শিল্প-প্রয়াস ও উপলব্ধি, জীবন-বোধ ও জীবন-রহস্য-বোধের প্রচেষ্টা—এগুলিও সমাজ-জীবনের পরিবর্তনে সক্রিয় শক্তি। বুদ্ধের ধর্ম-চিন্তা ও মার্কসের দার্শনিক ও সমাজ-চিন্তা সমাজে বহু পরিবর্তন এনেছে, বৌদ্ধযুগের ইতিহাসে ও চীন-রাশিয়ার বিপ্লবের মধ্যে তার সাক্ষ্য আছে।

মানব-প্রকৃতি ও মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নিরূপণের উপর সমাজ-জীবন অনেকাংশে নির্ভরশীল। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ দু'টি মূল তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন করেছেন, তা তাঁর সত্য উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। তা হ'ল প্রথমতঃ মানুষের দেবত্ব (Divinity of man) ও মানুষের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রবণতা (Essential spirituality of man)-এর থেকে তিনি সমাজ-জীবনের কাম্য রূপ নির্ণয় করেছেন, বলেছেন :

> That every society, every state, every religion ought to be based on the recognition of this all powerful presence latent in man. ......That in order to be fruitful all human interest ought to be guided and controlled according to the ultimate idea of the spirituality of life.

অর্থাৎ প্রত্যেক সমাজ, প্রত্যেক রাষ্ট্র, প্রত্যেক ধর্মকে মানুষের মধ্যে সেই সর্বশক্তিমান অস্তিত্ব যে সুপ্ত অবস্থায় নিহিত আছে, এই সত্য স্বীকৃতির উপর ভিত্তি ক'রে দাঁড়াতে হবে এবং মানব-জীবনের যে আধ্যাত্মিক-প্রবণতা স্বাভাবিক তা জেনে নিয়ে মানুষের সব স্বার্থ ও উদ্দেশ্যকে

গড়ে তুলতে হবে ও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, তবেই সমাজগঠনের উদ্দেশ্য সফল হবে। তাঁর এ কথার তাৎপর্য কি ? এ কথার সুগভীর তাৎপর্য আজও পর্যন্ত ভেবে দেখিনি আমরা। সেই কারণেই আমরা এর এই নিহিতার্থ এতাবৎকাল ধরে নিয়েছি যে তিনি এর দ্বারা সব মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা ও সকলকে সমান অধিকার প্রদানের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। কথাটি সত্য, কিন্তু আংশিক সত্য। সব মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা তিনি নিশ্চয়ই বলেছেন। কিন্তু তা স্থূল আর্থিক বা রাজনৈতিক অধিকারের অর্থে মাত্র নয় এবং ঠিক এই জন্যই তাঁকে অন্যান্য সমাজতন্ত্রবাদীদের সমগোত্র বলে ঘোষণা করলে নিতান্ত ভুল হবে। আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অধিকারের কথাই মাত্র তিনি বলেননি, তা হ'লে তাঁর মৌলিকতার কোনও দাবিই থাকে না। তিনি বলেছেন সমান অধিকার থাকলেই চলবে না, মানুষের সব স্বার্থ গড়ে তুলতে হবে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তার স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক-প্রবণতার দিকে দৃষ্টি রেখে। এখানেই বিবেকানন্দের সমাজ-চিন্তা অন্যান্য যাবতীয় সমাজ-তত্ত্ববিদ্দের চিন্তাধারা থেকে ভিন্ন রূপ নিয়েছে এবং নতুন অর্থবহ হয়ে উঠেছে। যে সাম্যবাদের কথা তিনি বলেছেন তাই তার রূপও অন্য। বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিক-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করলেই সে সাম্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না। সে রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যপদ্ধতি, সে সমাজের সমগ্র জীবন মানব-জীবনের দেবত্ব ও আধ্যাত্মিকতা উন্মেষের সহায় হবে। ফলে শুধু রাষ্ট্রবিপ্লব নয়, আর্থিক বিপ্লব নয়, মানুষের সমগ্র জীবন-জোড়া এক আমূল পরিবর্তনের তিনি রূপ দিয়েছেন, এবং সর্বপ্রকার বিশেষ সুবিধার অবসান চেয়েছেন তিনি। শুধু অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক নয়, ধর্মের নামে যে বিশেষ সুবিধা আবহমান কাল ধরে প্রতিষ্ঠিত রাখবার প্রয়াস চলেছে তারও তিনি অবসান চেয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত :

> But the idea of privilege is the bane of human life. ..There is first the brutal idea of privilege, that of strong over the weak. There is the privilege of wealth. If a man has more money more than another he wants a little privilege over those who have less. There is still the subtler and more powerful privilege of intellect, because one man knows more than others, he claims privilege. And the last of all and the worst, because the most tyrannical is the privilege of spirituality. If some persons think that they know more of spirituality, of God, they claim superior privilege over everyone else... The same power is in every man, one manifesting more, the other less, the same potentiality is in every one. There is the claim to privilege ?
>
> —(Vedanta and Privilege)

সর্বপ্রকার বিশেষ সুবিধার অবসান চেয়েছেন বিবেকানন্দ, সে বিশেষ সুবিধা শারীরিক শক্তির ভিত্তিতে হোক, অর্থের বুদ্ধিব বা বিদ্যাবত্তার ভিত্তিতে হোক বা ধর্মের ভিত্তিতে হোক। বেদান্ত-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমাজের যে পরিকল্পনা করেছেন বিবেকানন্দ তাতে বিশেষ সুবিধার কোনও স্থান নেই।

যে সর্বাত্মক সাম্যবাদের কথা বিবেকানন্দ বলেছেন, অনেকে তাকে নিছক কয়েকটি উচ্ছ্বাসের কথা বলে ধরে নিয়ে তাঁকে আখ্যা দিয়েছেন 'romantic socialist'. পাশ্চাত্যে এই আখ্যা-প্রাপ্ত কয়েকজন সাম্যবাদী আছেন, যথা Robert Owen, St. Simon, Fichte প্রভৃতি। কিন্তু এই সকল সাম্যবাদীদের সঙ্গে বিবেকানন্দের আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ তাঁদের সাম্যবাদ হচ্ছে একটি 'pious wish' বা সদিচ্ছা মাত্র, যুক্তি-তর্কের ভিত্তি তাঁদের

বিশেষ ছিল না। কিন্তু বিবেকানন্দের অভিমতের ভিত্তি বৈজ্ঞানিক যুক্তি-সহ ও ইতিহাস-সম্মত। প্রথমতঃ বেদান্তের সিদ্ধান্ত হতে তর্কশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী তাঁর সিদ্ধান্ত তিনি উপস্থাপিত করেছেন জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ যদি অভিন্ন হয়, তাহলে সহজ সিদ্ধান্ত এই যে সব মানুষের সমান অধিকার আছে, কারও কোন বিশেষ সুবিধা থাকতে পারে না। এ ছাড়া বিজ্ঞান ও ইতিহাস-ব্যাখ্যার দ্বারাও তিনি তাঁর মত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করেছেন তাঁর প্রমাণ আমরা তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা পত্র এবং অনুপম অথচ অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ 'বর্তমান ভারতে' পাই। বারান্তরে এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনার ইচ্ছা রইল।

শ্রীশ্রীভক্তজন-স্তুতি

[সঙ্গীত]

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

সর্বশক্তি বিশ্বপতি কে করেছে জয় ?
সে তো আর কিছুই নয়, ভক্তের হৃদয় ॥
অণুপরমাণু হয়েও বেঁধেছে ভূমা।
ষড়ৈশ্বর্য-রূপধারী মহান্ মহিমা ॥
ভবে থেকেও ভবপাশ কে করেছে ক্ষয় ?
সে তো আর কিছুই নয়, ভক্তের হৃদয় ॥

বিশ্বমাঝে নিঃস্বভাবে কে করেছে দান ?
সে তো আর কিছুই নয়, ভক্তের পরাণ ॥
আত্মা-ধনে সর্বজনে করেছে অর্পণ।
ভরি' বক্ষ হর্ষে দুঃখ করেছে হরণ ॥
বিশ্ববিষ অহর্নিশ কে করেছে পান ?
সে তো আর কিছুই নয়, ভক্তের পরাণ ॥

সুধাহাসি পূর্ণশশী কে করেছে ম্লান ?
সে তো আর কিছুই নয়, ভক্তের বয়ান ॥
স্নিগ্ধ শোভা মনোলোভা করেছে শীতল।
শতধারে মধুঝোরে তপ্ত ধরাতল ॥
অমৃতের উৎস-তলে কে করেছে স্নান ?
সে তো আর কিছুই নয়, ভক্তের বয়ান ॥

অরূপের রূপসুধা কে করেছে পান ?
সে তো আর কিছুই নয়, ভক্তের নয়ান ॥
চিত্তদ্যুতি নিত্য-নিতি করেছে উজ্জ্বল।
রক্তরাগে অনুরাগে কলঙ্ক-কজ্জল ॥
দেব-হৃদে পরাহ্লাদে কে মেরেছে বাণ ?
সে তো আর কিছুই নয়, ভক্তের নয়ান ॥

ধবাধূলা পরাজিয়া কে করেছে রণ ?
সে তো আর কিছুই নয়, ভক্তের চরণ ॥
পদক্ষেপে বিশ্ব ব্যেপে ফুটেছে কমল।
লীলা-লোল রসোচ্ছল নবনী-কোমল ?
স্বর্গ-লোকে নিত্য-সুখে কে করে ভ্রমণ ?
সে তো আর কিছুই নয়, ভক্তের চরণ ॥

রমা দীনা অকিঞ্চনা যাচে কৃপাকণা।
ভক্ত-পাদ-পদ্ম-রেণু পীযূষ-ঘনা ॥
হোক ভক্তগণ জয় !
অমৃত অভয়।
হোক বিশ্ব নিরাময় !
বিভু-পদাশ্রয় ॥

সমালোচনা

Idealism : A New Defence and a New Application—প্রণেতা শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দেব, এম এ, পি-এইচ. ডি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পাকিস্থান কো-অপারেটিভ্ বুক সোসাইটি, ঢাকা কর্তৃক পরিবেশিত। রয়াল—১২৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ৪৲ টাকা।

আলোচ্য পুস্তকটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন-ধারার চিরাচরিত বস্তু-বিশ্লেষণের রোমন্থন নয়। ইহার প্রধান নয়টি অধ্যায়ে এবং প্রায় দেড়শত অনুচ্ছেদে, একদিকে যেমন বিভিন্ন দর্শনবাদের মূলসূত্রগুলিকে আহরণ করা হইযাছে, অন্যদিকে তেমনি আবার তাহাদের সুচিন্তিত প্রয়োগমূলক সংযোগে মানবের কল্যাণকামী সমাজ কিভাবে নানা আদর্শবাদী দর্শনের সমন্বয়-সূত্রের সাহায্যে সার্থক মানবগোষ্ঠির সৃষ্টি করিয়া এই জগতেই মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রসর করাইয়া দিয়া তাহাকে যথার্থ মনুষ্য-ধর্মে ব্রতী করিতে পারে—তাহারই একটি সুষ্ঠু আলোচনা রূপায়িত হইয়াছে।

ইহাতে প্রথমেই দেখিতে পাই আদর্শবাদী দর্শন-চিন্তার প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও বর্তমান রূপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং উহাদেরই সাথে সাথে লেখকের ঐ সব বিষয়ে প্রশংসনীয় অভিমত-চয়ন। এই আলোচনায় সোক্রাতেস্, প্লেতো, আকুইনস্, কাণ্ট, হেগেল, স্পিনোজা, শঙ্করাচার্য, আল্-ঘাঝলী প্রভৃতি অনেকের দর্শনবাদের সারাংশের বিচার আছে এবং এই প্রসঙ্গে আদর্শবাদের কোন কোন ভুলের প্রতিও (অবশ্য লেখকের মতে) আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কিভাবে ঐসব সুসংস্কৃত আদর্শবাদের সঙ্গে বিজ্ঞান ও বাস্তবতা, তথা বস্তুবাদ ও আদর্শবাদ সম্মিলিত হইয়া আবার মনুষ্যত্বকে বাঁচাইতে পারিবে—সে বিচারও আমাদের নিকট উপস্থাপিত দেখিতে পাই।

পরিশেষে দার্শনিক ভিত্তিতে জগতের বর্তমান রাজনীতি ও সমাজনীতি সুসংস্কৃত করিলে মানুষ কিরূপে এক সর্বমানবীয় ভালবাসার জীবনালোকে উদ্ভাসিত হইয়া সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে পারিবে—তাহারও দিঙ্ নির্ণয় সুধী লেখক করিয়াছেন।

মোট কথা, ইহা বিভিন্ন দর্শনবাদের একটি সংকলন-পুস্তক নহে। ইহাতে দর্শনের আদর্শবাদের পটভূমিকায় ভবিষ্যৎ মানবের গ্রহণীয় দার্শনিক মতবাদের কথাই আলোচিত হইয়াছে অধিক। তথ্যের দিক হইতে এই বিচার এক নূতনতর আস্বাদে রুচিকর হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তাহা কিভাবে কার্যে পরিণত করা যায়, এবং সেজন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, কিভাবে ঐ আদর্শ প্রচার করিলে তাহা সর্বমানবের নিকট গ্রহণীয় হইবে, কিংবা এই তথ্য সত্যসত্যই এই পার্থিব জীবনে সকলের দ্বারা প্রতিপালন করা সম্ভব কিনা—ইত্যাদি প্রয়োগমূলক আলোচনার বহুমুখী বিচার আরও অধিক আলোচিত হইলে ভাল হইত।

পুস্তকের পরিশেষে লেখক যে কল্পনার ছবি আঁকিয়াছেন—'নবদর্শন'-অনুযায়ী ভবিষ্যদ্রূপের অনুশীলন দ্বারা জগতে একটি মাত্র মানুষ জাতি তাহাদের আদর্শবাদের নবরূপায়ণের মাধ্যমে পরস্পর প্রীতি ও প্রেমের আকর্ষণে, এবং বিজ্ঞানের মঙ্গলীভূত প্রচেষ্টায় একেশ্বরবাদের আলোকে সহ-অবস্থান করিতেছে—তাহা যদি

সত্যই এই মুমূর্ষু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়—তাহা হইলে পরম মঙ্গল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা সত্য-সত্যই বাস্তবে পরিণত হইবে কিনা তাহা আগামীকালের ইতিহাসই সাক্ষ্য দিবে। একথা ঠিকই যে পৃথিবীর সকল মানবই যদি মহম্মদ ও রামচন্দ্র, যীশু ও শ্রীরামকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কনফুসিয়সে পরিণত হইত তাহা হইলে জগৎ সত্যই সুন্দর হইত, কিন্তু ইহা যে হয় না, তাহাই তো সকল দুঃখের মূল।

পুস্তকটির কাগজ, মুদ্রণ ও বাঁধাই সুন্দর ও রুচিকর। ইহাতে অনেক বানান ভুল রহিয়া গিয়াছে, পরবর্তী সংস্করণে তাহা সংশোধিত হইলে পুস্তকের শ্রীবৃদ্ধি হইবে আশা রাখি।

আমরা সর্ব শ্রেণীর পাঠককেই এই পুস্তকে আলোচিত সকল মানবের মঙ্গলপ্রদ আদর্শ পথ-রেখার সন্ধান নিতে আহ্বান জানাইতেছি।

—**মহানন্দ**।

অনামী (পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ) : শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত, প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। পৃষ্ঠা ৪২২, মূল্য টাকা ৬৫০।

শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদপূত গ্রন্থখানি একদিকে যেমন সাধক 'সুরসুধাকরে'র অনবদ্য অবদান, অন্যদিকে তেমনি পাঠক-পাঠিকাদের আকাঙ্ক্ষিত একখানি সুন্দর সঞ্চয়ন।

'অনামী' রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া নাম, নামটি একাধিক কারণে সার্থক হয়েছে। ভাগবত রস যে নামের মাধ্যমে সিঞ্চিত হয়, যে নাম নামীর সন্ধান দেয়—সে নাম অনামীর মাঝেই হারিয়ে যায়। তাছাড়া 'অনামী' শুধু তো গীতিসঞ্চয়ন বা কাব্যসংগ্রহ নয়। সূচীপত্রেই তার পরিচয়।

(১) মণিমঞ্জুষায় আছে নানা কবির সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ কবিতার অনুবাদ। সংস্কৃত, ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী, ইতালিয়ান, হিন্দী, ফার্সী কবিদের কোথাও অনুবাদ, কোথাও অনুরণন, কোথাও বা প্রতিস্বনন (resonance)।

(২) 'কবিতা-কুঞ্জে' কবি নিজে সুর ধরেছেন, এখানে তাঁর নিজের নির্বাচিত কবিতা। বহু পরিচিত কবিতার সঙ্গে আবার যেন নতুন ক'রে দেখা হয়। লঘুগুরু ছন্দে ১৮ পঙ্‌ক্তির, ১২ পঙ্‌ক্তির সনেট বাংলায় বড় দেখা যায় না। ১৮টি 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিকা' ভাবের গভীর-তায়, ভাষার সংক্ষিপ্ততায় এবং ছন্দের বৈচিত্র্যে শিল্পরীতির নতুন ইঙ্গিত দেয়, তবে মনে হয় এ রীতি অনুকরণ করা সহজ নয়।

(৩) 'গীতিগুঞ্জনে'—কবির অন্তর্লোকের সাধনার সুর-মূর্ছনা বেজে উঠেছে কখনও গভীর গাম্ভীর্যে, কখনও বা ব্যাকুল ব্যঞ্জনায়।

(৪) 'মীরাভজনে' পাওয়া যায় ইন্দিরা-দেবীর 'সুধাঞ্জলি' গীতাবলীর অনুবাদ।

(৫) 'পরিশিষ্টে' আছে দেশী বিদেশী মনীষী-দের কাছে লেখা দিলীপকুমারের চিঠি, কোন কোন ক্ষেত্রে আছে দিলীপকুমারকে লেখা তাঁদের চিঠি।

এতগুলি অন্তর্নিহিত নাম যে গ্রন্থের, তার কি অন্য নাম সম্ভব? 'অনামী' নাম ঠিকই হয়েছে। এই হৃদয়োৎসারিত কাব্য-সঙ্গীত-সুষমা আমাদের ভাল লেগেছে এবং যাঁরা দিলীপ-কুমারের অন্তরের পরিচয় পেতে চান—তাঁদের পক্ষে এই সঞ্চয়নখানি অপরিহার্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

মাদ্রাজ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ১৯৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৪২,৫৮৬ ('৫৭ খৃঃ ১,৩৩,৩৫১), এক্স-রে বিভাগে ৩ শতাধিক, চক্ষু-বিভাগে ১৭ হাজারের অধিক, E.N.T. বিভাগে ১১ হাজারের অধিক এবং দন্ত বিভাগে ৫,৬৬৬ রোগীর পরীক্ষা ও চিকিৎসাদি করা হয়। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের ২,০০০ রুগ্ণ ও অপুষ্ট শিশুর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিশেষ চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মোট ৮৫,৮৩৯ জনকে দুধ দেওয়া হয়। লেবরেটরির পরীক্ষাকার্য উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, ৬২০টি নমুনা পরীক্ষা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ১৪জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসা করেন। সরকার ও জনসাধারণের সহানুভূতিতে এই সেবা-প্রতিষ্ঠান ক্রমবিস্তার লাভ করিতেছে।

বাঙ্গালোর ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যার্থিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৩ খৃঃ স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রম-সংলগ্ন একটি গৃহে। জনসাধারণের আগ্রহাতিশয্যে বিভিন্ন কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রদিগকে নৈতিক জীবন-গঠনের সুযোগ দানের জন্য পর বৎসরই ডক্টর নারায়ণ রাও-এর প্রদত্ত ভবনে ইহা স্থানান্তরিত হয় এবং বিদ্যার্থিসংখ্যাও ৬ হইতে বাড়িয়া ৩৫ হয়। এই ভবনেই ১১ বৎসর বিদ্যার্থিমন্দিরের কাজ চলে।

১৯৫৪ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে নূতন বিদ্যার্থিমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ।

নীচের তলায় ১৮টি এবং উপর তলায় ১৯টি ঘর বিশিষ্ট প্রশস্ত দ্বিতল ভবনের নির্মাণ-কার্যে ৭৫,৩৫০ টাকা খরচ হইয়াছে। প্রার্থনা-গৃহ, অধ্যয়ন-গৃহ প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছে, গ্রন্থাগার ব্যায়ামাগার প্রভৃতি এখনও নির্মিত হয় নাই। ৮৫ জন ছাত্র এখানে থাকিতে পারিবে।

রাঁচি ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৫৮ খৃঃ বার্ষিক কার্যবিবরণীতে প্রকাশ ঃ এই কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়টিতে রোগী-সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, যথেষ্ট বায়োকেমিক এবং এলোপ্যাথিক ঔষধও রাখা হয়। সহায়ক সহ একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক সেবার ভাবে প্রতিদিন রোগিগণের চিকিৎসা করেন। এ বৎসর রোগীর সংখ্যা ৮ হাজারের উপর। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পথ্যও দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত দরিদ্র পল্লীবাসীদের প্রায় ১,০০০ জনকে গুঁড়া দুধ ও ১০০ জনকে বিবিধ-পুষ্টিসাধক খাদ্য (multipurpose food) দেওয়া হইয়াছে।

শহরের প্রান্তে নির্জন স্থানে নূতন গ্রন্থাগার নির্মিত হওয়ায় শহরের ও পল্লী-অঞ্চলের লোকদের পাঠের সুবিধা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান রাজনীতি অর্থনীতি ইতিহাস সাহিত্য ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ে ১,৩১৪ খানি নূতন পুস্তক সংযোজিত হইয়াছে। লাইব্রেরি-হলে সমাজ ও কৃষ্টি সম্বন্ধীয় সভা এবং শিক্ষামূলক চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, মাঝে মাঝে সঙ্গীতানুষ্ঠানও উল্লেখযোগ্য।

আশ্রমে নিয়মিত পূজা পাঠ ভজন কীর্তন হয়। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও খৃষ্টের জন্মদিনে বিশেষ ভজন ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথিতে বিশেষ উৎসবে দরিদ্রনারায়ণ-সেবা অনুষ্ঠিত হয়, এবং সভায় তাঁহাদের জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়। আদিবাসী গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে আশ্রমটির সমাজসেবামূলক কাজের পরিধি ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

উৎসব-সংবাদ

বালিয়াটীঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ১৪ জ্যৈষ্ঠ হইতে ২০শে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে নগরকীর্তন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, হোম, সভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ মধ্যাহ্নে দরিদ্রনারায়ণ-সেবায় ৩০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে বার্ষিক সভায় অধ্যাপক উপেন্দ্রমোহন সাহা অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশ আলোচিত হয়। ১৮ই হইতে ২০শে জ্যৈষ্ঠ তিন দিন স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক 'স্বামীর ঘর' ও 'মহিষাসুর' অভিনীত হইয়াছে।

জয়রামবাটী (বাঁকুড়া) ঃ গত ২৭শে বৈশাখ (অক্ষয় তৃতীয়া) শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পবিত্র আবির্ভাব-ভূমি জয়রামবাটী গ্রামে শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির-প্রতিষ্ঠার সপ্তত্রিংশ বার্ষিক মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রত্যূষে মঙ্গলারতি পূজা, পাঠ, ভজন ও সমাগত ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ দেওয়া হয়। বৈকালে বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মহেশ্বরানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে এক জনসভায় কলিকাতা হইতে আগত অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত, শ্রীসমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী ভবানন্দ মহারাজ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর ভজন ও রামায়ণ গান হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার

সানফ্রান্সিসকোঃ প্রতি রবিবারে বেলা ১১টায় এবং বুধবার রাত্রি ৮টায় বেদান্ত সোসাইটির নিজস্ব ভাষণ-গৃহে স্বামী অশোকানন্দ, স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন :

জানুআরি, '৫৯ : নববর্ষের আহ্বান, স্বামী শিবানন্দ—যেমন আমি বুঝিয়াছি, কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব, মানুষ—ঈশ্বরের প্রতিরূপ, খৃষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণ, পূজা—তত্ত্ব ও সাধন, আধ্যাত্মিক অনুভূতির মনোবিজ্ঞান, কর্ম হইতে কিরূপে মুক্তি পাওয়া যায়?

ফেব্রুআরি : তাঁহাকে খুঁজিও না—দর্শন কর, অন্তর্জীবন, স্বামী বিবেকানন্দ—আমেরিকায় প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ, অমরত্বের প্রমাণ, শাস্তি নয়, তববারি, ঈশ্বর কোথায়? আমরা মরি কেন? মানুষের একটিই সমস্যা—মন!

মার্চ : ঈশ্বর দর্শনের অর্থ, ব্যক্তিগত ধর্ম, মন পবিত্র কবিবার উপায়, শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন ও কর্ম, ঈশ্বর এবং আত্মা, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য, পুনরুজ্জীবনের প্রকৃত অর্থ।

এতদ্ব্যতীত প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮টায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। প্রতি রবিবার ছোটদের মধ্যে সকল ধর্মের উদার সর্বজনীন সাধারণ ভাবগুলি সঞ্চারিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। স্বামী অশোকানন্দ ধর্মজীবন-গঠনে আগ্রহশীল তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণকে উপদেশ দিয়া থাকেন।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে ভক্ত পণ্ডিত আকুলি মিশ্র

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ৩০শে মে, ১৯৫৯, শনিবার অপরাহ্ণ ৫।১০ মিনিটের সময় ওড়িশ্যার বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক বিশিষ্ট সমাজসেবী ভক্ত পণ্ডিত আকুলি মিশ্র সত্তর বৎসর বয়সে কটক তেলেঙ্গাবাজার-স্থিত নিজ বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। চারি বৎসর পূর্বে পণ্ডিত মিশ্রের দৃষ্টিশক্তি লোপ পায় এবং এক বৎসর হইল তিনি রক্তচাপ-জনিত রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন।

পণ্ডিত আকুলি মিশ্র কটক জিলার খণ্ডসই গ্রামে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা দরিদ্র পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। বদান্য ব্যক্তিদের সাহায্যে আকুলিবাবু কেন্দ্রপাড়া বিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন এবং সেখান হইতে কাব্যতীর্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে চাকরির জন্য তিনি কটকে আসেন এবং সেখানে মিশনরী স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন, সেই সময়ে (১৯১৪) কটকে পাঠ্য পুস্তকের কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ছিল না। পণ্ডিত মহাশয় কয়েকজনের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য লইয়া 'কটক ট্রেডিং কোম্পানি' নামে ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং শীঘ্রই উহাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে সুলভ মূল্যে বিক্রয়ের জন্য ওড়িয়া ভাষায় বহু পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করেন। এ ছাড়া তিনি জগন্নাথ দাসের ওড়িয়া ভাগবত, কৃষ্ণসিংহ রচিত মহাভারত, রাধানাথ-গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন।

পণ্ডিত মিশ্র অতি ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। ১৯১২।১৩ খৃঃ যখন তিনি কলিকাতায় ছিলেন, তখন পদব্রজে জয়রামবাটী গিয়া সেখানে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট দীক্ষা লাভ করেন।

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে কয়েকজন বন্ধুর সহিত কটকে দরিদ্র ছাত্রদের সুশিক্ষা দানের এবং ধর্মজীবন যাপনের জন্য 'রামকৃষ্ণ কটেজ' নামে একটি ছাত্রনিবাস স্থাপন করেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচারে সহায়তা করিতে থাকেন। পণ্ডিত আকুলি মিশ্রের দেহত্যাগে সমগ্র উৎকলবাসী একজন বিশিষ্ট ধর্মপরায়ণ, সাধুপ্রকৃতি এবং সমাজসেবী ব্যক্তি হারাইলেন, আমরা এই ভক্তের আত্মার কল্যাণ কামনা করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উৎসব-সংবাদ

দক্ষিণেশ্বরঃ শ্রীরামকৃষ্ণ বানপ্রস্থ আশ্রমে গত ৫ই আষাঢ় (২০শে জুন, ১৯৫৯) স্নানযাত্রা দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা হোম ও ভোগারতির পর প্রায় দুই শতাধিক ভক্তকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও ভজন হয়। সন্ধ্যারতির পর কলিকাতা 'হরিবাসরে'র সভ্যগণ কর্তৃক কীর্তন ও শ্যামা-সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়।

খড়্গপুরঃ গত ১৩ই জুন হইতে দিবসত্রয় এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিবস অষ্টপ্রহর নাম-যজ্ঞ, দ্বিতীয় দিবস শোভা-যাত্রা ও বেতার-কথক পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'র কথকতা এবং তৃতীয় দিবস বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, কথামৃত আলোচনা ও প্রসাদবিতরণের পর বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী মহানন্দের সভাপতিত্বে এক বিরাট ধর্মসভা হয়। সভাপতি

মহারাজ বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় দুই ঘণ্টাব্যাপী ভাষণ দেন। দ্বিতীয় দিবস কথকতায় প্রায় ৪,০০০ এবং তৃতীয় দিবস ধর্মসভায় প্রায় ৫,০০০ নরনারীর সমাগম হয়।

মেদিনীপুরের মফঃস্বলে : গত এপ্রিল, মে ও জুন মাসে ঘাটাল, চন্দ্রকোণা, শালবনী, গোপীনাথপুর, কল্যাচক ও ব্রাহ্মণবসানে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পূজা পাঠ ভজন ও প্রসাদ-বিতরণ ও ধর্মসভার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাটালে আয়োজিত সভায় মহকুমাশাসক শ্রীঅমলকুমার দাশগুপ্ত (সভাপতি) এবং স্বামী ব্রহ্মাত্মানন্দ ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। চন্দ্রকোণায় অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন 'যুগসমস্যা ও শ্রীরাম-কৃষ্ণ' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সব কয়টি স্থানেই শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গীত-সহযোগে কথকতা শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। স্বামী বিশ্বদেবানন্দ তিনটি সভায় পৌরোহিত্য করেন। কল্যাচকের সভায় স্বামী অন্নদানন্দ সভাপতিত্ব করেন।

কুচবিহার : স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৮ই হইতে ২০শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী যুক্তানন্দ বিভিন্ন দিনে 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী', 'স্বামী বিবেকানন্দ' ও 'শ্রীশ্রীমা' সম্বন্ধে বলেন। উৎসবের প্রথম ও শেষ দিন রাত্রে 'কৃষ্ণযাত্রা' হয়।

আলিপুর দুয়ার : গত ২৫শে ও ২৬শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বহু ভক্ত সমক্ষে স্বামী যুক্তানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন আলোচনা করেন।

ডিব্রুগড় : শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতির উদ্যোগে গত ২৪শে হইতে ২৬শে এপ্রিল দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের সভায় স্বামী মহানন্দ 'বর্তমান যুগে বেদান্তের স্থান' বিষয়ে বক্তৃতা দেন এবং সভাপতি লখিমপুরের জেলাশাসক বেদান্তের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিন শ্রীনন্দেশ্বর চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী সৌম্যানন্দ ও স্বামী মহানন্দ বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা ও নাগরিকদের কর্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া 'আধুনিক যুগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শেষদিন কীর্তন ভজন পূজা ও প্রসাদবিতরণ হয়।

ইম্ফল : শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতির উদ্যোগে গত ২৪শে এপ্রিল বাবুপাড়া পূজামণ্ডপে শ্রীরাম-কৃষ্ণ জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রথম দিন জনসভায় স্থানীয় জুডিসিয়েল কমিশনার শ্রীরবি-বর্মা তিরুমল্পদ সভাপতিত্ব করেন। এই উৎসবে শিলং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ভব্যা-নন্দ যোগদান করেন।

দ্বিতীয় দিন পূজা, হোম, ভোগরাগ ও সারাদিনব্যাপী ভজন ও কীর্তন ছিল প্রধান অঙ্গ। সমবেত ভক্তবৃন্দ পুষ্পাঞ্জলির পর প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইয়াছেন।

কুমিল্লা : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৭ই হইতে ১০ই বৈশাখ পর্যন্ত চারদিনব্যাপী শ্রীরাম-কৃষ্ণ-জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। নোয়াখালি 'গান্ধী শান্তিশিবিরে'র ব্যবস্থাপক শ্রীচারু চৌধুরীর সভাপতিত্বে তৃতীয় দিবসে একটি সাধারণ সভায় ভক্ত ও মনীষিগণ বিভিন্ন দিক দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন আলোচনা করেন।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার বাল্যকালের কথা স্মরণ করিয়া বলেন : ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণীতে পড়িবার সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সংগৃহীত 'শ্রীরাম-কৃষ্ণের উপদেশ' বইখানি পাই, তখন কিছু বুঝি নাই। 'বিবেকবাণী' বইখানি পড়িয়া বুঝি যে স্বাধীনতা লাভই জীবনের উদ্দেশ্য, সে সাধনা এখনও চলিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-সাধনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন : জগতের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এক একটি ধর্ম দিকে দিকে বিকশিত হয়েছে; হিন্দুধর্মে দর্শনের, বৌদ্ধধর্মে করুণার, খৃষ্টধর্মে সেবার, ইসলামে সৌভ্রাত্রের বিকাশ।

পরিশেষে সভাপতি বলেন : বেদের শেষ ও শ্রেষ্ঠ ভাব যেমন বেদান্ত, তেমনি আজ সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ভাব নিয়ে 'ধর্মান্ত' করার সময় এসেছে। অর্থাৎ 'কে কোন্ ধর্মের' এ প্রশ্ন আর কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করবে না। ধর্মসমন্বয়ই এই 'ধর্মান্ত'। গীতায়ও শ্রীভগবান বলেছেন 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—সকল ধর্মের শেষে সেই এক ভগবান্, তাঁহার উপর একান্তভাবে সর্বস্ব সমর্পণ করাই 'ধর্মান্ত', এই ভাবের দ্বারাই সব মানুষ এক হতে পারে। অশুভচিন্তনের দ্বারা আবহাওয়া বিষাক্ত হয়। শুভচিন্তার দ্বারা তা আবার ভাল হতে পারে। নিজ নিজ ব্যক্তিগত প্রার্থনা শেষ ক'রে যদি সকলে দিনান্তে একবার একত্র হয়ে সকলের শুভচিন্তা করে, তাহলে দেখা যাবে কিছু দিনের মধ্যে আবহাওয়া বদলে গেছে। বিভেদের মাঝে এই এক করার আহ্বান নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী আজ আমাদের হৃদয়ের দ্বারে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

জলে লবণতা-বৃদ্ধি : এ বৎসর কলিকাতায় পরিস্রুত ও ঘোলাজলের লবণতা গত বৎসর অপেক্ষা বাড়িয়াছে। কলিকাতা করপোরেশনের রেকর্ড অনুযায়ী এ বৎসর ২৯শে মে পরিস্রুত জলের লবণতা সর্বাধিক হইয়াছিল দশ লক্ষ ভাগে ৮৪০ ভাগ (840 parts per million gallons of water)। গত বছর (১১ই মে) সর্বাধিক লবণতার এই সূচক সংখ্যা ছিল ৬৮০ (680 p.p.m.)।

ঘোলা জলের সর্বাধিক লবণতা এ বৎসর ২৪৫০ (2450 p p m.), গত বৎসরের এই সংখ্যা ছিল ১৯২০ (1920 p.p m.)। বৃষ্টি হওয়ার পর হইতে এই লবণতা কমিতেছে।

থ্রম্বোসিস : হৃদ্রোগ-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মাথুর আগ্রায় (Indian Council of Medical Research) চিকিৎসকদের গবেষণা-সভায় বলিয়াছেন : গত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারতে করোনারি থ্রম্বোসিসের আক্রমণ বাড়িয়াই চলিয়াছে। হৃদ্‌যন্ত্রে রক্ত জমাট বাঁধিয়া রক্ত-চলাচলে বাধা সৃষ্টির ফলে এই রোগ হয়।

ডাঃ মাথুরের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়িয়াছে,—পল্লীবাসী অপেক্ষা শহরের অধিবাসীদেরই এই রোগ হইবার সম্ভাবনা বেশী। তাঁহার পরীক্ষিত রোগীদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই উচ্চতর সামাজিক-আর্থনীতিক স্তরের (higher Socio-economic group)—তাঁহাদের অধিকাংশই সরকারী কর্মচারী, উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক ও অন্যান্য কর্মচারী এবং ব্যবসাদার। চাষী ও মজুরদের মধ্যে এই রোগ অজ্ঞাত।

করোনারি থ্রম্বোসিসের রোগীদের অধিকাংশের বয়স ৪৫ হইতে ৫০। নারী রোগী খুবই কম, পুরুষ রোগীর সংখ্যার অষ্টমাংশ।

ডাঃ মাথুরের মতে শারীরিক পরিশ্রমের অভাব ও আধুনিক জীবনের অত্যধিক মানসিক চাপই এই রোগের প্রধান কারণ।

বি. সি. জি. : যুক্তরাষ্ট্রের ১৭ জন ডাক্তার বি সি. জি. টিকার যক্ষ্মা-প্রতিষেধক শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। 'বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নালে' তাঁহারা তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন।

যদিও এই টিকার সাফল্য সম্বন্ধে প্রায়ই দাবি করা হয়, তথাপি তাঁহারা বলিয়াছেন—ইহার সঠিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

আইসল্যাণ্ড, হাওয়াই ও হল্যাণ্ড হইতে যক্ষ্মা দূরীভূত হইয়াছে, এ সকল স্থানে বি সি.জি. ব্যবহৃত হয় নাই বলিলেই চলে। ডেনমার্ক নরওয়ে এবং সুইডেনে বি সি. জি'র সাহায্যেই যক্ষ্মার সহিত সকল সংগ্রাম করা হইতেছে, তবে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পদ্ধতিও আছে।

সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁহারা বলিয়াছেন: খাঁটি বি সি.জি নাই বলিলেই হয়। এই টিকায় কয়েক প্রকার জীবাণু আছে এবং দেখা গিয়াছে কয়েকটি বিপজ্জনক। প্রধানতঃ গবাদি পশুর যক্ষ্মা-প্রতিষেধের পরীক্ষার ভিত্তির উপর পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে সকল গোশালায় টিকা বিফল হইয়াছে সে সকল স্থানে ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে, অল্প কয়েক স্থানে যেখানে পূর্ব পদ্ধতিই বহাল আছে, সেখানে অবস্থা সংকটাপন্ন।

সংস্কৃতি সংবাদ

বাইবেলের অনুবাদ: মূল গ্রীক হইতে বাইবেলের নূতন টেষ্টামেণ্ট আধুনিক ইংরেজীতে অনূদিত হইতেছিল, তাহা শেষ হইয়াছে। ক্যাথলিক চার্চ ব্যতীত অন্যান্য বড় বড় চার্চের অনুমতি লইয়া অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এই কাজে হাত দেন। পুরাতন টেষ্টামেণ্ট অনুবাদের কাজও আরম্ভ হইয়াছে, তবে উহা প্রকাশিত হইতে কয়েক বৎসর সময় লাগিবে। নূতন টেষ্টামেণ্ট মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে।

কালাডি (কেরল): গত ১৫ই মে বিহারের শ্রীকপিলদেব শর্মা শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে অখিল ভারতীয় সংস্কৃত সম্মেলনে কালাডিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমাবেশে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে:

(১) 'সংস্কৃত' সরকারী ভাষা হউক। তাহা হইলে প্রাদেশিক ভাষাগুলিরও যথেষ্ট উন্নতি হইবে, এবং হিন্দী-ইংরেজী বিতর্কের অবসান হইবে।

(২) এই সম্মেলন ভারতের বিভিন্ন মঠ ও দেবস্থানগুলির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে নিয়োগ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

(৩) কুরুক্ষেত্র, বারাণসী ও দ্বারভাঙ্গার আদর্শে কেরল রাজ্যের অন্তর্গত শংকরাচার্যের জন্মস্থান কালাডিতে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক, যেখানে 'বেদ', 'শাংকর বেদান্ত' ও 'তুলনামূলক ধর্ম' অধ্যয়নের বিশেষ ব্যবস্থা থাকিবে।

(৪) সংস্কৃত শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে অবৈতনিক করিতে হইবে।

(৫) ছাত্রদিগকে গবেষণার সুযোগ-দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) 'সাহিত্য আকাদামি'র আদর্শে 'সংস্কৃত আকাদামি' প্রতিষ্ঠিত হউক।

(৭) অপ্রকাশিত সংস্কৃত পুঁথিও প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হউক।

(৮) সংস্কৃত ভাষায় সাময়িক পত্রিকাদি প্রকাশিত হউক।

(৯) সকল রাজ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংস্কৃত অবশ্য পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

(১০) বৈদেশিক দূত নিয়োগ ব্যাপারে সংস্কৃত জ্ঞান বিশেষভাবে বিবেচিত হওয়া আবশ্যক, কারণ সংস্কৃতই ভারতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের বাহক।

(১১) বেতার-সূচীতে সংস্কৃতে সংবাদ ও সংস্কৃত-শিক্ষা প্রচারের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানানো হইতেছে।

উদ্বোধন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রম্

শ্রীকালীপদ-বন্দ্যোপাধ্যায়-বিদ্যাবিনোদেন বিরচিতম্

লব্ধ্বা পাশ্চাত্যশিক্ষামগণিতযুবকা ধর্মহীনা বিমূঢাঃ
স্বৈবাচারপ্রমত্তাঃ শুভমতিবহিতা ধ্বংসমার্গং গতাশ্চ।
তেষামুদ্ধারণার্থং ভুবনবিজয়িনং মাতৃমন্ত্রং দদানং
বন্দে শ্রীবামকৃষ্ণং কলিকলুষহবং পাবনং পুণ্যরাশিম্ ॥১॥

ধর্মানৈক্যাৎ পৃথিব্যামজনি জনমনঃস্বাসুবী ভেদবুদ্ধি-
র্হিংসা-দ্বেষোত্থদাবানল-দহনভয়ব্যাকুলে সর্বলোকে।
সর্বে ধর্মাঃ সমানা ইতি নিজচরিতৈর্মানবং দর্শয়ন্তং
বন্দে শ্রীরামকৃষ্ণং হবিহবদয়িতং কালিকা-লীনচিত্তম্ ॥২॥

নাধীত্য গ্রন্থরাজিং ন চ গুরুভবনং শিষ্যরূপেণ গত্বা
বেদান্তাতীত-তত্ত্বং সুললিত-বচনৈর্হেলয়া কীর্তয়ন্তম্।
জ্ঞানে তুঙ্গং মহীধ্রং শিশুমিব সরলং বিশ্বকল্যাণমূর্তিং
বন্দে শ্রীবামকৃষ্ণং দ্বিজকুলতিলকং নির্জবং মানবাখ্যম্ ॥৩॥

বাল্যাৎ ত্যাগস্য মার্গে স্থিবমতিচলিতং ভোগমার্গঞ্চ হিত্বা
পশ্যন্তং ন প্রভেদং কমপি কবধৃতে কাঞ্চনে মৃচ্চয়ে চ।
জিত্বা জৈবপ্রবৃত্তিং প্রকৃতিসহচরং ব্রহ্মচর্যং চরন্তং
বন্দে শ্রীরামকৃষ্ণং জগতি নিরুপমং সাধকেষগ্রগণ্যম্ ॥৪॥

জীবন্মুক্তং মহান্তং বিজিতভবভয়ং শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপং
বিশ্বাবাধ্যং মহিম্না বিজিতরিপুচয়ং তাপসং দেবকান্তিম্।
ভক্তানামার্তিরাশিং নিজবরবপুষি স্বেচ্ছয়া ধারয়ন্তং
বন্দে শ্রীরামকৃষ্ণং শরণগ-সদযং তাপিত-ত্রাণহেতুম্ ॥৫॥

শ্যামাধ্যানে নিমগ্নং হসিতরুদিতয়োর্লীলয়া দীপ্যমানং
'মা! মা! মা! মা!' ব্রুবাণং চরণ-সরসিজে তন্ময়ং লুপ্তসংজ্ঞম্।
উদ্গীতে মাতৃমন্ত্রে পুনরপি তরসা লব্ধসংজ্ঞং সচেষ্টং
বন্দে শ্রীরামকৃষ্ণং স্মরহর-রুচিরং পূজিতং সর্বলোকৈঃ ॥৬॥

গ্লানৌ ধর্মস্য পৃথ্ব্যাং প্রভবতি কলুষে পীড্যমানে চ সাধৌ
দুষ্টানাং শাসনায়াবতরতি ভুবনে বিশ্বরাড্‌বিশ্বভূত্যৈ।
যো রামো যো হি কৃষ্ণঃ শমন-ভয়হরো মানব-ত্রাণকর্তা
বিশ্বপ্রেমাবতারো ধৃতমনুজতনু রামকৃষ্ণঃ স এব ॥৭॥

জাহ্নব্যাঃ পুলিনে পবিত্রধরণৌ শ্রীমন্দিরে শোভনে
ঘণ্টা-শঙ্খ-নিনাদ-নিত্যমুখরে চৌঙ্কার-সন্দীপিতে।
দিব্যে ধাম্নি দিনে দিনে চ বহুভিঃ পুণ্যার্থিভিঃ সেবিতে
লীনং শ্রীভবতারিণী-চরণয়োঃ শ্রীরামকৃষ্ণং স্তুমঃ ॥৮॥

(বঙ্গানুবাদ)

পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া যখন দেশের অসংখ্য যুবক ধর্মহীন, বিমূঢ়, স্বেচ্ছাচারী ও শুভমতি-রহিত হইয়া ধ্বংসের পথে যাইতেছিল, তাহাদের উদ্ধারের জন্য যিনি ভুবনবিজয়ী মাতৃ-মন্ত্র দিয়াছিলেন, সেই কলিকলুষহারী— লোকপাবন এবং পুণ্যরাশি-স্বরূপ—শ্রীরামকৃষ্ণকে বন্দনা করি।১।

ধর্মের অনৈক্যবশতঃ যখন পৃথিবীতে জনগণের মনে অসুরসুলভ ভেদবুদ্ধির উদ্ভব হইয়াছিল, যখন লোকসকল হিংসাদ্বেষ-জনিত দাবানলের দহন-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল তখন যিনি নিজ আচরণের দ্বারা 'সকল ধর্মই সমান' ইহা মানবকে দেখাইয়াছিলেন, সেই হরিহরপ্রিয় এবং কালিকা-নিবিষ্টচিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে বন্দনা করি।২।

যিনি গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন বা শিষ্যরূপে গুরু-গৃহে গমন না করিয়াও বেদ-বেদান্তের অতীত তত্ত্বসকল অবলীলাক্রমে সুললিত ভাষায় কীর্তন করিতেন, এবং যিনি জ্ঞানে অত্যুচ্চ পর্বতসদৃশ হইয়াও শিশুর ন্যায় সরল ও বিশ্বকল্যাণের মূর্তিস্বরূপ ছিলেন, সেই দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠ এবং মানব-নামধারী দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণকে বন্দনা করি।৩।

যিনি বাল্যকাল হইতেই ভোগের পথ ত্যাগ করিয়া স্থিরচিত্তে ত্যাগের পথে চলিয়াছিলেন, যিনি হাতে সোনা এবং মাটির ঢেলা ধরিয়া উহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখিতে পান নাই, এবং যিনি জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে জয় করিয়া প্রকৃতি-সহচর হইয়াও ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছিলেন, জগতে তুলনাবিহীন এবং সাধকগণের অগ্রগণ্য সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে বন্দনা করি।৪।

যে জীবন্মুক্ত মহান্, ভবভয়-জয়কারী, শুদ্ধসত্ত্বগুণস্বরূপ, মহিমায় বিশ্বের আরাধ্য, রিপুগণ-জয়ী, দেবকান্তি তাপস স্বেচ্ছায় নিজের দিব্যদেহে ভক্তগণের আধিব্যাধি ধারণ করিয়াছিলেন, শরণাগতের প্রতি সদয় এবং তাপিতের ত্রাণকর্তা সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে বন্দনা করি।৫।

যিনি শ্যামা-ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া হাসিকান্নার লীলায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেন, যিনি 'মা! মা! মা! মা!' বলিতে বলিতে তাঁহার চরণকমলে তন্ময় হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইতেন, আবার যিনি উচ্চ স্বরে মাতৃমন্ত্র উচ্চারিত হইলে তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞালাভ করিয়া চেষ্টাশীল হইয়া উঠিতেন, সেই মহাদেবতুল্য মনোহর ও সর্বলোক-পূজিত শ্রীরামকৃষ্ণকে বন্দনা করি।৬।

পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি ও পাপের অভ্যুত্থান হইলে এবং সাধুলোক নিপীড়িত হইলে বিশ্বের রাজা (ভগবান্) দুষ্টের শাসন ও বিশ্বের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, যিনি শমনভয়হারী এবং মানবের ত্রাণকর্তা রাম ও কৃষ্ণ, তিনিই বিশ্বপ্রেমের অবতার মানব-দেহধারী রামকৃষ্ণ।৭।

জাহ্নবীতটে পবিত্রভূমিতে প্রতিদিন বহু পুণ্যার্থিসেবিত দিব্যধামে, শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনিতে নিত্য-মুখরিত, ওঙ্কার-সমুজ্জ্বল মনোরম মন্দিরে শ্রীভবতারিণীর চরণলীন শ্রীরামকৃষ্ণের স্তব করি।৮।

কথাপ্রসঙ্গে

মানসিক পুনর্বাসন

থ্রম্বোসিস বা ক্যানসার নয়, মানসিক স্তরচ্যুতিই এ যুগের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ব্যাধি। এই ব্যাধি দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এবং মানুষের ব্যক্তিগত পরিবারগত সমাজগত—সর্ববিধ শান্তি বিনষ্ট করিয়া আজ মানুষকে গৃহহারা লক্ষ্মীছাড়া উদ্বাস্তুর মতো করিয়া তুলিয়াছে। এই ব্যাপক ব্যাধির কারণ কি এবং কিভাবে ইহা দূরীভূত হইতে পারে, কিভাবে মানুষ আবার তাহার পূর্ব শান্তি ফিরিয়া পাইতে পারে, অর্থাৎ কিভাবে মানুষের মানসিক পুনর্বাসন সম্ভব—তাহাই আজ মানবপ্রেমিক মনীষিগণের চিন্তার বিষয়।

প্রাচ্যের মানুষ চাহিয়া আছে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানলব্ধ সুখসুবিধা ও জাঁকজমকের প্রতি, আর পাশ্চাত্য মনীষিগণ সে দেশের অশান্ত জীবনে বিরক্ত হইয়া শান্তির সন্ধানে বাহির হইয়াছেন প্রাচ্য-তীর্থ পরিক্রমায়, কিন্তু এদেশে আসিয়া তাঁহারা দেখেন—এখানে এখন রাজনীতির কচকচি, শিল্পোন্নতির উগ্র আকাঙ্ক্ষা, পাশ্চাত্যের চর্বিত-চর্বনেই, পাশ্চাত্য যাহাতে পরিপূর্ণতা পায় নাই তাহাতেই এখন প্রাচ্যের আগ্রহ, উনবিংশ শতাব্দীর পরিত্যক্ত আদর্শগুলির প্রতিই এখনও তাহার মোহ।

জগৎ জুড়িয়া আজ এই মানসিক স্তরচ্যুতি। দেশে এবং কালে—উভয়ত্র এই বিপর্যয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এক সমতলে অবস্থিত নহে। অতীত ও বর্তমানের মধ্যেও আজ ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সামর্থ্য না বুঝিয়া প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে জীবনের সর্বক্ষেত্রে উপর হইতে বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে, কে জানে জন-মনের সহন-সীমা কোথায়! হতাশ হৃদয়ে প্রশ্ন ওঠে: শিল্প-বিপ্লবের বন্যার মুখে আধ্যাত্মিক আদর্শ কি ভাসিয়া যাইবে? অথচ সেই আদর্শ ভিন্ন পৃথিবীতে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী শান্তি—মানুষের যথার্থ কল্যাণ সম্ভব কি?

প্রাচ্যে চলিয়াছে পুরাতন জীবনাদর্শ ছাড়িয়া আধুনিকতার অর্থাৎ শিল্প-বিজ্ঞান-যন্ত্রের দুঃসাহসিক অভিযানে। আর পাশ্চাত্যে জীবনের সর্ববিধ মূল্যবোধ আজ স্থগিত, মহামৃত্যুর সম্মুখে আজ তাহার একান্ত প্রয়োজন—জীবনের চরম প্রশ্নের উত্তর। আজ তাহাকে কতকগুলি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেই হইবে, নতুবা জীবনসংশয়। তাহার জীবন আজ এক বিষম মোড়ের মাথায় উপস্থিত। এখনকার গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিতেছে শুধু পাশ্চাত্যের নয়, পাশ্চাত্য-নির্ভর প্রাচ্যেরও জীবন।

(১) হাইড্রোজেন বোমা ব্যবহার করা হইবে কিনা? ইহাই প্রথম প্রশ্ন। বিজ্ঞানের বলে তো অণুর অন্তর্নিহিত শক্তি আবিষ্কার করা হইয়াছে, কিন্তু ততঃ কিম্! শত্রু-সংহারে এ শক্তি অবশ্যই ব্যবহার করা যায়, শত্রু একেবারে নিশ্চিহ্ন না হইলেও নিস্তেজ হইয়া যাইবে, কিন্তু বিপদ হইয়াছে—শত্রুর হাতেও যে এই অস্ত্র। অতএব কি করা যায়?—তাহাই আজ প্রথম প্রশ্ন!

(২) তবে শত্রুর সহিত তথাকথিত বন্ধুত্ব স্থাপন? সেই চেষ্টাই এখন চলিতেছে। কিন্তু দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদর্শের মিলন কি সম্ভব? একদিকে 'জনগণে'র এক-নায়কত্ব, অন্যদিকে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র—ইহাদের সহাবস্থান সম্ভব কিনা, তাহারই পরীক্ষা ও নিরীক্ষা চলিতেছে আজ দেশে-বিদেশে।

(৩) তৃতীয় প্রশ্ন: এই যান্ত্রিকযুগে সমষ্টি-কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের হাতে সামগ্রিক ক্ষমতা

প্রয়োজন, কিন্তু তাহাতে কি ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে না? ব্যক্তিগত অভ্যুদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে চেষ্টা ও চরিত্রের কোন মূল্য থাকিবে কি? মানুষমাত্রেই কি রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশমাত্রে পরিণত হইবে না? ব্যক্তিগত নীতিবোধ, ব্যক্তিগত চরিত্র, ত্যাগ ও সেবা, সাধনা ও পবিত্রতা—সকলই কি অর্থহীন হইয়া পড়িবে না? সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা যদি রাষ্ট্রায়ত্ত হয়, তবে তাহাদের মূল্য কতটুকু? স্বাধীনচেষ্টা- ও স্বাধীনচিন্তা-হীন জীবন যাপনের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

মানুষের সম্মুখে আজ এই সব প্রশ্ন? প্রশ্নগুলির ধরন দেখিয়াই বেশ বোঝা যায় মানুষের মনে আজ ফাটল ধরিয়াছে,—মানুষ আজ বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইতেছে না, ব্যক্তিগত মানুষের নিজেরও চিন্তায় এবং কর্মে এত অসঙ্গতি—বোধ হয় কখনও এমন করিয়া ধরা পড়ে নাই। ডক্টর জেকিল ও মিষ্টার হাইড আজ আর বইএর পাতায় বা সিনেমার পর্দায় নাই, পথে-ঘাটে ঘরে-বাইরে এই বিচ্ছিন্ন-ব্যক্তিত্ব (Split personality) মানুষটির সাক্ষাৎ আমরা পাই। মানসিক স্তরচ্যুতিই আজ মানুষের বিষম ব্যাধি, ইহারই অপর নাম 'ভাবের ঘরে চুরি'। মানুষ জানে এক, করে আর এক, মুখে বলে: উপায় নাই, বর্তমান পরিবেশে এরূপ না করিলে বাঁচিয়া থাকাই অসম্ভব। কিন্তু কেন যে বাঁচিয়া থাকা—এ প্রশ্ন কেহ করে না। আধুনিক মানবের মনে এ প্রশ্ন নিরর্থক, এ প্রশ্ন অবান্তর, এ প্রশ্ন পাগলের। অথচ আশ্চর্য, এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই নির্ভর করিতেছে—জীবনের মূল্যবোধ, এবং তাহারই উপর নির্ভর করে অন্য সকল প্রশ্নের উত্তর।

বিজ্ঞানলব্ধ প্রাকৃতিকঘটনা-জ্ঞানে মনের ও জীবনের এ সকল মৌলিক প্রশ্নের উত্তর মিলিতে পারে না, তাই এই সঙ্কটে কল্যাণকর সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার জন্য আজ আবার ডাক পড়িয়াছে প্রাচীন প্রজ্ঞার।

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ভিত্তির উপর শিল্পের প্রতিষ্ঠা। শিল্প-বিপ্লবের প্রথম ফলভোগ করিলেন বণিকেরা, ধীরে ধীরে মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র তিরোহিত হইয়া দেখা দিল গণতন্ত্র ও জাতীয়তা এবং শাসনক্ষমতা আসিয়া পড়িল রাজনীতিকদের হাতে। বিজ্ঞানের দ্বিতীয় ফসল কাটিতেছেন তাঁহারাই, এবং তাঁহারাই কল্যাণরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি দিয়া সাধারণ মানুষকে টানিয়া আনিতেছেন বিলুপ্তির বিপুল গহ্বরে। মানুষ আজ গৃহ-পরিবার ছাড়িয়া ছুটিয়া চলিয়াছে মাঠ হইতে কারখানায়, গ্রাম হইতে শহরে। যে গৃহ-পরিবার ভাঙিয়া যাইতেছে, তাহা আর গড়িতেছে না।

শিল্প-বিপ্লব ইওরোপে আসিয়াছিল ধীরে ধীরে দুই শতাব্দী ধরিয়া, রাষ্ট্রনীতিক পদ্ধতি সেখানে গড়িয়া উঠিয়াছে ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের পথে। কিন্তু প্রাচ্যদেশসমূহে রাজনীতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বিপ্লব দেখা দিয়া এদেশের জনসাধারণের জীবন বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এশিয়া-আফ্রিকার এই জাগরণের ফল ইওরোপ-আমেরিকায় যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতেছে, তাহাও যে সর্বথা সুখকর হইতেছে, তাহা নয়।

বিজ্ঞান ও রাজনীতিজ্ঞান শেষ রক্ষা করিতে পারিবে—এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় না। পরন্তু দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞানচর্চা যে পরিমাণে হইয়াছে—প্রজ্ঞার চর্চা সে পরিমাণে হয় নাই বলিয়াই আজ এ সঙ্কট, সভ্যতার এ অধোগতির সূচনা।

জ্ঞান বা বিজ্ঞান অবশ্যই একটা শক্তি, তাহা মানুষকে ক্ষমতা দিয়াছে মানুষের উপর প্রভুত্ব করিবার। শক্তিমান্ যদি প্রজ্ঞাবান্ না হয়, তবে শক্তির অপব্যবহারই হয়। এরূপ নেতার নেতৃত্বে মানুষের কোন মূল্য থাকে না, মানবিক মূল্যবোধ তিরোহিত হয়।

বিজ্ঞান-শক্তিকে চালিত করিবার জন্ত আজ একান্ত প্রয়োজন প্রজ্ঞা-শক্তি—উচ্চতর মানসিক শক্তি। অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে পরিপূর্ণ করিবার জন্মই প্রয়োজন এই প্রজ্ঞান। বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া নয়, বিজ্ঞানের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই জীবন প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে, এ ছাড়া অন্যরূপ আজ আর সম্ভব নয়, এইখানেই হইয়াছে মুস্কিল। পূর্ব পূর্ব যে-সকল পদ্ধতি দ্বারা মানব-জীবন চালিত হইত, তাহা এখনকার বৈজ্ঞানিক মনের অগ্রাহ্য! 'ইহা ভগবানের আদেশ', 'শাস্ত্রে এ কথা আছে' অথবা 'আমার নিকট সত্য এইভাবে প্রকাশিত হইয়াছে'—এরূপ বলিলে এখন আর চলিতেছে না। তবে উপায় কি? বৈজ্ঞানিক মন লইয়াই বিচার করিতে হইবে: পূর্ব পূর্ব যুগের পদ্ধতি-সকল কেন এখন বিফল হইতেছে? মানুষের মনের কতদূর কি পরিবর্তন হইয়াছে? পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও কোথাও অনুরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল কি না?—ইত্যাকার গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।

ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে—অনুরূপ অবস্থার ভিতর দিয়া মানুষকে একাধিক বার যাইতে হইয়াছে। আজ আণবিক শক্তি মানুষকে যতটা বিচলিত করিতেছে, সহস্র বৎসর পূর্বে বারুদ আবিষ্কার তাহাকে তাহা অপেক্ষা কম বিচলিত করে নাই। এইরূপ অন্যান্য ছোটবড সকল আবিষ্কার সম্বন্ধেই বলা যায়।

যে প্রজ্ঞা মানুষকে আজ সৎপথে, সত্য ও কল্যাণের পথে, প্রেম ও মিলনের পথে চালিত করিতে পারে, সেই প্রজ্ঞার উৎস কোথায়—এখন তাহাই সন্ধান করিতে হইবে। স্বভাবতই আমরা আসিয়া পড়িয়াছি ধর্ম ও দর্শনের এলাকায়। এইখানে অন্বয়-ব্যতিরেকী প্রমাণে দেখা যায় শাস্ত্র কিছু জ্ঞানের উৎস নয়। পণ্ডিত অজ্ঞ থাকিয়া যায়, আবার আর একজন শাস্ত্র না পড়িয়াও সর্ব জ্ঞানের অধিকারী হয়। এ জ্ঞান কোথা হইতে আসে? অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়—ধর্ম-জীবনের সাধনায় অন্তর্নিহিত এমন কোন শক্তি জাগ্রত হয়, যাহা কল্যাণময় জ্ঞানের উৎস। এই জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিলে তবেই অন্যান্য জ্ঞানকে আমরা শুভ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারি। শুভ বুদ্ধি জাগ্রত না হইলে শক্তিকে আমরা অশুভ উদ্দেশ্যেও লাগাইয়া থাকি। এই শুভ বুদ্ধি—এই কল্যাণ-বুদ্ধির অপর নাম প্রজ্ঞা (wisdom)। এই প্রজ্ঞাই সিদ্ধান্ত করে কোন্ পথ অবলম্বনীয়, এই প্রজ্ঞাই আমাদের পথ দেখাইয়া চলে—এই প্রজ্ঞাই মানুষের অন্তরে ঊর্ধ্বতর শক্তির ইঙ্গিত-স্বরূপ। এই প্রজ্ঞাই বুঝাইয়া দেয় মানবিক মূল্যবোধ, বুঝাইয়া দেয় জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি—পরম কাম্য কি, বুঝাইয়া দেয় অপরের সুখশান্তির সহিত নিজের সুখ-শান্তিতেই চরম তৃপ্তি, পরম লাভ।

অতএব দেখা যাইতেছে, আর্থনীতিক সমস্যাকে অত্যন্ত বড করিয়া দেখাইয়া যন্ত্রবিজ্ঞান সহায়ে তাহার সমাধান করিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আরও দশটি সমস্যা উদ্ভূত হইয়া সমস্যার সমাধান অসম্ভব করিয়া তুলে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের সমস্যাগুলি আর আর্থনীতিক নয়, অধিকাংশই মানসিক; বস্তুকেন্দ্রিক (objective) নয়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক (subjective), অতএব বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও পদ্ধতিকে আজ বস্তুতে নিবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না, ব্যক্তিকেও ধরিতে হইবে, অর্থাৎ এ সকল সমস্যার সমাধান হইবে মনোবিজ্ঞানের রাজ্যে, এবং ধর্মকেও আজ মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণের সম্মুখীন হইতে হইবে। বিজ্ঞানকে বলিব, 'ধর্মকে পরীক্ষা না করিয়া যদি উড়াইয়া দাও, তবে তুমি অবৈজ্ঞানিক', আর ধর্মকে বলিব, 'যদি তোমার ভিতর সত্য থাকে, তবে ভীত

হইও না—বিশ্লেষণী পরীক্ষার সম্মুখীন হও, সত্য উদ্‌ঘাটিত হইবে।'

এক কথায় বলিতে পারা যায়: বস্তু ও ব্যক্তিকে, জড় ও মনকে পৃথক্‌ভাবে না দেখিয়া একই সত্তার বিভিন্ন অবস্থারূপে দেখা সম্ভব কি না?—বিজ্ঞান এই চিন্তার সূত্র লইয়া গবেষণা করুক। মনের বিভিন্ন অবস্থায় একটা ক্রম-বিকাশের সহজ নিয়ম প্রতিভাত হইবে। মনের বিভিন্ন স্তরে একই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ। এই একের সূত্র ধরিতে পারিলে আর স্তরচ্যুতির আশঙ্কা কই? এইখানেই মানুষ খুঁজিয়া পায় তার নিশ্চিত আশ্রয়।

এই নিশ্চিত এবং নিশ্চিন্ত আশ্রয়েই মানুষের পুনর্বাসন সম্ভব। এইখানে আসিলে তাহার ভয় নাই, ভাবনা নাই, অপরের নিকট হইতে ক্ষতির আশঙ্কা নাই, অপরের ক্ষতি করিবারও প্রবৃত্তি নাই। এইখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব—মানুষের স্বরূপানুভূতি,—অমৃতত্ব।

বৈজ্ঞানিকেরা রাতারাতি আধ্যাত্মিক সাধনা শুরু করিবেন, এরূপ আশা করা যায় না, তাই আধ্যাত্মিক সাধকদেরই শুরু করিতে হইবে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং দেখিতে হইবে আধ্যাত্মিকতাকে কুজ্ঝটিকা-মুক্ত করিয়া 'অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে' পরিণত করা সম্ভব কিনা। যদি তাহা সম্ভব হয়, তবেই এ যুগের মানুষ তাহার বিষম ব্যাধি মানসিক স্তরচ্যুতির প্রতিকারের জন্য—শাশ্বত শান্তি লাভের জন্য ছুটিয়া আসিবে ধর্মের কাছে। সেইখানেই সে পাইবে তাহার সমগ্র মনের পরিচয়—সে চিনিবে নিজেকে, নিজেকে চিনিয়াই সে চিনিবে সকলকে, এই আত্মানুভূতিতেই ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব মানসিক স্বাস্থ্য ও শান্তি।

যখনই এই জ্ঞান—এই যোগ লুপ্ত হয়, তখনই ব্যাপকভাবে দেখা যায় মানসিক স্তরচ্যুতি—তখনই বহু মানব অধর্ম আচরণ করে, দুর্নীতি-পরায়ণ হয়,—ইহারই অপর নাম ধর্মগ্লানি। তখনই ঐশ্বর শক্তি আবির্ভূত হন, এই জ্ঞান ও যোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। আবার বহু মানব স্বধর্ম পালন করিতে আরম্ভ করে, সমাজে সংসারে শান্তি ও সুনীতি ফিরিয়া আসে, ইহাই মানসিক পুনর্বাসন—ইহারই অপর নাম ধর্মস্থাপন।

Science of Religion

All science has its particular methods, so has the science of religion. It has more methods also, because it has more material to work upon The human mind is not homogeneous like the external world According to the different natures there be different methods

Yet through all minds runs a unity and there is a science which may be applied to all This science of religion is based on the analysis of the human soul. It has no creed

—*Swami Vivekananda*

চলার পথে

'যাত্রী'

তোমায় মনে পড়ে। মনে পড়ে, এই রকম এক কৃষ্ণাষ্টমীতেই তুমি একদিন এসেছিলে। সেদিনের আকাশ অসীম উদার নীলে হাসেনি। রাতের নভতলে সেদিন ছিল নিবিড় মেঘের আবরণী। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কেমন এক ভয়াল ভ্রুকুটি। নিথর নিশীথে ছিল—মহাতন্দ্রার নিমীল অনুভূতি। বৃষ্টি পড়ছে অবিরত, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে। আর সেই ভরাদুর্যোগের মধ্যে বসুদেব চলেছেন সদ্যোজাত তোমাকে কোলে নিয়ে। তোমাকে দেখে, তোমার ঐ 'অখিলরসামৃতমূর্তি' রূপের ছটায় তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। অত ভয়ের মধ্যেও তাঁর শোণিত-স্রোতে লহরে লহরে কেমন এক পুলক ঝলমল করছে। পূর্ণচন্দ্র তুমি, সেদিন তুমি তাঁর হৃদয়-সাগর দিয়েছিলে দুলিয়ে। আকুল তাঁর সে পথচলায়, মাতাল বাতাস এসে কত না স্বপ্ন ঝরাল। তবুও সমস্ত 'সৌন্দর্যসারসন্নিবেশ' তোমাকে ছাড়তে হবে মনে ক'রে তাঁর আকুল ক্রন্দন, স্মৃতি-যমুনার কূলে এসে কত না আছাড় খেল। আবেগে তাঁর উথল পরাণ হ'ল উদাস।

মৃত্যুহীন তুমি, এলে মর-জগতে। জন্মজরাহীন তুমি, অথচ সাধারণ মাণবকের মতোই হ'লে বর্ধিত। রূপহীন তুমি, কিন্তু কি এক অপূর্ব অভিরাম নব-ঘন-শ্যাম-দ্যুতি তোমার তনুকে ক'রল আলোকিত। তুমি অচঞ্চল, তুমি 'ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্'—ক্রীড়াচ্ছলেই দেহ ধারণ করেছ, তবুও ভারতের সকল দিক ঘিরেই তোমাকে নিয়ে লুকোচুরি খেলার অন্ত নেই। তাইতো প্রেমভাবে গোপিকাগণ, ভয়ভাবে কংস, দ্বেষযুক্ত হ'য়ে শিশুপাল, সংসার সম্বন্ধে বৃষ্ণিবংশীয়গণ, সখ্যভাবে পাণ্ডবগণ, বাৎসল্যভাবে যশোদা, ভক্তিভাবে উদ্ধবাদি ভক্তগণ তোমার জীবনায়নের সবটুকুই ঘিরে রেখেছে। আর আশ্চর্য। বিভিন্নভাবে, এমনকি বিরুদ্ধ ভাবে হলেও, অনন্য-মনে তোমাকে চিন্তা ক'রে এরা সকলেই তোমাকে পেয়ে গেল। তোমাকে পেয়ে ধরণী ধন্য। তোমার পায়ের পরশ পেয়ে তৃণ-গুল্ম ধন্য তোমার নখ-স্পর্শে তরুলতা ধন্য ! তোমার সদয় দৃষ্টিলাভ ক'রে নদী-গিরি-পশু-পক্ষীরাও ধন্য (ধন্যেয়ম্ করজাভিমৃষ্টাঃ—ভাগবত, ১০।১৫।৮)।

কিন্তু তুমি যে ঠিক কে, তা আজও বুঝতে পারলাম না। মহাভারতে, পুরাণে, ভাগবতে, গীতায় এবং পরবর্তী কত না ভক্তিশাস্ত্রে তোমাকে কত রূপেই না দেখেছি। কতবার তোমাকে দেবতা বলে মনে হয়েছে, কখনও পূর্ণব্রহ্ম—আবার পরক্ষণেই মনে হয়েছে তুমি সাধারণ মানুষের মতো—তুমি 'অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল'। কেন এমন হয় ? সর্বজীবে, সর্বভাবে, সর্বানুভবে তুমি ওতপ্রোত ব'লেই কি—কিংবা ভালমন্দ, সবার ভেতরেই তুমি একাকার ব'লেই কি ঐ রকম হয় ? শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব, তিনগুণের অতীত ব'লেই কি তোমার আপাতবিরুদ্ধ কথাবার্তা ও ব্যবহারের মধ্যেই তোমার শ্রেষ্ঠত্ব ওঠে ভেসে ? এই প্রসঙ্গে আচার্যের সেই কথা মনে পড়ে—'নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ'—তিনগুণের অতীত ব্যক্তি যখন জীবনের পথে চলেন, তখন তাঁকে কখন কোন বিধিনিষেধের মধ্যে আটকে রাখা যায় না।

তুমি তো বলেছ—তুমি সর্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা (গীতা, ১০।২০)। তুমি অব্যক্ত স্বরূপে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত ক'রে অবস্থান ক'রছ (গীঃ, ৯।৪), তাইতো ভক্তের চোখে 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে' (চৈতন্যচরিতামৃত)। ভাগবতেও শুনি, সকল আত্মার আত্মা তুমি। জানি,

তুমি জগতের হিতের জন্য মায়াযোগে এই পৃথিবীতে দেহ ধরে এসেছ ('কৃষ্ণমেনমবেহিত্বম্ …মায়য়া।' ভাগবত, ১০—পূর্বার্ধ ১৪।৫৫)। শুধু তাই নয়, তুমিই যে আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তুমি পিতাপুত্রাদি থেকে প্রিয়, ধনসম্পদের চেয়ে প্রিয়, অন্য সমস্তকিছুর থেকেও প্রিয় (বৃঃ উপঃ, ১।৪।৮)। এমন কি, সমস্ত প্রিয় বস্তুর মধ্যে তুমিই প্রিয়তম (ভাঃ, ৩।২।৪২)। আমাদের দেহ যে এত প্রিয়, তাও তার মধ্যে তুমি রয়েছ ব'লে (ভাঃ, ৩।২।৪২)। তোমাকে পেলে অন্য কোন পাওয়া আর সুখকর ব'লে মনে হয় না (গীঃ, ৬।২২)। আর তুমি নিজে নির্গুণ-ব্রহ্ম হ'য়েও সকল জীবের মঙ্গলের জন্যই মনুষ্যদেহ আশ্রয় ক'রে লীলা করতে এসেছ, যাতে বর্হিমুখ জীব, তোমার লীলাকথা শুনে তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয় ('অনুগ্রহায় · তৎপরোভবেৎ।'—ভাঃ, ১০।পূর্বার্ধ ৩৩।৩৭) আর রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ তুমি, তোমার প্রতি কেউ আকৃষ্ট না হ'য়ে কি পারে? তোমার অনুভবও আমাদের কাছে আনন্দপ্রদ ('কেবলানুভবানন্দ স্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ।'—ভাঃ, ৭।৬।২৩)। তাইতো, হে পরম প্রিয়, তোমাকে আহ্বান জানাচ্ছি। তোমার শঙ্খনিনাদে আমাদের মোহ ঘুচিয়ে দাও। আমাদের আঁখির নীলে তোমার স্বপন-সুরভি দাও ছড়িয়ে। তোমার কৃপাকণা দিয়ে আমাদের হৃদয় দাও রাঙিয়ে। ওগো বাঁশরিয়া, তোমার সেই মহাকর্ষণের বাঁশীটি আবার বাজাও।

শুনেছি, তুমিই হ'লে আমাদের গতি, আমাদের সকল কর্মের নিয়ামকও। এমন কি, তোমাকে জানবার ইচ্ছাটুকুও তোমারি দেওয়া (গীঃ, ১৫।১৫)। আমরা তোমার হাতের ক্রীড়নক মাত্র। তুমি যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি—'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু'—নিমিত্ত মাত্র (গীঃ, ১১।৩৩), আমাদের সকল ক্লান্তি তোমার ছোঁয়ায় সরিয়ে দাও।

তবে আমাদের বলতে কি কিছুই নেই? আছে। তুমি যদি হও আগুন, আমরা তার স্ফুলিঙ্গ, তুমি যদি হও বারিধি, আমরা তার জলকণা, তুমি যদি হও আকাশ, আমরা তার একটি স্থান-বিন্দু, তুমি যদি হও পৃথিবী, আমরা তার ধূলিকণা। আমাদের মনে তোমাব স্মৃতি নিয়ত রয়েছে আঁকা!

এর পরেও, 'তুমি কে?'—এ প্রশ্ন আর তুলব না। এই রকম প্রশ্নের উত্তরেই তুমি অর্জুনকে বলেছিলে—'হে পার্থ, তোমার এত সব বিভূতি জেনে লাভ কি? জেনে রাখ, এই সমস্ত জগৎ আমার এক অংশ দিয়েই ধরে রেখেছি।' (গীঃ, ১০।৪২, 'পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি'—ছাঃ উপঃ, ৩।১২।৬)। সামান্য অংশের পরিমাণই যদি এত হয়, তাহলে তোমার স্বরূপ কি? উত্তরে বলবে, সেটা তোমাদের সান্ত মন দিয়ে জানা সম্ভব নয়, কারণ—সেটা অনন্ত, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অজ্ঞেয়। বুঝলাম, আমাদের জ্ঞানের ছোট্ট দীপটি নিয়ে তোমার মতো সূর্যকে দেখানো যায় না, আরতি করা যায় মাত্র।

তাই চল পথিক, তাঁকে আবাহন করবে চল। তোমাদের ডাকের জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন যে! মনে রেখ, তোমরা আছ বলেই তিনি আছেন। মনে রেখ—সন্তানকে বাদ দিয়ে মাতৃত্ব নেই, প্রেমাস্পদকে বাদ দিয়ে প্রেমিক নেই, জীবকে বাদ দিয়ে নেই ঈশ্বরত্ব, মেঘকে বাদ দিয়েও রামধনু হেসে ওঠে না। তোমাদের আকর্ষণ করছেন বলেই তিনি শ্রীকৃষ্ণ। যেমন ক'রে পার তাঁকে আঁকড়ে ধর। যশোদার মত তাঁকে স্নেহ দিয়ে ধরো, কংসের মত তাঁকে ভয় দিয়ে ধরো, শিশুপালের মত তাঁকে ঈর্ষা দিয়ে ধরো, অর্জুনের মত তাঁকে সখা ব'লে ধরো, শ্রীরাধার মত তাঁকে প্রেম দিয়ে ধ'রে এক হয়ে যাও। তোমাদের জন্যই তো লীলার স্রোতে তিনি ভেসে এসেছেন তোমাদেরই প্রাণের খেয়ায়। চল চল, সেই খেয়ার ঘাটে তাঁকে আহ্বান ক'রে নিতে চল।

শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।

সৎপ্রসঙ্গ ❋

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

জ্ঞান, কর্ম ও যোগ—এই তিনটিই উপায়, এই তিনটিই তাঁকে লাভ করবার পথ।

ভগবান বলেছেন, যে তাঁকে যেভাবে চায়, তাকে তিনি সেভাবেই দেখা দেন।

যাঁরা রাজসিক প্রকৃতির, কাজ না ক'রে থাকতে পারেন না, তাঁদের জন্যে কর্মের উপদেশ। আসক্ত কর্ম নয়, নিরাসক্ত কর্মই কর্মযোগ। আর যাঁরা সংসারে থেকেও সংসারে আসক্ত না হ'য়ে ঈশ্বরকে ভালবাসেন, তাঁদের জন্যে ভক্তি। আর যাঁরা ব্রহ্ম ছাড়া সংসারে বা অন্য কিছুতেই তৃপ্তি পান না, তাঁরা জ্ঞানী।

ভগবান অর্জুনকে কর্মের উপদেশ দিয়েছেন, অর্জুন ক্ষত্রিয়, কর্ম করাই তাঁর প্রকৃতি। কিন্তু সে কর্ম কেমন ক'রে করতে হবে, ভগবান তা নিজেই শিখিয়ে দিলেন: 'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব'—আমি তো পূর্বেই মেরে রেখেছি, কর্তা আমি—তুমি নও।

'অহঙ্কারবিমূঢাত্মা'-ই নিজেকে 'কর্তাহমিতি মন্যতে'—কাঁচা আমিই নিজেকে কর্তা মনে করে, কিন্তু পাকা আমি জানে, 'আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর।'

শরণাগত হ'তে হবে—'যৎ করোষি'—যা কিছু কর সবই তাঁর কর্ম। তুমিই যে তাঁর, এই ভাব নিয়ে থাকতে হবে।

প্রথমে চাই গুরুবাক্যে বিশ্বাস। এই বিশ্বাস থেকে নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা—'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'। গুরু সব দিয়ে দেন শিষ্যকে। অর্জুন যখন 'আমি তোমার শিষ্য—আমাকে কৃপা কর' বলে শরণাগত হলেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ পরম গুহ্যতম জ্ঞান দিলেন অর্জুনকে, বিশ্বরূপও দর্শন করালেন—যা কেউ দর্শন করেনি।

আর বললেন: 'মৎকর্মকৃৎ'—আমার কর্ম কর, মৎপরায়ণ হও, আমার ভক্ত হও। অর্জুন, তুমি আমার পরম প্রিয়, তাই তোমাকে গুহ্যতম কথা শোনাচ্ছি, 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য'—সকল ধর্ম ত্যাগ ক'রে 'মামেকং শরণং ব্রজ'—একমাত্র আমারই শরণ লও, আমিই শুভাশুভ পাপ-পুণ্যের পারে নিয়ে যাব।

পুণ্যকর্ম, শুভকর্মও বন্ধন, যদি তা সকাম ভাবে করা হয়। অশুভ কর্ম তো বন্ধনই, সংসারে জড়িয়ে রাখে—তাঁর কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়।

তাই কায়মনোবাক্যে তাঁর শরণ নিতে হবে। 'তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি'—তাঁর কৃপাতেই পরমা শান্তি পাওয়া যাবে।

ঠাকুরও ছিলেন মায়ের শরণাগত। ধর্ম-অধর্ম, শুচি-অশুচি, পাপ-পুণ্য—সবই তিনি সমর্পণ করেছিলেন মাকে।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শুনে বললেন, 'সবই যে দিয়ে দিলেন, আপনার রইল কি?'

এই তো 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য'—সব ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে তাঁর শরণ লওয়া, তাঁর হ'য়ে যাওয়া। গীতায় স্পষ্টই তো বলেছেন ভগবান: 'বৈধী ভক্তির পার হও, শুভাশুভ ধর্মাধর্মের পার হ'য়ে এসো অর্জুন।

❋ ১৯৫৭ খৃঃ শিলচর ও করিমগঞ্জে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজনীয় সহাধ্যক্ষ মহারাজের ধর্মপ্রসঙ্গের সারাংশ। অনুলেখিকা—শ্রীসুধা সেন।

তারপর তো আমি আছি—আমিই ধুয়ে মুছে সাফ ক'রব তোমায়। সবচেয়ে সোজা পথ এই শরণাগতি! যাগ-যোগ নেই, কোনও কষ্ট নেই, শুধু আত্মসমর্পণ করা, তাঁর হ'য়ে যাওয়া।

সকলের হৃদয়ে তিনি অধিষ্ঠিত থেকে যন্ত্রের মতো সকলকে ঘোরাচ্ছেন। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা কিছুই নেই। গরুকে যেন লম্বা দড়ি দিয়ে খোঁটায় বেঁধে রেখেছে, ঐ সীমার মধ্যেই ঘোরা-ফেরা, যত আস্ফালন।

অর্জুনকে উপলক্ষ ক'রে সংসারী জীবদের বলছেন ভগবান: কর্মের সাধনা ক'রে পরা ভক্তি লাভ কর। পরা ভক্তি আর পর জ্ঞান তো একই কথা।

তাই শুধু তাঁর হ'য়ে কর্ম ক'রে যাওয়া, শরণাগত হ'য়ে পড়ে থাকা—স্বাধীনতা এতটুকুও নেই। যাকে তুলবেন তাকে দিয়ে 'এষ এব এনং সাধু কর্ম কারয়তি'—সাধু কর্ম করাচ্ছেন, আবার যাকে ফেলবেন তাকে দিয়ে অসাধু কর্ম করাচ্ছেন। সবই তাঁর ইচ্ছা। আমাদের কোন ইচ্ছা বা কোন স্বাধীনতা নেই।

'তমেব শরণং গচ্ছ'—সর্বভাবে তাঁরই শরণ লও। তিনিই গতি, ভর্তা, প্রভু সব।

কৃপা পাওয়া যাবে, তিনি কৃপা করবেন। তিনি জ্ঞানীর কাছে অবাঙ্মনসোগোচর, যোগীর কাছে পরমাত্মা আর ভক্তের কাছে ভগবান। একটা ভাব নিয়ে পড়ে থাকতে হবে।

ভগবান এসে অযাচিত ভাবে কৃপা করছেন, নিজে ডেকে বলছেন: 'মাং নমস্কুরু'—আমাকে নমস্কার কর; 'মদ্‌যাজী'—আমার সেবাপরায়ণ হও। দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পেয়েছ, এবার এগিয়ে পড়। এই তো অমৃতত্ব-লাভের পথ। তাঁকে ভক্তি কর, তাঁকে ধর, আর কিছু করতে হবে না। তিনি নিজে এসে বলেছেন, 'আমি তো আছি—।'

ঠাকুরও বলেছেন: আমি ছাঁচ তৈরী ক'রে রেখেছি, তোরা শুধু মনটা ছাঁচে ঢেলে নে—খাড়া ভাত্তে বসে যা।

মাথা নীচু করতে শেখ। মাথা নীচু ক'রে তাঁর শরণাগত হ'য়ে যাও। তিনি আছেন, ভয় কি?

* * *

রাজসিক আহার বর্জন ক'রে সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করলে মন স্থির হয়, চঞ্চলতা দূর হয়। চঞ্চল মনকে সংযত স্থির করতে হ'লে অভ্যাস চাই। এই অভ্যাসই সাধনা। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ—এইগুলি অভ্যাস করতে হবে।

ভগবান বলেছেন:

যিনি অনন্যচিত্ত হ'য়ে আমাকে স্মরণ করেন, আমি তাঁর কাছে অনায়াসলভ্য। নিত্য স্মরণে কি হয়? আমরা তো কাজলের ঘরেই থাকি। নিত্য স্মরণে আমাদের গায়ে কালি লাগে না—তাছাড়া সংস্কারগুলো ততটা ক্ষত করতে পারে না। স্মরণ বেশী হলেই তো ধ্যানে পরিণত হ'ল।

এই তিনটি জিনিসের মূলে আবার থাকা চাই অনুরাগ, বিশ্বাস। কামনা-বাসনা দমনের জন্য শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণের দরকার। আর চাই সাধুসঙ্গ। সাধুর কাছ থেকে ভগবৎকথা শ্রবণ ক'রে পরে সে সব মনন করতে হয়। সাধন ঠিক হ'লে সিদ্ধি হয়। পওহারী বাবা বলতেন: 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি'। ঠিক রাস্তায় গেলে গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। শাস্ত্রে চিনি ও বালি মেশানো আছে, বালি ফেলে চিনি নিতে হয়। সাধুমুখে শাস্ত্রের সার মর্ম জেনে নিতে হয়।

Intellect আর Intuition দুটি জিনিস। Intellect অর্থাৎ মস্তিষ্ক দিয়ে, কেবল পাণ্ডিত্য দিয়ে তাঁকে জানা যায় না। Intellect আমাদের কেবল ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু

Intuition অর্থাৎ আসল অনুভূতি আমাদের নিয়ে যাচ্ছে ইন্দ্রিয়াতীত সত্যে। ধ্যানের ভেতর দিয়ে সেখানে যেতে হয়।

আজ দেখছি মস্তিষ্কবান্ পণ্ডিতেরা সব হৃদয়ের কাছে, অনুভূতির কাছে মাথা নত করছেন। ঠাকুরের কাছে এই অনুভূতির কথা পেয়েছে বলেই জগৎ আজ তাঁর পূজা করছে।

সাধুসঙ্গ দরকার—তপস্যায় যা না হয়, সাধুসঙ্গে তাই হয়।

গিরিশবাবুর কাছে গেলুম। তিনি বললেন, 'ওরে তোরা ঠাকুরের কথা শুনতে এসেছিস, আমাকে ত্যাখ, আমাকে কি ক'রে দিয়েছেন ঠাকুর। ত্যাখ, কি ছিলুম, আর কি হয়েছি।'

সাধারণ লোকের মন বন্ধক দেওয়া আছে বিষয়ের কাছে, সাধুসঙ্গে সে বন্ধক ছুটিয়ে আনা যায়। ঠাকুর বলতেন, 'মাতালকে চাল-ধোয়া জল খাইয়ে দিলে মাতলামি যায়, হুঁশ হয়।'

মাঝে মাঝে ঠাঁই-নাড়া হ'তে হয়, নির্জনে গিয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। যে ঘরে বিকারের রোগী, সে ঘরেই জলের জালা আর তেঁতুল—রোগ সারে কখনও?

আর চারা গাছকে বেড়া দিয়ে রাখতে হয়। গুঁড়ি মোটা হ'য়ে গেলে আর ছাগল-গরুতে খেতে পারে না।

যীশুও বলেছেন এমনি কথা। একজন কিছু বীজ ছড়ালে, কিছু পড়ল পাহাড়ে, কিছু কাঁটার জঙ্গলে, কিছু রাস্তায়, কিছু উর্বরা জমিতে। পাহাড়ের পাথরে বীজ ফ'লল না, কাঁটার জঙ্গলে বীজের গাছ হ'ল, কিন্তু বাড়তে পেল না, রাস্তার বীজ খেয়ে গেল পাখীতে, শুধু উর্বর চষা জমিতেই বীজের থেকে গাছ হ'ল, ফসল ফ'লল।

জমির চাষ মানে কি? অভ্যাস, সাধন; তবে তো জ্ঞান-ভক্তির ফসল ফলবে।

সংসারে সারাদিন খাটতে পারি আমরা, কিন্তু তাঁকে ডাকবার সময় পাই না।

ঠাকুর বলতেন, সংসারে কুলোর মতো হবে, চালুনির মতো নয়। কুলো অসার বস্তু ফেলে দিয়ে সার বস্তু গ্রহণ করে। আর আমরা চালুনির মতো সার ফেলে দিয়ে অসার নিয়েই মেতে আছি।

ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা*

শ্রীবিমানেশ চট্টোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণ মিশনের এই গ্রন্থাগারটি উদ্বোধন করবার দুর্লভ সুযোগে ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে দু-এক কথা বলব। বিশেষ আশা করি, এই গ্রন্থাগার ভারতীয় চিন্তা বিকীরণের ও ভারতীয় কৃষ্টি-ব্যাখ্যার একটি কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠবে।

একই সমুদ্র যেখানে দুটি দেশের উপকূল বিধৌত করে সে ক্ষেত্রে ইতিহাস ও ভূগোলের পরিস্থিতি অনুসারে যতটা আশা করা যায়, ভারত-কৃষ্টি এখানে ততটা প্রসারিত হয়নি, তবু মিশনের বন্ধুদের চেষ্টায় এই গ্রন্থাগার শুভ সূচনাই করছে।

ঠিকভাবে ব্যবহৃত হ'লে গ্রন্থাগার কৃষ্টি-বিস্তারের বিশেষ সহায়ক, বিভিন্ন জাতির কৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করবার জন্যে দেশে দেশে

* মরিশাস রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রে গ্রন্থাগার-উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতার সারানুবাদ। মেজর জেনারেল চট্টোপাধ্যায় তখন মরিশাসে ভারত সরকারের কমিশনার ছিলেন; বর্তমানে নিউইয়র্কের কনসাল নির্বাচিত হইয়াছেন।

গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে সভ্যতার ঊষাকালেই। পুস্তক রচিত হয়েছে, পঠিতও হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। প্রশ্ন ওঠে: বই লেখা ও বই পড়ার দ্বারাই কি মানুষ তার জীবনের চরম উদ্দেশ্য—পরম পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে? আরও প্রশ্ন জাগে, বিদ্যা ও কৃষ্টি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন উদ্দেশ্য কিনা?

জ্ঞানী সমদর্শী, তিনি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে যে চোখে দেখবেন মূর্খ চণ্ডালকে—এমনকি অন্যান্য জীবজন্তুকেও সেই চোখে দেখবেন, শান্ত মনে। তিনি সৃষ্টির সব কিছুকে এক উদার দৃষ্টিতে দেখবেন। এইটিই হচ্ছে ভারতীয় কৃষ্টির মূল কথা।

কৃষ্টি ও সভ্যতা

বিষয়টির ভেতরে প্রবেশ করবার আগে 'কৃষ্টি' ও 'সভ্যতা' কথা-দুটির সংজ্ঞা-নিরূপণের চেষ্টা ক'রব। সংস্কৃত ভাষায় 'কৃষ্টি' বা 'সংস্কৃতি'র অর্থ উৎকর্ষ, অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্তব্য-সচেতন প্রাকৃতিক বুদ্ধিকে শুদ্ধ ক'রে উৎকৃষ্ট করবে যে প্রক্রিয়া—তাই সংস্কৃতি বা কৃষ্টি।

কৃষ্টির মধ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের একটি মানদণ্ড পাওয়া যায়। কৃষ্টি বলতে বোঝায়—একই স্থানে একই পরিবেশে অবস্থিত অনেক মানুষের মনের ও বুদ্ধির উৎকর্ষ। জাতীয় কৃষ্টিতে ধরা পড়ে একটি জাতির প্রতিভা ও সংখ্যাধিক লোকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। পাঞ্জাবী, তামিল, মারাঠী প্রভৃতি আঞ্চলিক কৃষ্টি থাকতে পারে, তারা ভারতীয় কৃষ্টির প্রশস্ত ধারাকেই পুষ্ট করে। আবার ভারতীয় কৃষ্টি প্রাচ্য কৃষ্টিরই একটি বিশেষ ধারা। পাশ্চাত্য কৃষ্টিও এইরূপ এক আঞ্চলিক ও জাতীয় কৃষ্টি থেকেই গড়ে উঠেছে। এখন এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কৃষ্টির সমন্বয়েই রূপ নেবে এক বিশ্ব-কৃষ্টি, যাকে বলা যেতে পারে এ যুগের সভ্যতা।

'কৃষ্টি' ও 'সভ্যতা' ব্যবহারের দিক্ থেকে প্রায় সমার্থক, কিন্তু তাদের মূলগত পার্থক্য বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে ধরা পড়ে। 'কৃষ্টি' মানসিক অগ্রগতি, আর 'সভ্যতা' জাগতিক উন্নতি। 'কৃষ্টি' কথাটির মধ্যেই একটা গতি-ময়তা রয়েছে, অবিরত অগ্রসর চিন্তাধারা মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির অপূর্ণতা পরিপূরণ ক'রে দিচ্ছে। বড় বড় সাধক, দার্শনিক, কবি, দেশপ্রেমিক ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের মনীষিবৃন্দ ইতিহাসের স্রোতে তাঁদের ভাবধারা মিশিয়ে দিয়েছেন, যার ফলে দেখা দেয় নব নব কৃষ্টির ক্রমবিকাশ।

ইংরেজী 'civilization' কথাটি 'civil' বা 'city' শব্দের সঙ্গে জড়িত। এই 'সিটি' বা নগরে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে বাস ক'রত দিগ্-দেশাগত বিচিত্র লোক, পারস্পরিক অভিজ্ঞতার বিনিময়ে একটা সামঞ্জস্য সাধন ক'রে তারা শিক্ষায় ও সৌন্দর্যবোধে উৎকর্ষ লাভ করে। বুদ্ধিসহায়ে শিল্পবাণিজ্য, নগরনির্মাণ, যোগা-যোগস্থাপন, সামাজিক স্বাধীনতা, রাজনীতিক সংঘ প্রভৃতির সূত্রপাত ক'রে মানুষ চাইল তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে। সব কিছুর উদ্দেশ্য উৎকর্ষ-লাভ, ভয় ও অভাব থেকে মুক্ত জীবন-যাপনই তার লক্ষ্য। যারা এর বিপরীত—যারা শহর থেকে দূরে একা একা বা ছোট ছোট পরিবার নিয়ে বাস ক'রত, তাদের থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে এরা নিজেদের 'নাগরিক' বা 'সভ্য' ব'লত।

সংস্কৃত 'সভ্য' কথাটি এসেছে 'সভা' শব্দ থেকে। 'সভ্য' মানে সভার উপযুক্ত। 'দাস' বা 'দস্যু' প্রভৃতি জাতির অমার্জিত রীতির পরিবর্তে এরা ছিল সমাজ-জীবনের সুখসুবিধার পক্ষপাতী।

বিশ্বজনীনতা

প্রাচীন ভারতের কৃষ্টিগত চিন্তা বরাবরই বিশ্বজনীনতায় বিশ্বাসী। ভারতবাসীর চেতনায় এর গভীর প্রভাব। ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের মতে

কতগুলি দেশের উৎকট যুক্তিনিষ্ঠ প্রয়োগবাদ (rationalistic pragmatism) সংশোধন করার জন্য যে বিশ্বজনীন চিন্তা প্রয়োজন, তা রয়েছে ভারতে।

সমাজ-জীবনের সাংস্কৃতিক পদ্ধতি মানুষের স্বার্থপরতার কাঁটাগুলি দূরীভূত করে, এবং পারস্পরিক সাহচর্যে ও ভাববিনিময়ে একটা স্বাভাবিক দায়িত্বও গড়ে ওঠে।

সহস্র সহস্র বছর ধরে যে অফুরন্ত পরিবর্তন চলেছে—আদিম, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক মানুষের মনে ও সমাজে, সর্বত্র তা অবশ্যই প্রতিফলিত রয়েছে। আজ শহরের পরিবেশে সভ্যতার মান আমাদের হিসাবে উঁচু, তা ব'লে গ্রামাঞ্চলে কৃষ্টির মান নীচু নয়।

নৈতিক মূল্যমান

ভারতের প্রাচীন জীবনদর্শন—যার ধারা যুগ যুগ ধরে অব্যাহত—তা শুধু যে মানব-জীবনের রহস্যময় বিপরীত ধারাগুলির ব্যাখ্যা করে তা নয়, ব্যক্তিকেও উৎসাহিত করে এমন একটি ভাবে জীবন যাপন করতে—যাতে সে নিজে শান্তি পেতে পারে, অপরকে সুখী করতে পারে, এবং সমাজব্যবস্থা শক্তিশালী ক'রে তুলতে পারে। যে দেশে বিভিন্ন রীতিনীতি, নানা ভাষা ও একাধিক ধর্মবিশ্বাস বর্তমান—সেই বহুসমাজবিশিষ্ট দেশে যে সামাজিক নীতিবোধ প্রয়োজন, তা এই জীবনদর্শনই দিতে পারে।

ভারতের দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক উদারতা ও তার ঘনীভূত চিরন্তন ভাবরাশি নতুন নতুন কৃষ্টি-শক্তিকে আত্মসাৎ করেছে এবং এই প্রক্রিয়ায় ভারত লাভবান্‌ই হয়েছে। 'আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতঃ'—ভদ্র চিন্তাধারা চারি দিক থেকে আমাদের কাছে আসুক—ঋগ্‌বেদের এই প্রার্থনার ভাব—যত না প্রচারিত হ'ত, তার থেকে বেশী আচরিত হ'ত। সমসাময়িক চিন্তার অপ্রধান ধারাগুলিও আমাদের সভ্যতায় অনেক কিছু এনে দিয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টি—উত্তরকালের জন্য যে অনেক খোরাক রেখে গিয়েছিল, তা জাতীয় জীবন-রক্ষায় ও উৎসাহ-সঞ্চারে আজ যতটা কাজে লাগছে, এতটা বোধ হয় আর কখনও লাগেনি।

মনই সকল কৃষ্টির উৎস, মানুষের সকল কর্ম-প্রচেষ্টাও মনকেই কেন্দ্র ক'রে। প্রাচীন দার্শনিক-দের ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি কত স্বচ্ছ ছিল! বিশ্বরহস্য উদ্‌ঘাটনে তাঁদের গভীর গবেষণা দেখে মানুষ আজও বিস্ময়ে অভিভূত। ভারতীয় দর্শনের সার কথা, জীবনের সংকল্প ও উদ্দেশ্য অতি তাৎ-পর্যপূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়েছে এই প্রার্থনায়:

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময়।

ভারত-কৃষ্টিতে রয়েছে এমন একটি গতি-শীলতা, যা ব্যক্তিগত চিন্তা কথা ও ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনকে বিকশিত করে মানসিক ঐশ্বর্যে ও নৈতিক সৌন্দর্যে। উর্ধ্বতর এই রূপান্তরের সাধনায় ভারতীয় মন স্বীকার করে প্রার্থনার বা দিব্যশক্তির প্রভাব।

অনাসক্তির শিক্ষা

অনাসক্তি অভ্যাস করতে গেলে কিছু না কিছু পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়, এই ত্যাগের ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত। যার যেমন প্রয়োজন তাকে তেমন একটু সাহায্য করা—জমি বা অর্থ দ্বারা সাহায্য, অন্ন বস্ত্র বা আশ্রয় দান, কি একটু পরামর্শ দেওয়া বা কারও শুভ চিন্তা করা—সবই অনাসক্তি বা ত্যাগমূলক কর্মের প্রতীক।

মন নিয়ন্ত্রণ করে শরীর, অতএব মনঃসংযমের পথেই জীবনকে অনাসক্তভাবে গ্রহণ করা সম্ভব। অনাসক্ত ভাব দ্বারা প্রলোভন জয় করা যায়, এবং লাভক্ষতির ভাব দূর হলেই দায়িত্ববোধ

জাগ্রত হয়। আজকের বিভ্রান্ত বিশ্বে দৈনন্দিন কর্তব্য-সম্পাদনেও যে তিক্ততা ঈর্ষা ভুলবোঝা ভয়জাত ক্রোধ ও ঘৃণা দেখা যায়—তা সবই এড়ানো সম্ভব, যদি আমরা 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' গীতার এই নীতি অনুসারে কাজ ক'রে যেতে পারি, যদি আমরা সম্মান পুরস্কার, এমনকি স্বীকৃতিরও অপেক্ষা না রেখে নিষ্ঠাসহকারে নিজ নিজ কর্তব্য ক'রে যাই, তবে অবশ্যই ফল ফলবে—যথাসময়ে।

স্বতই মনে পড়ছে গত শতাব্দীর দৃঢ়সংকল্প অগ্রগামী দলের কথা, যারা মাতৃভূমি ছেড়ে বেরিয়েছিল—দূর বিদেশে নিজ নিজ শ্রমের সাহায্যে ভাগ্য পরীক্ষা করতে। ক্রমাগত সৎ-পরিশ্রমের দ্বারা তারা প্রমাণ ক'রে গেছে যে তারা কর্মকুণ্ঠ ছিল না, আজ দেখা যাচ্ছে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়নি।

মনঃসংযম

প্রাচীন আর্যদের প্রার্থনা সূর্যের কাছে: আমাদের মন আলোকিত কর। প্রাচ্য চিন্তা বার বার জোর দেয়—চিত্তশুদ্ধির ওপর। জগতের মায়াজাল থেকে মুক্তি পেতে মুনি-ঋষিরা প্রার্থনা করেছেন এই আলোর জন্য। তাঁরা বুঝেছিলেন, আত্মপরীক্ষার উদ্দেশ্যে এই আলোক অন্তর্মুখী করতে হবে। বিশাল ভারত-কৃষ্টিতে কত বিচিত্র ছাঁচ—সবই মনঃসমীক্ষার ফল, আত্মোপলব্ধির সাধনার পথে ক্রমপ্রাপ্ত অভিজ্ঞতা। এরই জন্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করা হয়েছিল জ্ঞানের আলো। এই ভাব 'ভারত' নামটির সঙ্গেও যেন জড়িয়ে গেল। 'ভা' শব্দের অর্থ জ্ঞানালোক, 'রত'—সাধননিমগ্ন। তাই কোন কোন মনীষীর মতে 'ভারত' শব্দটির অর্থ—অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোকের সাধনায় নিমগ্ন।

আত্মোপলব্ধি

ইতিহাসের অসংখ্য পতন-অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে ভারতীয় কৃষ্টি চেষ্টা করেছে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করতে তার স্বরূপে, যেখানে বোঝা যায়—জীবনের অর্থ কি, জীবনযাপনের উদ্দেশ্য কি? ঐতিহাসিক ভাগ্যবিবর্তন ও সামাজিক রাজনৈতিক বিপ্লব সত্ত্বেও ভারতের আত্মা অপরিবর্তিত রয়েছে। যে সব ভ্রান্ত ধারণা ভারতের মূলগত ভাবকে নষ্ট করতে চেয়েছিল, তার ভেতর থেকে দেশকে টেনে তোলার শক্তি জুগিয়েছে এই কৃষ্টি। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে অভিজ্ঞতার আগুনে কৃষ্টির গঠন বদলাচ্ছে, তার প্রয়োগও পরিবর্তনশীল। তাই একটি দেশের কৃষ্টি ঠিক মতো বুঝতে গেলে প্রয়োজন যথাযথ তথ্যসহ সে বিষয়ে শিক্ষা।

তথাকথিত উচ্চ শিক্ষা বলতেই যে উচ্চ কৃষ্টি বোঝায় তা নয়। ভারতে প্রায়ই দেখা যায় পল্লীবাসী দরিদ্র অশিক্ষিত, কিন্তু উচ্চ ভাবের পরিবেশে তারা মানুষ হচ্ছে, তাদের কৃষ্টিও উচ্চ স্তরের। সংকল্পের শুদ্ধতা ও সিদ্ধির আগ্রহ থেকেই হৃদয়ে অনুভূতি জাগে, শুধু পাঠ ও আলোচনার দ্বারা সত্যের উপলব্ধি হয় না। মেঘ সরে গেলে যখন আর কোন বাধা থাকে না, তখনই সূর্য দেখা যায়। মনের মলিনতা দূর হলেই অন্তরের দিব্যভাব অনুভূত হয়।

আত্মনিগ্রহ

বর্তমান পৃথিবীতে—মানুষের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি যখন গোলমাল সৃষ্টি করছে, মানুষে মানুষে ভুলবোঝা, ঈর্ষা হিংসা চলেছে, তখন আমরা সগর্বে আমাদের প্রাচীন উত্তরাধিকারের দিকে ফিরে তাকাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ভারত এগিয়ে চলেছে সামনে, তার রসদ জোগানো হচ্ছে পেছন থেকে। গান্ধীজীও বলেছেন, জীবন এগিয়ে যাবে সামনে, কিন্তু তাকে বুঝতে হবে পেছন থেকে।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই বলতেন, 'শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, শক্তিই সকল ব্যাধির মহৌষধ।' মনের শক্তিকে বাদ দিয়ে শুধু শারীরিক বা জড়শক্তি কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে না। চিত্তবৃত্তি-নিরোধমূলক যোগই সেই সাধনা, যা শক্ত মনের সহায়ে শক্ত শরীরও গড়ে দেয়।

ভয় ক্রোধ ঈর্ষা লোভ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কলুষিত করেছে, এগুলি জন্মায় অজ্ঞান মনে, অসীম থেকে এরা আমাদের মনকে টেনে নিয়ে যায় জড় বস্তুর প্রতি। তাইতো বলা হয়, 'বাসনার দুয়ার রুদ্ধ হলেই অন্তরের মানুষটির দেখা মেলে।'

শান্তিপ্রিয়তা

যন্ত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রতিদিনই পৃথিবী সংকুচিত হচ্ছে, ফলে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ সংঘর্ষময় আকর্ষণে পরস্পরের ঘাড়ে এসে পড়েছে। এতে শান্তি নষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। তবে এরই প্রত্যুত্তরে জ্ঞান-সমুজ্জ্বল কল্পনা-সহায়ে জেগে উঠবে এক উচ্চতর কৃষ্টি, যখন মানুষ মানুষের ভেতর দেখতে চাইবে শাশ্বত ও সম্পূর্ণ মানবটিকে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় বস্তুকে নয়।

ভারতীয় কৃষ্টির গতি শান্তির পথে, শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে মানুষের মনে শান্তি আনাই তার উদ্দেশ্য। যজুর্বেদের সেই শান্তি-প্রার্থনা আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, 'সা মা শান্তিরেধি'—সেই শান্তি আমার কাছে আসুক—এই প্রার্থনা ভারতবাসীর শান্তিপ্রিয়তার যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে।

শান্তির সন্ধানেই ধ্যান ও উপাসনার স্থান-গুলি নির্মিত হয়েছিল দুর্গম পর্বতে বা তরঙ্গমুখর সমুদ্র-সৈকতে, ঘনবনের ভয়াল নির্জনতায় অথবা লোকালয় থেকে দূরে—নদীতীরে। এই সব স্থানে মানবের অন্তর্নিহিত মহামানব বা বিশ্বমানব অনুভব করেন প্রকৃতির সৌন্দর্য—দেবতার উজ্জ্বল ঐশ্বর্য।

সত্য-শিব-সুন্দর

অবিনশ্বর পরমেশ্বরের চিন্তা সর্বদা প্রয়োজন —আমাদের ব্যক্তিগত অভিমান খর্ব করবার জন্য। দৈনন্দিন আচরণে—প্রার্থনায়, কথাবার্তায় কাজে-কর্মে, নৃত্যগীতে, খেলাধূলায়, পড়াশুনায়, চাষবাসে, খাওয়া-পরায়—জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভারতীয় কৃষ্টি সত্য-শিব-সুন্দরের এক অবিচ্ছিন্ন সঙ্গীত-ধারার ইঙ্গিত দেয়। জীবনের সর্বপ্রচেষ্টায় —হ'ক তা আধ্যাত্মিক বা সামাজিক, আর্থ-নীতিক বা রাজনীতিক, শিল্প বা সাহিত্য, দর্শন বা বিদ্যা—সর্বত্র প্রকাশিত এক কল্যাণময় আভিজাত্য ও সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যচর্যা ও শারীরিক পরিচ্ছন্নতা এখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠানেরই একটি অঙ্গ, এদেশের লোক বিশ্বাস করে—পবিত্র শরীরেই পবিত্র মন থাকতে পারে। খাদ্যের শুচিতার ওপরও এত যে লক্ষ্য রাখা হয়, তার কারণ শুধু যে উপনিষদে আছে 'অন্নব্রহ্মের কথা'—তা নয়, চিত্তের ধীরতা ও শরীরের নিরাময়তার জন্য প্রয়োজন এক নির্দিষ্ট মানের খাদ্য—এ ধারণা এ দেশের মজ্জা-গত। সাধকদের অভিজ্ঞতা, আহারশুদ্ধি থেকেই মন শুদ্ধ হয়, তাই থেকে লাভ হয় ধ্রুবা স্মৃতি, এই ধ্রুবা স্মৃতি থেকেই অজ্ঞান দূরীভূত হয়।

অহিংসার আদর্শ

কল্যাণভাবের মধ্যেই নিহিত আছে হিংসার বিরোধিতা, এই অহিংসা ভারতীয় কৃষ্টিতে ও জীবননীতিতে এক উচ্চ স্থান অধিকার ক'রে আছে। 'অহিংসা' বলতে মহাত্মা গান্ধী শুধু শারীরিক হিংসার অভাবই বুঝতেন না, যা কিছু সত্য শিব ও সুন্দর—তাই বুঝতেন। অহিংসার ওপর এত জোর দেওয়া হয়েছে যে চরম সীমায় উপায় যেন উদ্দেশ্যকেও ছাড়িয়ে যায়। 'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্', 'অপ্রিয় সত্য বোলো না'—এই কর্কশতা-পরিহার সজ্জনসম্মত, এও এক প্রকার অহিংসা।

ঘৃণার দ্বারা ঘৃণাকে জয় করা যায় না, ভালবাসাতেই ঘৃণা অবলুপ্ত, ভারতের এই চিরন্তন চিন্তার সঙ্গেও অহিংসা এক সুরে বাঁধা। মন্দ উপায় দ্বারা উচ্চতম উদ্দেশ্য লাভ করা যায় না, এ উক্তিও অহিংসাভাবের দ্বারা সমর্থিত।

সর্বোদয় ও সমন্বয়

অতি প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন বর্ণের, সভ্যতার নানা স্তরের জাতি—একের পর এক ভারতে প্রবেশ করেছে, পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের পর সমন্বয়ের পথ ধরেই ভারত চলেছে শক্তি ও আত্মবিশ্বাসপূর্ণ জীবনের শান্ত ছন্দ বজায় রেখে, এই তাব অধিবাসীদের সহনশীলতার ও অবস্থানুযায়ী আচরণ করার শক্তির বিপুল পরিচয়।

সর্বভূতে দয়া বা করুণাই সকল সন্দেহ অবিশ্বাস ভয় ও বিরোধিতাকে জয় ক'রে মানুষের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করতে পারে। যে সূক্ষ্ম কৃষ্টিতে কোন ভেদই থাকবে না, তার জন্য প্রয়োজন বুদ্ধিমার্জিত দৃষ্টিভঙ্গী, তারই আভাস পাওয়া যায় 'য একোঽবর্ণঃ' শ্রুতির মধ্যে।

এই উদার দৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে আছে 'সর্বজীবে সমভাব'। বিপর্যয়পূর্ণ ইতিহাসের সুদীর্ঘ যাত্রায় এই নীতিই ভারতকে পথ দেখিয়েছে। এ-কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে সহনশীলতা, আদান-প্রদান, সহাবস্থান প্রভৃতি ভাব আজ আরও বেশী ক'রে প্রয়োজন।

উদার দৃষ্টি, মহৎ চিন্তা, মধুর ভাষা, স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও সৎ আচারণের দ্বারা সংস্কৃতি-সম্পন্ন মানুষ এদেশে চেষ্টা করে যাতে জীবনের কটা দিন মানুষের সেবায়, মানুষকে সুখ-শান্তি দিতেই কেটে যায়। জন্মলাভের পূর্বে সবই অব্যক্ত, মৃত্যুর পরও সব কিছু অজানা, মাঝের জীবনটুকুই তো আমাদের হাতে।

বর্তমান কর্তব্য

সর্বভূতে দয়া, পরম সত্তায় বিশ্বাস, সত্য জিজ্ঞাসা, সৌন্দর্যানুভূতি ব্যতীত মাতাপিতা ও জ্যেষ্ঠকে মেনে চলা, বৃদ্ধের যত্ন নেওয়া, বিদ্বান্‌কে শ্রদ্ধা করা, সাধু-সন্ন্যাসীকে ভক্তি করা, নারীর প্রতি সম্ভ্রম, শিশুর প্রতি স্নেহ, দেশপ্রেম, অতিথি-সৎকার—প্রভৃতি যে সব সূক্ষ্ম ভাব জীবনকে সুখকর ও সুন্দর করে, সে সবই ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্গত।

ভারতের মতো বহুসমাজবিশিষ্ট দেশে—যেখানে ভাবের অখণ্ড সমগ্রতাই চিন্তায় ও কর্মে সামঞ্জস্য আনতে পারে, সেখানে অপরের ভাষা প্রথা ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, তদভাবে সহনশীলতা একান্ত প্রয়োজন। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাদর্শ ভারত-কৃষ্টির এই ভাব প্রচার কববার প্রেরণা দিতে পারে।

অন্তরেব আলো

আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান আজ মানুষকে যত কাছাকাছি এনেছে, এত কাছাকাছি বোধ হয় মানুষ এর আগে কখনও আসেনি। আবার মনের দিক দিয়ে মানুষ এখন মানুষেব থেকে যত দূরে সরে গেছে—এত দূরে বোধ হয় পূর্বে কখনও যায়নি।

আমাদের কৃষ্টি অবিরত অন্তঃসমীক্ষার নির্দেশ দিচ্ছে, যাতে আমাদের চিন্তার তীক্ষ্ণকঠিন অসামঞ্জস্যগুলি দূরীভূত হয়, মনের যাবতীয় গ্রন্থি খুলে যায় এবং ভ্রান্তি ও স্বার্থপরতা যাতে আমরা বীরের মত জয় করতে পারি।

আশা করি মানব-মনে জ্ঞানের স্ফুরণে—এই গ্রন্থাগার বিকীরণ করবে সেই অতি প্রয়োজনীয় অন্তরের আলো। বিশ্বাস করি, এই প্রতিষ্ঠান দুই দেশের কৃষ্টির মধ্যে অধিকতর বোঝাপড়ার ভাবপ্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করবে, আরও আশা করি ভারত-কৃষ্টির চিন্তাধারা মানবচরিত্র-গঠনে সর্বত্র ব্যবহৃত হবে, এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী শ্রেণী জাতি ধর্ম রাষ্ট্র—সকলের মধ্যে পারস্পরিক মিলনের পরিধি ক্রমশঃ বেড়ে গিয়ে মানুষের সভ্যতা ও শুভবুদ্ধি এক স্থিরতর আশ্রয় লাভ করবে।

রামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন

একদা বৈকুণ্ঠাধিপতি স্বয়ং ছোট্ট শিশুটি হ'য়ে বৃন্দাবনে এসেছিলেন যশোদা মায়ের কোলে। যিনি যুগে যুগে ভারতের উপাস্য দেবতা, তিনি খেলাচ্ছলে গোপ-বালকদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন, বুকের ওপর চেপে ধরেছেন তাদের ধূলিমাখা পা। মাটি খেয়ে আর পাঁচজন শিশুর মতো মার কাছে ধরা পড়ে গিয়ে অস্বীকার করেছেন। হাঁ করতে বললে শিশু মুখ ব্যাদান করলেন। এ কী! সমগ্র বিশ্ব যে সেই ছোট্ট মুখগহ্বরে। অমঙ্গল চিন্তায় যশোদা 'ষাট্‌ষাট্' বলে শিশুকে কোলে তুলে নিলেন। মহাভারতের মহাবীর কৃষ্ণসখা অর্জুন দিব্যচক্ষু দ্বারা বিশ্বরূপ দর্শন ক'রে ভয়চকিত স্বরে বলে উঠেছিলেন: 'অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে' এবং কত ক্ষমা চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের সৌম্যরূপ দেখবার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। সেই বিশ্বরূপ মা যশোদা দেখলেন সাদা চোখে, অপরিসীম মাতৃস্নেহে বিশ্বরূপের আধার সেই অপরূপ শিশুকে বুকে চেপে ধরলেন।

আমরা মাধুর্যেই মুগ্ধ হ'য়ে আছি, রামকৃষ্ণের ভগবত্তা আমরা যেন দেখেও দেখতে পাইনা। ভালই হয়েছে। আমাদের শাস্ত্রে অধিকারি-ভেদের কথা আছে। আমাদের সাদা-মাঠা চোখে যেটুকু দেখতে পাই, তাতেই তো অন্তর ভরে যায়, তা বলতে পারলেই ধন্য হবো। যিনি আমাদের ভালবেসে চিরকাল কাছে কাছে রইলেন, দুর্গম গুহায় কঠোর তপশ্চর্যায় সংসার-সমাজ ছেড়ে চলে গেলেন না, গেরুয়াবসন পরলেন না সাদা ধুতি ছেড়ে, যিনি সরল শিশুর 'মা' 'মা' ডাকে বিশ্বভুবনকে মুগ্ধ মুখরিত ক'রে 'পরম' পদ লাভ করলেন, নিজের জননীর মাঝে বিশ্বজননীকে প্রত্যক্ষ করলেন, সহধর্মিণী সারদামণিকে পূজা ক'রে অপূর্ব মাতৃসাধনায় পূর্ণাহুতি দিলেন, ধর্মের যে তত্ত্ব গুহায় নিহিত—তা অকৃপণ হাতে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিলেন যিনি স্বচ্ছ তাঁর জীবনরসে স্নিগ্ধ ক'রে ঘরোয়া অনাড়ম্বর গ্রাম্য ভাষার সহজবোধ্য উপমার সাহায্যে, তাঁকে যে পরম আপন জনের মতো পেয়েছি, এখানেই তো আমাদের জোর—আমাদের অধিকার। গান আমাদের যতই বেসুরো হ'ক না কেন, ভাষা আমাদের ভাবের যতই দুর্বল বাহন হ'ক না কেন, তা দিয়েই আমরা কাছের মানুষ—ভালবাসার মানুষ রামকৃষ্ণের দিগ্‌দর্শন ক'রব। আমাদের ভয় কি? আমরা তো আর নির্বিকল্প-সমাধিমগ্ন সাধকশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণের কথা আলোচনা করছি না।

কিন্তু তাতেই কি রেহাই আছে নাকি আমাদের? মাধুর্য দিয়ে ঐশ্বর্যকে সর্বদা আড়াল ক'রে রাখবার শক্তি যোগমায়াই বা পাবেন কোথায়? দ্বাপরের বৃন্দাবনে তাই সময় সময় বিভ্রাট বেধেছে। আমরাও সাধারণ স্থূল দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণকে দেখতে গিয়ে অভিভূত হ'য়ে যাই, ভাবি অবাক বিস্ময়ে—এই সহজ সরল গাঁয়ের মানুষটি কেমন ক'রে হলেন এ যুগের ভারতেতিহাসের প্রধান স্রষ্টা, যুগন্ধর মহামানবের অপরিমেয় শক্তির আধার!

সাধারণ যুক্তি দিয়ে একটু বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যাক রামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য। তার আগে ভারতেতিহাসের মর্ম-বাণীটি খুঁজে পেতে হবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূল সূত্র ধর্ম, এই বিরাট প্রাচীন দেশের সামগ্রিক কাহিনীকে বিধৃত ক'রে রেখেছে ধর্ম। কিন্তু আপাত-দৃষ্টিতে এটি আমাদের চোখে পড়ে না, বরং রাজনৈতিক ইতিকথা প'ড়ে আমরা সিদ্ধান্ত ক'রে বসি যে তথাকথিত ধর্মই এদেশটার বারবার সর্বনাশ ঘটিয়েছে। একটু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারব, যে তথাকথিত ধর্ম যুগে যুগে ভারতের পতন ডেকে এনেছে, তা মোটেই ধর্ম নয়—তা ধর্মহীনতা। ধর্ম মানে মানবধর্ম, যা আমাদের সনাতন ধর্মের প্রাণস্বরূপ। 'একেশ্বরবাদী' সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের ঊর্ধ্বে এর স্থান, বিশেষ উপায়ে বিশেষ কোন দেবতার পূজাপদ্ধতিতেও এ ধর্ম পর্যবসিত নয়। এ ধর্মের প্রাণ জ্ঞান প্রেম ও ঔদার্য। এ ধর্ম গণ্ডী টানে না, এর বিকাশ হয় আপাত-দৃষ্টিতে বিবদমান মতবাদগুলির সামঞ্জস্য স্থাপনের মধ্যে। এ ধর্ম বাহুতে শক্তি দেয়, হৃদয়ে ভক্তি দেয়, আর এই শক্তি ও ভক্তি দিয়েই মন্দিরে মন্দিরে প্রতিমা গড়া হয়। অপর ধর্মমতকে সম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন দ্বারা স্বধর্ম পালন সার্থক হ'য়ে ওঠে এই ধর্মেরই আশ্রয়ে। ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ এবং ক্রান্তদর্শী বিবেকানন্দ ভারতেতিহাসের এই পরম সত্যটি ধরতে পেরেছেন এবং তাঁদের অজস্র লেখায় ও কথায় তা প্রকাশিত হয়েছে। ইওরোপের মানদণ্ডে এঁরা হয়তো কিছু ঐতিহাসিক পদবাচ্য নন। কিন্তু জাতীয় উত্থান-পতনের ইতিহাসের পশ্চাতে মহাকালের শাশ্বত ইঙ্গিতের সাঙ্কেতিক লেখা তত্ত্বদর্শী এই দুই মহামনীষী পড়তে পেরেছেন। আর এটাই তো ইতিহাস-দর্শনের আসল কথা। ভারতবর্ষের ইতিহাসের অগণিত তথ্যগুলি যখন এঁদের দেওয়া তত্ত্বের আলোকে এবং এঁদের দেখানো ধারায় পরিবেশিত হবে, সে দিন রচিত হবে এদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

রাজা মন্ত্রী সেনাপতি ও সভাসদদের রাজনৈতিক কীর্তিকাহিনী স্বভাবতই ভিড় ক'রে আছে আমাদের ইতিহাস-গ্রন্থে। এ তো বহিরঙ্গ কাঠামো মাত্র ভারতেতিহাসের, এর অন্তরালে রয়েছে অন্তরঙ্গ ফল্গুধারার মতো প্রাচীন ভারতের যা কিছু গৌরব। তা নিহিত রয়েছে সংঘর্ষ বা সংহারে নয়, আত্মসাৎ করাতেও নয়, রয়েছে সমন্বয় সাধনের মধ্যে, রয়েছে বহুর মধ্যে একের সাধনায়। যতদিন এই সমন্বয়ী ধর্ম তার ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, ততদিনই ভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। আর্যগণ এদেশে এসে বহু সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল 'অনাস'* অনার্য ভারতীয়দের সঙ্গে, এ সংঘর্ষের কাহিনী আমরা অল্পবিস্তর জানি। কিন্তু আর্য অনার্য সংস্কৃতির ও ধর্মের এমনকি দেবতাদেরও কেমন ক'রে কি অপূর্ব সমন্বয় হ'ল, সে ইতিহাস আজও অলিখিত। অথচ সনাতন ধর্মের অধুনাতন রূপ হিন্দুধর্মের সূচনা এই সমন্বয়ের মাঝে। আর্য রুদ্র আর আর্য-পূর্ব পশুপতি—মহাদেব বা শিবে একাত্ম হয়েছেন, যেমন হয়েছেন বৈদিক বিষ্ণু আর পৌরাণিক কৃষ্ণ—নারায়ণে। সমন্বয়ী আর্য ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে কত দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিধৃত হ'য়ে আছে আমাদের শাস্ত্রাদি গ্রন্থে। ইতিহাসে পড়ি আর্য ভারতের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ও অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে মৌর্যোত্তর যুগে এবং গুপ্তোত্তর যুগে সার্থক সামরিক অভিযান ক'রে সাম্রাজ্য গড়েছিল গ্রীক শক পহ্লব কুষাণ হুন গুর্জর প্রভৃতি বহু বহিরাগত জাতি। এই বিজয়ী জাতিরা কিন্তু কালক্রমে সম্পূর্ণ ভারতীয় হ'য়ে গেল অন্যান্য ভারতীয়দের সঙ্গে বিবাহাদি নানা সামাজিক

* প্রাক্-আর্য ভারতীয়দের আর্যেরা বলতেন 'অনাস'—কারণ তাদের নাক চেপ্টা ছিল, যেন নাসাহীন; তাই 'অনাস' ঘৃণাবাচক শব্দ।

সম্বন্ধের মাধ্যমে। আর্যসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীতে এরা গুণানুসারে গৌরবের স্থান ক'রে নিল, মিশ্রিত জাতি হয়েও খাঁটি আর্য রক্তের গৌরবে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য রচনায় বিরাট অবদান রেখে দিল, রাজপুত্রদের ইতিহাসের এই তো গোড়ার কথা। সমন্বয়ধর্মী ভারতবর্ষ বৌদ্ধ-ধর্মকেও এমনি ক'রে ক্রমবিবর্তনের দ্বারা তার ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রসাধনায় ও বৈষ্ণবধর্মে আপন ক'রে মিশিয়ে ফেলে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের বাংলাদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি। জাগ্রত সমৃদ্ধ প্রাচীন ভারতের এই তো ইতিহাসের ধারা।

কিন্তু মুসলমান যখন এল উত্তর-পশ্চিমের সিংহদ্বার ভেঙে, তখন হিন্দু ভাবত তার ধর্মের প্রকৃত মর্ম হারিয়ে ফেলেছে। 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে'—ভারতের এই জীবনবেদ তখন অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে কূপমণ্ডূকতার আত্মপ্রসাদে কুসংস্কারের জঞ্জালে সামাজিক ঘৃণা, অসাম্য ও অত্যাচারের অভিশাপে লুপ্ত হয়েছে, বাইরের জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে হিন্দু ভারত তখন অচলায়তন সৃষ্টি করেছে। ধর্মের প্রকৃত মর্ম-জ্ঞানহীনতা-জনিত শক্তিহীনতাই হিন্দু ভারতের পতন ডেকে আনল। ইসলাম-ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ধর্মপ্রচারের উন্মাদনায় জাগ্রত দুর্ধর্ষ তুর্কি জাতি ভারতের অধীশ্বর হ'ল। বিভিন্ন রাজপুত বংশের রাজগণ বারবার ব্যক্তিগত শৌর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েও ইসলামের আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে পারল না।

তারপর তিনশত বৎসর ধরে দিল্লীকে কেন্দ্র ক'রে ভারতের রাজনৈতিক যে ইতিহাস আবর্তিত হ'ল, তা অত্যন্ত গ্লানিকর। শাসক মুসলমান আর শাসিত হিন্দুর বিরাট ব্যবধান ঘ'টল, রচিত হ'ল অত্যাচারী শাসক আর অত্যাচারিত প্রজার নিষ্ঠুর বিচ্ছেদের মর্মন্তুদ কাহিনী। এ কাহিনীই আমরা সবিস্তারে পড়ি। কিন্তু দিল্লীর কথাই তো মধ্য যুগের একমাত্র কথা নয়, শেষ কথাও নয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতের সর্বত্র ভিড় ক'রে এলেন কত সাধু ও সন্ত—রামানন্দ, কবীর, নানক, ভাস্করাচার্য, নামদেব ও নিমাই। ভারতের লুপ্ত সমন্বয়ী ধর্মকে আবার ভাষা দিলেন তাঁরা, জীবনের সাধনা দিয়ে আবার তাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। হিন্দু ভারত আর ইসলাম শাসন কাছাকাছি এল, ভয়শূন্য চিত্তের উদার প্রেমধর্ম ম্রিয়মাণ সনাতন ধর্মে নব-জীবন-রস ঢাল্‌ল। এই সাধু-সন্তরাই তৎকালীন ভারতের সত্যিকার ইতিহাস-স্রষ্টা, দিল্লীর সুলতানদের চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণে। উত্তরকালে (ষোড়শ শতাব্দীতে) মহামতি মুঘল সম্রাট্ আকবর এই হিন্দু-মুস্লিম সংস্কৃতি ও ধর্মের সমন্বয়সাধনে দৃঢ় পাদক্ষেপে অগ্রসর হ'য়ে 'মহাভারত' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সার্থক করেছিলেন। উদার সমন্বয়ী ধর্মকে ব্যাপক রাজনীতিতে রূপায়িত ক'রে আকবর মধ্যযুগের সাধু-সন্তদের বলিষ্ঠ উত্তর সাধকের স্থান গ্রহণ করলেন।

কিন্তু আবার তা হারিয়ে গেল, যখন ঔরংজীব তাঁর সমগ্র শক্তি দিয়ে আকবরের নীতিকে চূর্ণ ক'রে ফেললেন। তাঁর মৃত্যুর পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমান রাজশক্তির নির্বীর্যতা ও ব্যভিচার এবং হিন্দু সমাজের অবিশ্রান্ত কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ও লোকাচারনিষ্ঠ ভাবহীন ধর্মপালন ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপনের সুদূরব্যাপী পথ রচনা ক'রল। কালক্রমে কলকাতা হ'ল এই নূতন রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্র, পশ্চিমের জড়বাদী সভ্যতা ও সংস্কৃতির পাদপীঠ। আসল বিপর্যয় দেখা দিল তখন। ইওরোপ যেখানেই উপনিবেশ বা বাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপন ক'রে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে সেখানেই গড়ে উঠেছে বৃহত্তর ইওরোপ। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া,

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ—সবই ইওরোপীয় সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্র, তাদের নিজস্ব প্রাচীন কৃষ্টি প্রায় অবলুপ্ত। স্বাধীন হবার পরেও তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইওরোপীয় ছাঁচে ঢালা, ধর্ম ইওরোপেরই দেওয়া খৃষ্টধর্ম। খৃষ্টধর্মের গোটা ইতিহাসেই এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। খৃষ্টপূর্ব গ্রীসের এবং রোমের বিরাট সভ্যতা অতীত ইতিহাসের এক একটি বিচ্ছিন্ন গৌরবময় অধ্যায় মাত্র, বর্তমান গ্রীস বা ইটালির ইতিহাসের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ কোন যোগ নাই। বর্তমান যুগের গ্রীক বা ইতালিয়ানের মধ্যে তার পরম বিদগ্ধমনা হেলেনিক পূর্বপুরুষের বা মহা-অভিমানী প্রাচীন বীর্যবান রোমান নাগরিকের চিহ্নটুকুও আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ইসলামের ইতিহাসও তাই। মানব-সভ্যতার প্রাচীনতম পীঠস্থান মিশরদেশ আজ বৃহত্তর আরব সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র, ইসলামের শ্রেষ্ঠ বাহন। নীলনদের প্রাচীন সভ্যতা মরুপথে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে, পিরামিডের অতলতলে কান পাতলে আর তার মৃদুতম স্পন্দনও শোনা যাবে না। প্রাচীন পারস্য দেশের সুন্দর পারসিক সভ্যতা ইরাণীয় ইসলামের প্রচণ্ড প্রতাপে অবলুপ্ত। সকল ধর্মমতের নিরাপদ আশ্রয় সমন্বয়ী ভারতের বম্বে অঞ্চলে পার্শী সংস্কৃতির মধ্যে তার ক্ষীণতম প্রতিধ্বনি শোনা যেতে পারে মাত্র। ভারতেও ইসলাম এই ব্রত নিয়েই এসেছিল, দার-উল-হার্‌বকে দার-উল-ইসলামে* পরিণত করতে, শত শত বৎসর ধরে ইসলামের সমগ্র শক্তি এখানে এই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত ছিল। শাশ্বত ভারত ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু আবার তা চির পুরাতন সমন্বয়ী ধর্মের স্বরে বেঁচে থাকার দাবি জানিয়েছিল সদর্পে, ইসলামকে সাদরে স্থান দিয়ে ভারত ভারতবর্ষই রয়ে গেল—কেমন ক'রে তা আমরা সাধুসন্তদের জীবনে ও আকবরের মহৎ কীর্তিতে দেখতে পেয়েছি।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বিপর্যয় আরও গুরুতর, কারণ তা সাংস্কৃতিক বিপর্যয়, আর মুস্‌লিম যুগে এটা ছিল রাজনৈতিক সমস্যা মাত্র। রাজনৈতিক স্বাধিকার ভারত বহুবার হারিয়েছে, কিন্তু রাজনীতিকে ভারত কোন দিন সবার ওপরে স্থান দেয়নি ব'লে এতে তার সামগ্রিক বিপর্যয় ঘটেনি, অব্যাহত রয়েছে তার যুগযুগান্তব্যাপী ইতিহাসের ধারা। কিন্তু ইংরেজ শাসন তার মূল ধরে টান দিল। জড়বাদী যন্ত্রসভ্যতা আর ইওরোপীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি ইংরেজ বণিকের জাহাজে পণ্য হ'য়ে এল সমুদ্রের ঢেউয়ের কূলপ্লাবী মত্ততা নিয়ে। এর প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে গেল আমাদের দুর্বল মাটির বাঁধ, ভেসে গেলাম আমরা। খৃষ্টধর্ম আর পাশ্চাত্য সংস্কৃতি শিক্ষিত বাঙালীর তথা ভারতবাসী মাত্রেরই কাম্য হ'ল, অবলম্বন হ'ল। কলকাতাকে কেন্দ্র ক'রে চলেছে সনাতন ভারতবর্ষের এই অবলুপ্তির পালা, আর পল্লীভারত ধর্মের বিকৃতির বোঝা নিয়ে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মাঝে ক্ষুদ্রতর জীবনের গ্লানি বহন করছে। বিরাট প্রশ্ন জেগে উঠল সমগ্র ভারতবর্ষের সম্মুখে: রাজনৈতিক স্বাধিকার হারিয়ে এবার কি ভারত তার অতীতকে মুছে ফেলে দিয়ে আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার মতো বৃহত্তর ইওরোপের একটি অঞ্চল মাত্রে পরিণত হবে?

সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের এই ঘনকৃষ্ণ মেঘের বুক চিরে হ'ল বিদ্যুতের স্ফুরণ, রামমোহন দাঁড়ালেন এসে বলিষ্ঠ নেতিবাচক বাণী নিয়ে জ্যোতির্ময় মূর্তিতে; নব্যভারত জন্মগ্রহণ ক'রল তাঁর চিত্তে। সমন্বয়ের সূত্র আবার খুঁজে পেলেন এই

* 'বিধর্মী ও অবিশ্বাসীর দেশকে ইসলামী দেশে পরিণত করতে হবে'—কথাটা ঔরংজীবের রাজত্বকালে খুব চালু ছিল।

মহামনীষী যুগমানব। ভারত গ্রহণ করবে পশ্চিমকে নিঃস্ব কাঙালের ভাবে নয়; সনাতন সমন্বয়ী ধর্মের শক্ত মাটির ওপর দাঁড়িয়ে পশ্চিমকে নতুন ক'রে গ্রহণ ক'রে নিজেকে প্রবুদ্ধ ও সমৃদ্ধ করবে ভারত। সনাতন ধর্মের অঙ্গে যে জঞ্জাল পুঞ্জীভূত হয়েছিল, তা পরিষ্কার ক'রে ঔপনিষদ একেশ্বরবাদ উদ্ধার করলেন তিনি, ইসলামের 'জবরদস্ত মৌলভি' হয়ে তিনি তারও প্রাণশক্তিকে জাগালেন, খৃষ্টধর্মের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে সাদরে বরণ করলেন। এ তিনের অপূর্ব সমন্বয়ে ফুটে উঠল ভবিষ্যৎ ভারতের নবরূপ। এ কেই মূলধন ক'রে সৃষ্ট হ'ল ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজ, এদেশকে বাঁচাতে যার দান অপরিসীম।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের আবেদন বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত শহরবাসীদের গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহৎ পল্লী-ভারতের দুয়ারে পৌঁছতে পারল না। সহজ সরল মানুষের কাছে আবেদন পৌঁছয় হৃদয়ের মধ্য দিয়ে, মস্তিষ্কের ভেতর দিয়ে নয়। পল্লী-ভারত আর নগর-ভারতের ব্যবধান তাই নিছক যুক্তির পথে দূর হ'ল না, সূচনা বা পটভূমিকা রচিত হ'ল বটে। এক মাহেন্দ্রক্ষণে ভারতভাগ্য-বিধাতার ইঙ্গিতে পল্লীভারতের একটি মানুষ তখন পূজারী হ'য়ে এলেন জড়বাদী সভ্যতার ভারতীয় কেন্দ্র কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী-মন্দিরে। হৃদয়ের আবেদন নিয়ে শাশ্বত ভারত এই অভিনব পূজারী ব্রাহ্মণের মাঝে রূপ নিল। সবার অলক্ষ্যে একটি নূতন নক্ষত্র সেদিন বুঝি আকাশে জেগেছিল—গদা-ধরকে 'রামকৃষ্ণ' হবার পথনির্দেশ করতে। নীরবে অনাড়ম্বরে এক বিরাট বিপ্লবের পটভূমি রচিত হ'ল।

এ ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায় সবারই অল্প-বিস্তর জানা আছে, দু'একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত মাত্র দেবার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। ব্রাহ্ম-সমাজ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্তনের আন্দোলন করেছেন, মূর্তিপূজাকে নিন্দা ক'রে। অবশ্য এর প্রয়োজন ছিল অনস্বীকার্য। কারণ, হিন্দুসমাজ তখন অন্ধ সংস্কারবশে প্রায় পৌত্ত-লিকই হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে একই ব্রহ্মের আরাধনা করে—এ তত্ত্ব তখন সাধারণ্যে লুপ্তপ্রায়, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান তখন বিস্মৃত বা অবহেলিত। দক্ষিণেশ্বরের অদ্ভুত পূজারী তখন ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদন করছেন কালীমূর্তির সামনে বসে 'মা, মা' ডাকে চারিদিক মুখরিত ক'রে। মৃন্ময়ী কালীমাতা চিন্ময়ী ব্রহ্মময়ীরূপে তাঁকে দেখা দিলেন। হিন্দু যে পৌত্তলিক নয়, মাতৃসাধক রামকৃষ্ণ অপূর্ব সাধনার বলে তা আবার নতুন ক'রে জানিয়ে দিলেন। কলকাতায় সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। বুদ্ধিজীবী যুক্তিবাদী, ভক্তিপথগামী, নিছক কৌতূহলী—সকল শ্রেণীর নরনারী ভিড় ক'রে এই পাগলঠাকুরকে দেখতে এলেন, আর তাঁকে ছেড়ে যেতে পারলেন না। এলেন নরেন্দ্রনাথ, পশ্চিমের যুক্তি-প্রধান উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত সংশয়বাদী শক্তিমান্ যুবক। এসেই প্রশ্ন করলেন, মশাই আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন? রামকৃষ্ণের শান্ত সহাস্য আননে চিরন্তন ভারতবর্ষ সহজ দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে উঠল: হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে কথা কই যে, এই যেমন তোর সঙ্গে কথা কচ্ছি। যুক্তিবাদী পশ্চিম যেন ভারতবর্ষকে প্রশ্ন ক'রল: কী অধিকার আছে তোমার বর্তমান জগতে টিকে থাকবার সনাতন ধর্মকে আঁকড়ে ধরে? এস আমার ভাবাদর্শে অবগাহন ক'রে নতুন হ'য়ে ওঠ, প্রগতির পথে চল। ওই মহাশক্তিধর পূজারী ব্রাহ্মণ সমগ্র ভারতবর্ষের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎকে চিত্তে স্থাপন ক'রে যেন বললেন: অধিকার আছে বৈকি? ভারত পশ্চিমকে গ্রহণ করবে নিজের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত ক'রে নয়। পশ্চিমকে প্রাচ্যের সঙ্গে সমঞ্জসীভূত ক'রে নতুন

ক'রে আবার তার সত্যের সাধনা শুরু হবে। সত্য অন্তরে, সত্য তো বাইরে নয়, ভারত এই সত্যের আরাধনা করেছে যুগে যুগে, ডাক দিয়েছে : শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। সকলকে সঙ্গে নিয়ে সে বিশ্বজোড়া আসন পেতে প্রেমের পথে সত্যের আরাধনায় নিমগ্ন। ভারতাত্মাই যেন বলে উঠলেন : 'যত মত তত পথ', সত্যলাভে—ব্রহ্মলাভে সকলেরই সমান অধিকার। নিজে সকল ধর্মমতে উপাসনা ক'রে ভগবৎপ্রাপ্তির দ্বারা এ সত্যকে প্রকটিত করলেন সমন্বয়াচার্য রামকৃষ্ণ, শাশ্বত ভারতবর্ষকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন আধুনিক সভ্যতার পটভূমিকায়।

এই মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েই যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথ হলেন অনুভবী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, সহস্ররশ্মি সূর্য রামকৃষ্ণের একটি রশ্মি দ্বারা নিজের অন্তর-দীপ জালিয়ে নিয়ে বিশ্বজয় করলেন। ভারতের হীনম্মন্যতা দূর হ'ল, নবতর মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ভারতবর্ষ পশ্চিমকে আমন্ত্রণ জানাল ভাবের আদান-প্রদানের জন্য। বিবেকানন্দ তার অগ্রদূত। কম্বুকণ্ঠে তিনি ডাক দিয়ে বললেন—এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। অপূর্ব এক ঐতিহাসিক সম্ভাবনায় উনবিংশ শতাব্দীর ভারত ভাস্বর হ'য়ে উঠল। যে নব ভারতের সূচনা রামমোহনে, তারই পূর্ণ রূপ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে, তারই আনন্দরসঘন প্রগতির পথে যাত্রা মহাকবি রবীন্দ্রনাথে। আরও কত মনীষী, শিল্পী ও দার্শনিক নবভারত রচনাকে পূর্ণাঙ্গ করতে জীবনব্যাপী সাধনার ফল এনে দিলেন অর্ঘ্যরূপে। অথচ এ আশ্চর্য ঘটনা ঘ'টল যখন ভারত বিদেশী শাসনের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ। কোন পরাধীন দেশের ইতিহাসে এ রকম ঘটনা আর ঘটেনি, এমন ক'রে ধর্মকে ভিত্তি ক'রে সমন্বয়ের পথে সংস্কৃতির নবজন্ম আর কোথাও ঘটেনি।

কিন্তু এ তো গেল ভাবরাজ্যের বিপ্লবের কথা, ভারতের নব জাগরণের সূচনা মাত্র। কর্মসূচী কই—এ-কে রূপায়িত করবার? রামকৃষ্ণের দিগ্বিজয়ী রূপ বিবেকানন্দ সেই কর্মসূচী দিলেন। মাত্র দশ বছরের কর্মজীবনে তিনি আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এক অপূর্ব অধ্যায় সূচনা ক'রে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় পেয়ে তিনি স্বভাবতই চেয়েছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর পরমবাঞ্ছিত আত্মার মুক্তির তপস্যায় নিভৃত গুহায় চলে যেতে। ঠাকুর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্নেহের কণ্ঠে বলে উঠলেন : তুই এত স্বার্থপর, নিজের মুক্তি খুঁজছিস্। ওরে, তোর মুখ চেয়ে আজ যে কোটি কোটি মানুষ বসে আছে। জীবকে শিবজ্ঞানে আরাধনা—এই তো শ্রেষ্ঠ তপস্যা। এখানেই দেশপ্রেমিক বিবেকানন্দের জন্ম হ'ল। সমগ্র ভারত পরিক্রমা করলেন তিনি, এর অবিশ্বাস্য দারিদ্র্য আর দুর্গতি মরমী সাধক বেদনার চোখে দর্শন করলেন। ভারতের দক্ষিণ সীমান্তে কন্যাকুমারিকার সমুদ্রতটে শিলার ওপর বসে ধ্যান করলেন শাশ্বত ভারতবর্ষের, বর্তমানের সমগ্র দুঃখ নিজের বলিষ্ঠ বুকে ভরে নিলেন, দেশের সামগ্রিক শোষণ, বঞ্চনা ও দুর্দশায় তাঁর অন্তর কেঁদে উঠল। ভগবানের আরাধনায় যাঁর চিত্ত নিমজ্জিত, অন্তর নিবেদিত, দেহ উৎসর্গীকৃত, সেই পূতপবিত্র সত্তার অন্তস্তল থেকে উদাত্ত ঘোষণা দিগ্‌বিদিক্ কম্পিত ক'রল : আগামী পঞ্চাশ বৎসর জননী জন্মভূমিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য হউন। —হে ভারতবাসী, আজ থেকে তোমার একমাত্র উপাস্য দেবতা তোমার দেশ, অন্য সব দেবতার পূজা এখন থাক।

স্বামীজীর মন্ত্র জাতির ক্লীবত্ব পরিহারের মন্ত্র, জাতীয় মুক্তির আন্দোলন স্বামীজীর জীবন থেকেই প্রত্যক্ষ প্রেরণা পেল। গোখলে বলেছেন : আধুনিক যুগে বাংলা সমগ্র ভারতের গুরু, কি ভাবরাজ্যে—কি কর্মক্ষেত্রে। স্বদেশী আন্দো-

লনের জন্ম বাংলাদেশে, আবার বিপ্লবপন্থীরাও স্বামীজীর শক্তিবাদে অনুপ্রাণিত। এটা ভাবোচ্ছ্বাস নয়, নিছক ঐতিহাসিক সত্য। সম্প্রতি আমেরিকার মিস মেরী লুই বার্কের রচিত 'নব আবিষ্কার' নামে স্বামীজীর আমেরিকা-জীবনের ওপর একখানা বিরাট প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং স্বামীজীর অপূর্ব কার্যাবলীর অনেক অপ্রকাশিত কাহিনী তাতে স্থান পেয়েছে। ভারতে শোষণ-ভিত্তিক ইংরেজ শাসন তিনি কি ঘৃণার চোখে দেখতেন, তা আমরা জানতে পেরেছি আজ। খৃষ্টধর্মের নির্ভীক সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন সভায় বারবার বলেছেন, ভারতে খৃষ্টান ইংরেজদের নিষ্ঠুর শাসনের কথা, যে শাসন মানুষকে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্যা সিস্টার নিবেদিতা স্বদেশ ছেড়ে ভারতে এলেন গুরুর কাজে আত্মনিয়োগ করতে, এ দেশের বেদনা ও বঞ্চনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে গেলেন তিনি গুরুর প্রেরণায়। এই মহীয়সী নারীর জীবন থেকে এদেশের বিপ্লব আন্দোলন উৎসাহ পেয়েছে, তাও আমরা জানি। মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা ক'রে একদিকে জাতির সামগ্রিক মনুষ্যত্ব ও আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্বোধনে গুরুভাইদের সহযোগিতায় অপূর্ব কর্মসূচী রচনা করলেন স্বামীজী, আর একদিকে মানস-কন্যা নিবেদিতাকে দান করলেন দেশের মুক্তি-সাধনায়। কর্মযোগী বিবেকানন্দের নিঃস্বার্থ বলিষ্ঠ সেবাব্রত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি-স্থাপন, স্বাদেশিকতার মহত্তম প্রেরণা ও পথপ্রদর্শক নেতা স্বামীজী!

সপ্তদশ শতাব্দীতে শিবাজী-গুরু রামদাস যেমন মারাঠা জাতির সংহত বলিষ্ঠ জাগরণের মন্ত্রোদ্গাতা, এ যুগে স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র ভারতের নবজাগরণের মন্ত্রোদ্গাতা, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাগণ অনেকেই তা স্বীকার করেন। জীবনের সায়াহ্নে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যে সুভাষচন্দ্রকে দেশনায়কের পদে বরণ ক'রে গিয়েছিলেন, তিনি মুক্তকণ্ঠেই একথা বলতেন। বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার নিরপেক্ষ ইতিহাসের বিচারে দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করেছেন যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীরাগ্রগণ্য দেশপ্রেমিক নেতাজী সুভাষচন্দ্র, তাঁর অসামান্য বলিষ্ঠ কর্মধারায় এদেশের স্বাধীনতার পথ সুগম হয়েছে। তাঁর জীবনদর্শন স্বামীজীর দান, এ কথা সুভাষচন্দ্রই বারবার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

আর স্বামীজী? সহস্র প্রতিকূলতার মাঝে শাশ্বত ভারতের সমন্বয়ী ধর্মের পুনরুজ্জীবনে মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে এবং দেশপ্রেম-মন্ত্রদানে এই সন্ন্যাসী কি অপরিসীম শক্তি ও প্রেরণা পেয়েছেন তাঁর গুরু ওই পাড়াগাঁয়ের সহজ সরল মানুষটির কাছে, যিনি দেহাতীত জ্যোতির্ময় সত্তায় সর্বদাই তাঁর কাছে কাছে থাকতেন—এ স্বামীজীর নিজেরই কথা। সত্যই বর্তমান ভারতের ইতিহাস-স্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ, যুগন্ধর মহামানব স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ভাব ও সাধনার এক বিরাট সম্প্রসারণ।

আজ স্বাধীন ভারতের নাগরিক হ'য়ে এ কথা আমাদের আরও গভীর ভাবে স্মরণ ও মনন করা প্রয়োজন। কারণ স্বাধীনতা পাওয়ার চেয়ে তাকে রক্ষা করার কাজ মোটেই কম দায়িত্বপূর্ণ নয়। আমাদের জাতীয় জীবনের সকল স্তরে আজ অনেক ফাঁকি ও দুর্নীতি প্রবেশ করেছে। কথার মাধুরী দিয়ে যতই আমরা ঢাকতে চেষ্টা করি না কেন, একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে আমাদের জীবনের ভারসাম্য আবার নষ্ট হবার উপক্রম

হয়েছে, সামঞ্জস্যের বা সমন্বয়ের সূত্র আবার আমরা হারিয়ে ফেলছি। পশ্চিম আবার আমাদের গ্রাস করতে আসছে। ধর্মকে দুর্বলতা ব'লে পরিহার করতে চেষ্টা করছি অথবা ধর্মের নামে আবার ধর্মহীনতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। এদিকে আমাদের রাষ্ট্রিক শাসনতন্ত্রের কাঠামোর নাম দেওয়া হয়েছে 'সেক্যুলার ডেমোক্রেসি' বা ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র—এও পশ্চিমের অনুকরণে। দুর্গত মানুষের দুঃখে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করছি, বক্তৃতা-মঞ্চ সরগরম রাখছি, কিন্তু আসলে সেবা করছি নিজ নিজ নগ্ন স্বার্থের। আমাদের সাজানো মিষ্টি কথা আজ যেন আমাদের স্বার্থমগ্ন মনকে আড়াল করার বাহনে পরিণত হয়েছে, ভুলে গেছি স্বামীজীর কথা—'চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না'। দেশপ্রেম কি কথার কথা ? অপর এক মানুষকে কি সত্যই ভালবাসা যায়, যদি না তাকে আমার আত্মার আত্মীয় ব'লে মনে করতে পারি ? কিভাবে ভালবাসতে হয়, ঠাকুর তা দেখিয়ে গেছেন, কিভাবে দেশপ্রেম জন্মায়, স্বামীজীর জীবন ও বাণী তা প্রকাশ ক'রে গেছে। মানবতা-বাদের বড়াই করি আমরা, সমাজতন্ত্র-বাদের স্বপ্ন দেখছি আমরা, কিন্তু কোন কিছুই সার্থক হবে না, হ'তে পারে না, ভারত যদি স্বধর্মচ্যুত হয়। এই ধর্মই ভারতের প্রাণরস-সঞ্চারী, ভারতের ইতিহাসের নিয়ন্তা। এই ধর্মই বর্তমান জড়বাদের পটভূমিকায় মহাসমন্বয়াচার্য রামকৃষ্ণের জীবন দ্বারা রূপায়িত।

শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতবাদ দ্বারা জড় সভ্যতার কাঠামোতে এক অখণ্ড পৃথিবী এবং সমগ্র মনুষ্যজাতির এক সুখী পরিবার গড়তে গিয়ে আজ বিশ্ব এসে দাঁড়িয়েছে মহতী বিনষ্টির গহ্বর-মুখে। শান্তির ললিতবাণী মুখে মুখে আওড়ানো হচ্ছে যত জোর গলায়, ততই বেড়ে যাচ্ছে সমরোপকরণের নব নব সম্ভার এবং সমাবেশ। পশ্চিমের বিবদমান দুই মতবাদের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের নাগপাশের বন্ধনে মনুষ্যত্বের নাভিশ্বাস উঠেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অনুশীলনের আশীর্বাদে আজ পশ্চিম মানবসভ্যতাকে কি অপূর্ব ঐশ্বর্যের আভরণে সজ্জিত করেছে, কত কাছাকাছি এসেছে, কত ছোট হ'য়ে গেছে আজ মানবের বাসভূমি—এই সুন্দর পৃথিবী। তবুও পৃথিবীর কোটি কোটি নিরীহ মানুষ একটা কি অশুভ আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। ধরণীর এত শোভার মাঝে এ কি অভিশাপের বাণী লেখা !

ওদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানব-দরদী মনীষিগণ —তাঁদের সংখ্যাও মোটেই কম নয়—তাই তাকিয়ে আছেন ভারতবর্ষের দিকে, যে ভারতবর্ষ সমন্বয়ী মানবধর্মের জন্মভূমি। অন্তরকে উপবাসী রেখে শুধু মস্তিষ্কের নিরলস চালনা দ্বারা পশ্চিম তার বিরাট কর্মসূচীর কল্যাণপ্রদ সমাপ্তি আর যেন দেখতে পাচ্ছে না। বিভ্রাট বেধেছে এইখানে। দিব্যদৃষ্টিতে জড়সভ্যতার এ পরিণতি দেখেই স্বামীজী, শুধু ভারতবর্ষকে নয়, সমগ্র বিশ্বকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন : এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সংযোগেই বিশ্বজোড়া মানবজাতির এক সুখী পরিবার গড়ে উঠতে পারে। মস্তিষ্ক দিয়েছে পশ্চিম, হৃদয় দেবে ভারতবর্ষ, সে আশায় পৃথিবী কাল গুনছে।

এত বড় উত্তরাধিকার আমাদের ! শুধু ভারতকে নয়, বিশ্বকে সহজ ও আনন্দময় করার বিরাট দায়িত্ব আমাদের। শুধু ভারতের ইতিহাসে নয়, বিশ্ব ইতিহাসে যুগোপযোগী বিরাট পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। এ ঐতিহ্য আমাদের শক্তি দিক, আমাদের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা দিক।

তত্ত্ববোধিনী সভা

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে একটা অনগ্রসর জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যে আকস্মিক রূপান্তর ঘটতে পারে তার পরিচয়-বাহী হ'ল ১৮৩৯ খৃঃ ৬ই অক্টোবর কলকাতায় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা। ১৮৩৯ খৃঃ অক্টোবর হ'তে ১৮৫৯ খৃঃ ডিসেম্বর—মাত্র এই বিশ বৎসর বাংলা দেশে এ প্রতিষ্ঠানটি সক্রিয় ছিল, কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত স্বল্প কালের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালীর সাহিত্য, সমাজ ও ধর্মজীবনে নতুন প্রাণচাঞ্চল্য জাগিয়ে দিয়ে নয়া বাংলার গোড়া পত্তনে যে যুগান্তকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল তার তুলনা খুবই বিরল। বস্তুতঃ গত শতাব্দীর জ্ঞান- বিজ্ঞান- ও ধর্মচর্চামূলক এ সাংস্কৃতিক সংস্থা সে যুগের সাহিত্য ও জাতীয় জীবনের নবতর রূপদানে যদি বহুমুখী ও বলিষ্ঠ কর্মপন্থা গ্রহণ না ক'রত তাহলে আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রগতি যে বিলম্বিত ও ব্যাহত হ'ত, তা অনুমান করা অহেতুক নয়।

॥ ১ ॥

যে ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই স্মরণীয় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল, প্রথমে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নয়। বাংলা দেশে ইংরেজ অধিকারের প্রথম বিশৃঙ্খলার যুগ বহুদিন আগে গত হয়েছে। দেশের শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হয়েছে রাজধানী কলকাতা শহরে। জব চার্নকের অন্ধকারাচ্ছন্ন কলকাতার চেহারা তখন আর চেনা যায় না। শাসনকার্যের জন্ত বহু ইংরেজের সমাগম হয়েছে এ আজব নগরী কলকাতায়, আর সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বণিকও খুলে বসেছে তাদের বিচিত্র পণ্যের পশরা। ইংরেজরাজের রাজকার্যে ও বিদেশী বণিকের বাণিজ্য-ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্ত তখন রাজধানী কলকাতায় যুগপ্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে একদল অর্ধ-ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর। কিছু ইংরেজী শব্দ আয়ত্ত ক'রে 'যেন তেন প্রকারেণ' ইংরেজ প্রভুর সঙ্গে কাজের কথা চালাতে পারলে রাজসরকারে চাকরি হবে, কিংবা বণিক-বৃত্তিতে উন্নতি করা যাবে, এই আশায় তৎকালীন কলকাতার বহু পরিবারের ছেলে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে উঠল। বিদেশী ইংরেজরাও সুযোগ বুঝে কলকাতার স্থানে স্থানে ইংরেজী স্কুল স্থাপন ক'রে মহা উৎসাহে বাঙালী ছেলেকে ইংরেজী শিখাতে লাগলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পাঠে জানা যায়, সে যুগে ইংরেজী শিক্ষার পীঠস্থান ছিল চিৎপুর রোডে সার্বরণ (Sherburne) নামক ফিরিঙ্গীর স্কুল, আমড়াতলায় ফিরিঙ্গী মার্টিন বাউলের (Martin Bowle) স্কুল, আর আরাটুন পিট্রাস (Arraton Petres) নামক ফিরিঙ্গীর স্কুল। এ সমস্ত স্কুলে শিক্ষানবিশী ক'রে যাঁরা উত্তরকালে কলকাতার বিত্তবান্ সমাজের শীর্ষস্থান লাভ করেছিলেন তাঁদের দু'জনের নাম বাংলা দেশের সকলেই জানেন, একজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর, আর একজন সুবিখ্যাত ধনী ও দানবীর মতিলাল শীল, এ ছাড়া কানা নিতাই সেন এবং খোঁড়া অদ্বৈত সেনও ছিলেন সাহেবদের স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। এ সমস্ত স্কুলের শিক্ষার মান ছিল একটু অদ্ভুত রকমের। যে ছাত্র যত বেশী ইংরেজী শব্দ

আয়ত্ত করতে পারত, তাকে তত বেশী শিক্ষিত বলে গণ্য করা হ'ত।

সে কালের অধ ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী সামান্য ইংরেজী শব্দের পুঁজি নিয়ে ইংরেজদের আপিসে আদালতে কাজ ক'রত, আর ইংরেজ বণিকের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত। ক্রমে ক্রমে প্রগতিশীল বাঙালীদের মধ্যেও ইংরেজী শিক্ষাকে সামগ্রিক ভাবে গ্রহণ করবার জন্যে একটা আন্তরিক আগ্রহ জেগে উঠল। কিন্তু 'নেটিভ'দের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করলে পাছে এ-দেশবাসী নতুন বিদ্যাকে গুরুমারা কাজে লাগায়, এ আশংকায় সে যুগের ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ইংরেজী শিক্ষা-প্রসারে বহুকাল উদাসীন হ'য়ে রইলেন। শিক্ষানীতি সম্পর্কে সরকারের এরূপ নিষ্ক্রিয় অবস্থা চলেছিল ১৮১১খৃঃ যাবৎ। সে বৎসর বড লাট লর্ড মিণ্টো এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্যে যে মন্তব্য (minute) লিখলেন তাতেও তিনি এ-দেশীয় শিক্ষার ওপরেই জোর দেবার কথা বললেন। এ দেশের শিক্ষার ইতিহাসে ১৮১৩ খৃঃ একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘ'টল। সে বৎসর ইংলণ্ডের কোর্ট অব ডিরেক্টার্স্ ভারত-সরকারকে দেশী শিক্ষা চর্চা প্রসারের জন্য অন্যূন এক লক্ষ টাকা খরচ করতে নির্দেশ দিলেন। ১৮১৪ খৃঃ Committee of Public Institution নামক সরকারী শিক্ষাসংস্থা গঠিত হ'লে কমিটির সভ্যগণ সে এক লক্ষ টাকা সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের মুদ্রণ, পণ্ডিতদিগের বৃত্তি এবং সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি বাবদ ব্যয় করতে শুরু করেন।

সে যুগের ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট এ দেশে ইংরেজী শিক্ষায় প্রচারবিমুখ হলেও তৎকালীন প্রগতিশীল বাঙালী সমাজ যে দেশের মধ্যে ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসারের উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে উঠেছিলেন, রামমোহন রায়ের শিক্ষাবিস্তার আন্দোলনই তার প্রথম প্রমাণ। শিক্ষাপ্রেমিক ডেভিড হেয়ার, বিচারপতি হাইড্ ইষ্ট্ (Sir Hide East) প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হ'য়ে রামমোহন ১৮১৭ খৃঃ ১৭ই জানুআরি গরানহাটায় যে মহাবিদ্যালয় বা হিন্দু কলেজ স্থাপন করবার উদ্যোগ করেন এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের ইতিহাসে সে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শুধু কলকাতায় নয়, ১৮১৫ খৃঃ শ্রীরামপুরের মিশনারীদের চেষ্টায় শ্রীরামপুরেও একটি মিশনারী কলেজ স্থাপিত হ'ল। ১৮২৪ খৃঃ হিন্দু কলেজ সরকারী অর্থে নির্মিত সংস্কৃত কলেজের পাশে একটি নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হ'ল। ১৮২৮ খৃঃ হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও এ কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। তাঁর যুক্তিবাদী শিক্ষায় এ সময় কলকাতায় সৃষ্টি হ'ল 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে অভিহিত শিক্ষিত সম্প্রদায়, এঁদের বিপ্লবমুখী সংস্কার প্রচেষ্টায় আধুনিক বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত জীবনে অনুভূত হ'ল এক বিরাট প্রাণচাঞ্চল্য। 'ইয়ং বেঙ্গল'দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, (মাইকেল) মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন প্রাচীনপন্থী, অধিকাংশ ছিলেন অবশ্য ভাববিপ্লবী নবীনপন্থী।

একদিকে সংস্কৃত কলেজের মাধ্যমে প্রাচ্য বিদ্যা, আর একদিকে হিন্দু কলেজের মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিদ্যা—এ দু'ধারায় বাংলা দেশের শিক্ষা প্রবাহিত হ'তে থাকল আরও কিছুকাল। ক্রমে ক্রমে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের জন্যে দেশের প্রগতিশীল শ্রেণীর দাবি জোরালো হ'য়ে উঠল। ১৮৩৫ খৃঃ ভারতের শিক্ষা-সচিব তাঁর ঐতি-

হাসিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় মন্তব্যে (minute) ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুপারিশ করলেন। তাঁর সুপারিশ গ্রহণ ক'রে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক কোর্ট অফ ডিরেক্টর কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থ (এক লক্ষ টাকা) ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা প্রচারের জন্য ব্যয়িত হবে ব'লে বিধি প্রচার করলেন (১৮৩৫, ৭ই মার্চ)। বাংলা দেশে ইংরেজীর মারফতে শিক্ষাব্যবস্থা স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রল। বিপ্লবপন্থী 'ইয়ং বেঙ্গল' সর্বান্তঃকরণে এ শিক্ষাব্যবস্থাকে অভিনন্দন জানালেন। শুধু যে তাঁরা এই নব-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাকে স্বাগত জানালেন তা নয়, ভারতীয় সাহিত্য ও শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে তাঁরা মেকলের মতোই উন্নাসিক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে আত্মশ্লাঘায় স্ফীত হ'য়ে উঠলেন। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন:

তাঁহারা যে কেবল ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া সর্বত্র ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহা নহে; তাঁহারাও মেকলের ধুয়া ধরিলেন। বলিতে লাগিলেন যে—'এক সেলফ্ ইংরাজী গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ বা আরবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই।' তদবধি ইঁহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন, সেকস্পীয়র সেস্থলে অধিষ্ঠিত হইলেন, মহাভারত, রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া Edgeworth's tales সেই স্থানে আসিল। বাইবেলের সমক্ষে বেদ বেদান্ত গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না।

[দ্রষ্টব্য: রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ— পৃঃ ১৪২।]

সরকারী শিক্ষাসংস্কারের পূর্বেই কিন্তু হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান্ শিক্ষক ডিরোজিওর শিক্ষা 'ইয়ং বেঙ্গল'দের অন্তরে বিপ্লবের আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। শুধু মাত্র অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে ডিরোজিও যে তাঁর ছাত্রদের অন্তরে স্বাধীন চিন্তা জাগিয়ে দিয়েছিলেন তা নয়, ছাত্রদের নিয়ে 'অ্যাকাডেমিক এসোশিয়েশন' স্থাপন ক'রে বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমেও তিনি এ স্বাধীন চিন্তা-প্রবৃত্তিকে তীব্রতর ক'রে তুললেন। এ স্বাধীন চিন্তা যে সর্বাংশে সুফলপ্রসূ হয়েছিল, তা বলা চলে না। সমাজ- ও ধর্ম-সংস্কারের উন্মাদনায় তাঁদের ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ জীবনে প্রবল প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দিল। প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ মাংস ভোজন ও সুরাপান, জাতীয় জীবনে যা কিছু পুরাতন ও সনাতন—তার প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন তাঁদের সংস্কার-প্রচেষ্টার প্রধান বৈশিষ্ট্য রূপে পরিগণিত হ'ল। এদিকে ডাফ্, ড্রিয়াল্টি প্রভৃতি মিশনারীগণ অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে যে শুধু খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে লাগলেন তা নয়, প্রকাশ্য সভাসমিতি ক'রে খৃষ্টধর্মের মহিমা কীর্তনে তৎপর হলেন। হিন্দু কলেজের হিন্দু সভ্যগণ এ সমস্ত কারণে শংকিত হ'য়ে প্রথমে ছাত্রদের উন্মার্গগামী করবার অপরাধে ডিরোজিওকে পদচ্যুত করলেন, তারপর খৃষ্টীয় ধর্মসভায় ছাত্রদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ ব'লে আদেশ প্রচারিত হ'ল। হিন্দু সমাজের মুখপাত্র রাজা রাধাকান্ত দেব ইংরেজী শিক্ষিতদের মানসিক স্থিতিস্থাপকতা ও স্বধর্মে আস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্যে 'ধর্মসভা' নামে এক সভা স্থাপন করলেন। কলকাতার স্থানে স্থানে তার শাখা স্থাপিত হ'ল, এবং তাতে সনাতন হিন্দুধর্মের মহিমা কীর্তিত হ'তে লাগল।

রাজা রাধাকান্ত দেব ছাড়াও সনাতন হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে যাঁরা সেই অনিশ্চয়তার যুগে অগ্রণী হয়েছিলেন তার মধ্যে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন রামমোহন। কারণ রামমোহনই ছিলেন সে যুগে যুক্তিবাদী ধর্মান্দোলনের প্রধান উৎসাহ-

দাতা। রামমোহন প্রাচীনপন্থীদের 'চ্যালেঞ্জ'কে গ্রহণ ক'রে যে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা সকলেরই সুপরিজ্ঞাত। তারপর প্রাচীনপন্থীদের আক্রমণের সুতীক্ষ্ণ শরগুলি নিক্ষিপ্ত হ'তে লাগল ভাববিপ্লবী 'ইয়ং বেঙ্গল'-দের প্রতি। 'ইয়ং বেঙ্গল'ও এ আক্রমণের জবাব দিতে দেরি করলেন না। প্রাচীনপন্থীদের দ্বারা গৃহতাড়িত ও লাঞ্ছিত হ'য়ে হিন্দু কলেজের অন্যতম কৃতী ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'Inquirer' নামে সংবাদপত্র প্রকাশ ক'রে প্রাচীনপন্থীদের প্রতি তীব্র বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। এ পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে নব-তন্ত্রের বিপ্লবী হিন্দুরাও দলবদ্ধ হ'তে লাগলেন। ১৮৩২ খৃঃ ২৩শে আগষ্ট Inquirer পত্রিকাতে একটা চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হ'ল : ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তি—মহেশচন্দ্র ঘোষ খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। প্রাচীনপন্থীরা এ ধর্মান্তরের সংবাদ পেয়ে শিউরে উঠলেন। সে বছরের ১৭ই অক্টোবর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেন। জনরব প্রচারিত হ'ল হিন্দু কলেজের সমস্ত ভাল ভাল ছাত্র খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হবে। এতে প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজের মনে আরও ভীতির সঞ্চার হ'ল। কিছুকাল পরে প্রতিভাবান্ 'ইয়ং বেঙ্গল' মধুসূদন দত্ত এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরও খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। সনাতনপন্থী হিন্দুরা অনুভব করতে লাগলেন এ ধর্মান্তরের স্রোতকে বাধা না দিলে হয়তো বা বাঙালীর জাতীয় সত্তাই বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে। এ সনাতনপন্থী হিন্দুদের অনেকেই ছিলেন উদার মনোভাবের অধিকারী। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাতে এ সমাজবিধ্বংসী প্রভাব দেখে তাঁরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, জাতীয় জীবনে এ বিজাতীয় স্রোতকে বাধা দিতে হ'লে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে যার ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপ্লবপন্থীরা আত্মস্থ হবে, দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে, এবং সমন্বয়ের ভিত্তিতে এমন একটা উদার জাতীয় সংস্কৃতি সৃষ্টি করবে, যে সংস্কৃতি এনে দেবে বাঙালীর গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত জীবনের মুক্তির ইঙ্গিত। যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এ বিপরীত ভাবস্রোতের মধ্যে জাতীয় শ্রেয়োবোধের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তিনি হলেন চিন্তাশীল ও কর্মবীর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং যে সাংস্কৃতিক সংস্থার মাধ্যমে সে যুগের বিভ্রান্ত বাঙালী শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে একটা কল্যাণময় সত্য-পথের ইঙ্গিত পেল, সে প্রতিষ্ঠানের নাম—'তত্ত্ববোধিনী সভা'।

॥ ২ ॥

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী। আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি- ও সাহিত্য-বিকাশের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। এ বাড়ীরই কৃতী সন্তান দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম ইংরেজী-শিক্ষিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ব্যবসাক্ষেত্রে তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা সর্বপ্রথম বাঙালীকে বিদেশাগত ইংরেজদের নিকট সম্পর্কে এনে দিল। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সে সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর যুগে এ প্রগতিশীল মানুষটি ইংলণ্ডে গিয়ে নিজের ধনৈশ্বর্যের দীপ্ত গৌরবে বলদৃপ্ত ইংরেজের চোখে সে যুগের বাঙালীর আভিজাত্য-গৌরবকে বাড়িয়ে দেন শতগুণ। ইংরেজী শিক্ষা-প্রচারের প্রথম যুগে রামমোহনের দক্ষিণ বাহু ছিলেন দ্বারকানাথ। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবল সোসাইটি, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহু জাতীয় কল্যাণমূলক কাজের জন্য তাঁর মুক্তহস্তে দানের কথা বাঙালী চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে।

বন্ধু রামমোহনের মতো ধর্মমতের ক্ষেত্রে দ্বারকানাথও প্রগতিবাদী, রামমোহনের নব-

উপলব্ধ মানবতাবাদী ধর্মবোধের তিনি একজন প্রধান সমর্থক। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু মানসপ্রকৃতির দিক দিয়ে পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দু কলেজের শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু হিন্দু কলেজের শিক্ষায় সে যুগের ইংরেজী-শিক্ষিতদের জীবনে বিপ্লবের যে ঢেউ উঠেছিল, সে ঢেউ স্থিতধী দেবেন্দ্রনাথকে ভাসিয়ে নিতে পারেনি। সমসাময়িক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবল ভাবাবর্তের মধ্যে বাস করেও তাঁর মনে দেশীয় প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ছিল অটুট। কর্মক্ষেত্রে পিতার অসাধারণ ক্ষমতা হয়তো তাঁর ছিল না, কিন্তু বেদান্তবাদী হয়েও বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি যে মোটেই উদাসীন ছিলেন না, তার প্রমাণ আছে। পিতার বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়েও বিষয়-বাসনা দেবেন্দ্রনাথের স্বভাবশুচি মনকে কখনও প্রলুব্ধ করতে পারেনি। উপনিষদের ঋষিদের সত্যধর্ম ও জীবনাদর্শ তাঁর সমস্ত চিন্তাকে জাগ্রত করেছিল, আর উন্মোচিত করেছিল তাঁর মোহমুক্ত দৃষ্টির সামনে এক আদর্শ জীবনলোক।

সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এই মহৎপুরুষের মন সমসাময়িক ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকদের উচ্ছৃঙ্খল জীবন-উন্মাদনা দেখে যে ব্যথিত ও পীড়িত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। স্বজাতি- ও স্বদেশ-প্রেমিক দেবেন্দ্রনাথ তখন অন্তরের গভীরে অনুভব করতে লাগলেন জাতীয় সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠায় এমন কোন সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে, যার সাহায্যে সমসাময়িক ইংরেজী শিক্ষায় বিভ্রান্ত বাঙালী যুবকেরা আত্মস্থ হবে—আর সৃষ্টি করবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বিত আদর্শে এক নব্য সংস্কৃতির। বাঙালী সংস্কৃতির নতুন রূপদান-পরিকল্পনায় দেবেন্দ্রনাথের চিন্তা যখন কুয়াশাচ্ছন্ন, রামমোহনের মৃত্যু হয়েছে তখন সুদূর ইংলণ্ডের ব্রিস্টল শহরে (১৮৩৩ খৃঃ ২৩শে সেপ্টেম্বর)। তিনি জীবিত থাকলে সে যুগের বাঙালীর জাতীয় জীবনের কেন্দ্রচ্যুতির কথা দেবেন্দ্রনাথকে হয়তো এত ভাবতে হ'ত না, এ জন্য যে বিরোধী শক্তির সঙ্গে বিরামহীন সংগ্রাম ক'রে জাতীয় জীবন-সংস্কৃতিকে একটা আদর্শলোকে পৌছিয়ে দেবার প্রচেষ্টায় রামমোহনের ক্ষমতা ছিল তুলনাহীন। স্বদেশে থাকতে ও বিলাতে গিয়ে রামমোহনের বেদান্তচর্চার উদ্দেশ্যও ছিল বিশ্ববাসীর সামনে সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির গৌরবকে নতুন ক'রে তুলে ধরা। তাঁর অকালমৃত্যুতে এ মহৎ প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত ঘ'টল। চিন্তাশীল দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের অনুসৃত শাস্ত্র-বিচারের পথেই জাতীয় সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের ইঙ্গিত খুঁজে পেলেন। তিনি অনুভব করলেন বেদান্তচর্চার মাধ্যমে রামমোহন যে জীবন-সত্যের সন্ধান করেছিলেন, সে মহত্তম সত্যোপলব্ধিকে বিভ্রান্ত জাতির সামনে পুনরায় উপস্থিত করা প্রয়োজন। এ ছাড়া হিন্দু কলেজের শিক্ষার ফলে ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল পরিণাম দেখে তিনি এ সিদ্ধান্তেও উপনীত হলেন যে, দেশীয় কৃতবিদ্য লোকের পরিচালনায় দেশের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হ'লে উৎকেন্দ্রিক বাঙালী জীবনকে জাতীয়তার পাদপীঠে স্থাপন করবার আশা বৃথা। তাঁর পরিকল্পিত জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা, অথচ সে বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা হ'তে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিষয়ও বাদ যাবে না। দেশবাসীর বিচার-বিমূঢ় চিত্তের সঙ্গে সনাতন ভারতীয় শাস্ত্রের সত্যোপলব্ধির মিলন ঘটাবার উদ্দেশ্যে প্রাচীন শাস্ত্রের অনুশীলনের জন্যে প্রতিবৎসর চারজন ক'রে ছাত্রকে কাশীতে প্রেরণ করাও তাঁর নবপরিকল্পিত

শিক্ষাব্যবস্থার একটা প্রধান অঙ্গ ব'লে বিবেচিত হ'ল।

এ সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্যকে কার্যে রূপ দেবার জন্যে দেবেন্দ্রনাথ নিজ পরিবার এবং আত্মীয় স্বজনের মধ্য হ'তে মাত্র দশজন সভ্য সংগ্রহ ক'রে ১৮৩৯ খৃঃ ৬ই অক্টোবর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে একটি সভার প্রতিষ্ঠা করলেন, যার নাম দেওয়া হ'ল প্রথমে 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'। সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে সভার প্রধান উপদেষ্টা রামমোহনের সহকর্মী রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পরামর্শে ঐ সভার নাম পরিবর্তন ক'রে নতুন নামকরণ করা হ'ল 'তত্ত্ববোধিনী সভা'।

প্রধানতঃ ধর্মালোচনা ও ধর্মপ্রচারের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সঙ্গে ইতঃপূর্বে প্রতিষ্ঠিত 'ধর্মসভা'র পার্থক্য ছিল মৌলিক। সনাতন হিন্দুধর্মপন্থীদের ও 'ধর্মসভার' দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অনেকটা একপেশে (parochial)। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে গঠিত হয়েছিল ব'লে সে ধর্মসংস্থা সে যুগের ধর্ম- ও সমাজ-জীবনের ভাঙন প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ বাধা দিতে পারেনি। কিন্তু 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সভ্যেরা সংস্কারমুক্ত ও সত্যান্বেষী দৃষ্টি দিয়ে ধর্মের ক্ষেত্রে যে নতুন আদর্শ স্থাপন করলেন তার ফলে সমসাময়িক প্রবল বিরুদ্ধ ধর্মস্রোতকে বাধা দেওয়া সহজ হ'ল। এ দিক থেকে বিচার করলেও সে যুগে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই।

শুধুমাত্র বিরুদ্ধ প্রবল ধর্মস্রোতকে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে নয়, তদানীন্তন বাংলাদেশের সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতির নবজাগরণের ইতিহাসে একটা গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল 'তত্ত্ববোধিনী সভা', তা ক্রমশঃ আলোচ্য।

॥ ৩ ॥

স্বদেশীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও প্রসারের চেষ্টায় মনীষী দেবেন্দ্রনাথের এ মহৎ উদ্দেশ্য সমকালীন ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি শীঘ্রই আকর্ষণ ক'রল। ১৮৪০ খৃঃ হ'তে এর সভ্য-সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগল। ঐ বৎসর সভার সভ্য-সংখ্যা ছিল মাত্র ১০৫ জন, কয়েক বছরের মধ্যেই সে সংখ্যা বেড়ে হ'ল ৮০০ জন। এই সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান সমকালীন ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী মহলে কতটা জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল এর সভ্যসংখ্যা-বৃদ্ধিই তার অন্যতম প্রমাণ।

সভার কাজে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে দেবেন্দ্রনাথকে সাহায্য করতে লাগলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : শ্যামাচরণ শর্মা সরকার, ডাক্তার দুর্গাচারণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, রমাপ্রসাদ রায়, অমৃতলাল মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, আনন্দকৃষ্ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তবে প্রকৃতপক্ষে এ সভার নায়ক ছিলেন চার জন : (১) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (২) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, (৩) অক্ষয়কুমার দত্ত ও (৪) রাজনারায়ণ বসু। অবশ্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ছিলেন সভার প্রধান উপদেষ্টা ও আচার্য।[১] কি ক্ষুরধার ব্যক্তিত্বে, কি মনীষায়, কি তীক্ষ্ণ সমাজচেতনায়, কি সংস্কৃতি-প্রসারে সমসাময়িক বাংলা দেশে এঁদের স্থান কোথায়, সে আলোচনা বোধ হয় এখানে নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীযোগানন্দ দাস ১৩৪৫ সনের চৈত্র-সংখ্যা প্রবাসীতে 'তত্ত্ববোধিনী সভার' ৬৪ জন সদস্যের নাম উল্লেখ করেছেন। এ তালিকা হ'তে দেখা যাবে—এ সমস্ত সভ্যের অধিকাংশ বাংলা দেশের

১ যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্যসাধক-চরিতমালা—৩য় খণ্ড, ২৩ পৃষ্ঠা।

'রেনেসাঁ'র প্রধান নায়ক। নিম্নে সে তালিকা হ'তে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হ'ল: পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, নবগোপাল ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায, গঙ্গাচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ দত্ত, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, নন্দকিশোর বসু, কেশবচন্দ্র সেন, শিবচন্দ্র দেব, দিগম্বর মিত্র, দ্বারিকানাথ ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত।

এ তালিকা পাঠে এ কথা স্পষ্ট হবে সমকালীন বাংলা দেশের প্রতিভাবান্ কবি, লেখক, মনীষী, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, এমনকি চর্যাসম্পন্ন ভূস্বামী পর্যন্ত—একই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন পাশ্চাত্য ভাবস্রোতে ভাসমান বাংলা দেশকে ভারতীয় ঐতিহ্যের পটভূমিকায় আধুনিকতার পাদপীঠের ওপর স্থাপিত করবার জন্যে। এ রঙ্গমঞ্চে অভিনেতাদের প্রধান নায়ক অবশ্য মনীষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরিবর্তিত অবস্থায় বাঙালী সংস্কৃতির নব রূপ দান করবার এরূপ প্রচেষ্টা বাংলা দেশে বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' প্রতিষ্ঠার আগে আর দেখা যায়নি।

॥ ৪ ॥

শিক্ষা, সাহিত্য ও ধর্ম—এক কথায় জাতীয়তার ভিত্তিতে বাঙালী সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের যে বিপুল প্রয়াস উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে সক্রিয় হ'য়ে উঠেছিল এবং অবশেষে সমন্বয়ের ভিত্তিতে যে নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতি রচনা সম্ভব হয়েছিল, তার প্রাথমিক সূচনা দেখি আমরা 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র ত্রিবিধ কার্যক্রমের ভেতর। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রবল বিরুদ্ধ শক্তিকে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হওয়ায় তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যধারার ভেতর হয়তো বা কিছু প্রতিক্রিয়াশীলতা ছিল ব'লে মনে হবে (যেমন, বেদাধ্যয়নের জন্য কাশীতে ছাত্র প্রেরণ), কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে তত্ত্ববোধিনী সভার অস্তিত্বের বিশ বৎসর অর্থাৎ ১৮৩৯ থেকে ১৮৫৯ খৃঃ যাবৎ বাঙালী সংস্কৃতির সৃজ্যমান যুগ।

তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথম কাজ হ'ল জাতীয়তার ভিত্তিতে একটি পাঠশালার প্রতিষ্ঠা। সৃজ্যমান বাঙালী সংস্কৃতির যুগে এ পাঠশালা-প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য কতখানি তা বুঝতে হ'লে সে যুগের শিক্ষাব্যবস্থার একটু পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠার আগেই দেশীয় বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা শুরু হ'য়ে গেছে। এ ছাড়া কিছু কিছু দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়োগের নীতিও গৃহীত হয়েছে। এ অবস্থায় বিদেশী ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে দেশবাসীর মন যে উন্মুখ হ'য়ে উঠবে—এ তো খুবই স্বাভাবিক। শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীর ওপর বেশী জোর দেওয়াতে দেশের বাংলা পাঠশালা ও মাতৃভাষা শিক্ষার যে খুবই দুরবস্থা হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। সমসাময়িক একচক্ষু শিক্ষাকে এই ত্রুটি থেকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধে একটি পাঠশালা স্থাপন করলেন ১৮৪০ খৃঃ ১৮ই জানুআরি। এ বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান

উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মাধ্যমে ইওরোপীয় ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। এ পাঠশালার আদর্শই মনীষী দেবেন্দ্রনাথ ও তত্ত্ববোধিনী সভার কর্মকর্তাদের অনুপ্রেরণা দিল অনুরূপ একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ক'রে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে দেশী-বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার করতে। এ ছাড়া ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের মনে যাতে দেশীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জাগরিত হয়, এ নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সেদিকেও দেবেন্দ্রনাথ ও তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদের দৃষ্টি রইল সদা জাগ্রত। এ উদ্দেশ্য নিয়ে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠার এক বৎসরের মধ্যেই ১৮৪০ খৃঃ ১৩ই জুন তারিখে *'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'* প্রতিষ্ঠিত হ'ল কলকাতার সিমলা অঞ্চলে। সভার অন্যতম সদস্য অক্ষয়কুমার দত্তের মতো সুপণ্ডিত ব্যক্তি প্রথম থেকেই পাঠশালার শিক্ষা-দান-কার্যে ব্রতী ছিলেন। কিন্তু সমস্যা হ'ল পাঠ্যপুস্তক নিয়ে। ইতঃপূর্বে হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ নিজ পাঠশালার জন্যে যে সমস্ত বই কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের দ্বারা বাংলায় লিখিয়েছিলেন, তাদের ভেতর যাতে প্রাচ্য দর্শন, রীতিনীতি, বা ভাবধারা স্থান না পায় সেইটেই ছিল তাদের বিমাতা-সুলভ দৃষ্টি। তত্ত্ববোধিনী সভার প্রধান নায়ক দেবেন্দ্রনাথ দেখলেন, এ সমস্ত বইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে তা হবে সভার আদর্শের পরিপন্থী। সেজন্য দেবেন্দ্রনাথ নিজেই নতুন ধারায় পাঠ্যপুস্তক রচনায় অগ্রসর হলেন। ছাত্রদের পাঠোপযোগী বাংলা ভাষায় একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ তিনি রচনা করলেন। পাঠশালার অন্যতম শিক্ষক অক্ষয়কুমার দত্তও ভূগোল, অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে বাংলায় পাঠ্য বই রচনা করলেন। এ সমস্ত বই 'পাঠ-শালা'র ছাত্রদের পাঠ্য হিসেবে নির্ধারিত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য 'ধর্মতত্ত্ব' পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল। এ ভাবে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বাংলা দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা নতুন আদর্শের সন্ধান দিল।

কিন্তু উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষা অর্থকরী বিদ্যার অনুকূল না হওয়ায়, এবং শিক্ষার সময় (সকাল ৬টা হ'তে ৯টা) ছাত্রদের পক্ষে অসুবিধাজনক হওয়ায় পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে লাগল। এ সমস্ত কারণে 'পাঠশালা' কলকাতায় তিন বছরের বেশী চ'লল না। কর্তৃপক্ষ তখন পাঠ-শালার কার্যক্রমের কিছু পরিবর্তন ক'রে এই নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়কে হুগলী জেলার অন্তর্গত *বংশবাটী নামক গ্রামে স্থানান্তরিত করলেন।* পল্লীবাসীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারই বিদ্যালয় স্থানান্তরের প্রধান উদ্দেশ্য ব'লে ঘোষিত হলেও আসলে কলকাতার ইংরেজী স্কুলগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতার সামর্থ্যের অভাবই এই স্থানান্তরের প্রধান কারণ ব'লে মনে হয়। পাঠ-শালার স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যক্রমেরও কিছু পরিবর্তন সাধিত হ'ল: 'ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় উপযুক্ত-মত বৈষয়িক বিদ্যা, বিজ্ঞান শাস্ত্র এবং ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা হইল।'[২] বংশবাটীতে'পাঠশালা'র প্রতিষ্ঠা-উৎসব-বক্তৃতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্ত উভয়েই শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশীয় আদর্শের প্রয়োজনীয়তা এবং মাতৃভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র শিক্ষাদানই যে পাঠশালার প্রধান উদ্দেশ্য, সে সম্পর্কে সকলকে অবহিত হ'তে বলেন।[৩]

'পাঠশালা'র দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক বিবরণে প্রকাশ—বংশবাটীর বিদ্যালয়েও ছাত্রসংখ্যা ১২৭

২ যোগেশচন্দ্র বাগল—সাহিত্যসাধক চরিতমালা—৩য় খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।

৩ দ্রষ্টব্য: তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা- আশ্বিন, ১৭৬৫ শক।

জনের বেশী হয়নি। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা যত কমই হ'ক, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার পঠন-রীতি ও শিক্ষার মান যে অত্যন্ত উন্নত ছিল তৎকালীন সরকারী শিক্ষা-পরিষদও (Council of Education) তা স্বীকার না ক'রে পারেননি।

আরও তিন বৎসর পাঠশালাটি বাঁশবেড়েতে কৃতিত্বের সঙ্গে চলেছিল। কিন্তু 'কার ঠাকুর কোম্পানি' ও 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে'র পতনের ফলে 'পাঠশালা'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক দেবেন্দ্রনাথ আর প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করতে সক্ষম না হওয়ায় ১৮৪৬ খৃঃ পাঠশালার কাজ একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের বিস্তীর্ণ পটভূমিকায় 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'র শিক্ষাবিস্তার-প্রয়াস আজ অনেক পাঠকের নিকট হয়তো নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে হবে, কিন্তু এখানে শিক্ষা-বিস্তারের কথাটাই বড় নয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেকালের ইংরেজী শিক্ষানবীশ বাঙ্গালীর উৎকেন্দ্রিকতাকে সুস্থ মানসবৃত্তিতে রূপান্তরিত করবার জন্যে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যেরা তাঁদের সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়েও কতটা নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হয়েছিলেন তা দেখাবার উদ্দেশ্যেই এ দীর্ঘ প্রসঙ্গের অবতারণা।

॥ ৫ ॥

হিন্দু কলেজের শিক্ষিত 'ইয়ং বেঙ্গল' যখন পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি মন্থন ক'রে বাংলা দেশে নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতি রচনা-প্রস্তুতির জন্য ব্যস্ত, সে সময় তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথের অর্থব্যয় ক'রে কাশীতে বেদবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য ছাত্রপ্রেরণ কতকটা প্রতিক্রিয়াশীলতার লক্ষণ ব'লে মনে হবে। কিন্তু মনীষী দেবেন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন, যে শিক্ষা বিদ্যার্থীকে স্ব-ধর্ম ও স্বদেশীয় সংস্কৃতি বিমুখ ক'রে তোলে সে শিক্ষা মূল্যহীন। সেজন্য দেবেন্দ্রনাথ নিজে উদ্যোগী হ'য়ে হিন্দুর সনাতন শাস্ত্র বেদবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য তিন জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কাশী প্রেরণ করেন ১৭৬৬ শকে (১৮৪৪-৪৫ খৃঃ)। এঁরা যে শুধু বেদের বিভিন্ন অংশ পাঠ করেছিলেন তা নয়, টীকা-সমেত উপনিষদ্‌ও এঁরা ভাল ক'রে পাঠ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে আনন্দচন্দ্র (ভট্টাচার্য) বেদান্তবাগীশ পরবর্তীকালে বাংলা দেশের সংস্কৃতি-বিকাশের ইতিহাসে বেদচর্চা ও আলোচনার দ্বারা তাঁর দীপ্ত প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহ পেয়ে মনীষী রাজনারায়ণ উপনিষদের ইংরেজী তর্জমা করেন। এ ছাড়া দেবেন্দ্রনাথ নিজেও হিন্দুশাস্ত্রের মূলসমেত কিছু কিছু অনুবাদ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত ক'রে হিন্দু-ধর্ম সম্পর্কে বিশ্ববাসীর ঔৎসুক্য জাগ্রত করেন। তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে এবং মনীষী দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এ সমস্ত আলোচনা-গবেষণার ফলে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি শুধু উৎকেন্দ্রিক কালচার-বিলাসী বাঙালীর নয়, ভারতের এবং বিদেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও সশ্রদ্ধ হ'য়ে ওঠেন। এভাবে তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে বাংলা দেশে বেদচর্চা বাঙালীর সংস্কৃতি-বিকাশে পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছিল, সন্দেহ নেই।

॥ ৬ ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বাঙালী সংস্কৃতি-বিকাশে যে ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল তা বাঙালী মাত্রেরই স্মরণ-যোগ্য। কি সাংবাদিকতা, কি সাহিত্য, কি সমাজ-সংস্কার, কি ইতিহাস-চেতনা, কি বিজ্ঞানানুরাগ—সংস্কৃতির প্রায় সকল ক্ষেত্রেই 'সভা'র মুখপত্র এই সংবাদপত্রখানি যে উচ্চ মান স্থাপন

ক'রল, বাংলা দেশে তা অভূতপূর্ব। বহুবিস্তৃত বিস্তার বিচিত্র ক্ষেত্রে এ সংবাদপত্রের লেখকদের অবাধ সঞ্চরণ বাঙালী মানসিকতাকে আধুনিকতার তোরণে উত্তীর্ণ ক'রে দিল, এ পত্রিকার আলোচনা-গবেষণার মাধ্যমে বাঙালীর স্বদেশ-চেতনাও একটা সৃষ্টিধর্মী রূপ পেল। এ পত্রিকার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী সে যুগের ইংরেজী-শিক্ষিতদেরও অনুপ্রাণিত ক'রল নিজেদের চিন্তাপ্রসূত বিষয়গুলিকে রূপ দিয়ে পত্রিকাখানিকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলবার জন্যে। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির মোড় ঘুরে গেল। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রেখেও প্রাচ্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হ'য়ে উঠল এ পত্রিকার ইংরেজী-শিক্ষিত পাঠকেরা।

পত্রখানির প্রভাব ছিল দ্বিবিধ : একদিকে এ পত্রিকা নব্যশিক্ষিত বাঙালীর জড়বাদী দৃষ্টিকে অধ্যাত্মমুখী ক'রে তুলল, আর একদিকে ভাবপ্রবণ বাঙালী মানসকে যুক্তিবাদের কঠোর ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠা ক'রে আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি-রচনার অগ্রদূত হয়েছিল এই জ্ঞানগর্ভ সংবাদপত্র। 'গুপ্ত কবি'র সুবিখ্যাত 'সংবাদ প্রভাকরে'র সঙ্গে এ পত্রিকার পার্থক্য ছিল মৌলিক। 'গুপ্ত কবি'র 'সংবাদ প্রভাকর' যেখানে সমসাময়িক কাব্যকবিতার অন্যতম উৎসাহদাতা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সেখানে কাব্যকবিতা প্রকাশের প্রতি একান্তভাবে বিমুখ। 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদকেরা ছিলেন অনেকেই সংস্কারক, তাই সাহিত্যসৃষ্টিমূলক রচনা অপেক্ষা লোকহিতকর রচনাই যে সে পত্রিকায় প্রাধান্য পাবে, তা খুবই স্বাভাবিক। এ পত্রিকার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে সুসাহিত্যিক যোগেশচন্দ্র বাগল বলেন: শিক্ষায় স্বাবলম্বন, মিশনারীদের আক্রমণ হইতে স্ব-ধর্ম ও স্ব-ধর্মীদের রক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা, সুরাপান-নিবারণ, শারীরিক শক্তির উন্মেষ, নীলকরের অত্যাচার, রাজা-প্রজার সম্বন্ধ-নির্ণয়, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বঙ্গবাসীদের অনুপ্রেরণা দিয়াছিল।[৪]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ এবং প্রথম সম্পাদক বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সুলেখক অক্ষয়কুমার দত্ত—সে যুগের পক্ষে বলা যায় মণি-কাঞ্চন সংযোগ। এ পত্রিকার মান যে কত উন্নত ছিল, তা বোঝা যায় প্রবন্ধ-নির্বাচন-ব্যাপারে। এশিয়াটিক সোসাইটির অনুসরণে একটি গ্রন্থ-কমিটি (Paper Committee) স্থাপন ক'রে দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যেকটি প্রকাশযোগ্য রচনাকে কমিটি দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নেবার রেওয়াজ প্রবর্তন করেন। গ্রন্থ-কমিটির সদস্যরাও ছিলেন সে কালের সেরা লেখক, যেমন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি। রচনা নির্বাচন-ব্যাপারে এ গ্রন্থ-কমিটির মতামতই ছিল চূড়ান্ত। এমনও হ'ত, কোন কোন সময় গ্রন্থ-কমিটি রচনা-প্রকাশ-ব্যাপারে পত্রিকা-প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথের মতামত পর্যন্ত অগ্রাহ্য করছেন। ব্যক্তি-ও মতামত-নিরপেক্ষ এ রচনা-নির্বাচনপ্রথা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-কে যে সর্বজনসমাদৃত ও শ্রদ্ধেয় ক'রে তুলেছিল তা নিঃসন্দেহ।

প্রধানতঃ ব্রহ্মবিদ্যা-প্রচারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাখানি। প্রকাশের প্রথমাবস্থায় অধ্যাত্মবিষয়ক আলোচনা রচনায় প্রাধান্য লাভ করলেও যুক্তিবাদী পণ্ডিত অক্ষয়কুমারের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ক্রমে পত্রিকার মেজাজ পরিবর্তিত হ'তে শুরু করে। তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় অধ্যাত্মবিষয় ছাড়াও যুক্তিবাদী জ্ঞানবিজ্ঞান-বিষয়ক বিচিত্রধর্মী রচনা

৪ যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্যসাধক চরিতমালা—৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৫।

পত্রিকার পৃষ্ঠায় স্থান পেতে শুরু করে। বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী দেবেন্দ্রনাথ ঐ সমস্ত রচনা পছন্দ করুন আর না করুন, গ্রন্থ-কমিটির সুচিন্তিত মতামতের ওপর তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। অবশ্য মত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ নিজেও যখন 'যুক্তিবাদী' হ'য়ে পড়েন তখন ঐ শ্রেণীর রচনা-প্রকাশে তাঁর আর কোন দ্বিধা দেখা যেত না। পত্রিকায় রচনা-প্রকাশে শেষ পর্যন্ত অক্ষয়কুমারের মতামতই জয়ী হ'ল। বস্তুতঃ তাঁর সম্পাদনা-কালেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সমৃদ্ধি হয়েছিল সব চাইতে বেশী।

জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক কত বিভিন্ন বিষয়ে কত জ্ঞানগর্ভ রচনা প্রকাশিত হ'য়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সে যুগের ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর রুচি ও জ্ঞান-পিপাসাকে তৃপ্ত করতে পেরেছিল বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত কতগুলি প্রবন্ধের শীর্ষনাম থেকেই তার একটা পরিচয় পাওয়া যায়।[৫] এ তালিকায় অবশ্য অধ্যাত্মবিষয়ক সমস্ত রচনা বাদ দেওয়া হয়েছে :

অদ্ভুত কীটাণু ; অয়স্কান্তমণি , অলৌকিক রাসায়নিক , অসভ্য জাতির অদ্ভুত ভাব ও রীতি , অসভ্য জাতিগণের সৌন্দর্যের ভাব , অশোকচরিত , আকবর সাহার ধর্মবিষয়ক মত , আগ্নেয়গিরি ; আগ্নেয় গোধা , আত্মদর্শন—ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব , আদিম মনুষ্য , আন্দামান দ্বীপবাসীদিগের বৃত্তান্ত ; পার্বত্যজাতির নীতিশাস্ত্র ; আর্যজাতির উপনিবেশ , আর্যবংশের আদি ধর্ম ; * * * সমুদ্রযাত্রা (প্রাচীন হিন্দুদিগের), সিন্ধুঘোটক, সিপিয়া মৎস, শূদ্রদিগের বেদপাঠে অধিকার বিষয়ে প্রমাণ, হিমশিলা, হীরক। ইংরেজীতে : A Bengali in Germany, Famine Relief--Letter dated about 1861, Female seclusion, Philosophy and religion from Cousin (দ্রষ্টব্য : ইংরেজীতে অধিকাংশ রচনা এবং পত্রের উত্তর ধর্মবিষয়ক)।

তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তত্ত্ববোধিনীর বিভিন্ন সম্পাদক ও লেখকেরা আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রথম যুগে এমন সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা-গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন যা এ কালের প্রগতিশীল সংস্কৃতির যুগেও আমাদের অনেক পত্রপত্রিকায় কম দেখা যায়। বিষয়গুলির শ্রেণীবিভাগ করলে দেখা যাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিষয়ক নিম্নোদ্ধৃত বিষয়গুলি তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছিল :

উদ্ভিদবিদ্যা, জ্যোতিষ, ভূবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, দর্শন, ভূগোল, প্রাচীন কীর্তি—স্থাপত্য, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা, প্রকৃতি বিজ্ঞান, জীববিষয়ক আলোচনা, পদার্থবিদ্যা, কীটতত্ত্ব, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, রাজা-প্রজা-বিষয়ক আলোচনা, পশুবিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা (Zoology), পৃথিবীতত্ত্ব, সমরতত্ত্ব, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি, ভাষাতত্ত্ব, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, জ্ঞান ও ধর্মের তুলনামূলক বিচার, প্রাচীন শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সুদীর্ঘ বারো বৎসর (১৮৪৩-১৮৫৫ খৃঃ) যাবৎ এ পত্রিকার সম্পাদনা করেন জ্ঞানতাপস অক্ষয় কুমার দত্ত। তাঁর সম্পাদনা-কালেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শুধু যে বিষয়বৈচিত্র্য লাভ করেছিল তা নয়, সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালীর জ্ঞান-স্পৃহা সম্পর্কে জাগ্রত কৌতূহলকেও পরিতৃপ্ত করেছিল। সেকালে এ পত্রিকাখানির জনপ্রিয়তার অন্যতম নিদর্শন হ'ল—তাঁর সময়ে গ্রাহক-সংখ্যার আশাতীতরূপে বৃদ্ধি। এ সম্পর্কে "অক্ষয়-চরিতকার" নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস ও মনীষী দেবেন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

'অক্ষয়বাবুর চেষ্টায় ইহাতে ধর্মবিষয় ব্যতীত সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্বাদি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয়গুলি আলোচিত হইতে আরম্ভ হয়।' (দ্রঃ—অক্ষকুমার-চরিত—পৃঃ ১৯-২১)।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক ছিল, তাহা কেবল এক অক্ষয়বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময় পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না।' [দ্রষ্টব্য : ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—পৃঃ ২১]

৫ এই নির্বাচিত রচনার নামগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১ম হ'তে ৯ম কল্পের নির্ঘণ্টপত্র থেকে সংগৃহীত—লেখক।

অক্ষয়কুমার দত্তের ক্লান্তিহীন প্রয়াস ও মনীষার স্পর্শে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশের সাংবাদিকতা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ধর্মালোচনা এক কথায় সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্র কর্ষণ ক'রে বাঙালী মানসিকতার অনুর্বর ভূমিতে যে একটা যুগান্তরের সৃষ্টি করেছিল—তা সর্বজন-স্বীকৃত। এ পত্রিকার যুগোচিত আবির্ভাবের অনিবার্য ফলশ্রুতি হ'ল ভাবাবেগপ্রধান বাঙালী চিত্তে যুক্তিশৃঙ্খলার সৃষ্টি, যে যুক্তিশৃঙ্খলার প্রাধান্য পরবর্তীকালে বিদগ্ধ বাঙালী গদ্যলেখকদের অনুপ্রাণিত করেছে মননশীল প্রবন্ধ-রচনায়। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী-প্রধান ও বিষয়নিষ্ঠ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ঐতিহাসিক আবির্ভাব না ঘটলে উনবিংশ শতাব্দীর বিচিত্রমুখী সংস্কৃতি-বিকাশ যে বিলম্বিত হ'ত—তা অনুমান করা অহেতুক নয়।

১৮৫৯ খৃঃ 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের এ যুগান্তকারী পত্রিকার প্রচারও বন্ধ হয়ে যায়।[৬]

৬ সজনীকান্ত দাস, সাহিত্যসাধক-চরিতমালা—১ম খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা।

॥ ৭ ॥

বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি-বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যৌথ প্রয়াসের সাহায্যে দেশের মধ্যবিত্ত মানসিকতায় আমূল পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে নবযুগ সম্ভাবনা হয় সুদূর পরাহত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র ভূমিকা সে যৌথ প্রয়াসেরই পরিচয়বাহী। বস্তুতঃ তত্ত্ববোধিনী সভা যদি ত্রিমুখী কর্মপন্থার মাধ্যমে সে সংঘাতপূর্ণ যুগে দেশের সর্বত্র 'সংঘমন'কে[৭] ছড়িয়ে দিয়ে একটা 'যুগমন' গঠনে সক্ষম না হ'ত—তা হ'লে বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙালী সংস্কৃতি কি রূপ নিত তা বলা কঠিন। শিল্প-চেতনার দিক দিয়ে না হ'ক বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি ও গভীরতার দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্য তাৎপর্যময় হ'য়ে ওঠে এ তত্ত্ববোধিনীর যুগে, আর আজ আমরা যে সমন্বিত আদর্শের বাঙালী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক—তার সূচনা হয় এই 'তত্ত্ববোধনী সভা'র সমবেত প্রচেষ্টায়।

৭ 'সংঘমন' ও 'যুগমন' কথা দুটি—প্রবাসী চৈত্র (১৩৬৫) সংখ্যায় শ্রীযোগানন্দ দাস কর্তৃক ব্যবহৃত।

মগ্ন

শুভ গুপ্ত

ভোর হলো মেঘে মেঘে,
হে আলোর পাখি,
কে তোমারে দিল ঢাকি
প্রচ্ছন্ন ছায়ায়।
তৃণে তৃণে শিশির-স্বাক্ষর
রেখে গেছে নিদ্রাহীন
রাত্রির বেদনা;
আরো ম্লান ছায়া কেন
দিনের মুকুরে!

হয়তো প্রতীক্ষা তবু
ফিরে ফিরে ডাকে এই
সজল বাতাসে।
ঘাসের ডগায় কাঁপে
হাওয়ার ইসারা
প্রাণের আড়ালে দেখি
প্রজাপতি পাখ্‌না কাঁপায়।
হৃদয় দু'বাহু মেলে
পৃথিবীকে ফিরে পেতে চায়,
অতলের তল ছুঁয়ে
ফিরে পাই বাঁচার আশ্বাস।

খাদ্যে কৃত্রিমতা

অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বর্ধন

দুগ্ধ, মাখন, ঘৃত, আটা, ময়দা প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্যে নানারূপ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ব্যবসায়ীরা বিক্রয় করে। লোভে পড়িয়া ধর্ম ও সততা বিসর্জন দিয়া খাদ্যদ্রব্যে নানারূপ ভেজাল মিশাইয়া তাহা অখাদ্যে ও বিষে পরিণত করিতেছে। আমরাও অনেক সময় কেবল সস্তা জিনিস ক্রয় করিতে আগ্রহ প্রকাশ করি। ব্যবসায়ীরা খাঁটি জিনিস সস্তায় দিতে না পারিয়া খাঁটি দ্রব্যের সহিত অল্প মূল্যের জিনিস মিশাইয়া সস্তা দরে বিক্রয় করে। আমরা সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলে এই ভেজাল নিবারণ করিতে পারি। খাঁটি দ্রব্য ব্যতীত যদি আমরা সস্তায় খারাপ জিনিস না কিনি, তাহা হইলে ভেজাল নিবারণ করা যাইতে পারে। য়ুরোপ ও আমেরিকা যে উপায়ে ভেজাল নিবারণ করিয়াছে, আমাদের তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ডাক্তার দুর্গারতন ধর বলেন, "য়ুরোপ ও আমেরিকায় অধুনা আইন-প্রয়োগ, স্বাস্থ্যবিভাগের অধিকসংখ্যক কর্মচারীর দ্বারা খাদ্যাদি প্রস্তুত করার কারখানা ও গোশালা পরিদর্শন, সর্বোপরি জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান এবং দায়িত্বপূর্ণ জনমতের গঠন এই সকল কুকর্ম হইতে ব্যবসায়ীদিগকে বিরত করিয়াছে।" অসাধু ব্যবসায়ীরা খাদ্যদ্রব্যে নানারূপ ভেজাল দিয়া থাকে। নিত্যব্যবহার্য পদার্থ বিশুদ্ধ অবস্থায় না পাওয়া গেলে বড়ই অসুবিধা হয়।

দুগ্ধ

দুগ্ধে প্রধান ভেজাল জল। দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিলে ইহা পাতলা হইয়া যায়, কাজেই গোয়ালারা জল মিশ্রিত দুগ্ধের সহিত এবং মাখনতোলা দুগ্ধের সহিত আটা, ময়দা, বাতাসা, চিনি প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করে। মহিষদুগ্ধ গোদুগ্ধ হইতে ঘন ও সস্তা, এই কারণে সময় সময় ব্যবসায়ীরা গোদুগ্ধের সহিত মহিষদুগ্ধ ও জল মিশ্রিত করে। কলিকাতায় ময়লা জল দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া থাকে। এই ময়লা জল কলেরা, টাইফয়েড্ এবং আমাশয়ের বীজাণুতে পূর্ণ থাকে, কাজেই এই ময়লাজলমিশ্রিত দুগ্ধ ভালরূপ ফুটাইয়া না খাইলে কলেরা, টাইফয়েড্ প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে দুগ্ধ-দোহনকারীর হস্তে ময়লা থাকে, পাত্রেও সময় সময় ময়লা থাকে এবং কখনও কখনও বাঁটের দূষিত ঘায়ে দুগ্ধ দূষিত হয়। এইরূপ দুগ্ধ ফুটাইয়া পান করিলেও সময় সময় পেটের অসুখ হইয়া থাকে। যক্ষ্মা-রোগে পীড়িত গাভীর দুগ্ধে এই রোগ-জীবাণু থাকে এবং এই দুগ্ধ খাইয়া অনেকে এই রোগাক্রান্ত হয়। যদি ভালরূপ ফুটাইয়া দুগ্ধ পান করা যায়, তবে এই রোগের জীবাণু মরিয়া যায়।

ল্যাক্টোমিটার (Lactometer) নামক যন্ত্রে দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণীত হয়। দুগ্ধে জল মিশ্রিত থাকিলে এই যন্ত্রে ধরা যায়। দুগ্ধে চিনি বা বাতাসা মিশ্রিত করিয়া আপেক্ষিক গুরুত্ব সমান করিয়া দিলে তাহা এই যন্ত্র দ্বারা ধরা যায় না। সাধারণতঃ খাঁটি দুগ্ধে শতকরা ৩½ হইতে ৪ ভাগ মাখন থাকে। ল্যাক্টোস্কোপ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া যদি দেখা যায় যে মাখনের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা কম, তাহা হইলে বুঝা যাইবে দুগ্ধে জল মিশ্রিত করা

হইয়াছে, অথবা মাখন তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। গোদুগ্ধে মহিষের দুগ্ধ এবং জল মিশ্রিত করিয়া যদি মাখনের পরিমাণ শতকরা ৩½ ভাগ রাখা হয়, তবে এইরূপ ভেজাল ল্যাক্টোস্কোপ দ্বারাও ধরা পড়ে না। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা এইরূপ ভেজাল ধরা যায়।

পরীক্ষা ১ঃ কিঞ্চিৎ দুগ্ধ একটি টেষ্টটিউবে লইয়া তাহার সহিত সমপরিমাণ হাইড্রোক্লোরিক্ অম্ল যোগ করিবে। ইহার সহিত ২।১ গ্রেন রিসোরসিন্ (Resorcin) যোগ করিয়া উত্তাপ দিলে যদি লাল-রঙবিশিষ্ট হয় তবে দুগ্ধে চিনি মিশ্রিত আছে।

পরীক্ষা ২ঃ কিঞ্চিৎ দুগ্ধ একটি টেষ্টটিউবে লইয়া তাহাতে সমপরিমাণ হাইড্রোক্লোরিক অম্ল যোগ করিবে। ইহার সহিত আয়োডিন দ্রাবক (Iodine Solution) যোগ করিলে যদি দুগ্ধে নীল রঙ হয় তবে বুঝিতে হইবে, দুগ্ধে ময়দা মিশ্রিত আছে।

মাখন

১। সাধারণতঃ মাখনে ভেজাল জল। উৎকৃষ্ট মাখনে শতকরা ১০।১২ ভাগ জল মিশ্রিত থাকে। কখনও কখনও মাখনে শতকরা ৩০।৪০ ভাগও জল থাকিতে পারে।

২। সময় সময় মাখনের সহিত চর্বিও মিশ্রিত থাকে।

৩। কখনও কখনও মাখনের সহিত দধি মিশ্রিত থাকে।

৪। ব্যবসায়ীরা মাখনের সহিত কলাও চট্‌কাইয়া মিশ্রিত করে।

মাখনে যদি শুধু জল মিশ্রিত থাকে তবে উহা কোনও পাত্রে জাল দিলে, ঘৃতের পরিমাণ অধিক হইবে না এবং পাত্রের তলায় খাঁকৃরিও অধিক হইবে না। যদি খাঁকৃরি অধিক হয়, তবে বুঝিতে হইবে মাখনের সহিত চর্বি ও জল ছাড়া অন্য পদার্থও মিশ্রিত আছে। মাখনে যদি চর্বি মিশ্রিত থাকে, তবে ঘৃতের পরিমাণ অধিক হইবে এবং পাত্রের তলায় খাঁকরি থাকিবে না।

ঘৃত

অসাধু ব্যবসায়িগণ চীনে বাদামের তৈল, নারিকেল তৈল, মহুয়ার তৈল, রেড়ীর তৈল, পোস্ত বীজের তৈল, নানা প্রকার প্রাণীর চর্বি প্রভৃতি, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ তৈল ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া থাকে। অধিক চর্বি মিশ্রিত থাকিলে ঘৃত জমাট বাঁধিয়া যায়।

ঘৃত নানা প্রকার মিষ্টান্নের প্রধান উপাদান। এ দেশে ঘৃত প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার জহরলাল দাস ও বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁহাদের প্রণীত (Hygiene) পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, কলিকাতায় প্রতি বৎসর ২ লক্ষ ৭০ হাজার মণ ঘৃত আমদানী হয়। এই ঘৃতের অধিকাংশ মহিষদুগ্ধ হইতে উৎপন্ন এবং অবিশুদ্ধ। অধিক ভেজাল থাকিলে গন্ধ, বর্ণ এবং আস্বাদনের দ্বারাই বুঝা যায়। সামান্য একটু ঘৃত হাতে রাখিয়া ঘর্ষণ করিলে ভাল ঘৃত সুগন্ধ হইবে। নিম্নলিখিত উপায়ে ঘৃতে ভেজাল আছে কিনা ধরা যায়।

পরীক্ষা ১ঃ এক ভাগ ঘৃত ও বারো ভাগ ক্লোরোফরম্ একটি টেষ্টটিউবে লইয়া তাহাতে কয়েক ফোঁটা ফস্‌ফো-মলিবডিক অম্ল (Phosphomolybdic Acid) দিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া দিলে মিশ্রিত তৈল এবং ঘৃতের সংযোগস্থলে একটি সবুজ বর্ণ অঙ্গুরীয়ক দেখা যাইবে।

পরীক্ষা ২ঃ নয় অংশ কার্বলিক অম্লে (Carbolic Acid) এক অংশ জল মিশ্রিত

করুন। এই মিশ্র দ্রব্যের আড়াই অংশ একটি টেষ্টটিউবে লইবেন এবং তাহার সহিত এক অংশ ঘৃত মিশ্রিত করুন। এইরূপ করিবার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। মাখন বা ঘৃত জাতীয় পদার্থ অগ্নে দ্রব হইয়া যাইবে, কিন্তু প্রাণীর চর্বি যদি ঘৃতে থাকে তবে উহা উপরে উঠিবে। ঘৃতের সহিত অধিক তৈল মিশ্রিত থাকিলে তৈল তরল অবস্থায় উপরে ভাসিবে এবং দানার অংশ অধিক হইবে না। গ্রীষ্মকালে বিশুদ্ধ ঘৃত গলিয়া সময় সময় তরল হয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এইরূপ ঘৃতে কিরূপে ভেজাল ধরা যায়। বিশুদ্ধ এবং ভেজাল ঘৃত তুলনা করিয়া যদি দেখা যায় যে দানার পরিমাণ কম, তাহা হইলে যেটিতে দানা কম, সেটি কৃত্রিম বুঝিতে হইবে।

সরিষার তৈল

কখনও কখনও সরিষার তৈলের সহিত একরূপ মেটে (মৃত্তিকাজাত) তৈল মিশ্রিত করা হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ সরিষার তৈলের সহিত মাদ্রাজী বাদাম, পোস্ত, সোবগুজা, সত্যানাশের তৈল, হুড়হুড়ে বীজ, তারা বীজ, রেড়ীর বীজ প্রভৃতির তৈল মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। এই সমস্ত দ্রব্য সরিষার তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘানিতে পিষিয়া তৈল প্রস্তুত করা হয়।

কৃত্রিম তৈলকে সরিষার তৈলের ন্যায় ঝাঁজ-বিশিষ্ট করিবার জন্য সজিনার ছাল এবং লঙ্কা মিশ্রিত করিয়া ঘানিতে পেষা হইয়া থাকে। অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বড় বড় দোকানে ১নং ২নং ৩নং তৈল বিক্রয় হয়। ১নং তৈলে অর্ধেক সরিষা এবং অর্ধেক অন্য দ্রব্য থাকে। ২নং তৈলে সিকি সরিষা এবং বাকী অন্য পদার্থ। ৩নং তৈলে নামমাত্র সরিষা থাকে।

যাঁহারা সরিষা ক্রয় করিয়া কলুর বাড়ী হইতে পিষিয়া আনিবেন, তাঁহারা খাঁটি তৈল পাইতে পারেন। বাজারে খাঁটি ঘানির তৈল বলিয়া যাহা বিক্রয় হয়, তাহাতে কিছু পরিমাণ ঘানির তৈলের সহিত কলের তৈল মিশ্রিত থাকে।

আটা ময়দা

কখনও কখনও চাউলের গুঁড়া আটা ও ময়দার সহিত মিশ্রিত করা হয়।

আমরা যদি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য লই, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে অন্য দ্রব্যের গুঁড়া আটা ও ময়দার সহিত মিশ্রিত আছে কিনা।

কলের ময়দার সহিত চাক-খড়ির, ফরাসি খড়ির (French chalk) ও পাথরের গুঁড়া (Soft stone) এবং এক প্রকার ঘাসের বীজ মিশ্রিত থাকে, ইহারও আমরা প্রমাণ পাইয়াছি।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।
—রবীন্দ্রনাথ

'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্—'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তোমাতে আনন্দ মোর অনির্বচনীয়,
তোমা চেয়ে আর কিছু নাহি লোভনীয়
স্বর্গে, মর্ত্যে, রসাতলে—ওগো প্রিয়তম,
আমার হৃদয়াকাশে ধ্রুবতারা সম
জ্বলুক এ মহাসত্য : 'দুস্‌রা ন কোঈ'—
জীবনের মর্মমূলে যেন তোমা বই
আর কেহ নাহি রয়। এ দুটি নয়ন
সর্বত্র তোমারে শুধু করিবে দর্শন।

সমস্ত মানুষে ভালোবাসিব তোমারে।
তোমার আনন্দ রবে সবার মাঝারে।
তব পাদপদ্মে যদি লগ্ন থাকে হিয়া
প্রতিটি নিমেষে—জানি লইবে তুলিয়া
আমার সমস্ত বোঝা। ভাঙো অহঙ্কার।
হে প্রভু, আমারে করো—তোমার তোমার।

একান্ত আপন

শ্রীশান্তশীল দাশ

অনেকের মাঝে আছি, মনে হয়,
এ অনেক কেহ মোর আপনার নয়।
কারো 'পরে পারিনাতো করিতে নির্ভর,
যদিও তাদের সাথে আমার এ ঘর
বেঁধেছি এখানে। দেখাশুনা প্রতিদিন
হয়। হাসি, কথা কই, তবু বড় ক্ষীণ।
সে বন্ধন—ছিঁড়ে যায় নিমেষে আঘাতে।
মনে হয় : সঙ্গীহীন আমি, কারো সাথে
নেই মোর কোন চেনা—নিঃসঙ্গ, একাকী।
তখন তোমার কথা মনে পড়ে, ডাকি
তোমায় আকুল হ'য়ে, তুমিই আমার
একান্ত আপন জন ; নেই কেহ আর
তোমার মতন প্রিয়। বেদনাশ্রু-জলে
সঁপে দিই আপনারে ও চরণতলে।

গীতা-জ্ঞানেশ্বরী

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

[শ্রীজ্ঞানদেব-বিরচিত গীতার ব্যাখ্যা মূল মারাঠী 'ভাবার্থ-দীপিকা'র নবম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ]

পাঠকপাঠিকাদের স্মরণ থাকিতে পারে গত বৎসর চারিটি সংখ্যায় গীতার এই অপূর্ব ব্যাখ্যার পঞ্চদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩৬৪ উদ্বোধন, ১১শ ও ১২শ সংখ্যায় সন্ত জ্ঞানেশ্বরের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাওয়া যাইবে। নিম্নে ব্যাখ্যার অন্তর্গত বন্ধনীস্থ সংখ্যাগুলি মূল 'জ্ঞানেশ্বরী'র শ্লোক-সংখ্যা। উঃ সঃ

আপনারা একাগ্রচিত্তে অবধান করুন, আপনারা এই কথা শ্রবণ করিলে সর্বসুখের পাত্র হইবেন—ইহা আমি স্পষ্টভাবে বলিতেছি, পরন্তু ইহা আত্মশ্লাঘাপূর্ণ কথা নয়, আপনারা বিজ্ঞ, আপনাদের সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য ইহাই আমার আত্মীয়তাপূর্ণ নিবেদন, কারণ আপনাদের ন্যায় শ্রীসম্পন্ন 'মাতৃগৃহ' থাকিলে প্রেমের সকল আবদার পূর্ণ হয়, মনোরথের মনোরথ সফল হয়, আপনাদের কৃপাদৃষ্টির আর্দ্রতায় প্রসন্নতার উপবন ফলফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে, শ্রান্ত হইয়া আমি তাহারই ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছি। হে প্রভুগণ, আপনারা সুধামৃতের গভীর জলাশয়, সুতরাং আমি আপন ইচ্ছামত সুধামৃত পান করিয়া শীতল হইতে চাহি—তাহাতে যদি আত্মীয়তা প্রকাশ করিতে ভয় পাই, তবে আমি তৃপ্ত হইব কিরূপে? অথবা শিশুর অর্ধস্ফুট বাণী শুনিয়া, বা তাহার আঁকাবাঁকা চরণের কৌতুকপূর্ণ গতিভঙ্গী দেখিয়া মাতা যেমন আনন্দিত হন, তেমনই আপনাদের ন্যায় সন্তজনের প্রেম প্রাপ্ত হইবার জন্য অত্যধিক আগ্রহের সহিত আত্মীয়তাপূর্ণ অন্তরঙ্গতা করিতেছি, নতুবা আপনাদের ন্যায় জ্ঞানী শ্রোতৃগণের সম্মুখে কি আমার কিছু বলিবার যোগ্যতা আছে? সরস্বতীর পুত্রকে কি পাঠ পড়িয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়? দেখুন, জোনাকি যত বড়ই হউক না কেন, সূর্যের মহাতেজের সম্মুখে কি তাহার দ্যুতি নিষ্প্রভ হইয়া যায় না? এরূপ কি রসপূর্ণ সুখাদ্য আছে, যাহা অমৃতের থালায় পরিবেশন করা যায়? চন্দ্রকিরণকে পাখার বাতাস করা, অনাহত নাদকে গান শোনানো, অলঙ্কারকে অলঙ্কৃত করা কি কখনও সম্ভব? (১০)

বলুন তো, পরিমল স্বয়ং কেমন করিয়া আঘ্রাণ করিবে? সমুদ্র কোথায় স্নান করিবে? এমন কি বৃহৎ বস্তু আছে, যাহা সারা গগনকে আচ্ছাদন করিবে? তেমনই এমন বক্তৃতা-শক্তি কাহার আছে যে আপনাদের শ্রবণের তৃপ্তি সাধন করিবে এবং আপনাদের এমন আনন্দ দান করিবে যে আপনারা বলিবেন 'হাঁ, ইহাই ঠিক'? তথাপি বিশ্বপ্রকাশক সূর্যকে কি হাতের প্রদীপ দ্বারা আরতি করা যায় না? কিংবা, অঞ্জলিপূর্ণ জলে কি সমুদ্রকে অর্ঘ্য দেওয়া হয় না? আপনারা মহেশের মূর্তি, আর আমি দুর্বল, ভক্তি দ্বারা আপনাদের পূজা করিতেছি,—অতএব আমার বাণী (নিগুর্ডী * পত্রের ন্যায়) নিগুর্ণ হইলেও আপনারা কি তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইবেন না? বালক পিতার থালায় বসিয়া পিতাকে খাওয়াইতে

* গন্ধাবতী—নিগুর্ডীর পত্র—বিল্বপত্রের অভাবে পূজায় ব্যবহৃত হয়।

আরম্ভ করিলে পিতা সন্তোষে পূর্ণ হইয়া মুখ বাড়াইয়া দেন, তেমনই আমিও বালক-বুদ্ধিতে আপনাদের সহিত ইচ্ছামত ক্রীড়া করিতেছি, আপনারা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন—ইহাই প্রেমের রীতি, আর আপনারা—সন্ত শ্রোতারা—বহু প্রকারে আমার প্রতি আপনাদের প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন, সুতরাং আমি আপনাদের সহিত আত্মীয়তাসুলভ ব্যবহার করিতেছি, তাহা আপনাদের বিরত করিবে না, মাতার স্তনে শিশুর মুখের ঝটকা লাগিলে স্তনে আরও অধিক দুগ্ধ নিঃসৃত হয়—অত্যন্ত প্রিয়জনের রোষে প্রেম দ্বিগুণ বর্ধিত হয়, আমার বালকসুলভ কথায় আপনাদের সুপ্ত কৃপালুতা জাগ্রত হইয়াছে—ইহা জানিয়াই আমি এই ভাবে বলিতেছি, নতুবা চন্দ্র-কিরণকে কি জাঁক দিয়া পাকাইতে হয়? বায়ুকে কি গতি প্রদান করিতে হয়? গগনকে কি জালে টানিয়া আনা যায়? (২০)

শুনুন, জলকে আর তরল করিতে হয় না, মাখনের মধ্যে মন্থনদণ্ড ঢোকানো নিষ্প্রয়োজন, তেমনই যাহাকে দেখিলে ব্যাখ্যান লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসে—শুধু ইহাই নহে, শব্দব্রহ্ম স্তব্ধ হইয়া যে পালঙ্কের উপর শান্ত হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, সেই গীতার্থ মারাঠী ভাষায় বলিবার যোগ্যতা (আমার) কই? পরন্তু ইহাই আমার ইচ্ছা, আমার একমাত্র আশা এই যে আমার ধৃষ্টতা দ্বারা ভবাদৃশ জনের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিব, এখন চন্দ্র হইতেও শীতল, অমৃত হইতেও অধিকতর সঞ্জীবনীশক্তিবিশিষ্ট আপনাদের অবধান (মনোযোগ) দান করিয়া আমার মনোরথের পোষণ করুন। আপনাদের কৃপাদৃষ্টি বর্ষিত হইলে আমার বুদ্ধি সকলার্থসিদ্ধির পরিপক্বতা লাভ করিবে, অন্যথায় যদি আপনারা উদাসীন থাকেন, তবে আমার প্রতিভার অঙ্কুর শুকাইয়া যাইবে, আপনারা স্মরণ রাখিবেন, বক্তৃতাকে যদি অবধানরূপ খাদ্য দেওয়া যায়, তবে শব্দের সহিত অর্থের সামঞ্জস্য হয়, অর্থ শব্দের পথ দেখিতে পায় (শব্দের সহিত অর্থের প্রতিপত্তি হয়), এক অভিপ্রায় (অভিপ্রেত অর্থ) হইতে অন্য অভিপ্রায় বাহির হয়, বুদ্ধির মস্তকে ভাবের কুসুম-বৃষ্টি হয়, এই ভাবে (বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে) সংবাদের অনুকূল পবন বহিতে থাকিলে হৃদয়াকাশ বক্তৃতার সারস্বত (জ্ঞানপূর্ণ) রসে ভরিয়া যায়, শ্রোতা অমনোযোগী হইলে বক্তৃতার রস নষ্ট হইয়া যায়, চন্দ্রকান্ত মণি দ্রবীভূত হয় বটে, পরন্তু তাহাকে দ্রব করিবার শক্তি চন্দ্রমাতেই আছে, তেমনই শ্রোতা (শ্রোতার অবধান) বিনা বক্তা বক্তাই নয়, পরন্তু তণ্ডুলকে কি বিনতি করিতে হয় যে 'আমাকে গ্রহণ করুন'? কাষ্ঠপুত্তলীকে কি (নাচাইবার জন্য) সূত্রধারকে প্রার্থনা করিতে হয়? (৩০) সূত্রধার কি কাষ্ঠপুত্তলীর কাজের (উপকারের) জন্য তাহাকে নাচায়? কি, আপনার কলানৈপুণ্য দেখাইবার জন্য নাচায়? সুতরাং আমার বৃথা কষ্ট করার কি প্রয়োজন?

তখন শ্রীগুরু বলিলেন, 'কি হইল? (তোমার) এ সমস্তই আমি অঙ্গীকার করিয়া লইলাম, এখন নারায়ণ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) যাহা নিরূপণ করিলেন তাহাই বলো, ইহাতে নিবৃত্তিদাস (জ্ঞানদেব) সন্তুষ্ট হইয়া উল্লাসভরে বলিলেন, যথা আজ্ঞা—এখন শুনুন :

শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে বলিতে লাগিলেন—

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥১

হে অর্জুন, তোমাকে আমার হৃদয়ের অন্তস্তলের গুহ্য রহস্য—জ্ঞানের মূল বীজের কথা পুনরায় বলিতেছি, এইভাবে অন্তঃকরণের গুপ্ত দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া আমাকে কি গুহ্য রহস্যের কথা বলিবেন—এইরূপ কোনও সহজ সন্দেহ যদি তোমার মনে উঠিয়া থাকে, তবে হে প্রাজ্ঞ, শোন—তুমি (শ্রদ্ধার) প্রতিমূর্তি, আমার কোনও বাক্য অবজ্ঞা কর না, এই জন্য আমি চাহি যে আমার অন্তরের গূঢ় তত্ত্ব বাহির হইয়া আসুক, যাহা বলিবার নয় তাহাও ব্যক্ত করিতে বাধ্য হই, পরন্তু আমার হৃদয়ে যাহা কিছু আছে তাহা তোমার হৃদয়ে গিয়া প্রবেশ করুক, স্তনে দুগ্ধ ভরা থাকে, কিন্তু স্তন সে দুগ্ধের মিষ্টত্ব আস্বাদন করিতে পারে না, যদি দুগ্ধ পান করিবার কোনও একনিষ্ঠ বৎস মিলে তবে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হয়, যদি বীজের পাত্র হইতে বীজ লইয়া তৈয়ারী জমিতে বপন করা হয়, তবে কি বলা যায় যে বীজ ছড়াইয়া নষ্ট করা হইল। এইজন্য সুমনা শুদ্ধমতি অনিন্দক ও অনন্যগতি প্রেমিকের কাছে গোপনীয় বিষয়ও সুখে বলা যায়। (৪০)

এখন তুমি ভিন্ন এই সমস্ত গুণসম্পন্ন অন্য কেহই নাই, সুতরাং গুহ্য হইলেও এই রহস্য তোমার নিকট গোপন করা উচিত নহে, বার বার 'গুহ্য রহস্য' এই কথা শুনিতে শুনিতে তোমার হয়তো ইহা (কানাডী ভাষার ন্যায়) দুর্বোধ্য মনে হইবে, এইজন্য আমি বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান স্পষ্টভাবে উপদেশ করিতেছি, আসল ও জাল মুদ্রা একত্র থাকিলে যেমন তাহা পরীক্ষা করিয়া আলাদা করিতে হয়, তেমনই জ্ঞান হইতে বিজ্ঞান পৃথক্‌ করিয়া দেখাইব, রাজহংস চঞ্চুর সাহায্যে জল হইতে দুধ পৃথক্‌ করে, তেমনই আমি তোমাকে 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান' পৃথক্‌ করিয়া বুঝাইব, বায়ুর প্রবাহে তুষ উড়িয়া যায় এবং শস্যের দানা রাশীকৃত হইয়া পড়িয়া থাকে, তেমনই জ্ঞানলাভের পর সংসারকে সংসারের মধ্যে রাখিয়া মোক্ষ-শ্রীর সিংহাসনে গিয়া বসিবে।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥২

যে জ্ঞান সুবিদ্যার নগরে মুখ্য আচার্যের পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহা সকল গুহ্য বিষয়ের স্বামী, পবিত্র বস্তুর রাজা, আর ধর্মের নিজ ধাম, উত্তমের মধ্যে উত্তম, যাহা প্রাপ্ত হইলে আর অন্য জন্মের আবশ্যকতা হয় না, যাহা সামান্য পরিমাণে (দীক্ষাকালে) গুরুর মুখে উদয় হইতে দেখা যায়, পরন্তু যাহা হৃদয়ে স্বতঃসিদ্ধ (স্বয়ম্ভু) এবং আপনা-আপনিই তাহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে থাকে, আত্মসুখের সিঁড়ি বাহিয়া চড়িতে চড়িতে যাহার দর্শন পাওয়া যায়—যাহা প্রাপ্ত হইলে ভোক্তা তাহাতেই বিলীন হয়, (৫০)

পরন্তু ভোগের (প্রাপ্তিসুখের) এপারের সীমানাতেই (লয় হইবার পূর্বেই) চিত্ত সুখে পূর্ণ হইয়া স্থির হইয়া থাকে,—এই জ্ঞান সুলভ ও সহজ হইলেও উহাই পরব্রহ্ম, এই জ্ঞানের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে উহা একবার প্রাপ্ত হইলে আর নষ্ট হয় না। আর অনুভব করিলে কমিয়াও যায় না, নিষ্প্রভও হয় না, যদি তার্কিকের ন্যায় তোমার মনে এই সংশয় হয় যে এই প্রকার বস্তু লোকের গ্রাস হইতে কি প্রকারে রক্ষা পাইল—যে শতকরা একমুদ্রা সুদের

জন্য জলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে পারে, সে অনায়াসে লভ্য এই আত্মসুখের মাধুর্য কি করিয়া ত্যাগ করে? ইহা গৌরবের ও রমণীয়, সুখলভ্য, সুসুখ (সুখকারক) ও পরম ধর্ম্য (ধর্মানুকূল), ইহা স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত করাইয়া দেয়, এরূপে সর্বপ্রকারে অনুকূল হইয়াও ইহা লোকের হস্তগত হয় নাই কেন? এই শঙ্কার সত্যই কারণ আছে, পরন্তু তুমি এ আশঙ্কা করিও না।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥৩

দেখ, দুগ্ধ অতি পবিত্র ও সুমিষ্ট, (গাভীর স্তনে) ত্বকের একটা পরদার নীচেই সঞ্চিত থাকে, পরন্তু রক্তপায়ী কীট তাহা উপেক্ষা করিয়া রক্ত পান করে, কিংবা কমলকন্দ ও ভেক একই স্থানে বাস করে, পরন্তু ভ্রমর কমলের পরাগ আস্বাদন করে, ভেকের ভাগ্যে কর্দমই জোটে, অথবা দুর্ভাগার ঘরে দ্রব্যপূর্ণ সহস্র ভাণ্ড থাকিতে পারে, পরন্তু সে ঐ ঘরে বসিয়া উপবাস করে বা দারিদ্র্যে দিনপাত করে, তেমনই সর্ব সুখের আরাম (বিশ্রামস্থল) আমি 'রাম' (আত্মারাম) হৃদয়ের মধ্যে থাকিলেও লোকে ভ্রান্ত হইয়া বিষয় কামনা করে। (৬০)

(দূর হইতে) মৃগজল দেখিয়া মুখভরা অমৃত ফেলিয়া দিলে যেমন হয়, অথবা শুক্তি পাইয়া গলায় বাঁধা পরশপাথর ভাঙিয়া ফেলিলে যেমন হয়, তেমনই বেচারা জীব 'অহংতা' ও 'মমতা'র পঙ্কে পড়িয়া আমাকে পায় না এবং সেইজন্য জন্মমরণের দুই তীরের মধ্যে চুবানি খাইতে থাকে, বাস্তবিক পক্ষে আমি মুখের সম্মুখে সূর্যের মতো—পরন্তু সূর্য কখনও দেখা যায়, কখনও দেখা যায় না, আমার সে ন্যূনতাও নাই, (আমাকে সর্বদা অনুভব করা যায়)।

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥৪

যদি আমার বিস্তারের কথা বল, এ সমস্ত জগৎই কি আমার স্বরূপের বিস্তার নহে? দুগ্ধ যেমন স্বভাবতঃ জমিয়া দধি হয়, কিংবা বীজ হইতে যেমন বৃক্ষ হয়, অথবা স্বর্ণ হইতে যেমন অলঙ্কার হয়, তেমনই এই জগৎ একমাত্র আমারই বিস্তার, আমার স্বরূপ অব্যক্ত অবস্থায় ঘনীভূত হইয়া থাকে, এই বিশ্বাকার জগৎ তাহারই তরল অবস্থা—এই ত্রৈলোক্য আমার নিরাকার স্বরূপের সাকার বিস্তার, মহত্তত্ত্ব হইতে দেহ পর্যন্ত এই অশেষ ভূতগ্রাম আমাতেই প্রতিবিম্বিত আছে—জলে যেমন ফেনা থাকে, পরন্তু হে পাণ্ডুসুত, ফেনার মধ্যে দেখিলে যেমন জল দেখা যায় না, অথবা স্বপ্নের অনেকতা (স্বপ্নে দেখা অনেক প্রকারের রূপ) যেমন জাগ্রত হইলে অদৃশ্য হয়, তেমনই এই ভূতগণ আমার মধ্যেই ভাসমান, আমি তাহাদের মধ্যে নাই—এই উপপত্তি (যুক্তি) আমি পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি, অতএব যাহা বলা হইয়াছে তাহার পুনরুক্তি করিব না—এইজন্য ইহা থাকুক, পরন্তু তোমার দৃষ্টি আমার স্বরূপে প্রবেশ করুক। (৭০)

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫

প্রকৃতির অতীত আমার যে স্বরূপ তাহা যদি কল্পনা (সঙ্কল্প-বিকল্প)-রহিত হইয়া বিচার কর, তবে সমস্ত ভূতগ্রাম যে আমার মধ্যে অবস্থান করে, এই কথাও মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারিবে

—কারণ আমিই সর্বস্বরূপ, নতুবা সঙ্কল্প-বিকল্পের সন্ধ্যাবেলায়—যখন বুদ্ধির দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া যায়, তখন বুদ্ধির গোধূলি-সময়ে অখণ্ডিত পরব্রহ্মকে ভূত হইতে ভিন্ন বলিয়া দেখে, সেই সন্ধ্যার যখন লোপ হয়, তখন অখণ্ড পরব্রহ্ম স্ব-স্বরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন—যেমন শঙ্কা দূর হইলেই মালার সর্পাভাস যায়, মৃত্তিকা হইতে কি স্বতই কলসী-ঘটাদি উৎপন্ন হয়?—না উহারা কুম্ভকারের বুদ্ধির গর্ভ হইতে উৎপন্ন হয়? অথবা সমুদ্রের জলে কি তরঙ্গের খনি আছে? উহা কি বায়ুরই অতিরিক্ত কার্য নহে? দেখ, কার্পাসের উদরে কি বস্ত্রের পেটিকা থাকে? ব্যবহারনিপুণ ব্যক্তি দ্বারা বস্ত্র তৈয়ারী হয়, স্বর্ণ হইতে অলঙ্কার তৈয়ারী হইলে কি তাহার স্বর্ণত্ব নষ্ট হয়? আর অলঙ্কারও—যে ব্যবহার করে তাহার কল্পনা-অনুসারেই তৈয়ারী হয়। বল দেখি, প্রতিধ্বনির প্রত্যুত্তর, বা দর্পণে প্রতিবিম্ব—কি নিজেরই কথা বলা বা দেখার ফল?—না সত্য সত্যই সেখানে আমি থাকি? তেমনই আমার এই নির্মল স্বরূপে যে পঞ্চভূতের কল্পনা আরোপিত হয়, সেই সঙ্কল্পের জন্যই এই ভূতাভাস হয়, কল্পনাকারী প্রকৃতির শেষ হইলে ভূতাভাসেরও অন্ত হয় এবং একমাত্র আমারই শুদ্ধ অবিকৃত স্বরূপই অবশিষ্ট থাকে। (৮০)

এ কথা থাকুক, নিজে ঘুরিতে থাকিলে যেমন চতুর্দিকের পাহাড়-পর্বত ঘুরিতেছে দেখা যায়, তেমনই নিজের মনে কল্পনা উৎপন্ন হইলে অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপে ভূতাভাস হয়, সেই কল্পনা ছাড়িয়া দিলে আমি ভূতমধ্যে আছি বা ভূতগ্রাম আমার মধ্যে আছে, ইহা স্বপ্নেও ভাবা যায় না, 'আমিই ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি', অথবা 'আমি পঞ্চভূতের মধ্যে আছি'—এইসব কথা সঙ্কল্পরূপ সন্নিপাত-জ্বরের প্রলাপ-বাক্য, অতএব হে প্রিয়োত্তম, শোন—এইভাবে আমি বিশ্বের বিশ্বাত্মা, এই মিথ্যা ভূতগ্রামের আমিই অধিষ্ঠান বা আশ্রয়, সূর্যকিরণের আধারেই যেমন মিথ্যা মৃগজলের আভাস দেখা যায়, তেমনই ভূতজাত সর্ব পদার্থ আমারই সত্তার মধ্যে, এবং আমিও তাহাদের মধ্যে—ইহাই কল্পনা করা হয়, সূর্য এবং সূর্যের প্রভা যেমন অভিন্ন, তেমনই ভূতভাবন আমিও সর্বভূত হইতে অভিন্ন, ইহাই আমার ঐশ্বর্যযোগ—ইহা কি তুমি উত্তমরূপে বুঝিয়াছ? এখন বলো, ইহাতে কি ভূতভেদের তিলমাত্র স্থান আছে? এইভাবে ভূতমাত্রই আমা হইতে ভিন্ন নয়—ইহাই সত্য, আর আমাকে কখনও ভূতগণ হইতে ভিন্ন মনে করিও না।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥৬

আকাশের যতখানি বিস্তার, আকাশের মধ্যে পবনও ততখানি বিস্তৃত, সহজ সঞ্চালনেই তাহাকে পৃথক্ বলিয়া দেখা যায়, নতুবা উহা তো আকাশই, তেমনই আমার মধ্যে ভূতজাত আছে—ইহা কল্পনা করিলেই তাহার আভাস হয়, কল্পনার অভাবে (নির্বিকল্পে) ঐ আভাস চলিয়া যায়, তখন সমস্তই আমি হইয়া যাই। (৯০)

সেইজন্য ভূতগণের 'থাকা' বা 'না-থাকা' কল্পনার সংযোগেই হয়, কল্পনার লোপ হইলে তাহাদের অস্তিত্ব যায়, কল্পনার সহযোগে তাহাদের আভাস হয়; কল্পিত পদার্থের মূল কল্পনাই যখন থাকে না, তখন (ভূতগণের) 'থাকা' 'না-থাকা' কোথা হইতে আসিবে? সেইজন্য

তুমি পুনরায় আমার ঐশ্বরযোগ দেখ, অনুভবরূপ বোধসমুদ্রে তুমি আপনাকে একটি তরঙ্গের মতো দেখ—চরাচর বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সর্বত্র আপনাকেই দেখিবে।

তোমার মধ্যে কি এই জ্ঞানের প্রকাশ হইয়াছে? এখন (তোমার) দ্বৈত স্বপ্ন মিথ্যা হইয়াছে কিনা? আবার কদাচিৎ যদি বুদ্ধিতে কল্পনার নিদ্রা আসিয়া যায়, তবে স্বপ্নের ঘোরে এই অভেদবোধ চলিয়া যাইবে, এইজন্য এখন আমি সেই সত্যরূপ গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিব, যাহাতে নিদ্রার পর্ব ভাঙিয়া যাইবে, এবং তোমাকে নিখিল আত্মজ্ঞানের আলোকে সর্বদা জাগ্রত রাখিবে, হে ধনুর্ধর ধনঞ্জয়, তুমি ধৈর্য ধরিয়া উত্তমরূপে অবধান কর—মায়াই সর্বভূতের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ।

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥৭

যাহাকে প্রকৃতি কহে তাহা দ্বিবিধ, তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি, প্রথমটিতে অষ্ট প্রকারের ভেদ, দ্বিতীয়টি জীব-রূপ, হে পাণ্ডব, এই প্রকৃতির সমস্ত বিষয়ই তোমাকে পূর্বে শুনাইয়াছি, সুতরাং বারংবার বলিবার প্রয়োজন নাই, মহাকল্পের অন্তে সর্বভূতগণ আমারই প্রকৃতিরূপ অব্যক্তে ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া বিলীন হয়। (১০০)

গ্রীষ্মের আধিক্যে তৃণ যেমন বীজ-সহিত পুনরায় ভূমির মধ্যে বিলীন হয়, অথবা বর্ষার আড়ম্বর শেষ হইলে যেমন শরৎ ঋতুর আগমন হয়, তখন আকাশের মেঘসমূহ যেমন আকাশেই বিলীন হয়, অথবা শূন্যগর্ভ আকাশের মধ্যে যেমন বায়ু শান্ত হইয়া লুপ্ত হয়, কিংবা তরঙ্গ যেমন জলে বিলীন হইয়া যায়, অথবা জাগ্রত হইলে মনের স্বপ্ন যেমন মনেই মিলাইয়া যায়, তেমনই প্রাকৃত (প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন) জগৎ কল্পান্তে প্রকৃতিতেই বিলীন হয়, কল্পের প্রারম্ভে পুনরায় আমিই জগৎ সৃষ্টি করি—ইহাই লোকে বলে। এই বিষয়ে যথার্থ যুক্তি শ্রবণ কর:

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥৮

হে কিরীটী, আমি সহজ লীলায় স্বকীয়া প্রকৃতির অধিষ্ঠান হইয়া আছি, বয়নের কৌশলে যেমন তন্তুর সমষ্টি বস্ত্রের আকার ধারণ করে, সেই বয়ন-কৌশলের ছোট ছোট চতুষ্কোণ হইতে যেমন বস্ত্র তৈয়ারী হয়, তেমনই পঞ্চভূতাত্মক আকারে 'প্রকৃতি' হইতে সৃষ্টি উৎপন্ন হয়, দম্বল (অম্ল) সংযোগে দুধ যেমন জমিয়া যায়, তেমনই প্রকৃতিও সৃষ্টির আকার ধারণ করে, জলের সহিত সংযোগ হইলে বীজ যেমন শাখা-প্রশাখার রূপ ধারণ করে, তেমনই ভূতসৃষ্টির প্রসার আমা হইতেই হয়, 'রাজা নগর বসাইয়াছেন' বলিলে ঠিকই বলা হইবে, পরন্তু যথার্থ দেখিতে গেলে রাজার হাত কি এই জন্য কষ্ট করে? (১১০)

আর আমি কিভাবে প্রকৃতিকে ধারণ করিয়া আছি?—যেমন কেহ স্বপ্ন হইতে জাগ্রদ-বস্থায় প্রবেশ করে, হে পাণ্ডুসুত, স্বপ্ন হইতে জাগৃতিতে আসিতে কি পায়ে ব্যথা হয়? অথবা স্বপ্নের মধ্যে কি প্রবাসযাত্রা এবং যাত্রার কষ্ট হয়? এই সমস্ত বলিবার অভিপ্রায় এই যে এই ভূতসৃষ্টির জন্য আমাকে কিছুই করিতে হয় না—ইহাই তাহার অর্থ, রাজার আশ্রয়ে প্রজাকে

যেমন আপন কার্যের জন্য সমস্ত ব্যাপার আপনাকেই করিতে হয়, প্রকৃতির সহিত সঙ্গ (সম্বন্ধ) আমার তেমনই, তাহাকেই সমস্ত কার্য করিতে হয়, দেখ, পূর্ণচন্দ্র-দর্শনে সমুদ্রে অপার জোয়ার আসে, হে কিরীটী, তাহাতে কি চন্দ্রের কোনও পরিশ্রম হয়? লৌহ জড়, পরন্তু চুম্বকের কাছে আসিলে চলিতে থাকে, সান্নিধ্যের জন্য কি চুম্বককে কষ্ট পাইতে হয়? কিংবহুনা, এইভাবে আমি নিজ প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করি এবং ভূতবর্গ একেবারে প্রসূত হইতে আরম্ভ করে; হে পাণ্ডব, এই সমস্ত ভূতগ্রাম প্রকৃতির অধীন—বীজ হইতে লতা-পল্লব বাহির করিতে ভূমিই যেমন সমর্থ, অথবা দেহসঙ্গই যেমন বাল্যাদি অবস্থার মুখ্য কারণ, অথবা মেঘপুঞ্জই যেমন আকাশ হইতে বর্ষণের কারণ কিংবা নিদ্রাই স্বপ্নের কারণ, তেমনই হে নরেন্দ্র, প্রকৃতিই এই সৃষ্ট ভূত-সমুদ্রের সৃষ্টিকর্ত্রী। (১২০)

স্থাবর-জঙ্গম, স্থূল-সূক্ষ্ম—অধিক কি বলিব—সমস্ত ভূতগ্রামের মূলই প্রকৃতি, অতএব ভূতগ্রামের সৃষ্টি কিংবা সৃষ্ট প্রাণীর প্রতিপালন—এই সমস্ত কর্মের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই, জলের উপর চন্দ্রকিরণের প্রসার দৃষ্ট হয়, কিন্তু চন্দ্র তাহা (সেই প্রসার) করে না (দূরেই থাকে), তেমনই এই সমস্ত কর্ম আমা হইতে উদ্ভূত হইলেও আমা হইতে দূরে থাকে।

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ॥৯

সমুদ্রের জলে তরঙ্গ উঠিলে লবণের বাঁধ তাহাকে রোধ করিতে পারে না, সকল কর্মের আমাতেই অস্ত হয়। কিন্তু ঐ কর্ম কি আমাকে বাঁধিতে পারে? ধূমকণার পিঞ্জরে কি প্রবহমাণ বায়ুকে আটকানো যায়? কিংবা সূর্যবিম্বের মধ্যে কি অন্ধকার প্রবেশ করিতে পারে? আর অধিক কি বলিব? বর্ষার ধারা যেমন পর্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, তেমনই প্রকৃতির যাবতীয় কর্ম আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতির এই নামরূপাত্মক বিকারের আমিই একমাত্র আধার জানিবে, পরন্তু উদাসীনের মতো আমি কিছু করিও না, করাইও না—যেমন ঘরের মধ্যে রক্ষিত দীপ কাহাকেও কিছু করায় না, কিছু বাধাও দেয় না, আর কে কোন্ ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে দীপ তাহা জানেও না, সেই দীপ যেমন সাক্ষীভূত হইয়া গৃহব্যাপারাদি কর্মে প্রবৃত্তির হেতু হয়, তেমনই আমিও ভূতকর্মে অনাসক্ত থাকিয়া ভূতের মধ্যে থাকি। একই অভিপ্রায় (বক্তব্য) নানারূপ যুক্তি দ্বারা আর বার বার কত বলিব? হে সুভদ্রাপতি, একবার ইহাই জানিয়া লও (১৩০)—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥১০

সমস্ত লোকচেষ্টায় (ব্যাপারে) সূর্য যেমন শুধু নিমিত্তমাত্র, তেমনই হে পাণ্ডুসুত, আমাকেও জগতের উৎপত্তির হেতুমাত্র জানিবে, আমাতে অধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতেই এই চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি, সুতরাং আমিই এই উৎপত্তির হেতু (নিমিত্তকারণ)—ইহাই এ সম্বন্ধে উপপত্তি (যুক্তি)। এখন এই জ্ঞানের সত্য প্রকাশে আমার ঐশ্বরযোগ দেখিলে বুঝিবে যে ভূতমাত্রই আমার মধ্যে আছে, পরন্তু আমি ভূতের মধ্যে নাই, অথবা ভূতগণও আমার মধ্যে নাই, আমিও ভূতগণের মধ্যে নাই—এই

রহস্য তুমি কখনও ভুলিও না। আমার সমস্ত গূঢ় রহস্য তোমার কাছে প্রকাশ করিলাম, এখন ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া হৃদয়ের অভ্যন্তরে ইহা উপভোগ কর, এই মর্ম অধিগত না হইলে (বুঝিতে না পারিলে) আমার সত্য স্বরূপের উপলব্ধি হয় না—যেমন তুষের মধ্যে শস্যকণা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অনুমানের সাহায্যে আমার স্বরূপ জানা যায় মনে হয়, কিন্তু মৃগজলের আর্দ্রতায় কি ভূমি সিক্ত হয়? জলে জাল ফেলিলে মনে হয় চন্দ্রবিম্বকে ধরা গেল, পরন্তু কিনারায় আনিয়া জাল ঝাড়িলে কি তাহা হইতে চন্দ্রবিম্ব পাওয়া যায়? বলো। তেমনই বাক্যের বাচালতায় বৃথাই প্রতীতির (অনুভবের) চেষ্টা করা হয়, পরন্তু যথার্থ বোধের সময় দেখা যায়—সত্যই কোনও অনুভূতি হয় নাই। —(ক্রমশঃ)

অনুপম

[ইন্দিরাদেবীর মীরাভজনের অনুবাদ]

শ্রীদিলীপকুমার রায়

দেখিনি তোমার মতন কাউকে শ্যামল—আমার নয়নে!
চিতচোর! আঁখির আড়াল দিয়ে আসো চিত্তে কেমনে?

অগণন আমার মতন অনাথ, কে নাথ তোমার মতন আর?
তবুও বিন্দু মজে সিন্ধুতে যেই—হয় সে পারাবার।
অকূলে কৃপার মীরা ডুবল—কেটে কূলের বাঁধনে।

বঁধু, কে তোমার মতন দয়াল, নিঠুর কে তোমার মতন?
পরশে যার মিলিয়ে যায় পলে—ধন-গৃহ-পরিজন!
মধুময় প্রেমিক—তবু দাও না ধরা চাইলে মিলনে।

বাঁধলে কেমন প্রেমে—কাটলেও যার কাটে না বন্ধন!
নাম যার যায় না ভোলা—থাকুক কি বা থাক দূরে ভুবন।
জনমে জনমে যার দাসী মীরা চায় শ্রীচরণে।

ওরা গায়ঃ তুমি ত্রিলোকপতি চক্র-সুদর্শনধারী
আমি গাইঃ তুমি গোপাল আমার হৃদি-বৃন্দাবনচারী।
হে পরম সুন্দর নাথ বন্ধু মীরার জীবন-মরণে।

স্মৃতি-কুসুমাঞ্জলি

ডাক্তার শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়*

১৯০৬ খৃঃ ফার্স্ট আর্টস্ পরীক্ষা দিয়া শিবপুর ইঞ্জিনিয়রিং কলেজে ভরতি হইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানকার মনোনয়নের কার্ড পাওয়ার পর ইচ্ছা হইল বি.এ. পরীক্ষা দিয়া ইঞ্জিনিয়রিং পড়িব। রাজনৈতিক কারণে এই সময় মোটেই পড়াশুনা করি নাই। ১৯০৮ খৃঃ মেডিক্যাল কলেজে ভরতি হইলাম।

আমাদের সাবেক বাড়ীর পাশেই স্বর্গীয় ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গদের অনেকেই সে বাড়ীতে আসিতেন। আমরা বিদ্রূপ করিতাম, তখন এদিক সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ ছিলাম।

আমাদের বাড়ীটি তিনমহল ছিল, বাহিরের মহলে একটি বড় উঠানে আমরা খেলাধূলা করিতাম। একদিন বৈকালে অনেকক্ষণ ধরিয়া লাফালাফি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি এবং ঐ উঠানের দক্ষিণে বৈঠকখানা-ঘরের উত্তর বারান্দায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম। উঠানের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বাটীর দ্বিতলে ডাক্তার বিপিনবাবুর শয়নকক্ষ। হঠাৎ দেখি আমার বামদিকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' নামক একটি পুস্তকের খানকতক ছেঁড়া পাতা পড়িয়া রহিয়াছে। পূর্বে এই পুস্তকের নামও শুনি নাই। পাতা কয়খানি কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে লাগিলাম। এত ভাল লাগিল যে চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল। সমগ্র বইখানি পড়িবার জন্য বিশেষ আগ্রহ হইল।

পুঁটিয়ার মহারাণীর জামাতা বিশ্বেশ্বরবাবুর ভাগিনেয় বিভূতিবাবু সিটি কলেজে বি. এ. পড়িতেন এবং আমাদের সমিতিতে আমার নিকট লাঠিখেলা শিখিতেন। সেই কারণে তাঁহার সহিত হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বইটির বিষয় কিছু জানেন কিনা। তখন ঐ পুস্তকের তিন ভাগ বাহির হইয়াছিল, তিনি আমায় তিন ভাগই পড়িতে দেন।

পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদিগের উপর আমার প্রগাঢ় ভক্তির সঞ্চার হইল। ঐ সময়ের কিছুদিন পূর্বে আমাদের সাবেক বাড়ীর কাছে 'উদ্বোধন কার্যালয়' ছিল এবং নিকটেই ছেলেরা একটি লাঠিখেলার সমিতি করিয়াছিল। আমাকে উহাদের খেলা দেখিবার জন্য দুইবার লইয়া যায়। বেলুড় মঠের জ্ঞান মহারাজ (ব্রহ্মচারী জ্ঞান) তখন ঐ স্থানে থাকিতেন। পরে শুনিয়াছিলাম উদ্বোধন কার্যালয় ওখান হইতে বাগবাজারে কোথায় উঠিয়া গিয়াছে।

'কথামৃত' পাঠের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিবার পর একদিন বৈকালে চিৎপুর রোড ধরিয়া লোককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। বাড়ীতে ঢুকিয়াই বামদিকে বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীশরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ)-কে দেখিতে পাইলাম এবং অতিশয় শ্রদ্ধান্বিতভাবে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। আমার সকল পরিচয় পাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ঠাকুরঘরে গিয়াছিলাম কি না। আমি বলিলাম, এখানে এই প্রথম আসিতেছি, ঠাকুরঘর কোথায় জানি না। তখন তিনি একজন সাধুকে আদেশ করিলেন—আমাকে ঠাকুরঘরে লইয়া যাইতে। আমি ঠাকুরঘরে যাইয়া দর্শন ও প্রণাম করিয়া প্রসাদ ধারণ করিয়া নীচে মহারাজের নিকটে আসিয়া পুনরায় বসিলাম।

* বিবিধ সংবাদে লেখকের পরলোকগমন-সংবাদ দ্রষ্টব্য।

সেই সময় ডাক্তার কাঞ্জিলালবাবু প্রত্যহ 'মায়ের বাড়ী'তে আসিয়া সন্ধ্যার পূর্বে শরৎ মহারাজের নিকট গান শিক্ষা করিতেন। মহারাজ তানপুরা বাঁধিয়া তাঁহাকে দিলেন—তিনি প্রথমেই 'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ' এই গানটি গাহিতে লাগিলেন। ছেলেরা মিছিল করিয়া ঐ গানটি গাহিয়া যাইতেছিল, শুনিয়া আসিয়াছিলেন। ঐ গান ইহার পূর্বে সভাসমিতিতে আমি বহুবার গাহিয়াছি, সেইজন্য গানটির সুর ঠিক হইতেছে না বলিয়া আমার অস্বস্তি হইতে লাগিল। আমি বলিলাম, 'ঐ গানের সুর আপনার হইতেছে না।' তখন মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি গান জান নাকি?' আমি বলিলাম, 'মহারাজ, এই গান বহুবার গাহিয়াছি।' তখন মহারাজ আমাকে গানটি গাহিয়া শুনাইতে আদেশ করিলেন।

গান শুনিয়া মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শ্যামাসঙ্গীত কিছু জান কি না।' উত্তরে বলিলাম, 'কিছু কিছু জানি।' বলিয়া পাঁচ ছয়খানি শ্যামাসঙ্গীত গাহিয়া শুনাইলাম। মহারাজ গান শুনিয়া বলিলেন, 'তোমার বেশ গলা। তুমি গান শেখ, তান মান লয় শিখিলে তুমি উঁচুদরের গায়ক হইতে পারিবে।' আমি বলিলাম, 'মহারাজ, আমার গান শিখিবার খুব ইচ্ছা আছে, কিন্তু হইয়া উঠিবে কি না বলিতে পারি না।'

সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া আমি বলিলাম, 'মহারাজ, আমি এইবারে আসি।' আবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম এবং বাটী ফিরিবার জন্য উদ্যত হইলাম। মহারাজ বাটী ফিরিবার আদেশ দিয়া বলিলেন, 'আবার এস।' সেই কথা শুনিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়া বাড়ী ফিরিলাম। মনে হইতে লাগিল যে এত মিষ্ট করিয়া 'আবার এস' এই কথা বলিতে কাহাকেও কখনও শুনি নাই এবং সেইদিন হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুর ও মহারাজদের প্রতি আমার আকর্ষণ জন্মাইল এবং নিয়মিতভাবে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী যাইতে লাগিলাম।

সেই সময়ে অরবিন্দঘোষ-মহাশয় 'বন্দে মাতরম্' ইংরেজী কাগজ সম্পাদনা করিতেন এবং বাংলা 'যুগান্তর' কাগজ দেবব্রতবসু-মহাশয় সম্পাদনা করিতেন। দুইজনেই বোমার মামলায় ধৃত হইলেন। অরবিন্দবাবু পণ্ডিচেরী চলিয়া গিয়া সাধন-ভজনে মনোনিবেশ করিলেন এবং সেইখানেই শ্রীঅরবিন্দরূপে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দেবব্রতবাবুর বিরুদ্ধে মামলা প্রমাণাভাবে প্রত্যাহৃত হইলে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর-মায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হইলেন, তাঁহার নাম হইল 'স্বামী প্রজ্ঞানন্দ'। তিনি 'মায়ের বাটী'তেই বসবাস করিতে লাগিলেন। আমার সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। তিনি পণ্ডিত ছিলেন এবং সকলের প্রতি সহৃদয় ও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং সকলকেই সমান ভাবে ভালবাসিতেন। তাঁহার সঙ্গলাভে আমরা সকলেই বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলাম।

সাধু সজ্জন-পরিবেষ্টিত 'মায়ের বাটী'টির পরিবেশ অতি উচ্চ ধরনের ছিল। তাহার উপর যখন শ্রীশ্রীমা আসিয়া ওখানে থাকিতেন, তখন ঐ বাটীর শোভা এবং আকর্ষণ এত বাড়িয়া যাইত যে সকলেই আমরা আনন্দে ভরপুর হইয়া থাকিতাম। শ্রীশ্রীমা আহারান্তে দুধ-ভাত মাখিয়া একটি বাটিতে করিয়া আমাদিগের জন্য প্রসাদ রাখিয়া দিতেন। আমি এবং আমার মতো যাহারা প্রত্যহ বৈকালে মায়ের বাটীতে যাইত তাহারা সকলেই সেই প্রসাদ পরম আনন্দে একটু একটু করিয়া ধারণ করিত। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য প্রবোধবাবু খুব শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং বেশ মৃদঙ্গ বাজাইতে পারিতেন। শ্রীশ্রীমায়ের অবস্থানকালে সন্ধ্যার পর প্রায়ই গানবাজনা হইত এবং প্রবোধবাবু মৃদঙ্গ সঙ্গত করিতেন। শ্রীশ্রীশরৎ মহারাজও সেই সময় আনন্দে ভরপুর হইয়া থাকিতেন। —(ক্রমশঃ)

সমালোচনা

দীক্ষিতের নিত্যকর্ম ও উপাসনা—শ্রীকেবলানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক সংকলিত। প্রকাশক—শ্রীসতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল, সন্তোষপুর "চার্চ কলোনি, যাদবপুর, কলিকাতা—৩২। পৃষ্ঠা—২৬৪, মূল্য পাঁচ টাকা।

শাস্ত্রানুমোদিত সৎকর্মের আচরণে চিত্ত শুদ্ধ না হইলে সাধনমার্গে প্রবেশ-লাভ দুরূহ। কিন্তু 'গহনা কর্মণো গতিঃ'—কর্মপ্রধান ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন বিরাট ও জটিল বলিয়া আচরণীয় কর্মসমূহের মর্মোদ্ঘাটন সহজ নয়। দীক্ষা গ্রহণ করিলেও নিয়মিত সাধন-ভজন ও দীক্ষিতের কর্তব্য যথাযথ অনুষ্ঠানের অভাবে সাধকের জীবনে ঈশ্বরকৃপা শান্তি ও আনন্দ লাভ হয় না। যাঁহারা সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা গুরু-সকাশেই অনুষ্ঠান-পদ্ধতির আলোচনা করিয়া সংশয় নিরসন করিবেন। যাঁহারা উপাসনা-রহস্য জানিতে উৎসুক তাঁহারা বর্তমানকালোপযোগী সহজসাধ্য সাধনার দিগ্‌-দর্শন আলোচ্য গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকায় (৫৮ পৃষ্ঠা) পাইবেন সন্দেহ নাই।

পুস্তকখানিতে অকারাদি-ক্রমে একটি সূচী প্রথমেই আছে বটে, তথাপি অধ্যায়ানুযায়ী একটি বিষয়সূচীর অভাব অনুভূত হয়। গ্রন্থারম্ভে অধ্যায়-সূচী দিয়া গ্রন্থশেষে অকারাদি-ক্রমিক সূচী দেওয়া যাইতে পারে।

শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুকূল যুক্তি সহায়ে বৈধ কর্মের প্রয়োজনীয়তা স্থাপন এবং নাস্তিক্যবাদ ও অশ্রদ্ধা হইতে মনকে মুক্ত করিয়া তাহাকে অন্তর্মুখ করিবার উপায়গুলি সাধককে সাহায্য করিবে।

আনন্দই জীবের প্রকৃত স্বভাব, ব্রহ্মের জীবরূপে ভ্রান্তি, মায়া অতিক্রমণের পন্থা, ঈশ্বর নিরাকার হইয়াও সাকার, তন্ত্রের ভাবত্রয়, ভাবশুদ্ধিই লক্ষ্যের বস্তু, ইষ্ট-সাধনার পক্ষে যৌবন-কালই অধিকতর উপযোগী, বিভিন্ন দেবদেবীর মন্ত্র-পূজা-ধ্যান-জপ-প্রণালী, দক্ষিণাকালিকার বিস্তৃত পূজা ও হোম-পদ্ধতি প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য তত্ত্বে পুস্তকটি সমৃদ্ধ।

সাধনা গুরূপদেশ সাপেক্ষ, এবং গুরুর নির্দেশানুযায়ী করণীয়। চিকিৎসার পুস্তক পড়িয়া যেমন রোগনির্ণয় বা ঔষধনির্বাচন হয় না, সেইরূপ সাধন-পদ্ধতির গ্রন্থ পড়িয়া সাধনা করা যায় না, তথাপি স্বীকার করিতে হয় ইহা খানিকটা সাহায্য করে মাত্র। **—জীবানন্দ**

সরণী—'ভাস' প্রণীত। প্রকাশক—বাণী-তীর্থ, ২৬-২বি, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ২।০, পৃষ্ঠা ১৪৫।

বাংলা দেশের সজল আবহাওয়াতে আপাত-অদৃশ্য কবিত্বকণার প্রাচুর্য রয়েছে—একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। পরিচিত বাঙালীর মধ্যে এমন লোক খুব কম মেলে, যাঁরা জীবনে দু'চারবার পদ্য লেখার চেষ্টাও করেননি। এতে পরিহাসের কোন কারণ নেই। ভাবলোকের এই নীহারিকা থেকে কিছুসংখ্যক নক্ষত্র-কবি আমাদের মানস-গগনে উদিত হবেন—এমন আশা করা যায়। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতার প্রতি যাঁদের আগ্রহ আছে, তাঁরাই একথা স্বীকার করবেন। দেশের বেশীর ভাগ মানুষের মনে এই কাব্যচর্চার প্রেরণা থাকার ফলে অজস্র কাব্যগ্রন্থ প্রতিবৎসরই প্রকাশিত হয়। 'ভাস'-প্রণীত সরণীও তেমনি একটি কাব্যগ্রন্থ। রচনার সার্থকতায় নয়, কবির আন্তরিকতায় এ গ্রন্থের পরিচয়। মাঝে মাঝে কয়েকটি কবিতায় ভাবের সৌন্দর্য রয়েছে—'অকাল', 'আজবদেশ', 'দিল্লী', 'রন্ধনপ্রশস্তি' প্রভৃতি কবিতা লক্ষণীয়। **—প্রণব ঘোষ**

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

নিউ দিল্লী : রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের ১৯৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ১৯২৭ খৃঃ এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন শাখা-কেন্দ্রসমূহের মধ্যে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুদৃশ্য মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূর্ণাবয়ব মর্মর মূর্তি, ৯০০ লোকের উপবেশনোপযোগী প্রশস্ত ভাষণ-গৃহ, শিশুবিভাগ-সমন্বিত আধুনিক গ্রন্থভবন ও পাঠাগার, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম-সমন্বিত ত্রিতল যক্ষ্মা-ক্লিনিক প্রতিষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্য।

ইহার বর্তমান কর্মধারা :

(১) ধর্ম : নিয়মিত আলোচনা ও সময়োপযোগী বক্তৃতার মাধ্যমে বেদান্তের জীবনপ্রদ ভাব ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী-প্রচারের চেষ্টা করা হয়। দৈনন্দিন ভজন, পূজা, ধ্যান, মাঝে মাঝে রামনামকীর্তন প্রভৃতি সহায়ে সমাজে যাহাতে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত হয়, তাহারও ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

(২) চিকিৎসা : এই বিভাগ কর্তৃক আশ্রমে হোমিওপ্যাথিক ফ্রি বহির্বিভাগ এবং কারোলবাগে ফ্রি যক্ষ্মা-ক্লিনিক পরিচালিত হয়। আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৪২,৪৭৬ (নূতন ১৪,০২৭)। যক্ষ্মা-বহির্বিভাগে ১০৮,৬৪৪ জন রোগী (নূতন ১,৯৩৭) চিকিৎসা লাভ করে, অন্তর্বিভাগে ৫৩১ জন রোগী (স্ত্রীলোক ২৬২) পর্যবেক্ষণ করা হয়। ৪০০টি পরিবারকে বিনামূল্যে দুগ্ধ দেওয়া হইয়াছিল। গত বৎসর একটি নূতন এক্স-রে ইউনিট সংযোজিত হইয়াছে।

(৩) শিক্ষা ও সংস্কৃতি : আশ্রমে ফ্রি লাইব্রেরি ও পাঠাগার পরিচালিত হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগারে পুস্তক-সংখ্যা ১০,৭৫১, পঠনার্থে প্রদত্ত সংখ্যা ১০,৫৮০, দৈনিক পাঠক-সংখ্যা গড়ে ৩৫০। পাঠাগারে ১৪টি দৈনিক ও ১০৩টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। সংস্কৃত-শাস্ত্রে আগ্রহশীল বয়স্ক ব্যক্তিগণের জন্য সংস্কৃত-ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। তুলসী-রামায়ণের হিন্দী আলোচনাও বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্ত-সমিতির উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেকানন্দ-হলে প্রতি রবিবার সকালে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ 'পাতঞ্জল যোগসূত্রের' ক্লাস করেন। ছাত্র ও শিক্ষক মিলিয়া গড়ে শ্রোতৃসংখ্যা ১৫০।

(৪) প্রচার : আলোচ্য বর্ষে সাপ্তাহিক বক্তৃতা-সংখ্যা আশ্রমে ২৫ এবং বাহিরে ২৩, শ্রোতৃবৃন্দের মোট উপস্থিতি যথাক্রমে ৩১,০০০ এবং ৩,৬৩৫। কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং আন্তর্জাতিক ধর্মেতিহাস-সভায় আহূত হইয়া জাপানে যান, ফিরিবার পথে সিঙ্গাপুর ও ফিজি দ্বীপপুঞ্জেও বক্তৃতা দেন। ভারতের বাহিরে ৩২টি সভায় ১৫,০০০ শ্রোতা যোগদান করেন। এই বৎসরের মোট বক্তৃতা ও আলোচনার সংখ্যা ২০৬, মোট শ্রোতৃসংখ্যা ৯২,০২০।

(৫) জন্মোৎসব : শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ ও নানকের জন্মদিন পূজা পাঠ ভজন আলোচনার মাধ্যমে যথোপযুক্ত গাম্ভীর্য সহকারে প্রতিপালিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের ৯৬তম জন্মোৎসব উপলক্ষে স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় ২,২৫০ ছাত্র যোগদান করে, এবং তাহাদিগের মধ্যে মোট ৩০৪টি পুরস্কার বিতরিত হইয়াছিল। বক্তৃতার বিষয় ছিল—'স্বাধীন ভারতে স্বামী

বিবেকানন্দের শিক্ষা' ও 'ভারতের যুবকগণের প্রতি স্বামীজীর বাণী'। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব আশ্রমে ও দিল্লীর বিভিন্ন অঞ্চলে সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

(৬) সারদা মহিলা-সমিতির সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক কার্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বলরাম-মন্দির (কলিকাতা) : নিম্নোক্ত ক্রম অনুযায়ী প্রতি শনিবার পাঠ ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল—

	বিষয়	বক্তা
এপ্রিল :	বাংলার নবযুগ ও বিবেকানন্দ	শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়
	শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত	স্বামী দেবানন্দ
	শ্রীরামকৃষ্ণ	„ জীবানন্দ
	নারদীয় ভক্তিসূত্র	পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী
মে :	বিবেকানন্দ	অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার
	শ্রীরামকৃষ্ণ	স্বামী সুশান্তানন্দ
	গীতা	„ দেবানন্দ
	অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ	শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমন্বয়ে রামকৃষ্ণ	স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ
	যোগবাশিষ্ঠে জগতের উৎপত্তি	„ জীবানন্দ
জুন :	শ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শী পূজা	পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
	ধর্মজীবনের ক্রমবিকাশ	স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ
	গীতা	„ সাধনানন্দ
	রামকৃষ্ণ জন্মপ্রসঙ্গ	শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল
	শ্রীমদ্ভাগবত	স্বামী বোধাত্মানন্দ
জুলাই :	স্বামীজী ও ৪ঠা জুলাই	„ নিরাময়ানন্দ
	শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাগবত	পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ
	শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ও অধ্যাপক সমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
	নারদীয় ভক্তিসূত্র	পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী

চিঙ্গলেপুট (মাদ্রাজ) : এই শাখা-কেন্দ্রের ১৯৫৭ ও '৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া চিঙ্গলেপুটে সর্বপ্রথম মিশনের কাজ শুরু হয় ১৯৩৬ খৃঃ এবং ১৯৪০ খৃঃ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটিকে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে এই কেন্দ্রে বালকদের উচ্চ বিদ্যালয় (ছাত্র—৪০০), বালিকাদের উচ্চ বিদ্যালয় (ছাত্রী—২৫৬), প্রাথমিক বিদ্যালয় (ছাত্র—২৫৭, ছাত্রী—১৯৪), ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার ও পাঠাগার (পুস্তক—৪,৭৩০, পত্রপত্রিকা—২২) এবং ছাপাখানা পরিচালিত হইতেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ছাড়া নৈতিক চরিত্র গঠন ও স্বাস্থ্যচর্চার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। বাগান করা, ছাপার কাজ, অঙ্কন প্রভৃতি শেখানোর ব্যবস্থা আছে। মনোরম পরিবেশে আশ্রমটি অবস্থিত।

সেবাকার্য

রাজমহেন্দ্রী : রাজমহেন্দ্রীতে মিশন-পরিচালিত ১৯৫৬-৫৮ খৃঃ বন্যা-রিলিফের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। নদীর বন্যায় এই অঞ্চলের হরিজন অধিবাসিগণ চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়। অন্ধ্রের রাজ্যপাল তাঁহার তহবিল হইতে ২৪,০৬৫৲ দেন। ১½ একর জমি সংগ্রহ করিয়া স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের সহায়তায় ইহাকে ৪০টি প্লটে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি গৃহনির্মাণে ১,২৫০ টাকা খরচ পড়ে। কলোনির জন্য মোট ব্যয় হয় ৫০,৮৪০ টাকা। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক ১৯৫৮ খৃঃ জুন মাসে এই কলোনির উদ্বোধন করেন। ৪০টি দুঃস্থ গৃহহীন হরিজন পরিবারের বাসের সুব্যবস্থা হইয়াছে। সদাশয় গবর্ণরের নাম স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে কলোনির নামকরণ করা হয় 'ত্রিবেদী নগর'।

শিক্ষাশিবির

নরেন্দ্রপুর (২৪ পরগনা) : সমাজ-শিক্ষার কার্যে নিযুক্ত কর্মিগণকে লইয়া গত ১লা জুন হইতে ১৫ই জুন পর্যন্ত সাক্ষরোত্তর শ্রেণীর কর্মসূচী সম্বন্ধে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে লোকশিক্ষা-পরিষদের পরিচালনায় মূল কেন্দ্র নরেন্দ্রপুরে

১৫ দিনের এক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। লোকশিক্ষা-পরিষদ-পরিচালিত ১৫টি শাখা-কেন্দ্রের ৩০ জন কর্মী ছাড়া বাহিরের ১৩টি প্রতিষ্ঠান হইতে ২০ জন কর্মী এই শিবিরে যোগদান করেন। প্রতিদিন ভোর ৪-৩০ হইতে রাত্রি ১০-৪৫ পর্যন্ত সময়-সূচীর মধ্যে নিয়মিত কাজ ছাড়া দৈনিক সাড়ে নয় ঘণ্টা করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। মোট ৫ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

শিক্ষাব্যবস্থার ৪টি ভাগ:

১।	গ্রামে কাজ	প্রতিদিন ২ ঘণ্টা
২।	তাত্ত্বিক শিক্ষা	" ৩ "
৩।	ব্যাবহারিক শিক্ষা	" ৩ "
৪।	বিশেষজ্ঞ দ্বারা বক্তৃতা	" ১½ "

বিভিন্ন দিনে বক্তৃতার বিষয় ছিল: শিবির-জীবনের উদ্দেশ্য, ভারতের বাণী, বয়স্ক-শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাস, গ্রামীণ নেতৃত্ব, সমাজ-শিক্ষায় ছাত্রদের ভূমিকা, যুবসমাজের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, গ্রাম্য দলাদলি ও তাহার সমাধান, সংগঠন নীতি ও পদ্ধতি, গ্রন্থাগার-সংগঠন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও গ্রাম্য জীবন, সাক্ষরোত্তর শিক্ষায় শ্রেণীবিভাগ, গোষ্ঠী-স্বাস্থ্য।

বক্তাদের মধ্যে ছিলেন: স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, ব্রহ্মচারী বিপ্রচৈতন্য, অধ্যাপক শ্রীঅমরেন্দ্র দত্ত-চৌধুরী, অধ্যক্ষ শ্রীহিমাংশুবিমল মজুমদার, শ্রীঅসীমকুমার দত্ত, ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীধনুর্ধারী বসু, শ্রীননী দত্ত, শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীপরিমল কর, শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়, ডাঃ বি পি. ত্রিবেদী।

গ্রামীণ কাজের জন্য নিকটবর্তী একটি গ্রামের একটি পাড়া লওয়া হয়। সেখানে ২৩টি পরিবারের প্রায় সকলেই কুম্ভকার। স্তূপীকৃত জঞ্জাল ছাড়া ঘরবাড়ীর চারিদিকে স্তূপীকৃত ভাঙা হাঁড়িকলসীর টুকরা ছিল। শিবিরের ছাত্রেরা গ্রামবাসীদের সহায়তায় সেগুলি পরিষ্কার করিয়া কিভাবে ঘরবাড়ীর চারিপাশ পরিষ্কার রাখিতে হয় শিখায়, সারের গর্ত, সবজিবাগান, বেড়া প্রভৃতি করিয়াও দেখাইয়া দেয়। ২য় সপ্তাহে গ্রামের রাস্তা মেরামত ও জলনিকাশের ভাল ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গ্রামবাসীদের উন্নত জীবনের পথ ধরাইয়া দেয়।

ব্যাবহারিক কাজের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির উপর জোর দেওয়া হয়:

(১) পাঠ্যবস্তু প্রণয়ন—প্রাচীরপত্র, পোস্টার, সদ্য-সাক্ষরদের জন্য বয়স্ক সাহিত্য, ছোট গল্প। (২) শ্রুতিচাক্ষুষী পদ্ধতিতে—গীতি-আলেখ্য, একাঙ্ক নাটক, ম্যাজিক লণ্ঠন, সিনেমা। (৩) হিসাব রাখা। (৪) প্রাথমিক শুশ্রূষা। (৫) দেশী খেলা। (৬) গোশালা, হাঁস-মুরগী পালন, মাছের চাষ, মৌমাছি পালন, বই বাঁধা শেখা।

১৪ই জুন শিবিরের সমাপ্তি-উৎসব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাসচিব ডক্টর ডি এম সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কৃতী প্রতিযোগীদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যবিভাগের সেক্রেটারি শ্রীবি বি. ঘোষ। সভান্তে শিক্ষার্থীদের রচিত একটি গীতি-আলেখ্য ও একটি একাঙ্ক নাটকের অভিনয় হয়।

অতিথিভবন-উদ্বোধন

বাঁকুড়া: গত ২৬শে জুলাই, বেলা ৯ঘটিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ কর্তৃক বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে 'শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী স্মৃতি' অতিথি-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন-কার্য সুসম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে বাঁকুড়া জেলাশাসক শ্রীরণজিৎ ঘোষ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সভায় স্থানীয় মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মহেশ্বরানন্দজী অতিথি-ভবনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেন। সভায় শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বক্তৃতা-সূচী

গত মে ও জুনমাসে বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ কলিকাতা নগরী ও তাহার উপকণ্ঠে নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি দেন :

স্থান	বিষয়
বাগবাজার, বলরাম-মন্দির	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ, ধর্মজীবনের ক্রম-বিকাশ
বেলুড়মঠ, ট্রেনিং সেণ্টার	মহাপুরুষদের পুণ্যস্মৃতি
রহড়া, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম	সফল জীবন
বারাসত, শ্রীরামকৃষ্ণ শিবানন্দ আশ্রম	মহাপুরুষ শিবানন্দজীকে যেরূপ দেখিয়াছি
কাশীপুর ক্লাব	প্রাচীন ও নবীন ভারত
সিঁথি রামকৃষ্ণ সংঘ	যিনি বিবেকানন্দকে গড়িয়াছিলেন
শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রম	ভারতীয় বালিকাদের জীবনাদর্শ
নরেন্দ্রপুর, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম	ছাত্রজীবন
টালিগঞ্জ, জয়শ্রী সেবা প্রতিষ্ঠান	শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারের বৈশিষ্ট্য
ঢাকুরিয়া, পল্লীমঙ্গল সমিতি	শ্রীরামকৃষ্ণের মহত্ত্ব
শ্যামপুকুর সারদা সংসদ	ভারতীয় নারীর আদর্শ

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার

নিউইয়র্ক : রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টার—প্রতি রবিবার বেলা ১১টার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয় :

এপ্রিল : মানুষের দৈব উপাদান, আচার্য শঙ্করের জীবন ও বাণী, শুদ্ধচৈতন্য সম্বন্ধে সচেতনতা, ধ্যানের প্রণালী।

মে : প্রকৃত এবং প্রতীয়মান সুখ, আধ্যাত্মিক জ্ঞানদীপ্তি। [এ পর্যন্ত স্বামী ঋতজানন্দ একাই চালাইতেছিলেন, অতঃপর স্বামী নিখিলানন্দ ভারত হইতে ফিরিয়া আসেন।] ভারতে যাহা দেখিয়াছি, বুদ্ধবাণী, আত্মার সন্ধানে মানুষ।

জুন : হিন্দুধর্ম ও আধুনিক সংশয়, ঈশ্বরের প্রকৃত অনুসন্ধিৎসু কে? আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের প্রয়োজনীয়তা, যোগানুভূতির প্রকারভেদ।

প্রতি মঙ্গলবার ধ্যান ও নারদীয় ভক্তিসূত্রের ক্লাস এবং প্রতি শুক্রবার উপনিষদ্ অধ্যাপনা ও আলোচনা করা হয়।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে ভক্ত ডাঃ শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি গত ১৫ই শ্রাবণ শুক্রবার শেষ রাত্রে ৭২ বৎসর বয়সে কম্বুলিয়াটোলায় নিজ বাসভবনে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের পরম ভক্ত ডাক্তার শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় পরলোকে গমন করিয়াছেন। দীর্ঘকাল তিনি রোগ ভোগ করিতেছিলেন এবং গত বৎসর একটি অস্ত্রোপচারের পর হইতে শয্যাগত ছিলেন।

ছাত্রজীবনেই শ্যামাপদ শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা-সহচরগণের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁহাদের বিশেষ স্নেহ ও কৃপা লাভ করেন। তিনি ও তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষালাভ করিয়া সংসার-জীবনে উত্তম ভক্তের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

মেডিক্যাল কলেজ হইতে পাশ করিয়া তিনি উত্তর কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার বিপিন বিহারী ঘোষ-মহাশয়ের সহকারীরূপে কাজ আরম্ভ করেন। উদ্বোধনে, মঠে ও বলরাম-মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের ও শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচরগণের চিকিৎসা ও সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

উদ্বোধনের এই সংখ্যায় তাঁহার লিপিবদ্ধ 'স্মৃতি-কুসুমাঞ্জলি'র প্রথমাংশ প্রকাশিত হইল। শরণাগত ভক্তের আত্মা শান্তি লাভ করিয়াছে। তাঁহার সহধর্মিণী কয়েক বৎসর পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছেন, আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

খাদ্য-পরিস্থিতি

১৯৫৮-৫৯ খৃঃ পৃথিবীতে ১৩৫ কোটি টন খাদ্য উৎপন্ন হইয়াছে, গত বৎসর হইতে প্রায় ৯০ লক্ষ টন বেশী। পাকিস্তান ও কাম্বোডিয়া ছাড়া এশিয়ার সর্বত্রই ভাল বর্ষার দরুন বেশী ফসল উৎপন্ন হইয়াছে। পাকিস্তানে এবার গমের ফলন প্রচুর হয়। অভাবের দেশসমূহে যথেষ্ট ফলনের জন্য বৎসরের প্রথম দিকে আমদানি-রপ্তানি অন্য বৎসরের তুলনায় এবার কম ছিল, তবে ভারতকে প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশের চাল আমদানি করিতে হয়।

[F.A O. হইতে সংকলিত]

আমেরিকায় দেশবিদেশের ভাষাশিক্ষা

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নূতন কর্মসূচী অনুসারে ব্যাপকভাবে এশিয়ার ও আফ্রিকার ভাষা ও কৃষ্টি শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা, হিন্দুস্থানী, মারাঠী, তামিল ও তেলুগু শেখানো হইবে।

শিক্ষা স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ বিভাগের সেক্রেটারি আর্থার ফ্লেমিং বলেন: অপর দেশের শুধু ভাষাই যে আমাদের শিখতে হবে তা নয় তাদের অর্থনীতি এবং কৃষ্টিও আমাদের জানতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই কর্মসূচীতে ৩০ লক্ষ ডলার খরচ করবেন, সারা যুক্তরাষ্ট্রে ছড়ানো ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে। ২০০ জন গ্রাজুয়েটকে হিন্দুস্থানী, রাশ্যান, চীনা, আরবী, জাপানী ও পোর্টুগীজ ভাষা শেখবার জন্য ফেলোশিপ দেওয়া হবে। ২০টি গবেষণা-পরিকল্পনাও হাতে নেওয়া হয়েছে—ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। [USIS—হইতে সংকলিত]

ভারতীয় বিজ্ঞানের গুণগান

সম্প্রতি লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যুবকদের বিজ্ঞান-পক্ষে (International Youth Science Fortnight) বৃটিশ বৈজ্ঞানিক সার আলেকজাণ্ডার ফ্লেক তাঁহার সাম্প্রতিক ভারত ও পাকিস্তান সফর উল্লেখ করিয়া বলেন: ভারত বিজ্ঞানের প্রয়োগ করিয়া নানা দিকে উন্নতি করিতেছে, আগামী আণবিক যুগের জন্যও ভাবতে যথেষ্ট মোনাজাইট মজুত আছে।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ ক্রমশঃ বিজ্ঞানের জটিলতর সমস্যা-সমাধানে সক্ষম হইতেছেন, এবং তাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানের সুখ-সুবিধা কাজে লাগাইতে অগ্রসর। যদিও ভারতে তিন চতুর্থাংশ লোক লিখিতে বা পড়িতে জানে না, তথাপি বিজ্ঞানের নানা বিভাগে শিক্ষিত যথেষ্ট গ্র্যাজুয়েট আছেন—যাঁহারা যন্ত্রশিল্পের সকল দিক না হইলেও বর্তমানের বহু প্রয়োজন মিটাইতে পারেন।

সার আলেকজাণ্ডার প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রতিভারও সুখ্যাতি করিয়া বলেন: জল-সরবরাহ ও জলনিকাশ-বিজ্ঞানের নিদর্শন মহেন্‌জোদাড়োয় দেখিয়াছি। রোমানরা বৃটেনকে সভ্য করিতে আসার পূর্বেই ভারত ইস্পাত প্রস্তুত করিয়া রপ্তানি করিতে শুরু করিয়াছে। বীর আলেকজাণ্ডারকে তিন টন ইস্পাত প্রদত্ত হয়—একথা ইতিহাসেই লিপিবদ্ধ আছে। ভারতের মধ্য দিয়াই ইস্পাত সিল্ক কাগজ কাচ ও বিস্ফোরকদ্রব্য-প্রস্তুতপ্রণালী ইওরোপের দিকে গিয়াছে। একজন ভারতীয়ই পঞ্চম শতকে ত্রিকোণমিতির সাইন (Sine)—সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলির অনুপাত ধারণা করেন।

পরিশেষে তিনি বলেন: এই সব দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাইবে বিজ্ঞানের বিস্তৃতি একমুখী নয়, আজ প্রাচ্যদেশগুলি পশ্চিম হইতে বিজ্ঞান শিখিতেছে। আমরাও তাহাদের কাছে বিপুল ভাবে ঋণী।



উদ্বোধন

শ্রীশ্রীদুর্গাস্তোত্রম্

ব্রহ্মচারি-মেধাচৈতন্য-বিরচিতম্

যামারাধ্যামররিপুবরো রাবণো বাহুদর্পা-
ল্লঙ্কারাজ্যং কনকরচিতং শাসদাসীদবাধম্ ।
বিষ্ণূ রামো নয়নকমলেনাপি সংতোষয়ংস্তাং
রক্ষোরাজং তৃণমিব শিখী নাশয়ামাস জিষ্ণুম্ ॥১॥

রুদ্রঃ শূলী স্বয়মপি বিধির্যন্ত্রয়ান্মুদ্রিতাক্ষঃ
শেতে ভূমৌ শব ইব শিবো রূপমস্যাঃ স্মরন্ সঃ ।
দক্ষেজ্যায়াং তনুমপি যদা হীয়মানাং যদীয়াং
স্কন্ধারূঢ়াং বহতি বিপুলং ভারতং সা শরণ্যা ॥২॥

যদ্দেহাংশা ভবতবসতাকৈকপঞ্চাশদস্যাং
পীঠক্ষেত্রায়তনসুকৃতিস্থানরূপাণি জগ্মুঃ ।
যামাশ্রিত্য প্রথমপুরুষঃ সৃষ্টিকার্যং বিদধ্যৌ
সাস্মাকন্তু প্রকৃতজননী সৈব পূজ্যা শরণ্যা ॥৩॥

বিশ্বারাধ্যা ভবতি জননী বিশ্বাভূতাঽদ্বিতীয়া
দৃশ্যং সর্বং তব বিলসিতং নৈব কিঞ্চিদ্কৃতং স্যাৎ ।
কালার্কাগ্নিগ্রহসুরপতিব্যোমবায়্বগ্নিসিন্ধু-
ক্ষিত্যাদ্যাস্তে জড়চিতিগণাঃ ক্বাসতে ত্বাং বিহায় ॥৪॥

কিংবা সর্বং ন বিতথমিদং সত্যমেব ত্বদীয়ং
কার্যং মিথ্যা ভবতি নু কথং কারণে তত্ত্বভূতে ।
লীনং দৃষ্টং যদপি চ ভবেদ্‌বর্ততে তদ্বিধাত্র্যা-
মুত্তুয়াপি প্রথিতমখিলং তত্ত্ব এব প্রকৃত্যাঃ ॥৫॥

অনুবাদ—যাঁহাকে আরাধনা করিয়া দেবগণের প্রবল শত্রু রাবণ বাহুদর্পে নির্বিঘ্নে সুবর্ণরচিত লঙ্কারাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, স্বয়ং বিষ্ণু শ্রীরামচন্দ্ররূপে নয়নপদ্মের দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বিজয়ী হইয়া অগ্নি যেমন তৃণ ভস্মীভূত করে সেইরূপ সেই রাক্ষসাধিপতিকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥১॥

ত্রিশূলধারী রুদ্র শিব স্বয়ং বিধাতা হইয়াও যাঁহার ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ইঁহার রূপ স্মরণ করিতে করিতে ভূমিতে শবের মত শয়ন করেন, এবং দক্ষের যজ্ঞে যাঁহার বিগ্রহ পরিত্যক্ত হইলে সেই মূর্তি স্কন্ধে ধারণ করিয়া বিশাল ভারতভূমি ভ্রমণ করেন, তিনি (আমাদের) শরণ্য ॥২॥

যাঁহার দেহের অংশসকল এই ভারতবর্ষে একপঞ্চাশৎ পুণ্যস্থানরূপ পীঠক্ষেত্র হইয়াছে, প্রথম পুরুষ (বিরাট্) যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টিকার্যের চিন্তা করিয়াছিলেন—তিনিই আমাদের প্রকৃত জননী, তিনিই পূজ্য, তিনিই শরণ্য ॥৩॥

জননী বিশ্বের আরাধ্যা বিশ্বরূপা অদ্বিতীয়া। সমস্ত দৃশ্য পদার্থ তাঁহার লীলাবিলাস—কিছুই পৃথগ্ভাবে সত্য নয়। কাল, সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, গ্রহ, আকাশ, বায়ু, তেজ, সমুদ্র, পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত জড় ও চেতন পদার্থ, তিনি ছাড়া কোথায় থাকে ? ॥৪॥

অথবা কিছুই মিথ্যা নয়, সবই সত্য। (হে মাতঃ!) কারণস্বরূপ তুমি যখন সত্য, তখন তোমার কার্য কিরূপে মিথ্যা হইতে পারে ? যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়া প্রথিত হইতেছে, যাহা কিছু বর্তমান, যাহা কিছু লয় পাইতেছে, সে সমস্তই প্রকৃতিভূত তোমা হইতেই হইতেছে ॥৫॥

শারদা বরদা এস মা জননী

শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ

শারদা বরদা এস মা জননী দশভুজা ভগবতি !
র ঞ্জিত করি ভূলোক দ্যুলোক দশদিকে তুলি জ্যোতি।
দা ক্ষায়ণি, মাগো তোমার পূজার ঘটা কিবা ঘরে ঘরে,
ব ন্দনা-গীতি গাহে বিহগেরা বন-মন্দিরে ভোরে।
র ক্ত কমল স্বচ্ছ সায়রে উঠিয়াছে শত ফুটি,
দা নিতে অর্ঘ্য পূজিতে মা তব রাতুল চরণ দুটি।
এ কান্তে বসি সেবিকা শেফালী গাঁথিছে হীবকহার,
স মীরণ সদা সিঞ্চিয়া চলে শূন্যে সুরভিসার।
মা লা গেঁথে যায় লতায় পাতায়, ছড়ায়ে সবুজ শাখা
জ ননি, তোমার অঙ্গ ব্যজনে পাখীরা দুলায় পাখা।
ন দী-সৈকতে প্রান্তরে ক্ষেতে নিত্য দিবস রাতে ;
নী রবে বসিয়া কাশ-কুমারীরা শুভ্র চামর হাতে।
দ শদিকে ঐ বাজে নহবত—দোয়েল-শ্যামার শিস,
শ রৎ তোমাকে শ্যাম-সুষমায় সাজায় অহর্নিশ।
ভু বনে ভুবনে তোমার পূজার চলিতেছে আয়োজন,
জাগো মহামায়া জাগাও মোদের সুপ্তিমগন মন।
ভ য়ে ভীত মাগো মর্ত্য-মানব সদা সঙ্কটে পড়ি,
গ নিছে প্রহর অসুর-নাশিনি, তব আশাবাণী স্মরি।
ব রদার বেশে পলকের তরে দেখা দাও মহামায়া,
তিরোহিত হোক যতেক মোদের দুঃখশোকের ছায়া।

কথাপ্রসঙ্গে

মাতৃভাবের মাধুর্য

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য আমাদিগকে অভিভূত করে, প্রেমস্বরূপের সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ হই, মাতৃভাবের মাধুর্যে আমরা ডুবিয়া যাই।

সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী ঈশ্বরের বিরাট বিশ্বে চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা—নদীসমুদ্র বনপর্বত প্রত্যক্ষ করিতে করিতে, নিত্যনিয়ত পরিবর্তনশীল প্রকৃতির ঋতুনৃত্য উপভোগ করিতে করিতে আমরা সৃষ্টিকর্তাকেই ভুলিয়া যাই।

বহির্মুখী ইন্দ্রিয়নিচয় চলিয়াছে নিজ নিজ ভোগ্যবিষয়-সন্ধানে—চক্ষু চলিয়াছে রূপের সন্ধানে, কর্ণ ছুটিয়াছে ধ্বনির সন্ধানে, মনোমত রূপরসগন্ধশব্দ-স্পর্শের সন্ধানে জীবনের এই অভিযান!—কোথায় এর আদি? কোথায় এর অন্ত? 'কবে আমি বাহির হলাম?'—কোথা হইতে? কেন? কাহার আশায়?

স্থূল সূক্ষ্ম বহু বিষয় গ্রহণ করিয়া, বর্জন করিয়া ক্লান্ত মন যখন প্রশ্ন করে: 'কী আমার ঈপ্সিত-তম? কোথায় আমার বিশ্রাম-স্থান? কবে আমার যাত্রা শেষ?' তখনই শুরু হয় প্রত্যাবর্তনের পালা—উৎসমুখ সন্ধানের অভিযানে। মন হয় অন্তর্মুখী, কর্ণ শোনে দূরাগত বংশীধ্বনি, চক্ষে ভাসে প্রেমময়ের প্রতিচ্ছবি! পটীয়সী নর্তকী প্রকৃতি আর পারে না দর্শকের মনকে মুগ্ধ করিতে—আর পারে না তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে! শ্রান্ত ক্লান্ত মন তখন ঘরে ফেরার জন্য ব্যাকুল।

কে আছে ঘরে? কে সেখানে তাহার জন্য অনন্তকাল অনিমেষ-নয়নে প্রতীক্ষা করিতেছেন? কে নিশ্চয়ই জানেন—খেলার শেষে ক্লান্ত শিশু তাঁহারই কাছে ফিরিয়া আসিবে, ছুটিয়া আসিবে—বিশ্রামের জন্য—ঘুমাইয়া পড়িবার জন্য—ক্ষয়ক্ষতির পর পরম পুষ্টির জন্য!

মায়ার খেলার পরে মহামায়ার লীলা শুরু! ঈশ্বরের ঐশ্বর্য আমাদিগকে বিস্ময়বিহ্বল করে, প্রেমস্বরূপের সৌন্দর্য আমাদের মন প্রাণ আকর্ষণ করে; মাতৃভাবের মাধুর্যে মগ্ন হইয়া আমরা আত্মহারা হই, আমাদের হারানো স্বরূপ ফিরিয়া পাই! উৎসেরই বুকে পরিসমাপ্তি; যেখান হইতে যাত্রা শুরু সেইখানেই তো যাত্রা শেষ!

স্বামী আত্মবোধানন্দের দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ৯ই সেপ্টেম্বর (২৩শে ভাদ্র) বেলা ১১-৪৮মিঃ সময়ে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি (ও রামকৃষ্ণ মিশনের গভর্নিং বডির সদস্য) এবং বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের ও উদ্বোধন-কার্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মবোধানন্দ ৬৮ বৎসর বয়সে মূত্রাশয়বিকার রোগে উদ্বোধন-ভবনে (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে) দেহত্যাগ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি রক্তচাপ ও বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, শেষ কয়েক মাস মূত্রগ্রন্থির (kidney) রোগই তাঁহার প্রধান কষ্টের কারণ হইয়াছিল। কলিকাতার হৃদ্রোগ-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্ত দীর্ঘ দিন ধরিয়া স্বয়ং তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই রোগযন্ত্রণার অনেকটা উপশম হইত। শেষ দিন বেলা ১১৷৷টায় ভোগ নামার পর ঠাকুরঘর বন্ধ হইলে স্বামী আত্মবোধানন্দ স্নানচেষ্টার সময় সহসা কিছুক্ষণ হৃদ্‌যন্ত্রে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেন, এবং চরণামৃত ধারণের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম শুনিতে শুনিতে তিনি চিরনিদ্রিত হন। প্রবল বারিবর্ষণ ও দুর্যোগ সত্ত্বেও বহু সাধু ও ভক্তের উপস্থিতিতে উত্তর কলিকাতায় কাশীমিত্র শ্মশানঘাটে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে তাঁহার শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।

স্বামী আত্মবোধানন্দ ১৮৯১ খৃঃ (১২৯৮, আষাঢ়) ময়মনসিংহ জেলায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং চার বৎসর বয়সেই মাতৃহীন হন। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম সত্যেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী এবং পৈতৃক বাসভূমি নেত্রকোণা মহকুমার নওপাড়া গ্রাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রিত শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর স্বামী বিবিদিষানন্দ বিংশাধিক বর্ষ যাবৎ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে সিয়েটল্ শহরে রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ।

বাল্যকালেই সত্যেন্দ্রের মন আর্তসেবার জন্য ব্যাকুল হইত, বিদ্যালয়ে পাঠের সময়ই দেশের পরাধীনতা তাঁহাকে ব্যথিত করিত এবং তাঁহার মন দেশসেবার দিকে আকৃষ্ট হইত। ১৫ বৎসর বয়সে একবার একটি কলেরা-রোগীকে সৎকার করার পর জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া তিনি হরিদ্বারে চলিয়া যান। ১৯১৪ খৃঃ তিনি ৺কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে যোগদান করেন; এবং পরবৎসর মায়াবতী (হিমালয়) অদ্বৈত আশ্রমের কর্মী হইয়া সেখানে যান। এই স্থান হইতে তিনি দুর্গম কৈলাস এবং পরে অমরনাথ প্রভৃতি হিমালয়-তীর্থ দর্শন করেন।

১৯২০খৃঃ তাঁহার দীক্ষাগুরু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই সময় কলিকাতার কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের যে প্রকাশন-বিভাগটি খোলা হয়, স্বামী আত্মবোধানন্দ 'উদ্বোধনে' থাকিয়া তাহার পরিচালনা করিতেন।

১৯২৬ খৃঃ সংঘের প্রথম মহাসম্মেলনের (Convention) সময় তিনি বেলুড় মঠে আসেন এবং নবগঠিত ওআর্কিং কমিটির অন্যতর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২৯ খৃঃ জুলাই মাসে স্বামী বিরজানন্দজীর সহকারীরূপে তিনি বাগবাজার মঠে আসেন, এবং উদ্বোধন-কার্যালয়ের কার্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৩০ ডিসেম্বর হইতে এই কেন্দ্রের সম্পূর্ণ ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। শেষ দিন পর্যন্ত অক্লান্তভাবে এবং কৃতিত্বের সহিত তিনি এই গুরু দায়িত্ব বহন করিয়া গিয়াছেন।

১৯২৯ হইতে ১৯৪৫ খৃঃ পর্যন্ত তিনি মিশনের বাগবাজারে অবস্থিত নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বেলুড়ে অবস্থিত মিশন সারদাপীঠের প্রথমে তিনি সহসভাপতি ছিলেন, সম্প্রতি সভাপতি হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি ও বহুবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি অনাথ ভাণ্ডারেরও তিনি সভাপতি ছিলেন।

কাজকর্মে শৃঙ্খলা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ, প্রকাশনার ক্ষেত্রে শিল্পচেতনা, সঙ্ঘের ও বাহিরের প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-ব্যাপারে শান্ত ধীর সুবিবেচনা, সকলের সহিত—বিশেষভাবে প্রতিবেশীদের সহিত অমায়িক ব্যবহার এবং তাহাদের সুখে দুঃখে সহানুভূতি ও বিপদে আপদে পরামর্শদান—সব মিলিয়া একটি স্নেহকোমল সবল সুন্দর সাধুজীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহা আজ চোখের অন্তরালে চলিয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে তাঁহার অভাব অপরিপূরণীয়। সন্ন্যাসীর দেহমুক্ত আত্মা চির শান্তি লাভ করিয়াছে। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

চলার পথে

'যাত্রী'

তুমি কে মা? এমন ক'রে, আমাদের সকল জীবন ভ'রে, আমাদের সকল শিক্ষায় ব্যাপ্ত হ'য়ে, আমাদের সর্ব-ভাবের আঙ্গিনা ঘিরে ও আমাদের সমস্ত উন্নতির পরিবেশকে ধ'রে র'য়েছ,—রয়েছ আমাদের জীবনের সকল সম্ভাবনার স্বাভাবিক স্বরূপতায়!

আমাদের এই প্রিয় দেহের সৃষ্টি-সহায়ক তুমি—তার পরিপোষণ ও পরিপালনেও তোমার আন্তরিক অবদান অবারিত। শুধু কি তাই। তোমার মাতৃমূর্তির কল্যাণ-অঙ্ক না পেলে কি আমরা এই পৃথিবীর আলো আশা ও আনন্দকে আপনার ক'রে নিতে পারতাম? পারতাম কি আমাদের ধমনীতে উষ্ণ প্রস্রবণ বহাতে, তোমার স্তন্য-সুধার অমৃত-আস্বাদন না পেলে?

আমাদের জীবনের প্রতিটি অণুতে অনুস্যূত রয়েছে তোমার দান, প্রতিটি চিন্তায় বিজড়িত রয়েছে তোমার স্মৃতি, চলা-ফেরার প্রতিটি ছন্দে স্পন্দিত হচ্ছে তোমার শক্তি, জীবনের সবখানিকে ঘিরেই তোমার লীলাখেলা চলেছে, মা। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিকতার মত তা আবার এমন সহজ ক্রমে ও পরম প্রেমে উৎসারিত হচ্ছে যে আমাদের জীবনের সবকিছুকেই যে তুমি প্রথম চালিয়ে দিয়েছিলে—তার প্রারম্ভিক গতি দিয়েছিলে—তা মনে রাখতেই ভুলে যাই। ভুলে যাই—এ পৃথিবীতে আসার আগে তোমারই জঠরে থাকার সময়, তোমার ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছা, তোমার পুষ্টির সঙ্গে আমাদের পুষ্টি, তোমার স্পন্দনের ছন্দে আমাদের স্পন্দনের সমতানতা পরিবাহিত হয়েছিল ব'লেই আমরা আজ মানুষ হ'তে পেরেছি! তোমার জীবনের ঘড়ির সঙ্গে প্রথম ঘড়ি মিলিয়ে নিয়েছিলাম ব'লেই তো আজও সময়বোধ যায়নি, জীবনবোধও হারাইনি। তোমার জীবনের কণা কণা কুড়িয়েই তো আমরা গেঁথেছি আমাদের জীবনের স্বর্ণ-হার। তা ছাড়া আমাদের জীবন-সত্তায় তোমারই জীবনসত্তার গোপন পরিক্রমা আজও চলেছে অব্যাহত—এ কথা যখন ভাবি, তখন আমাদের জীবনে যে তোমার জীবন সর্বতোভাবে বিধৃত এই কথাই মনে জাগে!

এত দিয়েও, আমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাও না কেন, মা? মনে হয়, মাতৃরূপে তুমি মানবী নও, তুমি দেবী। মানুষ হ'লে কি আমাদের এত দিয়ে, পরিবর্তে কিছু না চেয়ে কি থাকতে পারতে? দেবীত্বের তথা মহামানবতার এক সুউচ্চ মণিকোঠায় তোমার মনটি বাঁধা, তাই তুমি নিজের মর্মের শত-বন্ধন ছিঁড়ে, আমাদের জন্য সব দিয়ে, ফতুর হ'য়ে আমাদের 'মা' হয়েছ।

বাস্তব জীবনের সবখানিকে ঘিরেই যখন তোমার এই অভিব্যক্তি, তখন আমাদের চিন্তার রাজ্যে, আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনায় তোমাকে আহ্বান করলে তুমি কি আমাদের না দেখা দিয়ে পারবে? পারবে কি মাতৃরূপের পরম পবিত্রতার মাধ্যমে, আমাদের অধ্যাত্ম-রূপ ফোটাবার জন্য যখন তোমাকে 'মা' বলে ডেকে, আমাদের সবকিছুকে, সেই ভাবের কান্নায় উজাড় ক'রে ঢেলে দেব, তখন কাছে না এসে দূরে সরে থাকতে? আমাদের ছোট বয়সের সেই অজানা-ক্রন্দনে-আঁকা ব্যথার আড়ালে দাঁড়িয়ে কতবার তো কোলে টেনে নিয়েছিলে,—আর আজকের এই অঝোর ক্রন্দনে সাড়া না দিয়ে কি থাকতে পারবে? পারবে কি না এসে, যখন আকুল কান্নায় উতরোল হয়ে বলব :—

হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর স্নেহহীন আকর্ষণে ব্যথিত হ'য়ে সন্তান তোমায় ডাকে, তুমি এস মা, সংসারের হৃদয়হীনতায় আহত হ'য়ে সন্তান তোমায় ডাকে, তুমি এস মা, জীবনের ভাঙা ভেলায় পার হবার সময় ভরসা দেবার জন্য সন্তান তোমায় ডাকে, তুমি এস মা, চারিদিকের দেওয়া-নেওয়ার হিসাব নিকাশে বিপর্যস্ত হয়ে সন্তান তোমায় ডাকে, তুমি এস মা, ওপারের অজানা কথায় সংশয়িত হ'য়ে তোমার অন্তরধন তোমায় ডাকে, তুমি এস মা, আধ্যাত্মিকতার উদ্ভাসিত আলোকে আমাদের স্নান করিয়ে দেবার জন্য সন্তান তোমায় ডাকে, তুমি এস মা। সংশয়াতীত হ'য়ে তোমার কোলে থাকবার জন্য সন্তান তোমায় ডাকে, তুমি কোল প্রসারিত ক'রে এস, মা।

জানি, অন্তরে তোমার শক্তিই আমাদের মাঝে দেখা দিয়েছে আমাদের আত্মারূপে,—বাহিরে আবার সেই শক্তিই বিকশিত হয়েছে 'প্রকৃতি'রূপে। আর এই দুয়ের দ্বন্দ্বেই জন্ম নিয়েছে মানুষের জীবন, তার মনুষ্যত্বও। আমরা যা কিছু করছি, যা কিছু বলছি, তা সবার পেছনে তোমারই শক্তির স্বীকৃতি—এ কথা শাস্ত্রও স্বীকার করে। আমাদের দুর্দিনে আমাদের সকল বন্ধুই—দারা পুত্র পরিজন সকলেই—আমাদের ছেড়ে যেতে পারে, কিন্তু তুমি তো মা, তখনই আমাদের বেশী নিকটে এসে, ধূলো মুছে, কোলে তুলে নাও। জানি, সন্তানের শত অপরাধেও মায়ের কল্যাণহৃদয় অমৃতের আস্বাদন ঝরায়।

তাই বলি, চল বন্ধু, মাকে হৃদয়ের নিবিড় নিভৃতে আহ্বান ক'রে নিতে চল—চল, তাঁর অঙ্কে আমাদের একান্ত নির্ভরতার পরাশান্তি পেতে চল। কোনরূপ প্রতিদানের, কোনরূপ ভয়ের লেশমাত্র না রেখে, এই একাধারে ভীষণা ও মধুরা, ভয়ঙ্করা ও শুভঙ্করা—মহামায়ার বিশ্বময়ী-মাতৃরূপকে হৃদয়ের মৌনগেহে আহ্বান ক'রে তাঁর জন্য সেবাহুতির সাধনা জ্বালাও। তাঁকে জানাও—'অর্ঘ্য তোমার আনিনি ভরিয়া বাহির হ'তে, ভেসে আসে পূজা পূর্ণপ্রাণের আপন স্রোতে।' দেখছ নাকি, পথিক, মেঘ-মেদুর বর্ষার ক্রন্দনময়ী পৃথিবীর অশ্রু মুছিয়ে শরতের এই সোনার রোদ মায়ের মতই আঁখি মুছিয়ে তার হাসি ফুটিয়ে দিয়েছে। চল পথিক, আমরাও মায়ের ঐ শারদীয়া মূর্তির চরণে আনত হ'য়ে প্রাণের প্রণতি রেখে হাসি ফুটিয়ে নিই। চল, চল, আর দেরী নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

রাজনীতি ও ধর্ম

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

এখন আমরা 'ধর্ম' বলিতে বুঝি—Religion. ধর্ম প্রকৃতপক্ষে মানুষের কর্তব্য। যাহার যাহা কর্তব্য, তাহাই তাহার ধর্ম—ইহাই গীতায় বলা হইয়াছে। সে ধর্ম—Religion নহে, কারণ, তাহার সহিত আধ্যাত্মিকতার সম্বন্ধ না-ও থাকিতে পারে এবং তাহার সহিত ঈশ্বরবাদ সংযুক্ত না-ও হইতে পারে।

বর্তমান কালে রাজনীতিকে Religion সম্পর্কশূন্য করিবার একটা চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে—অর্থাৎ কর্মনাশার জলে জাতীয়তা বিসর্জিত করিয়া যাঁহারা ভারতবর্ষকে—বদরীনারায়ণ হইতে কন্যাকুমারী ও চন্দ্রনাথ হইতে দ্বারকা এই দেশকে যাঁহারা বিভক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতের জন্য যে শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে ভারতকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলা হইয়াছে। রাষ্ট্রের কোন ধর্ম নাই। কেহ কেহ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—রাষ্ট্র ধর্মকে বর্জন করে নাই, কোন বিশেষ ধর্মও স্বীকার করে না। সম্রাট্ অর্থাৎ জারকে নিহত করিয়া রুশিয়ায় যে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, তাহাতে ধর্ম একেবারে বর্জিত হইয়াছিল, পূর্বে ব্যবস্থা অন্যরূপ ছিল—রাজ্যে একটি ধর্ম স্বীকৃত ছিল এবং রাজা ধর্মের রক্ষক—Defender of the Faith বলিয়া অভিহিত হইতেন। কিন্তু রাজ্যে যে অন্য কোন ধর্মমত থাকিতে পারিত না, এমন নহে। ভারতবর্ষ যখন হিন্দুস্থান ছিল, তখনও অগ্নির উপাসক পার্শীরা মুসলমানের ধর্মান্ধতার ও পরধর্ম সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতার জন্য পলাইয়া আসিয়া ভারতে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। কালিকটের রাজা (জামোরিন) তাঁহাদিগকে আশ্রয় ও অভয় দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অগ্নির উপাসনায় আপত্তি করেন নাই, কেবল শর্ত করিয়াছিলেন যে তাঁহারা গোমাংস ভক্ষণ করিবেন না। হিন্দুদিগের বৈশিষ্ট্য ছিল—তাঁহারা পরধর্মদ্বেষী ছিলেন না এবং অন্য ধর্মাবলম্বীকে হিন্দুর সমাজে গ্রহণ করিতেন না, সেই কারণে তাঁহারা নির্বিবাদী ছিলেন।

মুসলমানরা সেরূপ ছিলেন না। তাঁহারা অন্য ধর্মাবলম্বীকে ইসলামে দীক্ষিত করা পুণ্য কার্য বলিয়া মনে করিতেন। সেই জন্য তাঁহারা অত্যাচারী ছিলেন। খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীরাও মনে করেন, তাঁহাদের ধর্মই একমাত্র সত্যধর্ম। তাঁহারা মনে করেন, আর সব ধর্মের লোক অন্ধকারে রহিয়াছে—তাঁহারাই তাহাদিগকে সত্যধর্মের পথে লইয়া যাইতে পারেন—

> 'They call us to deliver
> Their land from error's chain'.

কিন্তু সকল ধর্মই—অল্প বা অধিক পরিমাণে আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, মানুষ স্বভাবতই দেবত্বের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে। ধর্মকে বাদ দিলে যে রাজনীতি হয়, তাহা মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক হইতে পারে। কিন্তু জড়বাদ তাহাই চাহে, কারণ তাহা ইহকালসর্বস্ব।

মানুষ আপনাকে যত ক্ষমতাবান্ই মনে করুক না কেন, সে যে সর্বশক্তিমান্ নহে এবং হইতে পারে না, তাহা সে স্বীকার করিতে বাধ্য। আর মানুষের মন স্বভাবতই তাহা স্বীকার করিবার প্রবণতা অনুভব করে।

হিন্দুর সমগ্র সমাজ-জীবন ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। কোন ইংরেজ লেখক ভারতে ইংরেজ কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি প্রদর্শনার্থ বলিয়াছিলেন: হিন্দুদিগের শিক্ষা-পদ্ধতি মানুষের তিনটি প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া রচিত হইয়াছিল—(১) শৃঙ্খলা, (২) সন্তোষ, (৩) ধর্ম। আর ইংরেজ আপনার স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহার প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে সেই তিনটিই বর্জন করিয়াছিল। এ দেশে শিক্ষা-পদ্ধতি শৈশবাবধি মানুষকে ঐ তিনটি বিষয়ে অবহিত করিত, ইংরেজের শিক্ষা-পদ্ধতি ঐরূপ না হওয়ায় বিপদ উৎপন্ন হইতেছে।

তিনি বলিয়াছেন—এ দেশে বিদ্যালয়ে প্রত্যেক ছাত্র প্রথমে দেবার্চনার স্তোত্র গান বা পাঠ করিত, তাহার পরে লিখিবার সময়, প্রথমে ঈশ্বরের নাম লিখিয়া পরে অন্য কিছু লিখিত। এখন যে ঈশ্বর অস্বীকৃত—শিক্ষা যে ধর্মবর্জিত, তাহার ফল ভয়াবহ হইবে।

রাজনীতি যদি আধ্যাত্মিকতা অস্বীকার করে, তাহা যদি ধর্ম উচ্ছিন্ন করিবার প্রয়াসী হয়, তবে তাহা মানুষের মনের অভাব অবজ্ঞা করিয়া যে ব্যবস্থা করে, তাহা কল্যাণকর হয় না।

দেশের লোককে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা দিলে তাহাতে মানুষ সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু অপরের ধর্মাচরণে বাধাদানের অধিকার অস্বীকার করিতে হয়।

আধ্যাত্মিকতা-বর্জিত সমাজ পশুত্বের আদর করে এবং তাহা মনুষ্যত্বের শত্রু।

রাজনীতিকে যাঁহারা ধর্ম অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা বর্জিত করিতে প্রয়াস করেন, তাঁহারা তাহাকে কেবল জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন—তাহা মানব-জাতির কল্যাণকর না হইয়া সর্ববিষয়ে অকল্যাণের কারণ হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ভারত কর্তৃক বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সে জয় অস্ত্রের দ্বারা নহে—আধ্যাত্মিকতার দ্বারা। ভারতবর্ষ অর্থাৎ হিন্দুস্থান একদিন যে নানা দেশে তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সে-ও তাহার আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের জন্য। সেই আধ্যাত্মিকতাই হিন্দুকে পরমতসহিষ্ণু করিয়াছিল এবং ভারতের আধ্যাত্মিক প্রভাবই চীনে, জাপানে, কোরিয়ায়, যব প্রভৃতি দ্বীপে—ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে—মূলতঃ এক, কিন্তু বাহ্যিক ভাবে বিভিন্ন সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল। অরবিন্দ সাহিত্যে, দর্শনে, শিল্পে, বিজ্ঞানে—নানাদিকে প্রাচীন ভারতের অসাধারণ কীর্তির কারণ সন্ধান করিয়া বলিয়াছেন, 'Without a great and unique discipline involving a perfect education of soul and mind, a result so immense and persistent would have been impossible'.

সেই শিক্ষা ও শৃঙ্খলার কারণ ধর্ম—আধ্যাত্মিকতা। তাহা যদি রাজনীতি হইতে বর্জন করা হয়, তবে মানুষের সভ্যতার অবসান হয়, এবং মানুষ পশুত্বের-আদর করিয়া সভ্যতার ধ্বংস সাধন করে।

'একৈবাহং জগত্যত্র'*

স্বামী নির্বেদানন্দ

চণ্ডীতে একটি সুন্দর ভাব রয়েছে। মা ব্রহ্মাণী ইন্দ্রাণী প্রভৃতি রূপ ধ'রে শুম্ভের সঙ্গে লড়ছেন দেখে সে হেসে বললে, 'এই তোমার একা যুদ্ধ করা! তুমি তো দেখছি অনেককে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করছ।' মা তখন হেসে বললেন, 'মূর্খ, জগতে আমি একাই তো রয়েছি! এরা কি আমা থেকে আলাদা? এরা যে আমার ভেতর থেকেই বেরিয়েছে' বলেই মা তাদের নিজ শরীরে লীন ক'রে নিলেন। এখন ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী, ব্রহ্মাণী এঁদের যেমন আমরা মা বলেই মনে ক'রে থাকি, তেমনিধারা যদি জগৎটাকে মায়ের বিভূতি—মা হ'তে উদ্ভূত ব'লে ভাবতে পারি, জানতে পারি, তবেই তো সব গোল চুকে যায়। তিনি কি শুধু ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী প্রভৃতিকেই সৃষ্টি করেছেন? এ সমস্ত জগৎকেই তিনি ভেতর থেকে বের করেছেন, আবার প্রলয়কালে নিজের ভেতর টেনে নিচ্ছেন। তবে ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণীকে যেভাবে আমরা শ্রদ্ধা করি, জগতের আর সকলকে সেভাবে করি না কেন? সকলই তো মায়ের বিভূতি। এরূপ ভাবাই হচ্ছে পরম সাধন। দিনরাত এইভাবে সবকিছুকে মায়ের বিকাশ ব'লে জানতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভাব নিয়েই তো বেশ্যাকেও মা ব'লে দেখে-ছিলেন। বস্তুতঃ শুম্ভের মতো চশমা চোখে আছে বলেই আমরা জগৎকে মা ব'লে ভাবতে পারি না, পৃথক্ পৃথক্ দেখি। সে চশমা খুলে গেলেই দেখব মা-ই সব হয়েছেন। ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী মানে কিনা ইন্দ্রের শক্তি—ব্রহ্মার শক্তি—রুদ্রের শক্তি, মা যে শুধু এই ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, রুদ্রের রুদ্রত্ব—তা নয়, তিনি বৃক্ষের বৃক্ষত্ব, মানুষের মনুষ্যত্ব—সকলের সকলত্বরূপে বিরাজ করছেন।

গীতায়ও—বিশেষ ক'রে বিভূতি-যোগে এই ভাবটি রয়েছে। সকলকে ভগবানের বিভূতি ব'লে ভাবা কঠিন; সেজন্য যেখানে যা কিছু বিশেষ শক্তি সবই ভগবান তাঁর নিজের ব'লে বর্ণনা করেছেন। অর্জুন ব'লে আলাদা একটি লোক রয়েছে—এ ভাবার চেয়ে পাণ্ডবদের মধ্যে তিনিই অর্জুনরূপে বিরাজ করছেন, এ ভাবা অনেক ভাল। যা কিছু বিশেষ শক্তি—সবই ভগবানের ব'লে ভাবতে ভাবতে আমরা ক্রমে সবই তাঁর শক্তির বিকাশ—এটি ভাবতে সক্ষম হব। ভগবান নিজের বিভূতির কথা গীতায় অনেক ব'লে শেষে বলেছেন, 'আমার বিভূতির অন্ত নেই, যেখানে যা কিছু শ্রীসম্পন্ন, অর্থাৎ ঊর্জিত বলযুক্ত—সবই আমার শক্তির অংশসম্ভূত। অধিক কি ব'লব—আমার একাংশেই জগৎ বিধৃত রয়েছে।' ঋষিরা এই তত্ত্ব বহু প্রাচীনকালেই সাক্ষাৎকার করেছিলেন, মুণ্ডকোপনিষদে আছে অগ্নি থেকে যেমন নানা সজাতীয় (অগ্নিধর্মী) স্ফুলিঙ্গ বেরোয়, তেমনি অক্ষর (ব্রহ্ম) থেকে বিবিধ জীব বেরিয়েছে, আবার তাতেই লয় পাচ্ছে। অগ্নি আর তার স্ফুলিঙ্গ একই। আবার কঠোপনিষদে রয়েছে—

> অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
> রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
> একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
> রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তেও আছে—

> সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
> স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

* বিদ্যার্থী আশ্রমে প্রদত্ত ধর্মপ্রসঙ্গ।

সেই সহস্রশির, সহস্রচক্ষু পুরুষ সমস্ত বিশ্ব জুড়ে রয়েছেন, আবার তাকে অতিক্রম করেও রয়েছেন। এই স্থূল জগৎ তিনি বই আর কিছু নয়, আর এর পারে যে সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগৎ রয়েছে—সেও তিনি। সমস্ত জগৎকে তাঁর বিকাশ ব'লে ভাবতে না পারলেও আমরা যদি বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন বস্তুকে তাঁর বিকাশ ব'লে ভাবতে আরম্ভ করি, তাহলেও আমরা এগোতে পাবব। এই সব মহারাজকে (ঠাকুরের সন্তানদের) আমরা যদি ঠাকুরের বিভূতি ব'লে ভাবতে পারি —তিনিই তাঁর ভেতর থেকে এঁদের বের ক'রে নানারূপে লীলা করছেন ব'লে ভাবতে পারি— তাতেও আমাদের অনেক সাধন হ'য়ে যায়। এভাবে যতই একত্বের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় ততই আনন্দ, কেবল আনন্দ। তাই উপনিষদে আছে—'যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি' অর্থাৎ ভূমাতেই পূর্ণানন্দ এবং 'যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্' অর্থাৎ একত্বানুভূতি না হওয়া পর্যন্ত আংশিক আনন্দ।

এই জগৎ মহামায়ার বিভূতি—কি ক'রে যে তাঁর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে, এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকরাও বলছেন, ঋষিরাও অনুভব করেছেন, এই বাইরের স্থূল জগৎ আলোকের স্পন্দন বই আব কিছু নয়। ঈথর-এ নানা রকম স্পন্দন হচ্ছে আর আমরা তাকেই রূপ, রস, মানুষ, ঘোড়া, গরু ব'লে ভাবছি। এ কি রকম ক'রে হয়? মন রয়েছে ব'লে এরূপ হওয়া সম্ভব হচ্ছে। মনেতেই আকাশের কোন স্পন্দন রূপ, কোনটি রস, আর কোনটি মানুষ ব'লে অনুভূত হচ্ছে। আর মনের পশ্চাতে বোধস্বরূপ চৈতন্য রয়েছেন ব'লে এ-সকলের জ্ঞান হচ্ছে। সেই মহাশক্তি একরূপে জড় মন ও আকাশ হ'য়ে রয়েছেন, আর একরূপে চেতন হয়েছেন, আর দুয়ের সংযোগে জগৎ ব'লে একটা পদার্থের ভান হচ্ছে। মনটা যেন একটা কালো পর্দা—তার মাঝখানে একটা ছিদ্র আছে। আকাশের স্পন্দনে আকার কেবলই পরিবর্তিত হচ্ছে। সে কখন সুখেব আকার ধরছে, কখন দুঃখের আকার ধরছে, কখন হাতী, কখন বা মানুষ হচ্ছে। আর এ পর্দার পশ্চাতে রয়েছেন চৈতন্য, ছিদ্রের ভেতর দিয়ে চৈতন্যের আলো বাইরে আসছে, আর আমাদেব সুখ, দুঃখ, হাতী, মানুষ এই সবের অনুভূতি হচ্ছে। মায়াব দুটি শক্তি আছে, একটি আবরণ-শক্তি, অন্যটি বিক্ষেপ-শক্তি। একটি শক্তি পরদা, চৈতন্যকে সে ঢেকে রেখেছে, তাই অনন্ত চৈতন্যের অনুভূতি হচ্ছে না। আর যে শক্তি বলে ছিদ্রটির আকার বদলাচ্ছে, তা হচ্ছে বিক্ষেপ শক্তি, তাতেই চৈতন্যের রশ্মি পড়ে নানারূপ অনুভূতি জাগাচ্ছে। চেতনের স্বভাবই হচ্ছে যে সে নিজে রয়েছে ব'লে অনুভব করে। জড কাকে বলি? যার নিজের সম্বন্ধে বোধ নেই। আমরা কি ভাবতে পারি যে আমরা নেই? তা কখনও হয় না, কাজেই আমরা চেতন। কাউকে যখন ক্লোরোফরম দ্বারা অজ্ঞান ক'রে দেওয়া হয়, তখন তার রূপ-রসের অনুভূতি হয় না, কারণ তখন তার মনেব ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে যায়, সুষুপ্তিতেও তাই। সেই মহাশক্তিই সব হয়েছেন। ভগবানকেও আমরা প্রতি মুহূর্তেই বোধ করছি প্রতিটি অনুভূতির মধ্যে। আমাদের যে স্ত্রী-পুরুষ বোধ হচ্ছে—সেই বোধের শুধু বোধটুকুই তিনি, তিনি বোধস্বরূপ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদে আছে: নানারকম বাদ্যযন্ত্রে নানারূপ শব্দ হচ্ছে, সেখানে নানারূপত্ব বাদ দিয়ে কেবল শব্দ ব'লে যেমন একটি পৃথক্ তত্ত্ব রয়েছে, তেমনি নানারকম বোধের নানাত্ব বাদ দিলে যে নির্বিশেষ বোধটুকু থাকে, তাই ভগবান বা চৈতন্য। একেরই বিভিন্ন বিচিত্র বিকাশ।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী — সমাসন্ন

ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ

শ্রীমতী বার্ক-এর গ্রন্থের[১] সঙ্গে স্বামীজীর পত্রাবলী পড়ার সুযোগ হ'ল আবার। ইংরেজী পত্রাবলীর (১৯৪৮—সংস্করণ) অধিকাংশ চিঠি লেখা হয়েছে (৬৫—৩৬০ পৃষ্ঠা) তাঁর শিকাগোতে আবির্ভাব, ধর্মমহাসম্মেলন এবং প্রায় তিন বছর (১৮৯৩-৯৬) প্রধানতঃ আমেরিকা ও ইংলণ্ডে বেদান্ত-প্রচার বিষয়ে। সেই 'বিরাট-পর্ব' শেষ ক'রে দেশে ফিরেই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ 'উদ্যোগ-পর্ব'। তখন যে বীজ তিনি বপন করেছেন আজ তা মহীরুহ। ১৮৯৯-১৯০০ খৃষ্টাব্দে শেষ বিদেশ-ভ্রমণ-কালেই বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন, বেলুড়ের গঙ্গা-তীরেই তাঁর নির্বাণ (১৯০২) আসন্ন। মাত্র ৪০ বছরের জীবনে 'যুদ্ধপর্ব' সেরে তাঁর 'শান্তি-পর্ব'। এত অল্প দিনে এত বড় কাজ আর কে করেছেন, আমি জানি না। শুধু জানি যে ভারতবাসীকে, বিশেষভাবে বাঙালীকে প্রস্তুত হ'তে হবে – উপযুক্তভাবে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী ব্রত উদ্‌যাপন করতে। আজ ভগিনী নিবেদিতার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করি। ১৯০১ থেকে ১৯১১ সালে তাঁর অকালমৃত্যু পর্যন্ত, নিবেদিতা একাই কত কাজ ক'রে গেছেন, তাঁর Master As I Saw Him প্রভৃতি অমূল্য রচনাই তার প্রমাণ। আশা দেবী (প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা)-রচিত নূতন নিবেদিতা-জীবনীও তার সাক্ষ্য দেয়। তেমনি আরও গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হবে—সে আশা করেই দু'একটি কথা বলছি।

১ Swami Vivekananda in America : New Discoveries By Marie Louise Burke (1958).

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' পত্রিকার নিয়মিত পাঠকরূপে সম্পাদক মহাশয়কে জানাই যে তিনি গত বছর শারদীয়া সংখ্যায় উদ্বোধনের প্রথম সংখ্যার প্রবন্ধ-তালিকা ছেপে আমাদের ধন্যবাদ অর্জন করেছেন। এবার অনুরোধ, তিনি যেন সমাসন্ন বিবেকানন্দ-জন্মশতাব্দী মনে রেখে (১৮৬৩-১৯৬৩) ধারাবাহিক ভাবে বিবেকানন্দ-যুগের অনুসন্ধান (research) শুরু করান। আমার ক্ষুদ্র শক্তিমত আগেই কিছু ইঙ্গিত করেছি—এবারও 'উদ্বোধনে' সে প্রসঙ্গ তুলছি। কারণ ১৯৫৩ সালে, অর্থাৎ Parliament of Religion এর ৬০বর্ষ-পূর্তি অথবা হীরক-জয়ন্তী বৎসরে আমি শিকাগো গিয়েছি এবং সেখানে স্বামীজীকে স্মরণ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আবার গত বছর (আগষ্ট, ১৯৫৮) শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ধর্মসম্মেলন[২] বসে, সেখানেও হিন্দুধর্ম বিভাগের নেতৃত্ব করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

সেখানে পুনর্দর্শন পেলাম Rev. Lathrop-এর, রেভারেণ্ড লেথ্‌প একেশ্বরবাদী প্রচারক। তিনি আমাদের গল্প শোনালেন:

১৮৯৩ সালে তিনি শিকাগোতেই ছিলেন—দশ বারো বছরের ছোকরা, কষ্ট ক'রে লেখাপড়া করেন—হঠাৎ খবর পেলেন গৈরিকধারী এক ভারতীয় সাধুপুরুষ (বিবেকানন্দ) এসেছেন ভাষণ দিতে। কিন্তু তাঁর দর্শন পেতে হ'লে টিকিট কেটে ধর্মসম্মেলনের হলে যেতে হবে। কিন্তু টাকা কোথা? তবু তাঁকে দেখবার এত আগ্রহ যে বাড়ী বাড়ী ফাই-ফরমাস খেটে তরুণ লেথ্‌প

২ International Congress of Religious Freedom.

১০ ডলার উপার্জন করেন ও টিকিট কিনে বিবেকানন্দ দর্শন ক'রে আর তাঁর দিব্য বাণী শুনে ধন্য হন। যেন সেদিনের কথা। আজ ৮০ বছর বয়সের লেথ্রপ কৃতজ্ঞচিত্তে সেকথা আমায় শোনালেন।

শ্রীমতী মারী লুইস বার্ক Swami Vivekananda in America New Discoveries (১৯৫৮) গ্রন্থে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করেছেন, স্বামীজীর জীবনে অভিনব আলোকপাত তিনি করেছেন। তাঁর প্রধান সন্ধান-ক্ষেত্র আমেরিকা তাঁকে বহু পত্রিকাদি সরবরাহ করেছে এবং তার ফলে ৬০০ পৃষ্ঠার উপর এক বিরাট গ্রন্থ আমরা পেলাম।

অথচ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভূমি বাংলা তথা কলকাতা ভারতের পত্রিকা-সাহিত্যের খনি, সেখানে খননকার্য চালাবার মত সুদক্ষ কর্মী আজও আমরা পাই না কেন? তথাকথিত স্বাধীনতা-সংগ্রাম বা Indian mutiny থামার দশ বছরের মধ্যেই (১৮৫৯-১৮৬৯) দেখি কয়েকজন মহাপুরুষের আবির্ভাব : জগদীশচন্দ্র ও বিপিনচন্দ্র (১৮৫৮), রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১), প্রফুল্লচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথ (১৮৬৩) ও মোহনদাস গান্ধি (১৮৬৯)—যেন এক অনিবার্য কারণেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। সে কারণ যেন ভারতের তথা এশিয়ার সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা—বিজ্ঞানে ও দর্শনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে, চিন্তায় ও সাধনায়, সাহিত্যে ও শিল্পে—সর্বক্ষেত্রেই এক নব প্রেরণার ও অভিনব যুগের আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী প্রায় কাছাকাছি উদ্‌যাপিত হবে। সেই সুবর্ণসুযোগে দেশের তরুণতরুণীদের আহ্বান করি—পরাধীনতার মিথ্যা জাল ছিন্ন ক'রে সত্যানুসন্ধান দ্বারা এক গৌরবের ইতিহাস রচনা করতে। রাজনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে তাঁরা প্রকাশ করুন সে কালের অধ্যাত্ম সম্পদ ও ভাবধারা—ধর্মে ও কর্মে, শিল্পে ও সাহিত্যে। সেই তো হবে স্বাধীন ভারতের ও প্রবুদ্ধ ভারতের সার্থক উদ্বোধন।

১৮৬৩ থেকে ১৮৮৩ খৃঃ পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথের প্রথম কুড়ি বছরের জীবন এখনও অনেকখানি অস্পষ্ট আছে। অথচ তাঁর জন্মস্থান শিমুলিয়া ও শিক্ষাস্থান 'জেনারেল এসেম্ব্রী' কলেজও সুপরিচিত। দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুরে ঘনিষ্ঠভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গলাভ (১৮৮৩-৮৬) নানা ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু তৎকালীন পত্রিকাদি আজও ভাল ক'রে দেখা হয়নি। 'সংবাদপ্রভাকর' বন্ধ হলেও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সোমপ্রকাশ, আর্যদর্শন, বঙ্গদর্শন, ভারতী প্রভৃতি মূল্যবান্ বাংলা পত্রিকা এবং ইংরেজী Hindoo Patriot, Calcutta Review, Indian Mirror ও অমৃতবাজার পত্রিকার দুষ্প্রাপ্য ফাইল ঘেঁটে সংকলন করলে 'রবীন্দ্র-নরেন্দ্র' যুগের আদিপর্ব সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। আবার ১৮৯৭-১৯০২ বিবেকানন্দ-জীবনের এই শেষ পাঁচ বছরের বহু মূল্যবান্ তথ্য ভারতের তথা বিদেশের নানা পত্রিকায় আমরা নিশ্চয় পেতে পারি। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও কাজ করা হয়নি।

বিশ্ব-বেদান্ত-সাহিত্যের গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) আজও করা হয়নি। অথচ তার মধ্যে রামমোহন থেকে রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজ নিজ প্রভায় দেখা দেবেন, শুধু আমাদের সেই গ্রন্থপঞ্জী সাজিয়ে ছেপে দিতে হবে। পরিভাষা-সূচীতে শ্রীমতী বার্ক (Burke) তার কিছু আভাষ দিয়েছেন, কিন্তু তার subject-index—আমেরিকায় বসে তাঁর পক্ষে করা সম্ভব হয়নি।

তাঁর মূল্যবান্ গ্রন্থে একজন রুশ মনীষীর নাম পেয়ে আমি কৃতার্থ হয়েছি। ভারতের সঙ্গে চীন ও জাপান শিকাগো-সভায় যোগ দিয়েছিল,

কিন্তু তুর্কী ও রাশিয়া দূরে ছিল। দর্শক হিসাবে দেখি স্বামীজীর অনুরাগী প্রিন্স ভলকনস্কি (Prince Wolkonsky—freelance delegate) ছিলেন ; তাঁর সম্বন্ধে আলবার্ট স্পালডিং (Albert Spaulding) লিখে গেছেন যে, ভারত-অনভিজ্ঞ মার্কিন প্রেস স্বামীজীকে নানা অদ্ভুত নামে ডেকেছিল যথা—'Indian Rajah', 'The High Priest of Brahma', 'The Buddhist Priest', 'Theosophist' ইত্যাদি। কিন্তু রুশ ভলকনস্কি (Wolkonsky) বিবেকানন্দের বন্ধুত্ব লাভ করেন এবং কিছুকাল দুজনে পত্রব্যবহারও করেন। অথচ সে সব চিঠি আমরা এ পর্যন্ত পাইনি, হয়তো কোন রুশ গবেষক একদিন সেগুলি আবিষ্কার করবেন।

মনীষী রম্যা রঁলার সঙ্গে যখন মহাত্মা গান্ধি, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ-জীবনী নিয়ে কাজ করি, তখনই জেনেছিলাম যে ঋষি টলষ্টয় (Tolstoy) বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' (Raja Yoga) গ্রন্থখানি পড়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর (১৯১০) দশ-বারো বছর আগেই। ১৯৫০ সালে যখন আমি 'Tolstoy and Gandhi' লিখি, তখন দেখিয়েছিলাম যে বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' (মার্কিন সংস্করণ) কোন এক বন্ধু (হয়তো Wolkonsky) টলষ্টয়কে উপহার দেন এবং সেই বই পাঠ ক'রে তিনি উপকৃত হ'য়ে তাঁর শিষ্য পল বিরুকভ্‌কে (Paul Birukov) বলেন। সেকথা বিরুকভের মুখেই আমি শুনেছি যখন ১৯২৩ সালে তিনি তাঁর 'Tolstoy and the Orient' রচনায় আমার সাহায্য চান। রুশ-জাপান যুদ্ধে তাঁর দেশ যখন উদ্‌ভ্রান্ত (১৯০২-১৯০৪) তখন টলষ্টয় বেশী ক'রে ভারত ও এশিয়ার অধ্যাত্ম তত্ত্বে ডুবেছিলেন, তখনই অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর দুই তিন বছর আগে গান্ধিজীর সঙ্গে টলষ্টয়ের পত্রালাপ হয়। বৈদান্তিক বিবেকানন্দ ও বৈষ্ণব-নেতা 'বাবা ভারতী' থেকে শুরু ক'রে বিপ্লবী তারকনাথ দাস ও গান্ধিজী যে টলষ্টয়-জীবনীর অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে গেছেন, সে বিষয়ে রাশিয়ার ও ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি।

স্বামী মাধবানন্দজীর আমন্ত্রণে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে বেলুড়ে একবার বলেছিলাম যে ধর্মে তথাকথিত ঔদাসীন্য দেখালেও রাশিয়া একদিন রুশ ভাষায় 'কথামৃত' অনুবাদ করবে। আজ নিশ্চয় জেনেছি[৩] যে সেই 'কথামৃত' অনুবাদের বহুল প্রচার তথাকথিত নাস্তিক রাশিয়াতেও হয়েছে।

রুশ-জাপান যুদ্ধের আগেই বিবেকানন্দের দেহান্ত হয়, অথচ তিনি কোন এক দিব্য দৃষ্টির বলে যেন স্বচক্ষে দেখেই ব'লে গেছেন : বিংশ শতকের প্রারম্ভে—ইউরোপের অভ্যুদয় শেষ হ'য়ে তার পতন যেন শুরু হচ্ছে। আর তাদের চেয়ে বড় হ'য়ে দেখা দিচ্ছে শ্রমিক-তান্ত্রিক দুই দেশ, চীন ও রাশিয়া। ১৯১১তে চীন-বিপ্লব ও ১৯১৭তে রুশ-বিপ্লব ঘনিয়ে এসে বিগত অর্ধ শতাব্দী ধ'রে যেন স্বামী বিবেকানন্দের ভবিষ্যৎ বাণীকেই স্পষ্ট রূপায়িত করছে। শিকাগোতে তাঁর মনে স্বপ্ন জেগেছিল—বিতর্কের ঊর্ধ্বে এক বিশ্ব-ধর্মে পূর্ব ও পশ্চিম সম্মিলিত হবে।[৪]....

৩ সম্প্রতি যে সব ভারতীয় পুস্তক রাশিয়ান ভাষায় অনূদিত হয়েছে তার তালিকায় 'কথামৃতে'র নাম দেখেছি।

৪ শিকাগোর প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'Poetry'র সম্পাদিকা বিখ্যাত কবি হ্যারিয়েট মনরো (Harriet Monroe) ১৮৯৩ সালে স্বামীজীর ভাষণ শোনেন এবং ১৯৩৬ সালে Argentina-তে P E N Congress ও শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক উৎসবের পর সেই কাহিনী আমায় শোনান ; তার কিছু দিন পরেই কবি Harriet Monroe দেহত্যাগ করেন। তাঁর আত্মজীবনী A Poet's Life গ্রন্থে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ে এই কথাগুলি লিখে গেছেন :

The 'world's first Parliament of Religion'—seemed a great moment in human history, prophetic of the promised new era of tolerance and peace.

হয়তো তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে সেই স্বপ্ন অভিনব রূপ পরিগ্রহ করবে। সেই আশায় আমার দেশবাসীদের আহ্বান করি বিবেকানন্দ-যুগের তথ্যানুসন্ধানে অগ্রসর হ'তে।

Swami Vivekananda the magnificent *stole the whole show and captured the town.* ...The handsome monk in the orange robe gave us in perfect English a masterpeice. His personality, dominant and magnetic; his voice, rich as a bronze bell; the controlled fervor of his feeling, the beauty of his message to the Western world he was facing for the first time—these combined to give us a rare and perfect moment of supreme emotion. It was human eloquence at its highest pitch.

One cannot repeat a perfect moment—the futility of trying to has been almost a superstition with me. Thus I made no effort to hear Vivekananda speak again, during that autumn and winter when he was making converts by the score, to his hope of uniting East and West in a world religion, above the tumult of controversy.

Vide Burke, Swami Vivekananda : New Discoveries—pages 59 60.

[ভাবানুবাদ : পৃথিবীর প্রথম ধর্মমহাসম্মেলন...মানবেতিহাসে এক মাহেন্দ্রক্ষণ; শান্তি ও পরমত-সহিষ্ণুতায় প্রতিশ্রুতিময় নবযুগের সম্ভাবনায় পূর্ণ।

মহিমময় স্বামী বিবেকানন্দ সারা সম্মেলনের হৃদয় হরণ ক'রে শিকাগোবাসীর চিত্ত জয় করেছিলেন। গৈরিক-পরিহিত সেই সুন্দর সন্ন্যাসী শুদ্ধ ইংরেজীতে দিলেন সর্বোত্তম ভাবপূর্ণ ভাষণটি। অপরকে প্রভাবিত ও আকর্ষণ করার শক্তিপূর্ণ তাঁর ব্যক্তিত্ব, গীর্জার ঘণ্টার মতো গম্ভীর তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর সংযত আবেগ, পাশ্চাত্য জাতির সহিত প্রথম সাক্ষাতেই প্রদত্ত তাঁর বাণীর সৌন্দর্য—সব মিলে আমাদের দিয়েছিল চরম আবেগের একটি পরম দুর্লভ মুহূর্ত, যার পুনরাবৃত্তি অসম্ভব,...সে চেষ্টাও আমার ব্যর্থ হয়েছে ·, তাই আমি আর সে বছর শরতে ও শীতে বিবেকানন্দের বক্তৃতা শোনার চেষ্টাই করিনি, তখন তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে বিতর্কের উর্ধ্বে এক বিশ্বধর্মে মিলিত করার আশায় শত শত ব্যক্তিকে তাঁর ভাবে দীক্ষিত করছিলেন।]

উপনিষদের বাণী

স্বামী বোধাত্মানন্দ

উপনিষদের বাণী বল-বীর্যের বাণী, আত্মার মুক্তির বাণী। উপনিষৎ বলেন, মানুষ যে নিজেকে দুর্বল অসহায় মনে করে—তাহার কারণ নিজ স্বরূপ বিষয়ে অজ্ঞতা। বস্তুতঃ মানবাত্মার মহত্ত্বই উপনিষৎ ব্যক্ত করেন। মানুষ যে কত বড়, কত মহান্, সে যে সত্যসত্যই নিষ্পাপ নিত্য-মুক্ত অমৃতস্বরূপ আত্মা, এই কথাই উপনিষৎ তারস্বরে ঘোষণা করেন। ভ্রমবশতঃ সত্য না জানার জন্য মানুষের এই হীন অবস্থা। জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞান দূরীভূত হইলে মানুষ তাহার নিজ আনন্দস্বরূপ আত্মাকে ফিরিয়া পায়। স্বামী বিবেকানন্দ একান্তভাবে ইচ্ছা করিতেন যে এদেশের লোক শ্রদ্ধার সহিত উপনিষদের চর্চা করে, উপনিষদুক্ত আত্মার মহত্ত্বে বিশ্বাসী হইয়া ভয় দুর্বলতাকে জয় করে। আর এই অজর অমর আত্মায় বিশ্বাসী হওয়াই সকল দুর্বলতাকে—সর্বপ্রকার দুঃখকে জয় করিবার উপায়, পরম আনন্দ লাভের ও একান্ত অভীঃ হওয়ার উহাই নিশ্চিত পথ।

বেদের প্রথম দিকে বিবিধ যাগযজ্ঞাদির কথা থাকিলেও সাধারণতঃ অন্তভাগে অর্থাৎ উপনিষদে উপাসনার কথা, পরম তত্ত্বের কথা, আত্মার স্বরূপের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উহা মানুষকে নিঃশ্রেয়স কল্যাণের পথ দেখাইয়া দেয়।

হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব এই উপনিষদে নিবদ্ধ। উপনিষৎপাঠে জানা যায়—আর্য ঋষিগণ কত উচ্চতত্ত্ব-আলোচনায় নিবিষ্ট থাকিতেন, কত উচ্চ আনন্দের তাঁহারা অধিকারী হইয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল ধরিয়া উপনিষদের পুণ্য প্রভাব এদেশবাসীর উপর পতিত হইয়াছে। ইহার ভাবগাম্ভীর্যে বৈদেশিক দার্শনিকগণও মুগ্ধ। জার্মান দেশীয় বিখ্যাত দার্শনিক শোপেনহর এই উপনিষদের ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ মাত্র পাঠ করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন: উপনিষদের মতো এমন কল্যাণকর ও উচ্চভাবপ্রদ বিদ্যা সমগ্র জগতে আর নাই। জীবনকালে ইহা আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, মরণেও ইহা আমাকে সান্ত্বনা দিবে।

মানুষ চায় সুখ, শান্তি, সে চায় অনন্ত জ্ঞান। এই আশায় সে নানাবিধ কর্ম করে, জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য কত বাহিরের বিদ্যা শিক্ষা করে। কিন্তু পরে সে স্বকীয় অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিতে পারে, 'প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়'। বাহিরের প্রকৃতি-জয়ে বা তাহার জ্ঞানে সেই ভূমানন্দ পাইবার আশা নাই দেখিয়া সে অন্তর্জগতে প্রবেশ করে। সেই সত্য, সেই আনন্দ পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। মুণ্ডক উপনিষদে আমরা দেখিতে পাই: এই ভাবে ধন-মান-যশে অতৃপ্তচিত্ত সত্যজিজ্ঞাসু মহাগৃহস্থ শৌনক সর্বত্যাগী তত্ত্বজ্ঞ ঋষি অঙ্গিরার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করেন, 'কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি'[১]? মহাশয়! কোন্ বস্তুকে জানিলে এই জগতের সব জিনিস জানা হয়? লোক-পরম্পরায় শ্রবণ করিয়াই হউক বা নিজ অভিজ্ঞতা বলেই হউক, শৌনকের এই ধারণা মনে আসিয়াছিল যে জগতে এমন একটি বস্তু আছে যাহা জানিলে মানুষ সর্বজ্ঞ হয়, যাহা পাইলে সে আপ্তকাম হয়। আর সেই বস্তু জানিবার, পাইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা শৌনকের প্রাণে।

ঋষি অঙ্গিরা সেই নিত্যধনে ধনী, সদাতৃপ্ত। তিনি ভাবিতে লাগিলেন কেমন করিয়া সেই তত্ত্ব শৌনককে বুঝাইবেন, কেননা সেই বস্তুটি এমন যে তাহা সাধারণভাবে বর্ণনা করা যায় না। অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তিও সে তত্ত্ব সহজে অবধারণ করিতে অসমর্থ। বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ যতদূর যাইতে পারে, যতদূর চিন্তা করিতে পারে সেই বস্তু যে তারও পারে। তাই তিনি উত্তর দিলেন, 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চ অপরা চ।' দুই প্রকার বিদ্যা অর্জন করিতে হইবে—এক অপরা, যাহার দ্বারা জাগতিক বিষয়ের জ্ঞান, মানুষের যেটি জাগতিক রূপ সেই শরীরেন্দ্রিয়-সংঘাতের জ্ঞানলাভ হয়, তাহার চাহিদা মিটানো যায়। আর মানুষের এই জাগতিক রূপের পারে তার যে নিত্যরূপ নিত্যসত্তা বিদ্যমান, যে স্বরূপটিকে না দেখিয়া তাহাকেই সে শরীরেন্দ্রিয়রূপে, এই বহির্জগৎরূপে নিয়ত গ্রহণ করে, সেই এক তত্ত্ব—যে বিদ্যার দ্বারা সাক্ষাৎকার করা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা।

এই পরা বিদ্যার বিষয় আত্মা বা ব্রহ্মকে শৌনকের বুদ্ধিতে ক্রমশঃ আরূঢ় করাইবার জন্য ঋষি বলিতে লাগিলেন: এই ব্রহ্ম হইতেই অন্ন প্রাণ মন, পঞ্চসূক্ষ্মভূত, সপ্তলোক, কর্ম, কর্মফল সকলই সৃষ্ট হইয়াছে। 'তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্মাণি যান্যপশ্যন্'[২] বৈদিক মন্ত্রে যে সকল কর্মের উল্লেখ আছে, সেগুলি সত্যফলপ্রদ বলিয়া তত্ত্বদর্শিগণ দেখিয়াছেন। অধিক কি কর্ম, উপাসনার সহিত সংযুক্ত হইলে উহা সাধককে সর্বোচ্চ ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়, ইহাও সত্য। বৃহদারণ্যকেও আমরা পাই—যেমন অগ্নি হইতে সমধর্মাপন্ন বিস্ফুলিঙ্গ সকল বাহির হইয়া আসে সেইরূপ সেই এক আত্মা হইতে সকল প্রাণ, সকল লোক, দেবগণ ও ভূতসমূহ বহির্গত হয়।

১ মুণ্ডক—১।১।৩

২ মুণ্ডক ১।২।১

ইহার পর কথিত হইয়াছে, 'প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ (আত্মা) সত্যম্'[৩]—প্রাণ প্রভৃতি সত্য, আত্মা তাহাদিগের অপেক্ষা সত্য। কেনোপনিষদে এই তত্ত্বকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে আমরা সত্যের তর-তম ভাব স্পষ্টতঃ দেখিতে পাই। কাজেই সৃষ্ট জগৎকে আকাশ-কুসুমের মতো অলীক বলা যায় না, অথচ ব্রহ্মের মতো চিরসত্যও বলিতে পারি না।

অতঃপর অঙ্গিরা বলিতে লাগিলেন: এই সব সৃষ্ট জগৎ সত্য, কিন্তু অনিত্য। নিত্যসুখ, ভূমানন্দ এই জগতের কোথাও নাই। উহা পাইবার সন্ধান—ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট হইতেই লাভ করিতে হয়। অন্তরের সমগ্র শ্রদ্ধা, আকুল আগ্রহ লইয়াই তাঁর নিকট উপস্থিত হইতে হয়। যাহার চিত্ত বিষয়ের আকর্ষণ ত্যাগ করিয়া সম্যক্ প্রশান্ত হইয়াছে, মন স্বভাবতঃ অন্তর্মুখীন, যিনি শ্রদ্ধাবান্ ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু, এইরূপ শিষ্যই যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী। আর আত্মজ্ঞ গুরুরও এই রীতি যে এইরূপ উপযুক্ত শিষ্য উপস্থিত হইলে যে প্রকারে শিষ্য ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে, সেই ভাবে তিনি তাহাকে উপদেশ দান করেন। গুরুব অহেতুকী কৃপাই তাঁহাকে শিষ্যের কল্যাণে নিযুক্ত করেন, তাঁহার আর কোন উদ্দেশ্য নাই।

বিদ্যালাভের উপায়ের কথা বর্ণনা করিয়া ঋষি এখন শৌনকের মূল প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য বলিতে লাগিলেন: এই বৈচিত্র্যময় জগৎ সেই এক ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই-মাত্র বলিয়াই ঋষি নীরব হইলেন না। তিনি মহা-সত্য উচ্চারণ করিলেন, 'পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্। এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সৌম্য'।[৪]

৩ বৃহদারণ্যক—২।১।২০ ৪ মুণ্ডক—২।১।১০

এই কর্ম-তপোযুক্ত বিশ্ব পুরুষই—অর্থাৎ পুরুষ হইতে অপৃথক্। এই পুরুষ—এই ব্রহ্মকে যিনি নিজের হৃদয়ে উপলব্ধি করেন তিনিই অবিদ্যার পাশ হইতে মুক্ত হন। তাঁহার আর 'আমি আমার' ভাব থাকে না। সর্বস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত একত্ব অনুভব করায় তিনি অজ্ঞানের পারে চলিয়া যান।

এখন পুরুষই কিরূপে এই বৈচিত্র্যময় জগৎ হইলেন? যদি এই জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম আর নির্বিকার অসঙ্গ থাকেন না। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন: এষ আত্মা অসঙ্গো ন হি সজ্যতে অনন্তরমবাহ্যম্।[৫] এই আত্মা অসঙ্গ—ইহার বাহির ভিতর বলিয়া কিছুই নাই। কাজেই বলিতে হয়, এই জগৎ ব্রহ্মের প্রতীয়মান রূপ, ঠিক ঠিক রূপ নহে—অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য সত্যই জগৎ হইয়া যান নাই। ঋষিগণ চরম সত্যের আলোকে অনুভব করেন যে ব্রহ্মই আছেন—আর কিছুই নাই। অন্য উপনিষৎও এই সত্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'[৬]—এই ব্রহ্মে কোনরূপ ভেদ নাই। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'[৭] ব্রহ্ম একই, দ্বিতীয়-রহিত। ঋগ্‌বেদও বলেন, 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।' মায়ার দ্বারা পরমেশ্বর এই বহুরূপ ধারণ করি-ছেন। ঐশ্বরিক এই মায়া এই অচঞ্চল, নির্বিকার ব্রহ্মের উপর এই নামরূপাত্মক জগৎ সৃষ্টি করেন। যতক্ষণ মায়াকে সত্য বলিয়া মনে হয়, ততক্ষণ সত্যের এই পূর্বকথিত তর-তম ভাব পরিদৃষ্ট হয়। এই মায়া, এই অজ্ঞান অপসৃত হইলে সর্বত্র ব্রহ্মই উপলব্ধ হন, জগৎ নহে। তাই অঙ্গিরা বলিলেন, 'ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাৎ ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্।'[৮]—সর্বদিকে ব্রহ্মই পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। পূর্বে অজ্ঞানবশতঃ যে নামরূপাত্মক

৫ বৃহদারণ্যক—৪।২।৪ ৬ কঠ—২।১।১১
৭ ছান্দোগ্য—৬।২।১ ৮ মুণ্ডক—২।২।১১

জগৎ অব্রহ্মরূপে দেখা যাইতেছিল, আজ জ্ঞানালোকে সেই জগতের অস্তিত্ব নাই, তৎস্থলে ব্রহ্মই একমাত্র রহিয়াছেন। এই একের জ্ঞানে সকল বিষয়ের জ্ঞান হইল। কেননা শৌনক এখন প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন: সেই এক ব্যতীত আর কিছু নাই। সেই একই চিরন্তন সত্য, তাহার সত্তাতেই জগতের সত্তা।

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই একই সত্য বর্ণিত হইয়াছে। সত্যদ্রষ্টা যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর নিকট আত্মতত্ত্ব বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন, 'আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদিতম্'[৯]—এই আত্মা দৃষ্ট শ্রুত বিচারিত ও বিজ্ঞাত হইলে সর্ব তত্ত্ব বিদিত হয়।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য পরম তত্ত্বের কেবল সন্ধান দিয়াই নিরস্ত হন নাই। এই তত্ত্ব যাহাতে অনুভব করা যায় তাহার উপায়ও বলিয়াছেন: 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'[১০]। এই আত্মতত্ত্বের উপলব্ধির জন্য শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক। শাস্ত্র ও গুরুমুখে এই তত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে। ঐ শ্রবণ তখনই শেষ হইবে যখন সাধক সম্যক্ প্রকারে এই ধারণায় উপস্থিত হইতে পারিবে যে, সকল উপনিষদের লক্ষ্য চরম প্রতিপাদ্য বিষয় ঐ এক অদ্বৈত তত্ত্ব। তারপর মনন। শ্রুতি-সিদ্ধান্তের অনুকূল যুক্তি দিয়াই সাধকের নিজের বুদ্ধিতে সেই চরম সত্যটি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা ঐ তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। যখন দ্বৈত দর্শন হইতেছে—ব্যাবহারিক দর্শন-শ্রবণাদি চলিতেছে, তখনও কিন্তু চরম সত্যের দৃষ্টিতে ঐ দর্শন-শ্রবণ বাস্তব নয়। নিষ্ক্রিয় আত্মাতে ঐ দর্শন-শ্রবণক্রিয়া আরোপিত হইতেছে মাত্র। তাই তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের শরীরেন্দ্রিয়াদির দ্বারা নানা কল্যাণকর কার্য কৃত হইলেও তিনি নিজেকে কোন ক্রিয়ারই কর্তা বলিয়া বোধ করেন না।

অজ্ঞানবশতঃ সাধারণ মানুষ ইন্দ্রিয়াদির প্রত্যেক ব্যাপারের প্রত্যেক ক্রিয়ার কর্তা বলিয়া নিজেকে মনে করে। সেই শুদ্ধ আত্মা শুদ্ধ ব্রহ্মই আমার স্বরূপ ঐ ধারণায় আসিতে যে অসম্ভব ভাবনা বা বিপরীত ভাবনার উদয় হইবে, তাহারও ঐরূপ যুক্তি ও গুরুবাক্যবলে নিরসন করিতে হইবে। জীবাত্মার স্বরূপ যে ব্রহ্ম, এই মহাসত্যটি উপনিষদে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য দ্বারা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এই ভাবে জীবাত্মা যে বস্তুতঃ ব্রহ্মই—এই সিদ্ধান্তে আসিয়া ঐ ঐক্যবিষয়ে নিরন্তর ধ্যান করিতে হইবে। উহারই নাম নিদিধ্যাসন। ঐ নিদিধ্যাসনের ফলে মন ব্রহ্মাকারাকারিত হইয়া নির্বিকল্পরূপে অবস্থান করে। ঐক্যবোধের প্রতিবন্ধক অজ্ঞান অপসৃত হয়। চিদাভাস পরব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়, ঘটাকাশ মহাকাশে বিলীন হয়।

এই সত্য-উপলব্ধি-বিষয়ে শুদ্ধ মনই প্রধান সহায়। ধ্যান ও সমাধি, সবিকল্প ও নির্বিকল্প—এ সবই মনের অবস্থাবিশেষ। এগুলি জীবের নিকট আত্মার প্রকাশের প্রতিবন্ধক দূর করে। মৈত্রায়ণী উপনিষৎ সত্যই বলিয়াছেন:

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং স্মৃতম্॥

মন যতদিন বিষয়-চিন্তায় আসক্ত, ততদিন মুক্তি ঈশ্বরলাভ প্রভৃতি কথার কথা। মন যে পরিমাণে ঈশ্বরে নিবিষ্ট, সেই পরিমাণে বন্ধনের নাশ—সত্যের অনুভূতি। ষোল আনা মন ঈশ্বরে সমর্পণ করিলে ঈশ্বরের যথাযথ স্বরূপের অনুভব—সাংসারিক ভাবের আত্যন্তিক বিনাশ।

উপাসনাদির ফলে যাঁহাদের মন অন্তর্মুখীন ও সূক্ষ্মতত্ত্ব অবধারণে সমর্থ, তাঁহারা বিচারের

৯ বৃহদারণ্যক—৪।৫।৬   ১০ বৃহদারণ্যক—৪।৫।৬

দ্বারা এই তত্ত্ব সহজেই বুদ্ধিতে আরূঢ় করাইতে পারেন। অপর সকলকে গুরুনির্দিষ্ট পথে ধ্যানাদির অভ্যাস করিয়া বুদ্ধির ঐ শুদ্ধাবস্থা আনয়ন করিতে হয়। তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে শুদ্ধ আত্মার বন্ধন নাই, কাজেই তার মুক্তিও নাই। তিনি সদামুক্ত। বন্ধন জীবের, অর্থাৎ অজ্ঞানবশতঃ অন্তঃকরণের সহিত একীভাবাপন্ন চৈতন্যের। তত্ত্বতঃ চৈতন্য অন্তঃকরণের সহিত এক হইয়া যায় না। কেননা জড়ের সহিত চৈতন্যের এক হওয়া সম্ভব নয়, তথাপি সাধারণ মানুষের ব্রহ্মবিষয়ে এই অজ্ঞান সুপরিচিত। পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞান সেই অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যকে কখনই আবৃত করিতে পারে না, কিন্তু উহা মানুষের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে অর্থাৎ জীবের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আসিতে দেয় না যে, সে সত্য সত্যই অজ্ঞানের পারে অবস্থিত নিত্যমুক্ত আত্মা। ভোগাকাঙ্ক্ষারূপ মলিনতা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হইলে শুদ্ধচিত্ত সাধক গুরুমুখে সত্য শ্রবণ করিয়া তাহার মর্ম সম্যক্ অনুধাবন করিতে পারেন। তিনি তখন প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারেন যে তিনি চিরকাল মুক্ত আত্মাই ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন।

নিজ মন দেখিয়াই সাধক তাহা বুঝিতে পারিবেন তিনি কিরূপ অধিকারী। বিশেষ গুরু এ বিষয়ে পরম সহায়ক। উপনিষৎ অনধিকারীকেও অধিকারী করিবার জন্য নানাবিধ উপাসনার বিধান করিয়াছেন। উহা দ্বারা সাধক উচ্চ হইতে উচ্চতর সত্যে আরোহণ করিয়া পরিশেষে চরম সত্যের দ্বারে উপস্থিত হন। সংযত জীবনযাপন করত সাধক যাহাতে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হন, তজ্জন্য কঠোপনিষদে সাবধানী বাণীও শ্রুত হয়:

নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

—যিনি অসৎ কর্ম হইতে বিরত, সংযতেন্দ্রিয়, প্রশান্তমনা, সমাহিতচিত্ত তিনিই জ্ঞানের দ্বারা এই আত্মাকে উপলব্ধি করেন—অপরে নহে।

উপরি-উক্ত সাধনাদির দ্বারা সিদ্ধ মহাপুরুষ শরীরে থাকিলেও অশরীরী। তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি কর্মরত হইলেও তিনি অকর্তা। এতকালের ধাঁধাঁ তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত। সেই জীবন্মুক্ত পুরুষের আত্মা আর সীমাবদ্ধ নহে, সকলের আত্মাই আজ তাঁহার আত্মা। এ জগতে কেহই তাঁহার পর নাই, সকলেই তাঁহার আপন। ভয় বা দুর্বলতার আর স্থান কোথায়? অপর কেহ থাকিলে তো ভয়! শরীরাদিতে অভিমান থাকিলে তো দুর্বলতা! তিনি যে আজ জ্ঞানবলে বলী।

আজ বিশ্বে যে নানা ভাববিপর্যয়, পরস্পরের প্রতি যে দ্বেষ ও অবিশ্বাস, পরস্পরকে বিনাশের যে অশ্রুতপূর্ব আয়োজন দেখা যাইতেছে, উপনিষদুক্ত এই একাত্মবাদই তাহার প্রতিষেধক। এই মহতী চিন্তাধারাই পৃথিবীর সমগ্র মানবসমাজকে একতাসূত্রে বন্ধন করিতে সমর্থ। উপনিষদের ভাবধারায় স্নাত সমদর্শী মহাপুরুষই অন্তরের গভীরতম অনুভূতির সহিত এই কল্যাণময়ী বাণী উচ্চারণ করিতে পারেন:

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥

দুই আমি

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

আমি দিবালোকে দাঁড়াইয়া আছি—রাজপথের পাশে, শহরের মাঝখানে, আকাশের নীচে। পথের উপর দিয়া গাড়ী ছুটিতেছে, মানুষ হন্তদন্ত হইয়া চলিতেছে, নগরীর বহুতর কর্মব্যস্ততার নানাবিধ শব্দ অবিচ্ছিন্নভাবে আমার কানে আসিয়া ঢুকিতেছে। বিংশ শতাব্দীর আকাশে পাখীরা ডানা নাড়িতেছে বটে, কিন্তু অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে—কেননা সেথায় আধিপত্য করিতেছে বিকট গোঙানি তুলিয়া তীব্রবেগে উড্ডীয়মান ছোট বড কত রকমের বিমান। পাখীরা তো ভয় পাইবেই। দিনের আলোতে দাঁড়াইয়া আমি লক্ষ লক্ষ মানুষের একজন হইয়া আমার পারিপার্শ্বিকের কথা, আমার নিজের কথা ভাবিতেছি।

আমার দশদিকে যে বিপুল চাঞ্চল্য, আমিও উহার সহিত মিশিয়া আছি। ঐ চাঞ্চল্য অপরিহার্য প্রয়োজনে সৃষ্টি করিয়াছি আমিই এবং আমারই মতো হাজার হাজার নরনারী। জীবনধারণের জন্য এবং জীবনের বহুমুখী আনন্দ উপভোগের জন্য আমাদের প্রত্যেককে ভাবিতে হয়, নানা উদ্যম আনিতে হয়, বহু দিকে বহু ভাবে ছুটাছুটি করিতে হয়। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলে না, তাহার অর্থ জীবনকে প্রত্যাখ্যান করা। কিন্তু আমি তো বাঁচিয়া থাকিতে চাই, বাঁচিয়া থাকাকে নানাভাবে সার্থক করিয়া তুলিতে চাই, অতএব আমাকে ছুটিতে হয়, প্রচণ্ড গতিবেগ আনিতে হয় আমার দেহে, মনে, স্নায়ুগুলীতে, রক্তপ্রবাহে, আমার চারিপাশে, আমার পক্ষে উপায়ান্তর নাই। যতক্ষণ আমি দিবালোকে রাজপথের পাশে দাঁড়াইয়া আছি, ততক্ষণ আমার কর্মচঞ্চল পরিবেশ আমা হইতে পৃথক্ নয়। আমিও চঞ্চল, চাঞ্চল্য আমার স্বধর্ম। আমাকে অতি সকালে বাজারে গিয়া শাক মাছ আটা হলুদ তেল কিনিয়া সওয়া সাতটার মধ্যে বাড়ীতে পৌছাইয়া দিতে হয়, নতুবা কিছু নাকে মুখে গুঁজিয়া সাড়ে নয়টায় ট্রাম ধরিতে পারিব না। আমাকে সাত আট ঘণ্টা —ভাল লাগুক বা না লাগুক—আফিসে বসিয়া কলম পিষিতে হয়, তাহার পর আবার বাসে ট্রামে ভিড় ঠেলিয়া দাঁড়াইয়া বা বসিয়া অর্ধমৃত অবস্থায় গৃহে ফিরিতে হয়। তখনও ছুটি নাই। গৃহের কত রকমের সমস্যা লইয়া ভাবিতে হয়, উহাদের সমাধানের জন্য ছুটাছুটি করিতে হয়। খাইয়া দাইয়া যে কয়েক ঘণ্টা ঘুমাইয়া থাকি, সেই সময়টুকু বোধ করি ছুটাছুটি হইতে নিষ্কৃতি পাই। অবশ্য কখনো ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ঘুমের ব্যাঘাতও ঘটে। পুনরায় সকাল, পুনরায় থলি লইয়া বাজারে যাওয়া, আফিস, বাড়ী। দিনের পর দিন এই ভাবে আমার দিন কাটে—ছুটিয়া, হাঁপাইয়া, ঘামিয়া, আধমরা হইয়া। নিয়মিত কার্যক্রম অনুসরণ করিয়াও নিষ্কৃতি নাই। মাঝে মাঝে ছুটাছুটি বাড়ে—অসুখ-বিসুখ, সাংসারিক আপদ-বিপদ, টাকার টানাটানি, সামাজিক লেনদেন ইত্যাদি তো লাগিয়াই আছে। কিন্তু করিব কি? ইহা যে আমার জীবন-ধর্ম, ইহা যে আমার ঈপ্সিত।

আমি যদি কলিকাতা শহরে মার্চেন্ট আফিসের কেরানী না হইয়া উকীল হইতাম, কিংবা ডাক্তার বা ইনসিওরেন্সের এজেন্ট বা ব্যবসায়ী হইতাম, অথবা মাষ্টার বা অধ্যাপক হই-

তাম—তাহা হইলে আমার থাকা-খাওয়া-পরার সুখের হয়তো কিছু তারতম্য ঘটিত, কিন্তু জীবনের প্রবল ঘূর্ণাবর্ত হইতে অব্যাহতি পাইতাম কি? ছুটাছুটি থামিত কি? না। কেরানী-জীবনের কতকগুলি নির্দিষ্ট অলিগলি আছে, আমি উহাদের ভিতর দৌড়াদৌড়ি করি, উকীলবাবু ডাক্তারসাহেব, মাষ্টারমহাশয় প্রভৃতি—ইঁহাদেরও ছুটিতে হয়, তবে অন্য রাস্তা দিয়া—এই পর্যন্ত। দিবালোকে, রাজপথের পাশে শহরের মাঝখানে, আকাশের নীচে আমরা সকলেই একটি জায়গায় এক,—আমরা প্রত্যেকেই ছুটিতেছি, ছুটিতেছি, ছুটিতেছি—রাজপথে গাড়ী-ঘোড়ার মতো, আকাশে এয়েরোপ্লেনের মতো। 'চরৈবেতি চরৈবেতি'—এই বেদমন্ত্র বোধ করি আমাদেরই জন্য উচ্চারিত হইয়াছিল।

দুই হাজার বৎসর আগেও মানুষ ছুটিত। যে মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে চায়, যে মানুষ এই সুন্দর পৃথিবীতে জীবনের পানপাত্র পরিপূর্ণ ভাবে পান করিতে চায় তাহাকেই ছুটিতে হয়। ইহা বিশ শতাব্দী আগেও যেমন সত্য ছিল, এই বিংশ শতাব্দীতেও তেমনই সত্য। তবে বিংশ শতাব্দীতে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি অনেক বদলাইয়াছে, উহা প্রাচীনকালের তুলনায় অনেক বেশী জটিল এবং সেইজন্য মানুষের ছুটিবার ধরনও এখন বহুতর বক্র। আগে মানুষ ছুটিতে ছুটিতে এক একবার পিছনে তাকাইত, একটু দম লইবার অবসর পাইত, মাঝে মাঝে লাভ লোকসান খতাইয়া দেখিত। এখন মানুষকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ছুটিতে হয়, আশে পাশে তাকাইবার মৌকা নাই, একদণ্ড বিশ্রামের ফুরসত নাই। সংসারের এত জিনিস এখন করায়ত্ত করিতে হয়, এত রকমের জ্ঞান বিজ্ঞান মগজে ঢুকাইতে হয়, এত বিচিত্র তামাসা দেখিয়া লইতে হয়, এখন মানুষের নিশ্বাস ফেলিবার সময় কোথায়? বিংশ শতাব্দীর দিবালোকে দেহ-মনযুক্ত যে মানুষ আমি—আমার সহিত বিংশ শতাব্দীর অনেক তীব্রগতি যন্ত্রের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। আমরা উভয়েই কর্ম-পাগল, আমরা উভয়েই অনবরত ছুটিয়া চলি, ছুটিবার মুখে প্রখর তাপ উদ্‌গিরণ করি, অপরের চোখ ঝলসাইয়া দি। আমরা উভয়েই দুর্বার, দুরন্ত, নির্মম।

আমার জীবনের এই যান্ত্রিক গতিবেগের ভাল মন্দ দুটা দিকই আছে। ভাল দিক এই যে, উহা আমাকে উন্নতির পথে, সুখের পথে, সমৃদ্ধির পথে লইয়া যায়, আমার অসাড় অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে, আমার পৌরুষকে সার্থক করে। আর মন্দ দিক বোধ করি এই যে, উহা আমাকে গতানুগতিকতার দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখে, আমার আত্মিক স্বাধীনতা খর্ব করে, আমাকে ভাবিবার অবসর দেয় না, বর্তমান গতিবেগের ঊর্ধ্বে কোনও উচ্চতর স্থিতির প্রশ্ন একেবারেই চাপিয়া রাখে।

* * *

আমি দিবাশেষে রাজপথ হইতে কিছু দূরে বসিয়া আছি। শরীর অসুস্থ হইয়াছে, পর পর অনেকগুলি দ্বন্দ্বে মনও অবসন্ন। রাজপথের শব্দ কানে আসিতেছে, কিন্তু আমার কাছে উহা যেন বিরক্তিকর বোধ হইতেছে। শরীর-মনে বল পাইতেছি না, উৎসাহ পাইতেছি না। জীবনের গতিবেগ যেন মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। উল্টা প্রশ্ন মনে উঠিতেছে, এত ছুটিতেছিলাম কেন? টাকার জন্য? পারিবারিক নিরাপত্তা—সাংসারিক সুখের জন্য? সামাজিক প্রতিপত্তি, বিদ্যার খ্যাতির জন্য? হাঁ, তাই। এইগুলি চাই বলিয়াই আমাকে খাটিতে হয়, ছুটিতে হয়। 'এই সবে আমার প্রয়োজন নাই'—যদি জোর করিয়া বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে অনেক

ঝঞ্ঝাট মিটিয়া যাইত। কিন্তু ঐরূপ বলা তো আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাহা ছাড়া ঐরূপ বলা সমীচীনও কি? মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি যখন, তখন মানুষ-জীবনের স্বাভাবিক চাহিদাগুলি হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিব কেন? ওহা তো মৃত্যুর লক্ষণ। লক্ষ লক্ষ মানুষ যে বিদ্যা উপার্জনের জন্য, অর্থোপার্জনের জন্য, পারিবারিক সুখের জন্য, নানাবিধ আমোদপ্রমোদের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছে, আমাকেও ঐ পথে যাইতে হইবে। ইহাই তো স্বাভাবিক, ইহাই তো সঙ্গত। অন্য প্রকার ভাবাও যে বড় দুঃসাহসের কথা।

কত বিদগ্ধ বুধমণ্ডলী জীবনের জয়গান করিয়া গিয়াছেন। সংসারের উন্নতি, স্ত্রীপুত্র-পরিবারের স্বর্গীয় ভালবাসা, সামঞ্জস্যপূর্ণ গৃহের নিবিড় শান্তি, জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পসাহিত্য, নৃত্য-গীত, সামাজিক সম্মেলন, উৎসব—এ সবই মানব-জীবনের ভিন্ন ভিন্ন দিক। তাঁহারা নানাভাবে এই সকলের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন, এই সকল বিষয় লইয়া কত বড় বড় বই লিখিয়াছেন। প্রত্যেকটির মূল্য আছে, প্রত্যেকটির গভীর সার্থকতা আছে। অতএব জীবনের এই সব মূল্য আমাকেও স্বীকার করিতে হইবে। ঐ সব ক্ষণজন্মা প্রসিদ্ধ জ্ঞানী গুণী ব্যক্তির চেয়ে আমি কি বেশী বুদ্ধিমান্? অতএব না, আমি জীবনের স্বাভাবিক গতি সম্বন্ধে কোন সংশয় তুলিব না। সুবোধ বালকের মতো জীবনকে স্বীকার করিব। জীবনের সার্থকতার জন্য অপরিহার্য যে ছুটাছুটি তাহা মানিয়া লইব, ঘাম ছুটিবে—তা ছুটুক। কষ্ট হইবে, কখনো হাত পা ভাঙ্গিবে, তা উপায় কি? দিবাশেষের চিন্তা আমার অলস দুঃস্বপ্ন। দিবালোকের উজ্জ্বল সত্যই আমার অপ্রত্যাখ্যেয় সত্য, দিবালোকের অকুণ্ঠিত অনুসরণই আমার স্বধর্ম।

আমার পায়ের নীচে এই বিস্তীর্ণা পৃথিবী, এই পৃথিবীর বুকের উপর মানুষের অসংখ্য কীর্তি, আমার মাথার উপর অনন্ত আকাশ। আমি আজ অনন্ত মহাকাশকে আমার বিদ্যাবুদ্ধি দিয়া পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত করিয়াছি। একদা, আমি বিশ্বপ্রকৃতির বিশালতায় ভীত, বিমূঢ় হইতাম। তখন মনে হইত প্রকৃতির নানা শক্তির কাছে আমার জীবন একটি অসহায় ক্রীড়নক মাত্র। এখন আর আমার সে ভয়—সে অসহায়তা নাই। প্রকৃতির রহস্যনিচয় আমি আজ একটির পর একটি উদ্‌ঘাটন করিয়া চলিয়াছি। বিশ্বপ্রকৃতি বিশাল—অতি বিশাল, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি সেই বিশালতার মর্মবোদ্ধা। আমার মেধা, আমার উদ্ভাবনী প্রতিভা বুক ফুলাইয়া প্রকৃতির সামনে দাঁড়াইতে পারে। আমি বিংশ শতাব্দীর দিবালোকের মানুষ—আমি বৃহৎ, আমি অপরাজেয়।

* * *

কিন্তু জানিতাম কি প্রাবৃট্‌কালে আকাশে কালো মেঘের নিরুপম শোভা দেখিতে দেখিতে এক মুহূর্তে অঘটন ঘটিতে পারে? এক মুহূর্তে মেঘের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ চমকাইতে পারে—চমকাইয়া ঘনপ্রসারিত মেঘপুঞ্জকে চোখের পলকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারে? আকাশে তাকাইয়া ছিলাম, মেঘের খেলা দেখিতেছিলাম, বিদ্যুৎ যে কোথায় লুকাইয়া ছিল, জানিতাম না। কিন্তু হঠাৎ যখন সে দেখা দিল—তাহার আকাশ-হইতে-ভূমিতল-স্পর্শ-করা বিশাল দীপ্তি দেখিয়া অবাক্ হইলাম। আকাশে মেঘ থাকে, বিদ্যুৎও থাকে—কিন্তু বিদ্যুতের শক্তি এবং ক্রিয়া মেঘের অপেক্ষা কত অধিক!

আমার দিবালোকের পৃথিবীকে চমকিত করিয়া দিবালোকচারী আমার দৃপ্ত অহমিকাকে

স্তম্ভিত করিয়া বিদ্যুল্লেখার দীপ্তির মতো এক নূতন সত্য আমার চেতনায় নামিয়া আসিল, কোথা হইতে আসিল, কেমন করিয়া আসিল—তাহা জানি না, জানিবার প্রয়োজন নাই। সেই সত্য আমার অতি পরিচিত রাজপথকে, রাজপথের কর্মপ্রবাহকে, আমার গতানুগতিক জীবনযাত্রাকে, আমার আমাকে—আকাঙ্ক্ষাকে, লক্ষ্যকে, চেষ্টাকে যেন 'ন স্যাৎ' করিয়া দিতে চায়। আমার প্রাচীন সংস্কার, আমার চিরাচরিত অভ্যাস, আমার বিশ্বাস, জ্ঞান, যুক্তি, শক্তি সকলই যেন আমার নিকট হইতে সরিয়া যাইতেছে। আমি যেন আমাতে নাই, আমার পুরাতন 'আমি'র এক অভিনব রূপান্তর ঘটিয়াছে। এক নূতন 'আমি' আমাতে ভর করিয়াছে। এ কি মৃত্যু না নূতন জন্ম? এ কি অন্ধকার না আগন্তুক আলোক? এ কি রিক্ততা, না সম্পন্নতা?

যে আমি লক্ষের একজন হইয়া, ধাবমান সংসারযাত্রায় নিজেকে লীন করিয়া, ঘাত-প্রতিঘাত আশা-নিরাশা তৃপ্তি-বেদনার মধ্য দিয়া নিজের সার্থকতা খুঁজিয়া ফিরি—যে আমি অবিচ্ছিন্নগতি পারিপার্শ্বিকের ঘূর্ণাবর্ত হইতে নিজেকে কিছুতেই পৃথক্ করিতে পারি না, ঘূর্ণাবর্তের সহিত মিশিয়া অবিরত ঘুরিয়া মরি—সে আমি এই নূতন আমির কাছে—বিদ্যুতের কাছে মেঘের মতো একান্তই সাধারণ, ক্ষুদ্র, দুর্বল, ভঙ্গুর। আমার সেই ক্ষুদ্র 'আমি' এত কাল এত ভাবে যাহা কিছু ভাবিয়াছে, বলিয়াছে, করিয়াছে তাহাদের নিজস্ব মূল্য ছিল—সার্থকতা ছিল, কিন্তু আমার বৃহৎ নূতন 'আমি'র বিদ্যুদ্দীপ্তির নিকট সে মূল্য সামান্য, সে সার্থকতা অকিঞ্চিৎকর। পুরাতন 'আমি' দেহের মধ্যে ছুটাছুটি করে, প্রাণের স্পন্দনের সহিত নাচে, মন-বুদ্ধির আন্দোলনের সহিত ওঠে নামে, ইন্দ্রিয়বেদ্য বস্তু ও ঘটনানিচয়ের বাহিরে আর কিছু দেখিতে পায় না, দেখিতে চায় না। বৃহৎ 'আমি'র কিন্তু কোন সীমা নাই। দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, এই অতি বিস্তৃত দেশ-কালে পরিধির অসংখ্য বস্তু ও ঘটনাসমূহ বৃহৎ 'আমি'র মাত্র এক তুচ্ছ বিন্দুতে অবস্থান করে। বৃহৎ 'আমি'র অনন্ত অপরিসীম ভূমা সত্য ক্ষুদ্র 'আমি'র সকল কল্পনার বাহিরে।

আমার বৃহৎ 'আমি' যখন আকাশে লুকাইয়া আছে, তখন রঙ্গমঞ্চের সমস্ত দৃশ্য নৃত্য সঙ্গীতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়ক হইল আমার ক্ষুদ্র 'আমি'—যে-আমি কেরানী, যে-আমি উকীল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, মাষ্টার—যে আমি অনবরত ছুটিতেছে, এই সংসারকে একান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে—যে-আমি এই সংসারের বিত্ত-বিভব জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিবার-সমাজের একনিষ্ঠ উপাসক। বিংশ শতাব্দীতে আমার এই ছোট-আমির বিদ্যা ও ঐশ্বর্যের অভিমান, কীর্তির দম্ভ, ক্ষমতার ঔদ্ধত্য—সকল ভব্যতার মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। সেক্ষেত্রে বৃহৎ-আমির আকাশে লুকাইয়া লুকাইয়া হাসা ছাড়া আর কি করিবার আছে? ক্ষুদ্র-আমির সহিত রঙ্গমঞ্চে প্রতিযোগিতা? ছি ছি লজ্জার কথা। বৃহৎ-আমি যে সম্রাট্—তাহার তো কোন অভাব নাই, দৈন্য নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, প্রয়োজন নাই।

আমার দুই আমি—ক্ষুদ্র-আমি ও বৃহৎ-আমি। ক্ষুদ্র-আমির উপাদান কাঠ, মাটি, খড়, আলকাতরা, বৃহৎ-আমি হইল উৎপত্তি ও বিনাশহীন স্বয়ংজ্যোতি চৈতন্য। ক্ষুদ্র-আমি অন্ধ, মূঢ়, বদ্ধ—বৃহৎ-আমি সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, চিরমুক্ত। যখন বৃহৎ-আমির সন্ধান পাই নাই, তখন ক্ষুদ্র-আমির সহিত মিশিয়া কত উন্মত্ত আচরণ করিয়াছি, কত প্রলাপ বকিয়াছি, কত ভয় পাইয়াছি, কত বেদনা, কত অপমান সহিয়াছি। বৃহৎ-আমিকে যখন বুঝিয়াছি

তখন সে আমাকে শান্ত করিয়াছে, নম্র করিয়াছে, নির্ভয়, নিঃসংশয় করিয়াছে।

আমার বৃহৎ 'আমি' আমার অনুপম ঐশ্বর্য। বৃহৎ 'আমি'তে দাঁড়াইয়াই আমি জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজিয়া পাই—জন্ম ও মৃত্যু, আশঙ্কা ও অভাব, সংগ্রাম ও পরাজয়—এই দ্বন্দ্বসমূহের পারে নিরাবরণ সত্যকে লাভ করি। বৃহৎ 'আমি'তেই মানুষের সর্বোত্তম, বৃহত্তম, সুন্দরতম মহিমা—মানুষের ঈপ্সিততম ভালবাসার পূর্ণ অভিব্যক্তি।

যখন বৃহৎ 'আমি'কে দেখি নাই তখন ভাবিতাম—আমার ক্ষুদ্র 'আমি'ই বুঝি সব। বৃহৎ 'আমি'কে দেখিয়া বুঝিলাম, কী ভুলই করিয়াছি! 'বৃহৎ আমি'-রূপে আমি আছি, বরাবরই আছি। 'ক্ষুদ্র আমি' সাজিয়া আমি যখন আত্মম্ভরিতা করি, তখনও আমি জানি আর না জানি, আমি 'বৃহৎ আমি'তেই আশ্রিত। ক্ষুদ্র-আমি বৃহৎ-আমির একটি বিকৃত ছায়া মাত্র।

আমি যেন আমাকে ঢাকিয়া না রাখি। আমি যেন আমাকে বরণ করি, বিশ্বাস করি, গ্রহণ করি। আমি যেন আমাকে দেখিয়া ভীত না হই, সংশয়াচ্ছন্ন না হই। আমি যেন আমাতে বাস করি, বিলাস করি, আমি যেন আমাতেই তৃপ্ত হই, শান্ত হই, পূর্ণ হই।

শ্যামাসঙ্গীত

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

মাগো,—ডাকিতে জানি না তাই, তাই তুমি আস না।
চাহিতে জানি না তাই মিটেনাক বাসনা।
বৃথা করি আরতি মা বৃথা করি প্রণতি,
হৃদয়ে মোদের নাই এক কণা ভকতি,
বাহুতে পাই না তাই বীরোচিত শকতি
হাসিতে জানি না মাগো, তাই তুমি হাস না॥
রুদ্রাণীরূপ তব, নহ তুমি নিদয়া
ভয়ের ছলনা কর, জানি তুমি অভয়া,
জননী কি হয় কভু অকরুণ-হৃদয়া,
না যাচিতে কর দয়া, মাগো তাপনাশনা॥
এক হাতে বরাভয় আর হাতে খড়্গ,
তব পদে রাজে মাগো চারি অপবর্গ,
যে পায় তোমার কৃপা চায় না সে স্বর্গ,
নরকবারিণী তুমি অন্তক-শাসনা॥
তনয় ভুলিতে পারে, মা তো কভু ভোলে না,
দ্বারে করাঘাত দিলে মা কি দ্বার খোলে না?
দুলাল অশুচি বলি মা কি কোলে তোলে না?
সেই ভরসায় রই শিব-হৃদয়াসনা॥

প্রাণের ঠাকুর এস ফিরে

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

মানুষ বিভ্রান্ত আজি পরাশ্রয়ী অশান্ত জীবনে,
পরম ক্ষুধায় তার চিত্ত নহে অস্থির চঞ্চল,
উদরে ক্ষুধার জ্বালা, আকণ্ঠ তৃষ্ণায় ক্ষণে ক্ষণে
পৃথিবীরে মনে হয় সর্বরিক্ত চির-নিঃসম্বল।

আজন্ম অশেষ স্নেহে যে শস্যশালিনী ভূমি-মাতা
নির্বিচারে সন্তানেরে পালন করেছে অকাতরে,
বৈমাত্রেয় দুষ্ট বুদ্ধি আজি হ'ল পরামর্শদাতা,
তারে চির-বন্ধ্যা বলি পরিহার করে অনাদরে।

স্ব-দেশের স্বর্ণধূলি শ্রদ্ধাভরে রাখে না মাথায়
দেবতারে দূরে ঠেলি সভা করে পূজার মন্দিরে,
ভুলেছে সাধন-মন্ত্র, নাস্তিকের প্রশস্তি-গাথায়
ন-স্যাৎ করিয়া দেয় শুভঙ্করী বিজয়-চণ্ডীরে।

তাইতো প্রার্থনা করি, হে ঠাকুর, এস এস ফিরে—
তব যাদুস্পর্শে দাও নবজন্ম আর এক জীবনে,
চরণে আশ্রয় মাগি পুণ্যতোয়া ভাগীরথী-তীরে
চিনুক আপন মায়ে, মাতৃপূজা শুভ উদ্বোধনে।

মহালগ্নে দেবীপূজা, বঙ্গভূমি পাদপীঠ তার,
তুমি তার পুরোহিত, তোমার অঞ্জলি হ'তে দেবী
নিজ হস্তে নিয়েছেন হাস্যমুখে অমৃতসম্ভার
তব চিত্তবিনিঃসৃত। মহা তপস্যায় ইষ্টে সেবি

দাঁড়ালে সেদিন তুমি, অন্ধকারে মগ্ন চারিধার—
আনিলে বিবেক-জ্যোতি, প্রভাতের উৎসারিত আলো,
মানব-চৈতন্যে এল কি অপূর্ব অনুভূতি তার।
বহু পথ বহু মত—এক হ'য়ে তোমাতে মিলালো।

তোমারে স্মরণ করি, হে পরমতৃষ্ণা-নিবারণ,
বহু তপস্যায় লব্ধ তব মহাজীবনের সুরে
ব্যাপ্তিতে তৃপ্তিতে আজ দীপ্ত হোক অপ্রবুদ্ধ মন,
গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গে মোহের মালিন্য যাক দূরে।

আলোহীন প্রাণহীন এ নীরন্ধ্র সংশয়-তিমিরে
এস এস প্রাণারাম, প্রাণের ঠাকুর এস ফিরে।

সর্বভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ

ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একদিন এক ব্রাহ্মভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মহাশয়! ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে নানা মত কেন? কেউ বলে—সাকার, কেউ বলে—নিরাকার, আবার সাকারবাদীদের নিকট নানা রূপের কথা শুনতে পাই। এত গণ্ডগোল কেন?' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'যে ভক্ত যেরূপ দেখে, সে সেইরূপ মনে করে। বাস্তবিক কোন গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোন রকমে যদি একবার লাভ করতে পারা যায়, তাহলে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। সে পাড়াতেই গেলে না, সব খবর পাবে কেমন ক'রে?'

ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন যা বলেছিলেন, আজ তাঁর সম্বন্ধেই তা প্রযোজ্য ব'লে মনে হয়। তাঁর মধ্যে এতগুলি ধর্মভাবের ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির সমাবেশ ছিল যে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বুঝা ও তাঁর সর্বভাবের কথা ঠিক ঠিক ভাবে বলা আমাদের মতো লোকের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। তাই আজ তাঁর সম্বন্ধে শিক্ষিত ও পণ্ডিত লোকদের মধ্যে নানা মত দেখতে পাই ও নানা ভাবের কথা শুনতে পাই। অবশ্য তাঁরা সকলেই তাঁর সর্বধর্ম-সমন্বয়ের কথা স্বীকার করেন। কিন্তু এই সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মূলে যে তাঁর মধ্যে সব ভাবের ও অনুভূতির সমাবেশ আছে, সে কথা তাঁরা সব সময় বুঝেন বা স্বীকার করেন ব'লে মনে হয় না। কেহ তাঁকে পরম কালীভক্ত বলেন, কেহ পরম জ্ঞানী বলেন; কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন; কেহ তাঁকে পরম যোগী মনে করেন, কেহ বা তাঁকে নিষ্কাম কর্মী বলেন। আবার কেহ কেহ তাঁর ভক্তি ও অদ্বৈতজ্ঞানকে বিরুদ্ধ ভাবের অসংহত ও অসঙ্গত সমাবেশ মনে করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক জীবন এবং ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে এরূপ বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ ধারণা তাঁর অপূর্ব অলৌকিক অধ্যাত্ম-জীবনের সম্পূর্ণ বা সত্য বর্ণনা নয়। এক একটি ধারণা তাঁর দিব্য জীবনের এক একটি দিক স্পর্শ করে মাত্র এবং উহা আংশিকভাবে সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। এস্থলে ভগবান বুদ্ধ ও যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের দুটি উপদেশপূর্ণ গল্পের কথা মনে পড়ে। এক সময় বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, 'চার অন্ধ ব্যক্তি যেমন এক হাতীর দেহের বিভিন্ন অংশ স্পর্শ ক'রে তার সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করে এবং প্রত্যেকে নিজ ধারণাটিকেই সত্য ব'লে পরস্পর কলহ করে, তেমনই পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিকগণ আংশিক সত্যমাত্র জেনে পরস্পরের মত খণ্ডন করবার জন্য কলহে প্রবৃত্ত হন।' শ্রীরামকৃষ্ণ যে গল্পটি বলতেন তা আরও সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ। তিনি বলতেন: একজন বাহ্যে গিছিল। সে দেখলে যে গাছের উপর একটি জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর একজনকে বললে, 'দেখ, অমুক গাছে একটি সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলাম।' লোকটি উত্তর করলে, 'আমি যখন বাহ্যে গিছিলাম, আমিও দেখেছি—তা সে লাল রঙ হতে যাবে কেন? সে যে সবুজ রঙ।' আর একজন বললে, 'না, না, আমি দেখেছি—হলদে।' এইরূপে আরও কেউ কেউ বললে,

'না জরদা, বেগুনী, নীল' ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বললে, 'আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি—তোমরা যা যা ব'লছ, সব সত্য—সে কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হলদে, কখন নীল, আরও সব কত কি হয়। আবার কখন দেখি, কোনও রঙ নাই।'

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনায় যেন অনন্ত ভাবধারার সমাবেশ ও সমন্বয় দেখা যায়। তাঁকে যিনি যেভাবে দেখেছেন, অথবা তিনি যাঁর কাছে যেভাবে দেখা দিয়েছেন, তিনি তাঁকে সেইভাবে বুঝেছেন। তাই কারও কাছে তিনি জগন্মাতার একনিষ্ঠ ভক্ত, আদ্যাশক্তি কালীর শ্রেষ্ঠ উপাসক বা শাক্ত, কারও কাছে ভগবান বিষ্ণুর পরম ভক্ত বা বৈষ্ণব, কারও কাছে শিবের পরম ভক্ত বা শৈব, কারও কাছে দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত মতাবলম্বী বেদান্তী, কারও কাছে ধ্যানমগ্ন রাজযোগী, কারও কাছে নিষ্কাম কর্মযোগী, আবার কারও কাছে সর্বভাবাতীত নির্গুণ ও নিরাকার ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত, নির্বিকল্প সমাধিমগ্ন অদ্বৈতবেদান্তী বা পরম জ্ঞানযোগী।

কখনও তিনি অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা' এই উপদেশ দিয়েছেন, এবং এবং যোগ্য পাত্র দেখে তাকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হবার প্রেরণা দিয়েছেন এবং সন্ন্যাসীর জীবনাদর্শ যে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ ও জীবসেবা তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন। আবার কখনও ভিন্ন অধিকারীকে দ্বৈতজ্ঞানের ও ভক্তি-পথের কথা বলেছেন, এবং ঈশ্বরই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সব হয়েছেন একথা ব'লে, সংসারে থেকে ভগবানে মন রেখে সংসারধর্ম পালন করতে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর কাছে যিনি যে ঈশ্বরীয় ভাব নিয়ে যেতেন, তাকে তিনি সেই ভাবেই ভাবিত ও অনুপ্রাণিত করতেন। তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপমা তাঁতেই প্রয়োগ ক'রে বলতে হয়, তিনি এমন এক দিব্য রঞ্জক ছিলেন যে তাঁর কাছে যে যে-রঙে কাপড় ছোপাতে চেয়েছে তাকে তিনি সেই রঙেই তা ছুপিয়ে দিয়েছেন, তাঁর এক আধারেই সব রঙ ছিল, কখন কখন তাতে কোন রঙই দেখা যেত না। এখন আমরা যদি বলি, তিনি ভক্ত ছিলেন, জ্ঞানী নয়, শাক্ত ছিলেন, বৈষ্ণব বা শৈব নয়, দ্বৈতবাদী ছিলেন, অদ্বৈতবাদী নয়, তবে আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ-বর্ণনা—'বহুরূপী লাল নয়—সবুজ, সবুজ নয়—হলদে' ইত্যাদি বর্ণনার মতো আংশিকভাবে সত্য হলেও সম্পূর্ণরূপে সত্য হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ-কল্পতরুর তলে যিনি সর্বদা ব'সে থাকতেন, সেই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: ঠাকুরের ভাবের ইয়ত্তা করা যায় না, তিনি ছিলেন একাধারে সমভাবে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদী, ভক্ত ও জ্ঞানী।—এই বর্ণনাই সর্বভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য বর্ণনা।

অজ্ঞ ও অবিশ্বাসী মানুষের মন জ্ঞানরূপ সূর্যের মেঘাবরণ। মেঘ যেমন মধ্যে মধ্যে সূর্যকে আবৃত ক'রে আমাদের দৃষ্টির অগোচর করে, তেমনই অজ্ঞ ও অবিশ্বাসী মন কূট তর্কজাল বিস্তার ক'রে জলন্ত ও জীবন্ত সত্যকে অস্পষ্ট ও আবৃত করে। কোন কোন পণ্ডিত ও সাধুলোক বিভিন্ন ধর্মভাব ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির একত্র সমাবেশ স্বীকার করেন না, অথবা সে সম্বন্ধে সন্দেহ ও আপত্তি করেন। তাঁদের ধারণা শাক্ত মত সত্য হ'লে বৈষ্ণব বা শৈব সিদ্ধান্ত সত্য হ'তে পারে না। সেইরূপ দ্বৈতবেদান্ত ঠিক হ'লে অদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত ঠিক হবে না, এবং অদ্বৈত মত ঠিক হ'লে দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত ঠিক হবে না। বেদান্ত আলোচনার সময় একদিন একজন খ্যাতনামা দ্বৈত-

বেদান্তী সাধু আমাকে এই কথাই বলছিলেন। বেদান্ত-দর্শনের বিভিন্ন শাখাগুলি পরস্পর বিরোধী নয় এবং তাদের একটা সমন্বয় সাধন করা যায়,—একথা বলায় তিনি আমাকে অনেক ভর্ৎসনাও করেছিলেন। বোধ হয় সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয় নেই। যাই হ'ক তাঁর বহু তর্কযুক্তির উত্তরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'যদি কোন লোক আপনার সম্মুখভাগ দেখে আপনার এক রকম বর্ণনা দেয়, এবং আর একজন লোক পশ্চাৎভাগ দেখে আর এক রকম বর্ণনা দেয়, তবে সেই দুইটি বর্ণনার মধ্যে কোন্‌টি ঠিক, আর কোন্‌টি ভুল—বলতে পারেন ?' তিনি এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারলেন না, শুধু বললেন, 'উপমার দ্বারা তত্ত্ব-নির্ণয় হয় না।' কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়।

তত্ত্বানুভূতি বা তত্ত্বসাক্ষাৎকারই তত্ত্বনির্ণয়ের প্রকৃষ্ট উপায়। আর একথাও সত্য যে তত্ত্বানুভূতির প্রকারভেদে তত্ত্বপ্রকাশ ও তত্ত্বনির্ণয়েরও প্রকারভেদ ঘটবে। সকলের তত্ত্বানুভূতি এক প্রকার হয় না এবং সেজন্য সকলের তত্ত্বনির্ণয়ও একরূপ বা একপ্রকার হবে না। মানুষের মন যখন যে ভূমিতে থাকে, তার জ্ঞান তখন সেই স্তরে ওঠে এবং তার তত্ত্বানুভূতিও সেই প্রকারের হয়। এ-সম্বন্ধে বেদে মনের সপ্তভূমির কথা আছে। মন যখন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভিদেশে থাকে তখন মানুষের জ্ঞান ইন্দ্রিয়বিষয়ে ও ইন্দ্রিয়সুখে নিবদ্ধ থাকে, এবং তার কাছে পরম তত্ত্ব রূপ রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-গুণযুক্ত জড়-জগৎরূপে প্রকাশিত হয়। মনের চতুর্থ ভূমি হৃদয়, পঞ্চম কণ্ঠ, ষষ্ঠ ভূমি ভ্রূমধ্য। মন যখন এসব ভূমিতে ওঠে, তখন মানুষের ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ ও ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। কিন্তু তখন জ্যোতিঃরূপে বা ঈশ্বরীয় রূপে প্রকাশিত তত্ত্ব এবং মানব মন বা মানবাত্মার মধ্যে একটা ব্যবধান থাকে এবং তাদের মধ্যে একটা ভেদ-জ্ঞানও স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে থাকে। এই স্তরে জ্ঞানের উৎকর্ষ ঘটালে মন সমাধিস্থ হয়। এ সমাধিকে যোগশাস্ত্রে সম্প্রজ্ঞাত বা সবিকল্প সমাধি বলা হয়েছে। এ অবস্থায় সাধক পরম তত্ত্বকে পরা শক্তি, পরমেশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মরূপে অনুভব করেন। তত্ত্বানুভূতির এই প্রকার ভেদে ও জ্ঞানের এই স্তরে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং তার উপরই শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের এবং দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি বৈষ্ণব বেদান্ত-মতের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

শিরোদেশ মনের সপ্তম ভূমি। সেখানে মন গেলে সব চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। তখন আর জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, বিষয়ী ও বিষয়, জীব ও ঈশ্বর ইত্যাদি দ্বৈতজ্ঞান থাকে না। মন তত্ত্বে লীন হয় এবং পরম তত্ত্ব পরম ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। অনুভূতির এই অবস্থাকে তুরীয় বলে এবং জ্ঞানের এই স্তরকে অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বিকল্প সমাধি বলে, এবং এখানে তত্ত্ব সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম-রূপে প্রকাশিত হন। এটি শুদ্ধ অভেদ জ্ঞানের অবস্থা, ইহাই অখণ্ডানুভূতি বা অদ্বৈত জ্ঞান। এই নির্বিকল্প সমাধি ও অখণ্ডানুভূতির উপর যোগীর শুদ্ধ আত্মজ্ঞান ও বেদান্তীর অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত।

এখন আমরা বুঝতে পারি যে মনের বিভিন্ন ভূমিতে, জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে তত্ত্ব কেমন বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয় এবং তা থেকেই বিভিন্ন ধর্মের ও দর্শনমতের প্রতিষ্ঠা হয়। এগুলি বিভিন্ন হলেও এদের মধ্যে একটি মাত্র সত্য, অপরগুলি মিথ্যা—এ কথা বলা যায় না। যেমন একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন সম্বন্ধে পিতা, পুত্র, স্বামী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্বোধনে অভিহিত করা

হয় এবং তার কোনটিই মিথ্যা নয়, কেননা প্রত্যেকটিতেই তিনি কোন না কোন ভাবে বিদ্যমান, তেমনই একই পরম তত্ত্বকে প্রকাশ ভেদে আদ্যাশক্তি কালী, মহাবিষ্ণু, পরম শিব, আত্মা, ভগবান, সগুণ বা নির্গুণ ব্রহ্ম বলা যায়; তার কোনটিই মিথ্যা নয়, কারণ প্রত্যেকটিতে একই তত্ত্ব কোন না কোন ভাবে প্রকাশিত।

তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে, সেই জানতে পারে—তাঁর স্বরূপ কি ? সে ব্যক্তি জানে যে তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন—তিনি সগুণ আবার তিনি নির্গুণ।'

নানা সাধনা ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্বের বিভিন্ন প্রকার অনুভূতিই লাভ করেছিলেন এবং জ্ঞানের সর্ব স্তর থেকে তত্ত্বের সর্ব রূপের ও ভাবের সাক্ষাৎকার করেছিলেন। তাই তিনি সর্ব ধর্ম ও দর্শনের মহাসমন্বয়ের বাণী দিয়ে গেছেন—'যত মত তত পথ'। এখন আমরা যদি তাঁর ধর্ম বা দর্শনমতকে একটি ক্ষুদ্র কোটরে আবদ্ধ করি, অথবা তাকে এক সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ করি, তবে তাঁর সব সাধনা ও শিক্ষাকে অস্বীকার করা হবে। কিন্তু সেটা শুধু ভুল হবে না, তাঁর প্রতি বড় অবিচারও করা হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সর্বভাবময় পরম পুরুষ, সর্বধর্ম-সমন্বয়ের যুগাবতার। যুগপ্রয়োজনেই তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। সে যুগপ্রয়োজন হ'ল—বিশ্বব্যাপী ধর্মদ্বন্দ্ব, ধর্মসম্প্রদায়গুলির কলহ, সংস্কৃতির সংঘর্ষ ও দর্শনমতের বিরোধ দূর ক'রে তাদের মহামিলন সাধন করা। এই যুগপ্রয়োজন আজ সিদ্ধির পথে যাত্রা শুরু করেছে, এবং কালে তা পূর্ণ হবে।

প্রতীক্ষান্তে

শ্রীশান্তশীল দাশ

চিরসুন্দর আমার জীবনে আসবে সে কোন্ রূপে ?—
দিনের আলোকে ক্ষিপ্র চরণে অথবা আঁধারে চুপে,
নানালঙ্কারে বিভূষিত হয়ে, অথবা নিরাভরণ,
রূপখানি তার সযতনে ঢেকে বেশবাসে সাধারণ,—
কিছু তো জানি না, বসে আছি শুধু আকুল প্রতীক্ষায়,
অনাদরে যেন দেবতা আমার ফিরে নাহি চলে যায়।

দিন কেটে যায় পথ পানে চেয়ে, আঁধারে সন্ধ্যা নামে,
পথ প্রান্তর জনহীন হয়, কলকোলাহল থামে,
তবু তার দেখা মেলে না তো, কই—সুন্দর এল না যে
মনের গভীরে অস্ফুট সুরে হতাশার সুর বাজে।
আসবে না সে কি ? আমার সময় হয়নি এখনো পার ?
ব্যাকুল এ মন আসা-পথ পানে ফিরে চায় বারবার।

নিশীথ রাত্রি, স্তব্ধ গভীর, চারিদিক নিঝ্ঝুম,
ক্লান্ত চোখের পাতা দু'টি ঘিরে নামে বিষণ্ণ ঘুম।
সে ঘুমের মাঝে দেখি বিস্ময়ে—খুঁজি যারে বার বার,
আমার সমুখে সে আছে দাঁড়ায়ে, হাসিমাখা মুখ তার।

গ্রন্থাগারে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আমার বই-এর ছোট্ট আলমারিতে সারি সারি বিরাজ করেন সমুদ্রের এ-পারের এবং ও-পারের মনীষীরা। তাঁদের কেউ বা অতীতের, কেউ বা বর্তমানের। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এঁদের কথা শুনি, শিক্ষাও পাই, আনন্দও পাই। মাঝে মাঝে মনে হয় পৃথিবীটা পাগলা-গারদ। হৃদয়ে ঘনিয়ে আসে নৈরাশ্যের অন্ধকার। বুঝতে পারিনে—কি রকমের পরিবর্তন দরকার, কল্যাণময় জীবনের বৈশিষ্ট্যই বা কি? তখন আশার আলো খুঁজে পাই দেশ-বিদেশের চিন্তা-বীরদের লেখার মধ্যে।

হাঁ, পৃথিবীতে যাঁরা চিন্তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে গেছেন দিগ্বিদিকে, তাঁদের সঙ্গে সত্যি কারও তুলনা হয় না। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের Principles of Social Reconstruction পড়তে পড়তে দেখি এক জায়গায় লেখা রয়েছে: The power of thought, in the long run, is greater than any other human power. —মানুষের নানা রকমের শক্তি আছে, চিন্তার শক্তির কাছে তারা কিছুই নয়। আর একথা হাজার বার সত্যি যে পৃথিবীতে যুগান্তকারী যত বড় বড় আন্দোলন হয়েছে তাদের উৎসমূলে তো মুষ্টিমেয় চিন্তাবীরের 'আইডিয়া'।

তাই আমার বইয়ের ছোট্ট আলমারিটা আমার কাছে একটা মহাতীর্থ। এই সুদূর গ্রামে সেবা-কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বাধার পর যখন বাধা পেয়েছি, স্বামীজীর পত্রাবলী প'ড়ে তখন সাহস এসেছে, ধৈর্য এসেছে—এসেছে আশা, উদ্দীপনা, উদ্যম। ১৮৯৪ খৃঃ আমেরিকা থেকে লেখা একখানি পত্রে দেখতে পেলাম লেখা রয়েছে:

হায়! যদি ভারতে একটা মাথাওয়ালা কাজের লোক আমায় সহায়তা করবার জন্য পেতাম! কিন্তু তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে—এখন দেখছি, আমাকে একলা ধীরে ধীরে কাজ করতে হবে।

১৮৯৬ খৃঃ লণ্ডন থেকে লেখা আর একখানি পত্রেও একই নিঃসঙ্গতার কথা। লিখেছেন:

> জীবন ক্ষণস্থায়ী, সময়ও ক্ষিপ্রগতিতে চলে যাচ্ছে। যে দেশে লোকের ভাবরাশি সহজে কার্যে পরিণত হ'তে পারে সেই স্থানে এবং সেই সকল লোকের সঙ্গে প্রত্যেকের থাকা উচিত। হায়! যদি দ্বাদশ জন মাত্র সাহসী, উদার, মহৎ ও অকপটহৃদয় লোক পেতুম!

আবার একখানি পত্রে লেখা রয়েছে:

'আর একটা ভূত যদি আমার মতো পেতুম!' পড়ি, ভাবি আর অবাক হয়ে যাই। জনতার মধ্যে স্বামীজী কি রকম নিঃসঙ্গ ছিলেন! কি পর্বতপ্রমাণ বাধাবিঘ্নের মধ্যে তিনি কাজ ক'রে গেছেন। লণ্ডন থেকে লিখছেন এক মহিলাকে:

> আমি শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরবো, পরিবর্তন-বিরোধী থস্থসে মাছের ন্যায় অস্থিমজ্জাহীন জড়প্রায় বিরাট দেশটার কিছু করতে পারি কি না দেখতে।

কিন্তু একদিকে যেমন নিঃসঙ্গ ছিলেন তিনি আর একদিকে কি সাহস, কি ধৈর্য। দিগন্ত-প্রসারী অন্ধকারের মধ্যে বসে দিকে দিকে বইয়ে দিয়ে গেলেন বৈপ্লবিক চিন্তার বিদ্যুৎপ্রবাহ। হৃদয়ের মধ্যে এ আশা অম্লান ছিল—তাঁর ভাব-

রাশি ব্যর্থ হবে না কখনও। একদিন না একদিন সেই ভাবের তরঙ্গমালা তাঁর স্বদেশবাসিগণের হৃদয়ে হৃদয়ে জাগাবে একটা নূতনতর প্রেরণা; সকল ক্লান্তি, সকল নৈরাশ্য মিলিয়ে যাবে দেশজোড়া উদ্দীপনার এবং মহাবীর্যের মধ্যে।

আমার ঐ ছোট্ট লাইব্রেরির মধ্যে বিরাজ করছেন যাঁরা, তাঁদের বাণীর মধ্যে কী আশ্চর্য মিল খুঁজে পাই। মাঝে মাঝে 'The Republic of Plato' নেড়ে চেড়ে দেখা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। মগজের কসরত ভালই হয়—আখ চিবোলে যেমন হয় চোয়ালের। আর প্লেটোর রসবোধও কী সুতীব্র! প্লেটো যে একজন রসিক পুরুষ ছিলেন—এতে কোন সন্দেহ নেই। কতকাল আগে তিনি লিখে গেছেন তাঁর Republic! কিন্তু সেদিন তাঁর কাছে যে-সব 'আইডিয়া' সত্য ব'লে প্রতিভাত হয়েছিল, আজও তারা আমাদের মনকে কী রকম নাড়া দেয়। বহু যুগের ওপার থেকে ভেসে-আসা প্লেটোর আইডিয়াগুলি আমাদের কাছে মনে হয় যেন উত্তুঙ্গ গিরিশিখরের বায়ু, যার মধ্যে আছে নবজীবন-সঞ্চারিণী শক্তি। মাদকদ্রব্য-বর্জন সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য আজও কত সত্য। এক জায়গায় বলছেন:

And you will grant that drunkenness, effiminacy and idleness are most unbecoming in guardians.

যারা হবে রাষ্ট্রের অভিভাবক, রাষ্ট্রতরণীর পরিচালক, রাষ্ট্রকে রক্ষা করবার দায়িত্ব থাকবে যাদের হাতে, তারা যদি মদ্যপ হয়—তবে তাদেরই রক্ষা করবার জন্যে তো রক্ষী লাগবে। প্লেটো রসিকতা ক'রে বলছেন, 'Truly it would be ridiculous for a guardian to require a guard'—রক্ষককে রক্ষা করবার জন্যে রক্ষীর প্রয়োজন, সত্যি একটা হাস্যকর ব্যাপার! প্লেটো বলেছেন: A guardian is the last person in the world, I should think, to be allowed to get drunk, and not know where he is

গ্রীক সংস্কৃতির প্রভাব মার্কিন কবি হুইটম্যানের কবিতাতেও প্রচুর। মদ্যপানকে হুইটম্যানও দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। হুইটম্যানের কাছে পবিত্রতা এবং স্বাস্থ্যের তুল্য আর কিছু নেই। নতুন যুগকে জয় করবার জন্যে সুখ-সম্পদ-মায়া-মমতার বন্ধন ছিঁড়ে পথে বেরিয়েছে যারা, তাদেরই জয়ধ্বনি কবির কণ্ঠে। পথ দুর্গম, বাধা বিপুল। নতুন পৃথিবীকে সৃষ্টি করবার সুদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কবির সহযাত্রী হবে যারা, তারা হবে valiant living men! তাদের যোগ্যতা-পরীক্ষার মাপকাঠি সাহস এবং স্বাস্থ্য। তিন শ্রেণীর মানুষকে কবি সঙ্গে নিতে নারাজ। প্রথম—যারা ব্যাধিগ্রস্ত, দ্বিতীয়—যারা মদ্যপায়ী এবং তৃতীয়—কুৎসিত ব্যাধিতে রক্ত যাদের দূষিত। Song of The Open Road কবিতায় হুইটম্যান বলছেন: No diseas'd person, no rum-drinker or venereal taint is permitted here মাতালকে তিনি তাঁর সহযাত্রীদলে ঠাঁই দিতে মোটেই রাজী নন। হুইটম্যান আগে থাকতেই বেশ সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন: None may come to the trial till he or she bring courage and health যদি দেহে স্বাস্থ্য এবং মনে সাহস থাকে, তবেই এগিয়ে এসো বাছাধন। আর যদি দেহের মধ্যে রোগ বাসা বেঁধে থাকে, অজানায় ঝাঁপিয়ে পড়তে মন ভয় পায়, তবে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

স্বামীজীর বাণীর মধ্যেও একই সুর। 'পত্রাবলী' পড়তে পড়তে দেখতে পাই কত

স্বরে, কত ভঙ্গীতে স্বামীজী নব্যভারতের কানে শুনিয়েছেন শক্তির অগ্নিমন্ত্র—শরীরে শক্তি, মনে শক্তি। হুইটম্যান যেমন বলেছেন, 'Only those may come who come in sweet and determined bodies' স্বামীজীও তেমনই বলেছেন, 'আমি চাই এমন লোক যাহাদের শরীরের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত-নির্মিত হইবে, আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটি মন বাস করিবে, যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব, ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ।' স্বামীজীর বজ্রকণ্ঠে বারংবার শুনতে পাই: 'সাহসী হও, সাহসী হও,—মানুষ একবারই মরে। আমার শিষ্যেরা যেন কখনও কোনমতে কাপুরুষ না হয়।' The Master As I saw him এক অপূর্ব গ্রন্থ। এই গ্রন্থে নিবেদিতা লিখছেন—এডেনের কাছাকাছি এক সন্ধ্যায় স্বামীজী তাঁর এক প্রশ্নের উত্তরে বললেন:

'So I preach only the Upanishads If you look, you will find that I have never quoted anything but the Upanishads. And of the Upanishads it is only that one idea—Strength. The quintessence of Vedas and Vedanta and all lies in that one word.'

—এই জন্য আমি কেবল উপনিষদের কথাই ব'লে থাকি। তুমি যদি দেখ, দেখতে পাবে আমার সমস্ত কথার মধ্যে শুধু উপনিষদের বাণীই উদ্ধৃত হয়েছে। আর উপনিষদের ভিতর থেকে শুধু শক্তির ভাবই আমি পরিবেশন করেছি। বেদবেদান্তের সার কথা ঐ 'শক্তি'।

এই অমূল্য গ্রন্থে নিবেদিতা আর এক জায়গায় গুরুদেব সম্পর্কে বলেছেন: Strength, strength, strength—was the only quality, he called for in woman as in man.

বাছাবাছা বইগুলির উপরে চোখ বুলাতে বুলাতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের মহামানবদের কণ্ঠে একই আইডিয়ার সমর্থন খুঁজে পেলে মনে হয় দিশেহারা চিত্ত সংশয়-সাগরে একটা আশ্রয় খুঁজে পেল।

যারা পৃথিবীটাকে নূতন ক'রে গড়ে তুলতে চায়, তারা যেন সুখের আশা না করে—এই কথাটা কত মনীষীর কণ্ঠে কত ভঙ্গীতেই না প্রকাশ পেল। রাসেলের Principles of Social Reconstructionএর শেষ পরিচ্ছেদে দেখতে পাচ্ছি লেখা রয়েছে: Those who are to begin the regeneration of the world must face loneliness, opposition, poverty, obloquy.—যারা দুনিয়াকে নবজীবনের পথে এগিয়ে দেবার কাজে হাত দেবে তাদের নিঃসঙ্গতার, বাধার, দারিদ্র্যের এবং লোকনিন্দার সম্মুখীন হতেই হবে। খেতড়ির মহারাজকে লিখিত স্বামীজীর পত্রে দেখতে পাচ্ছি—প্রত্যেক কার্যকেই তিনটি অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয় —উপহাস, বিরোধ ও পরিশেষে গ্রহণ। যে কোন ব্যক্তি তার সময়ের প্রচলিত ভাবরাশি ছাড়িয়ে আরও উচ্চতর তত্ত্ব ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করে, তাকে নিশ্চিতই লোকে ভুল বুঝবে। ১৮৯৫ খৃঃ আমেরিকা থেকে লিখিত পত্রখানিতে লেখা আছে:

বৎসগণ, কামড়ে পড়ে থাক, আমার সন্তানগণের মধ্যে কেউ যেন কাপুরুষ না থাকে। তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যে সাহসী, সর্বদা তার সঙ্গ করবে। বড় বড় ব্যাপার কি কখনও সহজে বিনা বাধায় হ'য়ে থাকে? সময় ধৈর্য ও অদম্য *ইচ্ছাশক্তিতেই* কাজ হয়।'

হুইটম্যানের Song Of the Open Road কবিতায় যাদের তিনি মুক্ত পথে আহ্বান করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে বেশ স্পষ্ট ভাষাতেই ঘোষণা করেছেন:

He going with me goes often with spare diet, poverty, angry enemies, desertions.

—আমার সহযাত্রীর ভাগ্যে অর্ধাশন, দারিদ্র্য ক্রুদ্ধ শত্রুদল, আপন জন তাকে ছেড়ে যাবে।

রবি ঠাকুরের 'বলাকা'য় শুনি হুইটম্যানের বিবেকানন্দের ও রাসেলের প্রতিধ্বনি। যাদের হাতে পুরাতনের জয়পতাকা, সেই প্রবীণ এবং পাকারা তাদের আঘাত তো হানবেই যারা নতুনকে নিয়ে আসছে আবাহন ক'রে।

'তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে একী বিষম কাণ্ডখানা।
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়
আয় প্রমত্ত, আয়রে আমার কাঁচা।'

মানুষের আত্মা দেশকালকে অতিক্রম ক'রে আছে। বুদ্ধ, খৃষ্ট, সক্রেটিস্, হুইটম্যান, টলস্টয়, রাস্কিন, রাসেল, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ—মানুষকে মর্যাদা দিলেন না কে?

আর নতুন সমস্যা ব'লে কি পৃথিবীতে কিছু আছে? এক বন্ধুর বাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজনের শেষে (কোন্ বইতে ঠিক মনে নেই) পড়ছিলাম: There is nothing new in the world, there are only the old problems happening to new people মানুষের প্রকৃতি আগেও যা ছিল, আজও তেমনই আছে। তপোবনের ঋষিরা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, আমাদের সামনেও সেই সব চির পুরাতন সমস্যা। শুধু নচিকেতার মতো স্বচ্ছ বুদ্ধিকে সহায় ক'রে যদি মৃত্যুর জালকে ছিঁড়ে যেতে পারতাম! মহৎ সাহিত্যের মধ্যে পথের নির্দেশ, আসক্তিকে জয় করবার ইঙ্গিত, ভালোবাসার জয়গান, দুর্বলতার উপরে কটাক্ষপাত।

শরৎ-সকাল

শ্রীপ্রণব ঘোষ

সবুজ সকালখানি,
ঘাসের শীতলপাটি
আঙিনায় পাতা—
নরম ধানের গুচ্ছে
লক্ষ্মীর আসন,
আম জাম নারিকেলে
দিগন্ত গহন,
ছড়ানো মাটির বুকে
রোদের আলপনা।

এখানে প্রাণের তারে
গান সাধো!
হে মোর স্বদেশ,
কোমলে শ্যামলে মিলে
আলোকে শিশিরে,
অশ্রুর আনন্দ দিয়ে
পূর্ণ করো সুর,
মেঘে মেঘে নীলে নীলে
দূর হ'তে দূর।

প্রতিভা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

প্রতিভার সংজ্ঞা ও উৎস কি?—এ-সম্বন্ধে আমার যা মনে উঠেছে—তাই বলছি, যদিও প্রশ্ন-দু'টির উত্তর দেওয়া মোটেই সহজ নয়।

কেন সহজ নয়? কারণ আমরা সংসারে অনেক কিছুরই সম্বন্ধে যা যা জানি তাদের মধ্যে অনেকখানি অংশই পাতলা মেঘের মতন আমাদের জ্ঞানের আলো-কে খানিকটা আবছা—অনির্বচনীয় ক'রে তোলে। এই অনির্বচনীয়তাকে ইংরেজী ভাষায় 'মিস্‌টিক' বিশেষণ দিয়ে ব্যক্ত করা হয়। কিন্তু 'মিস্‌টিক' কথাটিও কম মিস্‌টিক নয়, অর্থাৎ ওর ভাব হৃদয়ে থিতিয়ে গেলেও রূপের নাগাল পাওয়া শক্ত। আমাদের মনের গভীরে রকমারি আলো, প্রভা, স্ফুলিঙ্গ ঝিক্‌মিক্ করে, কিন্তু তাদের ছোঁয়া গেলেও ধরতে গেলেই ফসকে যায়।

'প্রতিভা' কি বস্তু? 'সৌন্দর্য' কাকে বলে? 'সুরুচি'র সংজ্ঞা কি? 'মায়া' মানে কি? এই জাতীয় নানা প্রশ্নই আমাদের মনের দুয়ারে টোকা মারে প্রায়ই। কিন্তু দুয়ার খুলে তাদের আপ্যায়িত করতে গেলেই দেখি, তাদের সংশয়-গ্রন্থি ছিন্ন করা ভার হ'য়ে ওঠে। এক কথায় যে-সব প্রশ্ন নিয়ে দিনের পর দিন ঘর করতে করতে মনে হয়, তাদের উত্তর খানিকটা জানি, তাদের সঙ্গে নির্জনে মুখোমুখি হ'তে না হ'তে দেখি যে জানার মতন জানি না।

এত কথা বলছি এইজন্য যে, সংজ্ঞা নির্ণয় করতে যাওয়ায় বিপদ পদে পদে। একটা খুব জানা উদাহরণ দিই। প্রতিভা কালেভদ্রে আসে, তাছাড়া সাধারণ মানুষের প্রতিভা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই ব'লে প্রতিভার সম্বন্ধে তাদের বোঝাবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু কখনও ভালবাসেনি এমন লোক দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া ভার। অর্থাৎ যদি রাম-শ্যাম-যদু-মধুকে জিজ্ঞাসা করা যায়—প্রেম সম্বন্ধে তারা কি বোঝে, দেখা যাবে সাড়ে পনেরো-আনা মানুষই ভুল জবাব দেবে এবং এক পাই মানুষকেও বোঝানো যাবে না যে প্রেমের প্রাণের কথাটি হ'ল—ভালোবাসতে চাওয়া, ভালোবাসা পাওয়া নয়, অর্থাৎ সত্যিকার প্রেম দেওয়া-নেওয়া নয়। নিধুবাবুর একটি গানে আছে:

'ভালোবাসিবে ব'লে ভালোবাসিনে—
আমার স্বভাব এই তোমা বই জানি নে।'

এক তরফা ভালোবাসায় কেউ পুরোপুরি সুখী হ'তে পারে না, কিন্তু একথা নিশ্চয়ই বলছি যে ভালোবাসার যদি স্বভাব এই হয় যে প্রতিদানে চাই প্রেমাস্পদের ভালোবাসার অঙ্গীকার, তবে সে হ'ল বাণিজ্য, আইনের ভাষায়: quid pro quo—আমি দিচ্ছি এই, তুমি দাও ঐ। বিশেষ ক'রে আজকের মানুষকে বোঝানো অসম্ভব খৃষ্ট কি বলতে চেয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, 'নেওয়ার চেয়ে দেওয়ার আনন্দই বেশি।' অসম্ভব এইজন্যে যে মনের মধ্যে খানিকটা অন্ততঃ নিষ্কামভাব না এলে 'নিষ্কাম প্রেম' শুনলে মনে হয় সোনার পাথর-বাটি বা আকাশ-কুসুম—অর্থাৎ ও হয় না, অবাস্তব। তাই হাজার চেষ্টা করলেও তাদের বোঝাতে পারা যাবে না যে রাধার প্রেমের মূল তত্ত্বটি হ'ল আত্মদান, দর-কষাকষি নয়—তুমি ভালোবাসলে তবেই আমি তোমাকে ভালোবাসব, নইলে নয়। রাধার মনের ভাব অঙ্গীকার করেই তো শ্রীচৈতন্য বলেছিলেন:

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্ মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

কোন নব্যা এ কথায় ফোঁস্ ক'রে উঠে বলবেন : 'আহা! কি কথা!' আধুনিকাদের 'আল্টিমেটাম' ফুটে উঠেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমরেরই মুখে—যে সতী হ'য়েও করতে চেয়েছিল শর্ত, গোবিন্দলালকে বলেছিল : 'যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য ছিলে ততদিনই তোমাকে ভক্তি করিয়াছি…' ইত্যাদি। ভ্রমর গোবিন্দলালকে যতই ভালোবেসে থাকুন না কেন, তাঁর সে নিবিড় প্রণয়ও ছিল নীতিসম্মত প্রেম, রাধার প্রশ্নহীন শর্তহীন প্রেম নয়—যে প্রেম শুধু ভালোবেসেই সার্থক—যে প্রেম বলে, তোমাকে যদি নাও পাই, তাহ'লে আর কাউকে চাইব না।

সংজ্ঞা-নিরূপণের দুরূহতা যদি প্রেমের সম্বন্ধেই সত্য হয়—যার ছিটেফোঁটা অনুভব মানুষমাত্রেই করেছে, তাহ'লে দুর্লভ প্রতিভা বলতে কি বোঝায় তা বোঝানো কি বিষম দায়। তাই কাউকে বোঝাবার চেষ্টা না ক'রে ব'লে যাই প্রতিভা বলতে আমার যা মনে হয়েছে।

সংস্কৃতে দু'টি বিশেষণ দিয়ে প্রতিভাকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি : নবনবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা; অন্যটি : মায়া-র উপমায়—অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি।

প্রথমটির ভাষ্য—প্রতিভা নিজের পথ নিজেই কেটে চলে নিত্য-নতুন পথে। এ কথা কে না মানবে যে প্রতি প্রতিভাই অদ্বিতীয়? প্রতি মানুষও তাই—সত্য, কিন্তু প্রতিভার অদ্বিতীয়ত্ব বিশেষভাবে সত্য, কেননা অনন্যতন্ত্রতা তার শুধু রক্তে নয়—মজ্জায়। তাকে যেন চেপে ধ'রে চালায় এক অদৃশ্য তাগিদ—স্পিরিট। স্পিরিটের 'ভূত' প্রতিশব্দও এখানে খাটে। কারণ প্রতিভা যে তার প্রেরণা, খানিকটা ভূতে-পাওয়া মানুষের মতনই যেন নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যায়—সে চলে খানিকটা যেন বিবশ হ'য়েই।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে হয়তো আমার বক্তব্যটি পরিষ্কার হবে। ইওরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার, প্রতিভার বরপুত্র বিটোভ্‌ন্ গামলায় মুখ ধুচ্ছেন, এমন সময় তাঁর মাথায় এল সুর-সম্পাত। তৎক্ষণাৎ মুখ না মুছেই বসলেন তিনি স্বরলিপি করতে। ঘর জলে জলময়—তাঁর ল্যাণ্ডলেডি (গৃহকর্ত্রী) রেগে আগুন, কিন্তু বিটোভ্‌নের গ্রাহ্যই নেই।

আর একটি দৃষ্টান্ত : এমার্সন লিখছেন দার্শনিক প্রবন্ধ। স্ত্রী অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠে বললেন, 'আমার এক জ্বালা হয়েছে তোমায় নিয়ে। শীতে কেঁপে মরি, চাকর পালিয়েছে। অথচ এই ঠাণ্ডা ঘরে ব'সে তুমি লিখে চলেছ কি যে মাথামুণ্ডু! যাও বাগান থেকে কিছু চেলাকাঠ নিয়ে এসো, এ-ও কি আমার কাজ নাকি?' এমার্সন দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে লেখা ছেড়ে উঠলেন। বাগানে গিয়ে কুড়ুল দিয়ে কয়েকটা কঞ্চি কেটে স্ত্রীর সামনে দিয়ে বললেন, 'এই নাও। এখন আমি শুরু করি—যা জীবনে একমাত্র বাস্তব সত্য—রিয়্যাল।' এই ব'লে লিখতে বসলেন দার্শনিক তত্ত্বকথা। তাঁর কাছে শীতে কাঁপার দুঃখও তেমন বাস্তব সত্য ছিল না, যেমন সত্য ছিল তাঁর দার্শনিক ভাবধারাকে ভাষায় রূপায়িত করা। তাই না তিনি হয়েছিলেন জগতের একজন সেরা দার্শনিক। ভাব এলে তাঁর আর নিস্তার ছিল না—তাকে যতক্ষণ না ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পারছেন, ততক্ষণ তাঁর পক্ষে আর কোন কাজে মন দেওয়া ছিল অসম্ভব।

হাল আমলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখতে পাই এ-প্রেরণার ফলে কী-ভাবে তিনি চলতেন, 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইটিতে এই সত্যেরই

পরিচয় পেয়ে মন অভিভূত হয় যে দারুণ রোগ-যন্ত্রণাও তাঁকে ঠেকাতে পারেনি কবিতা লেখা থেকে। যখন কলম ধরতে পারছেন না, তখনও লিখলেন—মানে, আবৃত্তি করলেন—অপরে টুকে নিল:

'দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে ··
যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
ততবার অনর্থ হয়েছে পরাজয়।·· '

অবসন্ন চেতনায়ও কবি কী অনুভব করলেন, তাকে ছন্দে ফুটিয়ে না তুলে রোগশয্যায়ও চুপটি ক'রে শুয়ে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠল—তাই-না লিখতে হ'ল তাঁকে:

'দেখিলাম, অবসন্ন চেতনার গোধূলি-বেলায়
দেহ মোর ভেসে যায়
কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি' ··

তবু প্রতিভার প্রেরণা জাগালো তাঁর বুকে প্রার্থনা:

' উর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড় হাতে—
হে পূষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতমরূপ,
দেখি তারে—যে-পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।'

আর এক বিরাট প্রতিভা শ্রীঅরবিন্দ। চোখে দেখতে পেতেন না তিনি শেষ কয় বৎসর। কিন্তু মুখে ব'লে চলেছেন, আর একজন টুকে নিচ্ছে, *এইভাবেই তিনি রচনা করেন তাঁর* মহাকাব্য—'সাবিত্রী'। শুনতাম এ-যুগ হ'ল লিরিক্ কাব্যেরই যুগ, এপিক্ আর কেউ রচনা করতে পারবে না। এ-যুগের শেষ এপিক্ না হোক্ আধা এপিক্ হ'ল মিল্টনের 'প্যারাডাইজ লষ্ট', কারণ তাতে এপিকের ছন্দ থাকলেও বিপুল বিভূতি নেই। 'সাবিত্রী'র মধ্যে আছে এপিকের কল্লোল তথা ঔদার্য—ব্যাপ্তি, এ-হেন এপিক তিনি প্রায়ান্ধ অবস্থায়ও মুখে-মুখেই রচনা ক'রে গেলেন। এরই নাম তো অঘটনঘটন-পটীয়সী প্রতিভা। বিরাট কাব্য মুখে-মুখে রচনা—তার কত ভাব, কত অনুভূতি, কত আবিষ্কার—নবনবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা আর কার নাম? তিনি দেখতে পেলেন যে আমরা যা: করি, ভাবি, সাধি—তার পিছনে রয়েছে এক চিরন্তন প্রেরণা—সেই চালায় এ বিশ্বভুবনকে:

A mystic motive drives
the stars and suns…
A mighty Supernature waits on Time.

প্রাতিভ প্রেরণা এক নিয়ন্ত্রিত করে সূর্যতারা···
কালের বাহিকা এক মহীয়সী অলোক-প্রকৃতি।

এবার প্রতিভার উৎস-মুখে প্রায় এসে গেছি। প্রতিভার ইতিহাসে এমন গভীরদর্শী ক-জন জন্মেছেন? 'সাবিত্রী'র সপ্তম স্কন্ধে ষষ্ঠ উল্লাসে তিনি লিখছেন:

The genius too receives
from some high fount,
Concealed in a supernal secrecy,
The work that gives him
an immortal name.
The word, the form, the charm,
the glory and grace
Are missioned sparks of a stupendous Fire.

—প্রতিভাও এক তুঙ্গ মহান্ গহন আলোকের
আদি-উৎস হ'তে পায় তার নিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা,
যার বরে সে লভে অমরণী কীর্তি এ-ধরায়।
লাবণ্য মহিমা ভাব-রূপায়ণ হ্লাদিনী সুষমা,
তারি মহীয়ান্ অনলের বাণীবাহী বহ্নিকণা।

প্রতিভার আদি-উৎস সম্বন্ধে এর চেয়ে সুন্দর স্পন্দমান সংজ্ঞা আর কোথাও পড়েছি ব'লে মনে পড়ে না। এ-স্থলে শ্রীঅরবিন্দ আরও একটি মূল্যবান্ কথা বলেছেন: এই স্বর্গীয় প্রেরণা মানব-মনের সীমাক্লিষ্ট ছোঁয়াচে খানিকটা খুইয়ে বসে তার আদিম দিব্য দীপ্তি: when least defaced, then is it most divine.

—মানসের ম্লান স্পর্শ হ'তে মুক্তি লভে সে যতই ততই সে হয় তার স্বর্গীয় স্বরূপে মূর্তিমতী।

এর বেশী আর কী বলা যেতে পারে প্রতিভার অমর্ত্য স্বরূপের সম্বন্ধে? শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Future of Poetry গ্রন্থে চমৎকার ক'রে ব্যাখ্যা করেছেন নানাশ্রেণীর কবিতার প্রেরণার স্তর। সে ব্যাখ্যার মূলে আছে প্রতিভাধর কবিদের এই চিরন্তন অনুভূতি যে তারা যে-পরিমাণে নিজেদের উচ্চতর সত্যলোকের কাছে খুলে ধরে সেই পরিমাণেই তাদের মধ্যে নেমে আসে সে অলক্ষ্য লোকের নিজস্ব ছন্দ দ্যুতি বর্ণ রাগ। এদের নিয়েই মানুষ আবহমানকাল শিল্পের দর্শনের কাব্যের সঙ্গীতের পসারী হ'য়ে এসেছে। অর্থাৎ, আসল কথা: আমাদের মর্ত্যমানস যে-অনুপাতে অমর্ত্যের বাহন হবে সেই অনুপাতেই সে প্রতিভাধর হ'য়ে ফুটে উঠবে।

এ-বাণীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ মেলে অধ্যাত্ম জগতে, কারণ, শিল্পে কাব্যে দর্শনে মানুষের মন নিরন্তর হানা দিয়ে অমল প্রেরণাকে খানিকটা চ্যুত করেই তার মলিন ছোঁয়া-তে। তাই এ-ছোঁয়াচ থেকে সবচেয়ে বেশি মুক্তি পায় কবি শিল্পী মনীষী নয়—যোগী, ঋষি, অবতারকল্প মহাপুরুষ। এ-যুগে এ-কথার সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মিলবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যজীবন পর্যালোচনা করলে। সচরাচর মহাপুরুষ মহাত্মাদের আমরা প্রতিভাধর নাম দিই না। কিন্তু বিচক্ষণ অলডাস্ হাক্স্লি—যিনি প্রতিভার একজন সেরা বোদ্ধা—ঠিকই বলেছেন যে ধর্মের জগতেই আমরা সবচেয়ে বেশি দেখতে পাই দিব্য প্রতিভার মর্ত্যলীলা। ঠিকই বলেছেন এইজন্য যে ধর্মের জগতেই মানুষ সবচেয়ে বেশি 'আমি'-র লয় সাধন করতে পারে—ভগবৎপ্রেমের আত্মহারা সাধনায়। তাই, প্রতিভার চরম পরিচয় মেলে সেই অবতারকল্প দিব্য পুরুষের সাধনায়, যাঁরা আমি-র ক্লেদ থেকে মুক্তি লাভ ক'রে হ'য়ে উঠেছেন ভগবদ্ভাব ও ভগবৎশক্তির বাহন। পরমহংসদেব সম্বন্ধে তাই তো স্বামীজী বলেছিলেন তাঁর একটি বক্তৃতায়: মানুষ মর্ত্যজীবনে যে কী ভাবে বিশুদ্ধ দেবত্বের পরিচয় দিতে পারে, তার দীপ্ততম দৃষ্টান্ত হ'য়ে এসেছিলেন এ-যুগে এই আশ্চর্য প্রেমের প্রতিভাধর, যাঁর প্রেমের শক্তি ছিল অঘটনঘটনপটীয়সী—অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই যাঁর প্রতিভা সারা বিশ্বে প্রকট করেছিল ভাগবতী শক্তির মহিমা। পরমহংসদেব বলতেন: আকাশজোড়া মুখ ক'রে ডাকতাম 'মা'। আর মাকে আনতাম টেনে। এই আবাহনের শক্তিই হয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ও ভাগবতী প্রেরণাই তার উৎস-গোমুখী।

ভক্তি-অর্ঘ্য

শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

জননি! জগদীশও তোমার অধীন।
পরা-অপরা ঐশ্বর্যে সদা পূর্ণ তোমার ভাণ্ডার,
তাই কত দাও মোরে: আর আমি? দীন, অতি দীন
কোথা পাব বল কণা মাত্র তার?
তবু আজও হায়! আছে ভক্তি নীলপদ্ম-রূপে, তোমারি দয়ায়—
এ হৃদয় মানস-সরসে: যদি লহ করুণায়—
তাই দিব অর্ঘ্য, তব কমল-কোমল রাঙা পায়।

সেকালের কথকতা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সেকালে কথকতাই ছিল আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা বিস্তারের প্রধান বাহন। দেশের নিরক্ষর বিরাট জনতা কথকতার আসর থেকে স্বল্প আয়াসে ধর্ম-জ্ঞান, নীতি-শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে শান্তি ও আনন্দলাভ ক'রত। বস্তুতঃ সে যুগে কথকতাই ছিল এদেশের সাধারণ জনগণের, বিশেষতঃ পল্লীবাসীদের সমষ্টিগতভাবে শিক্ষা-দীক্ষালাভ ও চিত্তবিনোদনের একমাত্র উপকরণ। অবশ্য পরবর্তীকালে পাঁচালি, যাত্রা, নাটক, তরজা, পালাকীর্তন প্রভৃতিরও ক্রমশঃ উদ্ভব এবং প্রচলন হয়। সম্প্রতি চলচ্চিত্র, বেতার, সংবাদপত্র এবং আরও কত চিত্তাকর্ষক উপকরণ সমাজ-শিক্ষার ক্ষেত্রে পাওয়া যেতে পারে।

ইদানীং দেশের সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে নিরক্ষরতাও ধীরে ধীরে দূর হচ্ছে। মুদ্রিত পুস্তক-পুস্তিকা এবং পত্র-পত্রিকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। পল্লীতে পল্লীতে পাঠশালা, গ্রামে গ্রামে উচ্চ বিদ্যায়তন, শহরে শহরে কলেজ গড়ে উঠেছে। নারী-শিক্ষার প্রচলন এবং প্রসারও হয়েছে। মেয়েদের স্কুল-কলেজগুলিতে তাদের স্থান সঙ্কুলান হয় না।

সুতরাং এই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-শিক্ষায় তথা আমাদের জাতীয় প্রগতিতে কথকতার অবদানের বিষয় বিচার করতে গেলে মনে হয়, সে সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা লাভ করা অসম্ভব হবে। জনশিক্ষার ক্ষেত্রে কথকতার ভূমিকা যে কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ এবং কত ব্যাপক, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হ'লে প্রথমে আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত ক'রে দূর অতীতের পারিপার্শ্বিকতায় নিয়ে যাওয়া দরকার।

তখন মুদ্রণযন্ত্র অথবা মুদ্রিত পুস্তক-পত্রিকাদি কিছুই ছিল না। হাতে লেখা তালপাতার পুঁথিই ছিল সম্বল এবং তার সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের টোল বা চতুষ্পাঠীগুলিতে লেখাপড়া এবং বিদ্যাচর্চা হ'ত, তাদের সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল না। তা ছাড়া সর্বসাধারণের বিদ্যার্জনের কোন সুযোগই ছিল না। দেশময় ছেয়ে ছিল নিরক্ষতার নিবিড় ছায়া। অতএব সেই যুগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তবেই আমাদের লোক-শিক্ষার ক্ষেত্রে কথকতার বিরাট ভূমিকা এবং মহান্ অবদান সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা হবে।

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে, সে যুগে দেশের জনসাধারণ নিরক্ষতার জন্য কি অজ্ঞ ও অধঃপতিত ছিল? তারা কি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক থেকে বঞ্চিত ছিল?—তা কখনই নয়। বরং বর্তমানের তুলনায় তখন তাদের নৈতিক মেরুদণ্ড সুদৃঢ় এবং চারিত্রিক মান উন্নততর ছিল। বস্তুতঃ এর মূলে ছিল শিক্ষাব্রতী কথকগণের সরল সুললিত কথকতারই অদৃশ্য প্রভাব। কথকতার আসরে বিমুগ্ধ শ্রোতৃবর্গ কেবল ধর্ম ও নীতি-শিক্ষাই নয়, তার সঙ্গে আমাদের মহাকাব্য, সংস্কৃত সাহিত্য, জাতীয় সাধনা, অধ্যাত্ম সংস্কৃতি, আচার-পদ্ধতি, কর্তব্যপালন, পরার্থ-পরতা প্রভৃতি বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ ক'রত। নারী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র

নির্বিশেষে সর্বসাধারণের জন্যই কথকতার আসর সদা উন্মুক্ত ছিল।

বিশাল জনমণ্ডলী ঐ আসরে বর্ণমালা-পরিচয়ের অবকাশ না পেলেও, জ্ঞানলাভের প্রচুর সুযোগ পেত। ফলে দেশের জনসাধারণ কথকতা শুনে মুখে-মুখে যথেষ্ট জ্ঞান ও শিক্ষা-লাভ ক'রত। নিপুণ কথকগণের সরস কথকতায় এমনই চমৎকারিত্ব ছিল যে, তা শুনে বিশাল জনতা সহজেই আকৃষ্ট হ'ত। অজ্ঞ, নিরক্ষর শ্রমজীবীদেরও কোমল চিত্তে তার অপরিসীম প্রভাব পড়ত। এইজন্য সেই সমস্ত কথা-কাহিনী বা উপদেশ-প্রসঙ্গ একবার মাত্র শুনেই সেগুলি তারা অনায়াসে ধরতে পারত, কথাবার্তায় তা ব্যবহারও ক'রত এবং জীবনের আচরণেও ঐ সব সৎশিক্ষা ফুটে উঠত।

প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যায় বাংলার পল্লীতে, শহরে নগরেও কথকতার আসর বসত। চণ্ডী-মণ্ডপ অথবা অন্য কোন দেবালয়ের প্রাঙ্গণ কিংবা ধর্মপ্রাণ গৃহস্থের বহির্বাটীই ছিল কথকতার আসরের স্থান। পুরাণ-শাস্ত্রাদির মনোহর কথামালা এবং সাধু-মহাত্মাদের অমর জীবন-কাহিনী শোনার আকাঙ্ক্ষায়, সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই, দলে দলে আবালবৃদ্ধবনিতা পরম আগ্রহভরে সম্মিলিত হ'ত। কথকগণ বাস্তব উপমার মাধ্যমে, সুমধুর সঙ্গীতসহ সরস কথাচ্ছলে ঐ সমস্ত পুণ্য প্রসঙ্গ বিচিত্র ভঙ্গিমায় কথকতা ক'রে শোনাতেন। শুভ্র বস্ত্র-, উত্তরীয়- ও যজ্ঞোপবীত-পরিহিত এবং মাল্যচন্দনাদি-ভূষিত নধরকান্তি ভক্তিমান্ কথকঠাকুরকে দেখে শ্রোতৃবৃন্দের অন্তর ভাবে ও ভক্তিরসে আপ্লুত হ'য়ে উঠত। লোক-শিক্ষক কথকগণ অতিশয় আচারনিষ্ঠ, পবিত্রাত্মা ও ঈশ্বর-পরায়ণ ছিলেন। তাঁরা নিজেদের দেহ ও মনের শুচিতার প্রতি সর্বদাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন।

সেকালে আমাদের দেশে বারো মাসে কেবল তের পার্বণই নয়, সারা বছর অগণন পাল-পার্বণ ও ব্রতোৎসব লেগে থাকত। তখন দেশের আর্থিক অবস্থা ছিল যেমন সচ্ছল, লোক-চিত্তে ধর্মভাবও ছিল তেমনই প্রবল। ফলে, লোকে সৎকার্যে ব্যয় ক'রত অকুণ্ঠচিত্তে, পার্বণ-উৎসবাদিতে খরচপত্র ক'রত মুক্তহস্তে। পাল-পর্ব উপলক্ষে ধর্মপ্রাণ রাজা, মহারাজা এবং জমিদার ও ধনী গৃহস্থগণ নিজ নিজ গৃহে কথকতা করাতেন। তাঁরা এই সকল অনুষ্ঠানে বেশ সমারোহও করতেন। জাঁকজমক এবং আড়ম্বর নিয়ে কখন কখন তাঁদের পরস্পরের মধ্যে প্রতি-যোগিতারও সৃষ্টি হ'ত।

প্রশস্ত প্রাঙ্গণে রঙবেরঙের বিস্তীর্ণ সামিয়ানা টাঙানো হ'ত। তার নিম্নে এক পার্শ্বে কথক-ঠাকুরের বসার জন্য নির্মিত হ'ত সুসজ্জিত মঞ্চ বা বেদী। তার চারি কোণে কলা-গাছ, উর্ধ্বে সুদৃশ্য চন্দ্রাতপ এবং চতুর্দিকে আম্রপল্লব, চাঁদমালা, কুসুমস্তবক ও পত্র-পুষ্পা-দির মাল্য শোভা পেত। মণ্ডপে সামিয়ানার নীচে নানা বর্ণের উজ্জ্বল প্রদীপমালার ঝাড় সব ঝুলত। শ্রোতাদের বসার জন্য সমস্ত মণ্ডপ জুড়ে গালিচা, সতরঞ্চ প্রভৃতি বিছানো হ'ত। মহিলাদের জন্য পৃথক্ আসন নির্দিষ্ট থাকত, তাঁদের আসন 'চিক' দিয়ে আড়াল করা হ'ত। চিকের ফাঁক দিয়ে তাঁরা সুরসিক কথকঠাকুরের বিচিত্র ভাব-ভঙ্গিমাসকল বেশ স্পষ্টই দেখতে পেতেন।

মঞ্চ বা বেদীর উপরে কথকঠাকুরের জন্য পাতা হ'ত সুদৃশ্য আসন। ঐ আসনের সম্মুখ ভাগে থাকত শুভ্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি জল-চৌকি অথবা পিঁড়ি। কথকঠাকুর তার উপর কথকতার গ্রন্থ বা পুঁথি রাখতেন। আসনের পশ্চাৎভাগে শোভা পেত একটি তাকিয়া। বাম

পার্শ্বে থাকত জলপূর্ণ গাড়ু এবং তার উপর একটি গামছা অথবা বস্ত্রখণ্ড। কথকঠাকুর তা দিয়ে প্রয়োজন-বোধে হাত মুখ মুছতেন। দক্ষিণ-ভাগে থাকত তাঁর আচমনাদির জন্য পবিত্র জলপূর্ণ কোশাকুশি বা পঞ্চপাত্র। পুষ্পপাত্রে থাকত ফুল, চন্দন, তুলসী, দূর্বা, মাল্য প্রভৃতি, আর একটি বড় পাত্রে থাকত দেবতাকে নিবেদনের জন্য ফল-মূল, সন্দেশ-বাতাসা প্রভৃতি। সামনে তৈল কিংবা ঘৃতের প্রদীপ জ্বলত; ধূপ-ধুনা দেওয়া হ'ত, তার মধুর সৌরভে চারিদিকে আমোদিত হ'য়ে উঠত।

মঞ্চে সামনের দিকে এক পার্শ্বে একটি টবে শোভা পেত তুলসীবৃক্ষ। ঐ টবটি সুন্দরভাবে লাল শালু দিয়ে আচ্ছাদিত থাকত। ঐ স্থানে তুলসী-মঞ্চ স্থাপনের একটি নিগূঢ় অর্থ ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রয়েছে। এ সম্পর্কে পুরাণে পাওয়া যায়:

তুলসীকাননং যত্র, যত্র পদ্মবনানি চ।
পুরাণপাঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ॥

—যে স্থানে তুলসীকানন থাকে, যে স্থানে পদ্মবন থাকে এবং যে স্থানে পুরাণশাস্ত্র পাঠ হয়, সেই স্থানে সাক্ষাৎ শ্রীহরির আবির্ভাব ঘটে।

কথকঠাকুর যে মঞ্চ, বেদী বা উচ্চাসনে বসে পুরাণশাস্ত্র কথকতা করতেন, তাকে বলা হ'ত 'ব্যাসাসন' বা 'ব্যাসপীঠ'। ঐ আসনকে ভাগবত-পুরাণাদি-প্রবক্তা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-দেবের আসন জ্ঞান করা হ'ত। কথকঠাকুর ঐ আসনে উপবেশন করার পূর্বে পরম ভক্তিভরে 'ব্যাসাসনায় নমঃ' কিংবা 'ব্যাসপীঠায় নমঃ' ব'লে তাতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতেন। কথকতা শেষেও তিনি আসন হ'তে নেমে আবার ঐ ভাবে ব্যাসাসনকে বন্দনা ও প্রণাম করতেন। ঐ আসনে উপবিষ্ট থাকাকালে তিনি কথকতার প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোন কথাবার্তা কারও সঙ্গে বলতেন না। কখনও বিশেষ প্রয়োজনে কারও সঙ্গে অন্য কথা বললে তিনি আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করতেন। তার পর আবার যথারীতি কথকতা ক'রে যেতেন। তিনি আত্মাভিমান ত্যাগ ক'রে ঐ আসনে উপবেশন করতেন, তাই তাঁর সুমধুর কথকতার উপসংহারে তাঁর ভক্তি-গদ্‌গদকণ্ঠে শোনা যেত—অদ্য শ্রীভগবান্ বেদব্যাস এই স্থানেই বিরাম (বিশ্রাম) গ্রহণ করলেন।

ধর্মপ্রাণ শ্রোতৃমণ্ডলীও ব্যাসাসন এবং কথক-ঠাকুরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-সম্মান ও ভক্তি-মর্যাদা প্রদর্শন করতেন। তাঁরা কথককে কথকতাকালে সাক্ষাৎ 'ব্যাসদেব'-রূপে দেখতেন। এই জন্য, তাঁরা ঐ সময়ে তাঁকে কোনও প্রশ্ন অথবা তাঁর ব্যাখ্যাদি সম্বন্ধে কোনোরূপ কটু মন্তব্য করতেন না। কারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে তিনি কথকতাশেষে ঐ আসন থেকে নেমে এলে তবে তাঁকে প্রশ্ন করতেন। এই সময়ে কেউ ইচ্ছা করলে তাঁর সঙ্গে আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্কও করতে পারতেন। কিন্তু তিনি ব্যাসাসনে উপবিষ্ট থাকাকালে কেউ কখনও তাঁর প্রতি কোনরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করতেন না।

বিশেষ বিশেষ পর্বাহ ছাড়াও কতকগুলি সামাজিক ক্রিয়াকর্মে—যেমন অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষেও ধর্মপ্রাণ গৃহস্থ-গণ নিজেদের গৃহে কথকতা করাতেন। বৈশাখ মাস হিন্দুদের নিকট অতি পবিত্র মাস। এই জন্য অনেকেই এই মাসে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিজ নিজ গৃহে কথকতার আসর বসাতেন। আবার 'নিয়মসেবা' উপলক্ষেও নানাস্থানে এক মাস ব্যাপী প্রত্যহ সন্ধ্যায় কথকতা হ'ত। আশ্বিনের শুক্লা একাদশী থেকে কার্তিকের শুক্লা একাদশী পর্যন্ত অথবা আশ্বিনের সংক্রান্তি থেকে কার্তিকের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রত্যহ যথাবিধি ভাগবতাদি পাঠ ও কথকতা হ'ত। এই কথকতাই নিয়মসেবার কথকতা বলে প্রসিদ্ধ।

নিয়মসেবায় ঘটস্থাপনা ও সংকল্প ক'রে পাঠ এবং কথকতা হ'ত। যে শাস্ত্রের কথকতার সংকল্প হ'ত, প্রত্যহ পূর্বাহ্ণে সেই শাস্ত্র ও তার অধিদেবতার যথারীতি পূজার্চনা করা হ'ত। প্রাতঃকালীন এই অনুষ্ঠান কথকতার মঞ্চ বা মণ্ডপে না হ'য়ে নিকটবর্তী আর একটি স্থানে হ'ত। কথকঠাকুর প্রত্যহ এই সময়ে ঐ গ্রন্থ ও দেবতার অর্চনাদি ক'রে গ্রন্থের মূল শ্লোকগুলি কিছু কিছু ধারাবাহিকভাবে পাঠ করতেন। পূর্বাহ্ণের এই অনুষ্ঠানকৃত্য-সম্পাদনে কথক কোন কারণে অক্ষম হ'লে, তিনি সংকল্প করিয়ে অন্য ব্রাহ্মণকেও ঐ কর্মে নিযুক্ত করতে পারতেন। যাঁকে ঐ কার্যে ব্রতী করা হ'ত তিনি 'পাঠক' নামে অভিহিত হ'তেন।

সকাল বেলার এই অনুষ্ঠানে আর দুইজন ব্রাহ্মণকে ব্রতী করা হ'ত—একজন 'ধারক' এবং একজন 'শ্রোতা'। ধারকের কাজ ছিল, পাঠকের পাঠে যাতে কোনরূপ ভুল-ভ্রান্তি না ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে 'গ্রন্থরক্ষা' করা। অর্থাৎ পাঠকের সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগ সহকারে তাঁর নিজের পুঁথি দেখে যাওয়া। পাঠকের পাঠ বা উচ্চারণে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে ধারক তা সংশোধন ক'রে তাঁকে ধরিয়ে দিতেন। শ্রোতার কাজ ছিল অর্থবোধ সহ নিবিষ্টচিত্তে পাঠকের পাঠ শ্রবণ করা। ধারক এবং শ্রোতাও যথাবিধি সংকল্পাদি ক'রে নিজ নিজ কার্যে ব্রতী হ'তেন।

পূর্বাহ্ণের এই পাঠে নিত্যই কিছুসংখ্যক ধর্মপ্রাণ শ্রোতাও সেখানে বসে ভক্তিভরে ঐ পাঠ শ্রবণ করতেন। শ্রোতাদের বোঝার সুবিধার জন্য পাঠক ঐ সময়ে কোন কোন কঠিন শ্লোকের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও করতেন। প্রত্যহ সকালে যতখানি পাঠ হ'ত, সান্ধ্য আসরে কথকঠাকুর তা বিচিত্র ভঙ্গিমায় শ্রোতৃমণ্ডলীকে কথকতা ক'রে শোনাতেন।

কথকতার উদ্‌যাপন উপলক্ষে ধর্মপ্রাণ রাজা-মহারাজা এবং জমিদার ও ধনী গৃহস্থগণ মহোৎসব করতেন। ব্রাহ্মণভোজন, পণ্ডিত-বিদায়, দরিদ্র-কাঙালসেবা এবং আত্মীয়বর্গ, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের খাওয়ানো প্রভৃতি ঐ উৎসবের অন্যতম অঙ্গ থাকত। কথক-ঠাকুরদেব প্রাপ্তিযোগও বেশ মোটা রকমের হ'ত। তাঁরা মূল্যবান্ পট্টবস্ত্র, উত্তরীয়, শাল, স্বর্ণাঙ্গুরী, বিবিধ তৈজস, শয্যা-পালঙ্ক, ছত্র-পাদুকা, স্তূপাকৃতি ভোজ্যসামগ্রী এবং গিনি-মোহর প্রভৃতি যথেষ্ট দান-দক্ষিণা পেতেন। কথকতার বিশেষ বিশেষ পালার দিনে—যেমন কথকতার অন্তর্গত প্রসঙ্গানুযায়ী অন্নপ্রাশন, বিবাহ, রাজ্যাভিষেক, বামন-ভিক্ষা প্রভৃতিতে ধর্মপ্রাণ শ্রোতৃমণ্ডলীও কথক-ঠাকুরকে বহু বস্ত্র, অর্থকড়ি, অলঙ্কার, বাসন-কোসন, ভোজ্য প্রভৃতি দান-প্রণামীরূপে দিতেন।

একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি—সেদিনও ছিল—আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। .....যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাট্‌না কাটে, যে ভাত পায়, যে না পায়, সেও শিখিত,...শিখিত যে ধর্ম নিত্য, ঈশ্বর আছেন পাপপুণ্য আছে,...পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার আছে, জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য .... —সে শিক্ষা কোথায়, সে কথক কোথায়? কেন গেল?

—বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীকণ্ঠের বিশিষ্ট-শিবাদ্বৈতবাদ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

ভারতের দর্শনশাস্ত্র যে সর্বদিক থেকেই জগতে অতুলনীয়, সে কথা আমরা গৌরবের সঙ্গেই ঘোষণা করতে পারি। এই দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে আবার বেদান্ত-দর্শনই যে তারাগণের মধ্যে 'একশ্চন্দ্রঃ' রূপে দেদীপ্যমান, তাও অবশ্য-স্বীকার্য। পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হবার জীবাত্মার যে শাশ্বত আকূতি—তারই প্রপূর্তি দৃষ্ট হয় বেদান্তের 'তত্ত্বমসি' প্রমুখ মহাবাক্যে। সেজন্যই বেদান্তকে ভারতের আত্মার মূর্ত প্রতীক-রূপে গ্রহণ করা চলে। বেদান্তের জনপ্রিয়তা এবং সর্বজনীন প্রভাবের মূল কারণও এই। অন্য কোন দর্শনের এরূপ অসংখ্য ভাষ্য টীকা ব্যাখ্যা প্রভৃতি বিরচিত হয়নি, এবং অন্য কোন দার্শনিক সিদ্ধান্ত থেকে এত অধিকসংখ্যক সাধক-সম্প্রদায় উদ্ভূত হয়নি। শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের স্বাভাবিক দ্বৈতবাদ, মধ্বের দ্বৈতবাদ এবং বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ—এই প্রখ্যাত 'পঞ্চ-বেদান্ত-সম্প্রদায়ে'র মধ্যে শেষোক্ত চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়, বিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' ও পরবর্তী বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি প্রপঞ্চিত 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ'ও বৈষ্ণব বেদান্ত-সম্প্রদায়। কিন্তু বেদান্তের শৈব সম্প্রদায় সম্বন্ধে সেরূপ অধিক কিছু জানা যায় না। প্রকৃতপক্ষে—বেদান্তের দু'একটি মাত্র শৈব সম্প্রদায়ের বিষয়ই আমরা কিছু জানি—তাদের মধ্যে অধিকতর প্রখ্যাত শ্রীকণ্ঠ শৈবাচার্যের 'বিশিষ্ট-শিবাদ্বৈতবাদ'।

শ্রীকণ্ঠ-বিরচিত একটি মাত্র গ্রন্থের কথা আমরা জানি, সেটি তাঁর সুবিখ্যাত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য। এই ভাষ্যে সুনিপুণভাবে তিনি শৈব-মতানুযায়ী বেদান্ত-ব্যাখ্যা করেছেন। দুঃখের বিষয়, এই অমূল্য গ্রন্থ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও আলঙ্কারিক অপ্পয় দীক্ষিত ষোড়শ বা সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে এই ভাষ্যের উপর 'শিবার্ক-মণি-দীপিকা' নামক একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা রচনা করেন। এই শৈব-বেদান্ত-ভাষ্য শৈবগণের পরম আদরের বস্তু। শ্রীকণ্ঠ স্বয়ং এর গুণবর্ণনা ক'রে বলেছেন :

শ্রীমতাং ব্যাস-সূত্রাণাং শ্রীকণ্ঠীয়ঃ প্রকাশতে।
মধুরো ভাষ্যসন্দর্ভো মহার্থো নাতিবিস্তরঃ ॥
সর্ব-বেদান্ত-সারস্য সৌরভাস্বাদ-মোদিনাম্।
আর্যাণাং শিবনিষ্ঠানাং ভাষ্যমেতন্মহানিধিঃ ॥(৬-৭)

শ্রীকণ্ঠের জীবনী ও আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে প্রায় কিছুই সঠিক জানা যায় না। তাঁর ভাষ্যের প্রারম্ভে তিনি তাঁর গুরু শ্বেতাচার্যকে এইভাবে প্রণতি নিবেদন করেছেন :

নমঃ শ্বেতাভিধানায় নানাগমবিধায়িনে।
কৈবল্যকল্পতরবে কল্যাণ-গুরবে নমঃ ॥ (৪)

শ্রীকণ্ঠের আবির্ভাব-সময় যথাযথভাবে নিরূপণ করা সম্ভবপর না হ'লেও, তিনি যে শঙ্করাচার্যের পরবর্তী ছিলেন, তা নিঃসন্দেহ। স্বীয় ভাষ্যের প্রারম্ভে তিনি সেই ভাষ্যরচনার কারণ নির্দেশ ক'রে বলেছেন :

ব্যাস-সূত্রমিদং নেত্রং বিদুষাং ব্রহ্মদর্শনে।
পূর্বাচার্যৈঃ কলুষিতং শ্রীকণ্ঠেন প্রসাদ্যতে ॥ (৫)

এস্থলে 'পূর্বাচার্য' শব্দের অর্থ যে শঙ্করাচার্য, তা নিঃসন্দেহ। অপ্পয়দীক্ষিত তাঁর 'শিবার্কমণি-দীপিকা'তে এই অর্থই গ্রহণ করেছেন। এতদ্ব্যতীত, শ্রীকণ্ঠ-ভাষ্যের বহু স্থলেই শঙ্করমত বা অদ্বৈতবাদের উল্লেখ ও খণ্ডন আছে। যথা, ২-৩-১৯, ২-৩-৪২, ২-৩-৪৯ প্রমুখ সূত্রে অদ্বৈত-মতানুযায়ী উপাধিবাদ প্রভৃতির খণ্ডন-প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়।

ব্রহ্ম

সাম্প্রদায়িক মতানুসারে, শ্রীকণ্ঠ সর্বোচ্চ তত্ত্ব বা ব্রহ্মকে 'শিব'রূপে গ্রহণ করেছেন। ব্রহ্ম বা শিব 'ভব', 'শর্ব', 'পশুপতি', 'মহাদেব', 'শম্ভু', 'রুদ্র', 'নীলকণ্ঠ', 'ত্রিলোচন', 'উমাপতি' প্রভৃতি অসংখ্য নামে অভিহিত হন। কিন্তু এইগুলি কেবলমাত্র অর্থহীন নাম নয়, উপরন্তু প্রত্যেকটির মাধ্যমেই আমরা শিবরূপী পরব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপ, গুণ ও শক্তির আভাস পাই। ১-১-২ সূত্রে শ্রীকণ্ঠ শিবের আটটি প্রধান নামের উল্লেখপূর্বক, তাদের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন :

ভব-শর্বেশান-পশুপতি-রুদ্রোগ্র-ভীম-মহাদেবা-ভিধানাষ্টকস্যাধিকরণং বাচ্যং পরং ব্রহ্ম (১-১-২)।

—সর্বত্র সদা ভবতীতি ভব-শব্দবাচ্যং ব্রহ্ম। শর্বশব্দেন সকল-সংহর্তৃ ব্রহ্ম প্রতিপাদ্যতে। নিরুপাধিক-পরমৈশ্বর্য-বিশিষ্টত্বাৎ ঈশান-শব্দবাচ্যং ব্রহ্ম। ঈশ্বরস্যেশিত-ব্যাপেক্ষতয়া পশুপতি-শব্দবাচ্যং ব্রহ্ম। সংসার-রুগ্‌দ্রাবকত্বাৎ রুদ্র-শব্দবাচ্যং ব্রহ্ম। পরতেজোভিরনভিভবনীয়ত্বাৎ উগ্র-শব্দবাচ্যত্বং ব্রহ্মণঃ। নিয়ামকত্বেন নিখিল-চেতনভয়হেতুতয়া ভীম-শব্দাভিধেয়ং ব্রহ্ম। মহত্ত্বেন দীপ্যমানতয়া মহাদেব ইত্যুচ্যতে শিবঃ।

অর্থাৎ সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান ব'লে তিনি 'ভব', সর্ববস্তুর সংহারকর্তা ব'লে তিনি 'শর্ব'; অন্তহীন পরমৈশ্বর্যবিশিষ্ট ব'লে তিনি 'ঈশান', সর্বজীবের শাসক ব'লে তিনি 'পশুপতি', সংসার-ক্লেশ দূর করেন ব'লে তিনি 'রুদ্র', অপর কর্তৃক অনভিভবনীয় ব'লে তিনি 'উগ্র', সকল জীবের নিয়ামকরূপে ভীতি-উৎপাদক ব'লে তিনি 'ভীম' এবং মহান্ ও দীপ্তিমান্ ব'লে তিনি 'মহাদেব'। এরূপ আটটি প্রধান গুণ এবং অন্যান্য অসংখ্য গুণবিশিষ্ট পরব্রহ্ম পরমবিশুদ্ধ ও মঙ্গলভাজনরূপে 'শিব'পদবাচ্য।

পরমব্রহ্ম শিবই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি ও মূল কারণ—সাংখ্য-সম্মত প্রকৃতি (১-১-১২), জীব (১-১-১৬), জীবসমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ (১-১-১৭) বা অন্য কোন বস্তু নয়। শিব জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। সাধারণতঃ নিমিত্ত ও উপাদান কারণ পরস্পর ভিন্ন এবং একে অন্যের বহির্ভূত হয়। যেমন, মৃন্ময়-ঘটের উপাদান-কারণ মৃৎ-পিণ্ড এবং নিমিত্ত-কারণ যন্ত্রাদি-সমন্বিত কুম্ভকার, একে অন্য থেকে ভিন্ন ও একে অন্যের বহিঃস্থিত। কিন্তু সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান্ পরমব্রহ্মের বাহিরে ও তাঁর থেকে ভিন্ন অপর কিছুই নেই। সেজন্য তিনি নিজেই নিজের স্বরূপকে জগদ্রূপে পরিণত করেন—এরূপে তিনিই জগতের একমাত্র নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ। (১-১-২) সূত্রব্যাখ্যায় :

'নিরস্ত-সমস্ত-সংসার-কলঙ্কতয়া নিখিল-মঙ্গলাধারতয়া শিবতত্ত্বং যদবগম্যতে তদুক্ত-স্বভাবতয়া সকল-জগজ্জন্মাদি-কারণং ভবতি। তত্র তাদৃশ-মহিম্নি জগদুভয়কারণত্বসম্ভবাৎ।'

পরমব্রহ্ম শিব তাঁর মায়া বা ইচ্ছা-শক্তির মাধ্যমে জগতের উপাদান-কারণ হন বা জগৎ সৃষ্টি করেন। ১-২-৯ সূত্রে শ্রীকণ্ঠ জগৎসৃষ্টি-প্রক্রিয়া সংক্ষেপে এরূপে বর্ণনা করেছেন :

'অসঙ্কুচিতবিশ্বঃ পরমেশ্বরো হি সিসৃক্ষুঃ বহুপ্রপঞ্চভবনায়াত্মনো মায়ালক্ষণামিচ্ছারূপাং শক্তিমাশ্রয়তি। তপস্‌স্বরূপিকয়া জ্ঞানাত্মিকয়া শক্ত্যা সকলজীব-কর্মানুগুণ-তত্তচ্ছরীরসামগ্রী-মালোচয়তি। আলোচ্য চ···· ক্রিয়াশক্ত্যা ইচ্ছাশক্তিভূতৌ নিখিল জগচ্চিত্রমুন্মীলয়তি। সকলকার্য-জাতমনুপ্রবিশ্য শক্তি-ত্রয়সম্বন্ধেন ত্রিগুণভিন্নমূর্তিত্রয়াদি-প্রপঞ্চরূপো ভবতি।'

অর্থাৎ সৃষ্টিকালে পরমেশ্বর মায়ারূপ ইচ্ছা-শক্তির সাহায্যে জগৎসৃষ্টিতে ইচ্ছুক হন। তৎপরে তিনি তপোরূপ জ্ঞান-শক্তির সাহায্যে জীবগণের কর্ম এবং তদনুসারে নূতন সৃষ্টিতে

তাদের অবস্থা বিষয়ে চিন্তা করেন। পরিশেষে পূর্বোক্ত ইচ্ছা ও জ্ঞান অনুযায়ী ক্রিয়াশক্তির সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি করেন। এরূপে পরমব্রহ্ম শিবের ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া—এই ত্রি-শক্তির সমন্বয়েই বিশ্বসৃষ্টি হয়।

এই উপাদানরূপী শিবই বিষ্ণু বা নারায়ণ (১-২-৩), এরূপে বিষ্ণু শিবাশ্রয়ী হ'য়েও শিব থেকে অভিন্ন। 'যতো বিষ্ণুশিবয়োরুপাদান-নিমিত্তয়োরবস্থাভেদমন্তরেণ স্বরূপভেদো নাস্তি' (১-৩-১২)। পুনরায় জীবসমষ্টি হিরণ্যগর্ভ বিষ্ণুর আশ্রয়ী ও বিষ্ণু তাঁর উপাদান (৪-৩-১৪)।

পরব্রহ্ম শিব নির্গুণ নন, সগুণ। এক পক্ষে তিনি অসংখ্য কল্যাণগুণের আকর; অপর পক্ষে তিনি সমস্ত হেয়গুণ-বর্জিত।

'নিরস্ত-সমস্তোপপ্লব কলঙ্ক-নিরতিশয়জ্ঞানানন্দাদি-শক্তিমহিমাতিশয়বত্বং ব্রহ্মত্বম্' (১-১-১)।

এই সকল গুণের মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়টি গুণ বিশেষ ভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ-দ্যোতক :

'সর্বজ্ঞত্বং নিত্যতৃপ্তত্বম্ অনাদিবোধত্বম্ স্বতন্ত্রত্বম্ অলুপ্তশক্তিমত্বম্ অনন্তশক্তিমত্বম্' (১-১-২)। —পরমব্রহ্মের জ্ঞান ইন্দ্রিয়াদি-করণনিরপেক্ষ নিত্য, নিষ্কলঙ্ক এবং নিখিলবস্তু-ব্যাপী—সেজন্য তিনি 'সর্বজ্ঞ'। পরব্রহ্ম সমস্ত দোষকলঙ্কশূন্য এবং নিরতিশয় আনন্দপরিপূর্ণ সত্তা, সেজন্য তিনি 'নিত্যতৃপ্ত'। পরব্রহ্মের জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ পূর্ণতম ও সীমারহিত সেজন্য তিনি 'অনাদি-বোধ'। পরব্রহ্মের শাসক পালক অন্য কেউ নেই, তিনিই সকলের শাসক ও পালক, তাঁর আশ্রয় অন্য কেউ নেই—তিনিই সকলের আশ্রয় ও ধারক, সেজন্য তিনি 'স্বতন্ত্র'। পরব্রহ্মের অসংখ্য শক্তি স্বাভাবিক—স্বভাবজাত ও নিত্য, অদ্বৈতমতানুযায়ী উপাধি-জাত ও অনিত্য নয়—সে-জন্য তিনি 'অলুপ্ত-শক্তি'। পরব্রহ্ম অসংখ্যশক্তিবিশিষ্ট, সে-জন্য তিনি 'অনন্ত-শক্তি'।

ব্রহ্মের গুণাবলী দুই শ্রেণীর—ভীষণ ও মধুর। একদিকে তিনি 'ভীষণং ভীষণানাম্'—অনন্ত অসীমশক্তিবিশিষ্ট শাসকরূপে ভয়জনক। 'কল্যাণ-মূর্তিরপি পরমেশ্বরঃ শাসকতয়া ভয়-দর্শনো ভবতি' (১৩-৪০)। কিন্তু অন্যদিকে তিনি আনন্দস্বরূপ এবং জীবগণের আনন্দ-দায়ক। 'ব্রহ্মানন্দ নিরতিশয়-নিরঙ্কুশো ভাস্বতে। .. তস্মাদানন্দময়ো পরমেশ্বর এব' (১-১-১৩)। 'স্বয়ং প্রচুরানন্দো পরান্ আনন্দয়তি।' (১-১-১৫)। পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মা এরূপে জীবগণের নিকট ভীতিপ্রদ কঠোর শাসকই কেবল নন—নিকটতম, আনন্দোচ্ছল, আনন্দপ্রদ সখা। তিনি সকল জীবের অনুগ্রাহক বন্ধু, এবং তাঁর প্রসাদেই জীবগণ মুক্তিলাভে সমর্থ হয়।

চিৎ ও অচিৎ পরব্রহ্মের শক্তিস্বরূপ। প্রলয়কালে চিৎ ও অচিৎ প্রচ্ছন্নভাবে ব্রহ্মে বিলীন হ'য়ে থাকে, সৃষ্টিকালে ব্যক্তরূপে জীব ও জগতে পরিণত হয়।

'নাম-রূপ - বিভাগানর্হ-সূক্ষ্ম-চিদচিৎ- প্রপঞ্চ-শক্তি-বিশিষ্টতয়া শিবঃ কেবল ইত্যুচ্যতে। স পুনঃ সর্গকালে স্বসংকল্পমাত্রেণ স্বস্মাৎ সকলং চিদচিদর্থজাতং সৃজতি প্রকাশয়তি'(১-২-৯)।

চিৎশক্তি ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া—এই ত্রিশক্তির সমাহার (১-২-৯), এবং অচিৎশক্তি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চ মহাভূতের সমাহার। ব্রহ্মা, জনার্দন, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব যথাক্রমে এই পঞ্চ মহাভূতের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা।

উপরি-উক্ত অষ্টরূপবিশিষ্ট চিৎ ও অচিৎ পরমব্রহ্মের শরীরস্থানীয়। 'সর্ব-চিদচিৎ-প্রপঞ্চ-বিশিষ্টং ব্রহ্ম সর্বপদ-বাচ্যম্' (১-২-৯)।

অন্যদিক থেকে বলতে গেলে চিৎ অচিৎ—ব্রহ্মের বিশেষণ বা গুণ, দেহ যেমন আত্মাকে—

নীলত্ব যেমন নীলোৎপলকে—বিশেষণরূপে বিশিষ্ট করে, চিৎ ও অচিৎ তেমনই ব্রহ্মকে গুণ বা বিশেষণরূপে বিশিষ্ট করে।

চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্মের দ্বিবিধ রূপ বা অবস্থা—কারণ বা অব্যক্ত রূপ এবং কার্য বা ব্যক্ত রূপ। কারণাবস্থায় ব্রহ্মের চিদচিৎ-প্রমুখ গুণ ও শক্তিসমূহই সূক্ষ্মভাবে ব্রহ্মেই বিলীন হ'য়ে থাকে। কার্যাবস্থায় সেই সকল গুণ ও শক্তি বিচিত্রনামরূপ-বিশিষ্ট বস্তুজাতে প্রকটিত হয়। এরূপে পরমেশ্বর একাধারে স্রষ্টা কারণ ও সৃষ্ট কার্য উভয়ই—জগৎ-প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্ম-সত্তাময়।

ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা বা সর্বজ্ঞ উভয়ই—অর্থাৎ জ্ঞান তাঁর যুগপৎ স্বরূপ ও গুণ। শ্রুতিতে তাঁকে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ব'লে বর্ণনা করা হ'লেও, তাঁর জ্ঞাতৃত্ব বা সর্বজ্ঞত্ব তাতে নিষিদ্ধ হয়নি। 'যথা স্বর্ণরূপং কিরীটমিত্যেতৎ স্বর্ণরূপতামাত্রকথনপরং, ন তৎখচিতরত্নাদিনিষেধপরং তদ্বদিতি' (৩-২-১৬)।

একটি রাজমুকুটকে 'স্বর্ণস্বরূপ' ব'লে উল্লেখ করলে, তার স্বর্ণরূপতাই সূচিত হয়, কিন্তু স্বর্ণের উপরে খচিত অন্যান্য বহু রত্নের অভাব বা বিলুপ্তি ঘোষিত হয় না। একই ভাবে সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব বা সর্বজ্ঞত্ব স্ববিরোধী নয়।

ব্রহ্ম ভোক্তা—অবশ্য জীবের মতো কর্মফল-ভোক্তা নন, কিন্তু স্বীয় অনন্ত স্বরূপানন্দের নিত্যাস্বাদী (১-১-২)।

পরিশেষে ব্রহ্ম কর্তা। তাঁর কৃত্য-পঞ্চক বা পাঁচটি কার্য এই : জন্ম, স্থিতি, প্রলয়, অনুগ্রহ ও তিরোভাব। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তিনিই বিশ্বচরাচরের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ—জগতের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয় তাঁরই কার্য। উপরন্তু জীবের বন্ধ ও মোক্ষেরও ব্যবস্থাপক একমাত্র তিনিই (১-১-২)।

পরমব্রহ্ম শিব অপার্থিব দিব্যদেহধারী। 'শরীর-সম্বন্ধাদস্মদাদিবদীশ্বরস্য ন সংসারদোষাপত্তিঃ শ্রুতিরেব ভগবতী হ্যস্য শরীর-সম্বন্ধং সর্বপাপ-রাহিত্যং চ প্রতিপাদয়তি' (১-১-২১)।

'সুখ-দুঃখভোগ-হেতুভ্যো জীব-শরীরেভ্যো ব্রহ্মরূপস্যাপি হি বৈশেষ্যম্। ইচ্ছাগৃহীতত্বাদস্য তেষাং কর্মমূলত্বাচ্চ। অতএবাপ্রাকৃতানি পাপ-জরা-মরণ-শোকাদি-রহিতানি স্বেচ্ছা-সম্পাদিতানি লীলা-মঙ্গলরূপাণি পরমেশ্বরস্য স্থিরাণি নিত্যানি বিজ্ঞায়স্তে'—(১-২-৪)। অর্থাৎ পরব্রহ্ম শরীরবিশিষ্ট হ'লেও, জীবের ন্যায় কর্মফলভোক্তা ও পাপপুণ্যভাগী নন। কারণ, তাঁর দেহ স্বেচ্ছা-প্রসূত, সকাম কর্মের ফল নয়, সেজন্য দেহধারী হ'য়েও তিনি সর্বপাপরহিত, বস্তুতঃ পাপ-জরা-মরণ-শোকাদি-রহিত লীলা-মঙ্গল তাঁর দিব্য অপ্রাকৃত রূপ নিত্য ও স্থির—জীবের ন্যায় তিনি মরণশীল পরিবর্তনশীল নন।

এইভাবে শ্রীকণ্ঠ বেদান্তের মূল তত্ত্ব 'ব্রহ্ম' সম্বন্ধে সুন্দর প্রপঞ্চনা করেছেন।

তিনি 'জীবজগৎ' সম্বন্ধে কি বলেছেন, সে বিষয়ে পরে কিছু আলোচনা করা হবে।

বিশ্বরূপের ভাবসন্ধানে পাণ্ঢারপুরে

ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

বিশ্বরূপ নিমাই পণ্ডিতের বড় ভাই। নিমাই যখন লিখিতে পড়িতে শিখেন নাই, এমনকি কাপড় পরিতেও শিখেন নাই, তখন বিশ্বরূপ বেশ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছেন। তিনি নবদ্বীপে অদ্বৈতের গৃহে বসিয়া শাস্ত্রচর্চা করিতেন; খুব সম্ভব 'যোগবাশিষ্ঠ' আলোচনা করিতেন। অদ্বৈত 'পঢাইয়া বাশিষ্ঠ, বাখানে কৃষ্ণভক্তি' (চৈঃভাঃ৩৷২২)। সেইখানে মায়ের কথা অনুসারে নিমাই

দিগম্বর সর্ব-অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
হাসিয়া অগ্রজ প্রতি করেন উত্তর॥
ভোজনে আইস ভাই ডাকেন জননী।
অগ্রজ বসন ধরি চলয়ে আপনি॥ (ঐ ১৷৫)

নিমাইয়ের বয়স তখন চার বা পাঁচ বৎসর হইলে বিশ্বরূপের বয়স অন্ততঃ কুড়ি বা একুশ হওয়া উচিত। কেননা সে সময়ে তিনি শুধু পণ্ডিতই নহেন, অনুভবী ভক্তও হইয়াছেন। বৃন্দাবন দাস বিশ্বরূপ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান্।
আজন্ম বিরক্ত সর্বগুণের নিধান॥
সর্বশাস্ত্রে সবে বাখানেন বিষ্ণুভক্তি।
খণ্ডিতে তাঁহার ব্যাখ্যা নাহি কারো শক্তি॥
শ্রবণে, বদনে, মনে, সর্বেন্দ্রিয়গণে।
কৃষ্ণভক্তি বিনে আর না বোলে না শুনে॥ (ঐ)

অন্যত্র: সর্বস্থানে বিশ্বরূপ ঠাকুর বেড়ায়।
ভক্তিযোগ না শুনিয়া বড় দুঃখ পায়॥ (ঐ)

কিন্তু মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন যে বিশ্বরূপ তখন ষোল বছরের (১-৭-৪)। বিশ্বরূপের গুণবর্ণনা-মূলক তাঁহার শ্লোককয়টি অষ্টাদশ শতকের প্রথমে নরহরি 'ভক্তিরত্নাকরে' (পৃঃ ৭৮০-৮১) উদ্ধৃত করেছেন।

বিশ্বরূপ ছেলেবেলা হইতেই প্রতিভাবান্। ছোট বয়সে তিনি ছোট ভাই বিশ্বম্ভরের মতনই তেজস্বী ছিলেন। একদিন তিনি পিতা জগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গে পণ্ডিতদের বিচারসভায় গিয়াছিলেন। এক পণ্ডিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি পড় ছাওয়াল?' বিশ্বরূপ তাহার উত্তরে বলিলেন, 'কিছু কিছু সভাকার।'—অর্থাৎ তিনি এক আধখানি বই বা কাব্য, ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কারের মতন এক আধটি বিষয় পড়েন না। অনেক বিষয়েরই কিছু কিছু পড়েন। তাঁহার উত্তরে পণ্ডিতেরা আর কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু বাড়ীতে ফিরিবার পথে জগন্নাথ মিশ্র তাঁহাকে এক চড় মারিয়া বলিলেন, 'যে যে বই পড় বলিলেই হইত, সভার মাঝখানে কি সব বলিলে? পণ্ডিতেরা তোমাকে মূর্খ ভাবিলেন।'

মার খাইয়া বিশ্বরূপ পুনরায় সেই বিচারসভায় যাইয়া বলিলেন, 'আমার পড়ার কথা তো আপনারা কেহ জিজ্ঞাসাও করিলেন না, অথচ আমি বাপের কাছে মার খাইলাম। আপনাদের কার কি জিজ্ঞাসা করিবার আছে, করুন।' পণ্ডিতেরা বেশী কিছু না বলিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা আজ যা পড়েছ, তার ব্যাখ্যা কর তো।' বিশ্বরূপ কয়েকটি সূত্রের ব্যাখ্যা করিলেন, শুনিয়া পণ্ডিতেরা বলিলেন, 'বেশ, চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছ।' কিন্তু বিশ্বরূপ বলিলেন, 'মোটেই না, আপনাদের ঠকাইলাম, আপনারা ধরিতে পারিলেন না। উহার প্রকৃত অর্থ এইরূপ।' এবারে পণ্ডিতেরা বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের উপরও বিস্ময়। বিশ্বরূপ সে ব্যাখ্যাও খণ্ডন করিয়া অন্যরূপ মানে করিলেন।

'এই মত তিনবার করিয়া খণ্ডন
পুন সেই তিনবার করিলা স্থাপন॥' (ঐ)

বোধ হয়, ন্যায়ের কোন সূত্র হইবে। ন্যায়ের

ফাঁকিতে নবদ্বীপ তখন ছিল মমগুল। বড় হইয়া তিনি নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের নিকট গীতা ব্যাখ্যা করিতেন (ঐ ২।২)।

কিন্তু শুষ্ক পাণ্ডিত্যে বিশ্বরূপের মন ভরিল না। তিনি ভক্তিভরে নিরন্তর কৃষ্ণনাম করেন আর বিষ্ণুগৃহে (বাড়ীর ঠাকুরমন্দিরে) থাকেন। তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া জগন্নাথ মিশ্র তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। বিবাহ হইলে ছেলের যদি ঘরসংসারে মন বসে, এই তাঁহার আশা। কিন্তু উল্টা উৎপত্তি হইল। বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছে দেখিয়া বিশ্বরূপ একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন। পরে বাপ-মা ও আত্মীয়বন্ধুরা শুনিলেন—

জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্করারণ্য।
চলিলা অনন্ত পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য॥

*　　*　　*

শিশুবয়সে নিমাইও অতিশয় চঞ্চল ছিলেন।
'পিতামাতা কাহারে না করে প্রভু ভয়।
বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নম্র হয়॥' (ঐ)
বড় ভাইয়ের উপর নিমাইয়ের খুব টান ছিল। না হইলে যে ছেলে বাপ-মাকেও ভয় করে না, সে বড় ভাইয়ের কথা শুনিয়া দুষ্টামি ছাড়িত কিরূপে? নিমাই পণ্ডিত ১৫১০ খৃঃ শীতকালে মাঘ মাসে চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাহার কয়েকমাস পরেই তিনি দক্ষিণদেশে তীর্থযাত্রায় বাহির হন। তীর্থযাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য হয়তো ছিল বড় ভাইয়ের খোঁজ করা। কেননা তিনি সন্ন্যাসীদের কাছে শঙ্করারণ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি পুরী হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত নানা তীর্থ দর্শন করিয়া মহীশূরের ভিতর দিয়া বোম্বাই প্রদেশের সূর্পারক তীর্থ (থানা জেলা) ও কোলাপুর হইয়া পাণ্ঢারপুরে আসেন। তিনি লোকমুখে পূর্বেই শুনিয়াছিলেন যে শঙ্করারণ্য পাণ্ঢারপুরে অনেকদিন ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ পাণ্ঢারপুরকে পাণ্ডুপুর বলিয়াছেন। এইখানে প্রেমভক্তি প্রচারের আদি-গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গ পুরীর সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের দেখা হইল। পাঁচ সাত দিন উভয়ে একসঙ্গে কৃষ্ণকথায় কাটাইলেন। কথায় কথায় মহাপ্রভু বলিলেন যে তিনি নবদ্বীপের লোক। তাহা শুনিয়া শ্রীরঙ্গ পুরী বলিলেন যে তিনি একবার মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে নবদ্বীপে গিয়াছিলেন আর সেখানে—

'জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব মোচার ঘণ্ট তাঁহা যে খাইল॥
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহাপতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয় তেঁহো যেন জগন্মাতা॥
রন্ধনে নিপুণ তা সম নাহি ত্রিভুবনে।
পুত্রসম স্নেহে করায় সন্ন্যাসী ভোজনে॥'
(চৈঃচঃ ২.৯)

মোচার ঘণ্টের বিশেষ উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, শ্রীরঙ্গপুরী বাঙালী ছিলেন। বিহারে এখন পর্যন্ত লোকে মোচার তরকারি খাইতে জানে না। যাহা হউক খাওয়ার এই গল্প বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী বলিলেন:

তাঁর এক যোগ্য পুত্র করিয়া সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তাঁর অল্প বয়স॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল॥

মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়া ভাবাবেগে আকুল হইয়া সন্ন্যাসের রীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া বলিলেন, 'জগন্নাথমিশ্র মোর পূর্বাশ্রমে পিতা'।

মহাপ্রভু ১৫১১ খৃঃ তাঁহার বড় ভাইয়ের সিদ্ধিপ্রাপ্তির কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। তখন নিশ্চয়ই তাঁহার অভাগিনী মায়ের অসীম দুঃখের কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। বিশ্বরূপ অল্প বয়সে লেখাপড়া শিখিয়া সন্ন্যাসী হইয়া-

ছিলেন বলিয়া নিমাইয়ের পিতামাতা তাঁহার পড়াশুনা করা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে ভয় ছিল পাছে এ ছেলেও লেখাপড়া শিখিয়া তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করে। পরে অবশ্য নিমাইয়ের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহারা তাঁহাকে পড়িতে দিতে বাধ্য হন।

* * *

শ্রীচৈতন্য-স্মৃতিবিজড়িত পাণ্ঢারপুর! ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল বিশ্বরূপের সিদ্ধিপ্রাপ্তির স্থান—সেই পাণ্ঢারপুর দর্শনের। কলেজে পড়ার সময় হইতে পাণ্ঢারপুরের বৈষ্ণব আন্দোলন ও মহারাষ্ট্রের জাতীয় জীবন-সংগঠনে তাহার প্রভাব সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনিয়া আসিতেছিলাম। ১৯৫৭ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে পুনায় অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এরূপ সময় করিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম যাহাতে সম্মেলনের দুই দিন পূর্বে পুনায় পৌঁছিয়া পাণ্ঢারপুরে যাইতে পারি। পাণ্ঢারপুর পুনা হইতে ১৪৮ মাইল দূরে, কিন্তু ট্রেনে যাইতে সময় লাগে প্রায় সাড়ে নয় ঘণ্টা। আমরা সকাল ৮টায় ট্রেনে চড়িয়া বৈকাল পৌনে ৬টায় পাণ্ঢারপুরে পৌঁছিলাম। পুনা হইতে ১১৫ মাইল দূরে কুর্দুবাদী জংশন, সেখানে নামিয়া গাড়ী বদল করিতে হয় লাটুর-মিরাজ লাইনের ট্রেন ধরিবার জন্য। কুর্দুবাদী হইতে পাণ্ঢারপুর ৩৩ মাইল দূরে। এই ৩৩ মাইল খুব জনবিরল। কোন ষ্টেশনে কিছু খাইবার জিনিস কিনিতে পাওয়া যায় না। বন জঙ্গল ও মাঠের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ট্রেন অগ্রসর হইতে লাগিল। ভাবিলাম বুঝি বা কোন জনহীন প্রান্তরই পাণ্ঢারপুর হইবে। কিন্তু সহসা সন্ধ্যার কিছু আগে এক সুন্দর শহর দেখা গেল। ঐ শহরই হইল পাণ্ঢারপুর। নামিতেই পাণ্ডা আসিয়া পাকড়াও করিল। ষ্টেশনের কাছাকাছি কয়েকটি সুন্দর দোতলা ধর্মশালা ছিল। কিন্তু মন্দির সেখান হইতে এক মাইলের চেয়ে দূরে হওয়ায় আমি মন্দিরের নিকটে পাণ্ডার বাড়ীতেই থাকা স্থির করিলাম। পুরাতন শহর, তাহাকে নূতনের রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। তাই নূতন রাস্তাগুলি চওড়া, কিন্তু মন্দিরের নিকটের পথগুলি সরু গলি।

বিশাল মন্দির। অনেক দোকানে পূজার উপযোগী জিনিসপত্র বিক্রয় হইতেছে। পাণ্ঢারপুরকে পশ্চিম ভারতের লোকে কাশীর তুল্য তীর্থস্থান বলিয়া মানে। সেইজন্য প্রত্যহ সেখানে বহুযাত্রীর সমাবেশ হয়। আর পর্বাদি উপলক্ষে লক্ষ লোক একত্র হইয়া নামকীর্তন করে। দেবমূর্তি বিট্‌ঠল বা বিঠোবা। তাঁহার দুই পাশে দুই ঘরে দুই দেবীমূর্তি। পাণ্ডা বলিলেন—একজন রুক্মিণী, অন্যজন রাধা। জানি না আমাকে বাঙালী দেখিয়া খুশী করিবার জন্য ঐ মূর্তিকে রাধা বলিলেন কিনা। পুনায় আসিয়া মারাঠী ভক্তদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন, রাধামূর্তি পাণ্ঢারপুরে নাই। মন্দিরের বৈশিষ্ট্য দেখিলাম দুইটি। প্রথমতঃ প্রত্যেকেরই শ্রীমূর্তি স্পর্শ করিয়া মাল্যদান করিবার ও পদধূলি লইবার অধিকার আছে। দ্বিতীয়তঃ এই তীর্থস্থানের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, তাঁহার মূর্তি মন্দিরে উঠিবার সিঁড়ির তলায়। তিনি স্বয়ং ঐ স্থানে তাঁহার মূর্তি স্থাপন করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন—যাহাতে মন্দিরে গমনেচ্ছু ভক্তজনের চরণধূলি তাঁহার মাথায় পড়ে। আমরা অতি সাবধানে পাশ কাটাইয়া মন্দিরে উঠিলাম।

ঐ মহাপুরুষের নাম নামদেব। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়া আনুমানিক ১৩৫০ খৃঃ দেহত্যাগ করেন। যে জ্ঞানেশ্বরের গীতার ব্যাখ্যা 'উদ্বোধনে' মারাঠী

হইতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে,* সেই জ্ঞানেশ্বরের তিনি ছিলেন সমসাময়িক। জ্ঞানেশ্বরের সঙ্গে তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে উত্তর ভারতে তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। পাঞ্জাবে তাঁহার অনেক মন্দির আছে এবং শিষ্যসংখ্যাও কম নহে। গুরু নানকের গ্রন্থ-সাহেবে তাঁহার 'অভঙ্গ' উদ্ধৃত হইয়াছে। নামদেব ছিলেন জাতিতে দর্জি। কথিত আছে, তিনি নাকি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন একশত কোটি অভঙ্গ রচনা করিবেন। তাঁহার বাড়ীর সকলেই, এমনকি দাসী জনাবাঈও অভঙ্গ রচনা করেন। এখনও নামদেবের কয়েক হাজার অভঙ্গ পাওয়া যায়। আমরা যেমন এখন অনেকগুলি চণ্ডীদাসের সন্ধান পাইয়াছি, মারাঠী পণ্ডিতেরা তেমনি বলেন যে, ঐ অভঙ্গগুলি একাধিক নামদেবের রচনা। একজনের নাম নামদেব, অন্যজন বিষ্ণুদাস-নামা; তা ছাড়াও চক্রধরের শিষ্য এক নামদেব ছিলেন, অন্য এক নামদেবের নাম ছিল নামা পাঠক—তিনিই জ্ঞানেশ্বরের সমসাময়িক, কান্হো পাঠকের পৌত্র। ঐ সব নামদেবের রচিত পদ নাকি মিশ্রিত হইয়া এক নামদেবের নামে চলিতেছে।

যাহা হউক জ্ঞানেশ্বর নামদেব প্রভৃতি যে সম্প্রদায় স্থাপন করেন সেই সম্প্রদায়ের ভক্তদিগকে বলা হয় 'বারকরী'। চতুর্দশ শতাব্দী হইতে আজ পর্যন্ত অসংখ্য ভক্ত জ্ঞানেশ্বরের সমাধিস্থান আলন্দী (পুনা হইতে ১৪ মাইল দূরে) হইতে পাণ্ঢারপুর পর্যন্ত নামকীর্তন করিতে করিতে অনবরত যাতায়াত করেন। পাণ্ঢারপুর-মন্দিরে এখনও প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা নাম-সঙ্কীর্তন হয়। শ্রীমদ্ভাগবত-প্রোক্ত নবধা ভক্তির অনুষ্ঠান ইঁহারা নিষ্ঠার সঙ্গে করিয়া থাকেন। সেইজন্য বিশ্বরূপ, শ্রীরঙ্গপুরী ও শ্রীচৈতন্য স্বয়ং এই তীর্থক্ষেত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মধ্যযুগের প্রেমভক্তির অন্যতম উৎসরূপে পাণ্ঢারপুর গৌড়ীয় মহাপুরুষদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু এখন কদাচিৎ কোন বাঙালী এই তীর্থে গমন করেন। মন্দিরের নিকটেই ভীমা নদী—কাশীর গঙ্গার ন্যায় অর্ধ-চন্দ্রাকারে পাণ্ঢারপুরকে বেষ্টন করিয়া আছে। নদীতে প্রত্যহ বহু নরনারী স্নান করিয়া ধন্য হয়। নদীর স্রোত অতি প্রবল।

শ্রীচৈতন্যের পাণ্ঢারপুরে যাত্রার প্রভাব 'মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি' শ্লোকের উপর পড়িয়াছে। কেননা আমরা নামদেবের 'হেচি দেবা পায় মাগত' শীর্ষক অভঙ্গে পাই:

তোমার পায়ে আমার এই এক প্রার্থনা—তোমার পদসেবা যেন আমি করি। আমি যেন পাণ্ঢারিতেই থাকি, তোমারই সাধুসন্তদের পাশে। উচ্চ বা নীচ যোনিতে আমার জন্ম হয় হউক, আমি যেন হরি, তোমারই ভজন করি। হে কমলাপতি, 'নাম' প্রার্থনা করে যেন সে সারা-জীবন তোমার নাম করিতে পারে।[১]

নামদেব তাঁহার 'দেহ যাবো অথবা রাহো' শীর্ষক অভঙ্গে গাহিয়াছেন: দেহ যাউক অথবা রহুক, হে পাণ্ডুরং। তোমাতেই আমার বিশ্বাস। প্রভু! তোমার চরণ আমি কখন ছাড়িব না—এই শপথ আমি তোমার নিকট করিতেছি। তোমার পবিত্র নাম আমার ওষ্ঠে, আর তোমার প্রেম আমার হৃদয়ে চিরদিন রহিবে। কেশব! এই তোমায় নামে আমি ব্রত নিলাম, তুমি ইহা পালন করিতে সাহায্য

* গত বৎসর পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, এ বৎসরে নবম অধ্যায়ের অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে।—উঃ সঃ

১ Psalms of the Maratha Saints হইতে অনুবাদ—১৫ সংখ্যক কবিতার।

কর প্রভু ! পাণ্ঢারপুরের পাণ্ডুরং বিগ্রহ বিঠোবা।[২]

'সর্বাভূতি পাহে এক বাস্থদেব' শীর্ষক অভঙ্গে নামদেব বলিয়াছেন : অহংবুদ্ধি থেকে মুক্ত হ'য়ে যিনি বাস্থদেবেই সব কিছু দেখতে পান, তাঁকেই তুমি সাধু ব'লে জেনো, আর সবাই বদ্ধ জীব। সাধুর চোখে টাকাপয়সা ধূলি ছাড়া কিছু নয়, রত্নরাজি পাথর ছাড়া কিছু নয়, তাঁর অন্তর থেকে কামক্রোধ দূরে গিয়েছে, ক্ষমা প্রশান্তি সেখানে বাস করে। আমি 'নাম', যা বলছি শোন—তিনিই সাধু, যিনি গোবিন্দের নাম ছাড়া একক্ষণও থাকেন না, দিনরাত নাম গ্রহণ করেন।[৩] এই ভাবের সঙ্গে শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকের 'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' উপদেশের সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়।

২ ঐ—১৪ সংখ্যা।

৩ ঐ—২১ সংখ্যা।

'দক্ষযজ্ঞ'—এখনও ঘটছে

ডক্টর শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহ

গুরু। পুরাণে দক্ষযজ্ঞের কথা আছে। পুরাণের কথা কিন্তু পুরানো নয়। এটি এখনও ঘটছে। দক্ষ মানে কর্মকুশল, expert, আমরা প্রত্যেকেই দক্ষ। আমরা প্রত্যেকেই মনে করি, আর কেউ সংসারে শান্তিলাভ ক'রে থাকুক বা নাই থাকুক, আমি নিশ্চয়ই শান্তিলাভ ক'রব। নিজের কর্মক্ষমতায় আমাদের এত প্রগাঢ় বিশ্বাস যে শিব অর্থাৎ মঙ্গলকে বাদ দিয়ে যজ্ঞ আরম্ভ করেছি।

শিষ্য। কিন্তু দক্ষযজ্ঞে শিব উপস্থিত না থাকলেও বিষ্ণু যজ্ঞরক্ষার ভার নিয়েছিলেন।

গুরু। সংসার-যজ্ঞেও কি সদাচার, সদ্ধর্ম নেই? তবে 'আমি করেছি', 'আমি করছি' এই সব দাম্ভিকতা থাকেই। 'আমি যজ্ঞ ক'রব', 'আমি দান ক'রব'—এই সব ভাবকে শ্রীভগবান গীতায় তামস আখ্যা দিয়াছেন। যেখানে তমঃ, সেখানেই অজ্ঞানের অন্ধকার—অহংকার। সেখানে ধর্মকে কেমন ক'রে ধ'রে রাখা যাবে বল? সতী—যিনি সত্যস্বরূপা, তাঁর প্রাণত্যাগ হ'ল, অর্থাৎ কিনা সংসারে সত্য পালন করা যায় না। আর কী হ'ল? ভূত প্রেত সব যজ্ঞ পণ্ড ক'রল। সংসারেও ভাখো না—ছেলে বাপ-মাকে মানছে না, বাপ-মাও ছেলেকে দেখছে না, স্ত্রী স্বামীকে মানছে না, স্বামী স্ত্রীকে মানছে না, এইরূপই তো সর্বত্র দেখা যায়। এ-কে ভূত-প্রেতের নৃত্য ছাড়া আর কী বলি বলো? অবশেষে নিজ মুখের পরিবর্তে দক্ষের ছাগমুণ্ড হ'ল। জীবনের শেষাশেষি আমাদের নিবুদ্ধিতা দেখে আমাদের মনেও ধিক্কার আসে, মনে হয় আমাদের বিচারবুদ্ধি ছাগলেরই অনুরূপ।

শিষ্য। এর প্রতিকার কি?

গুরু। শিবকে—মঙ্গলকে এনে তবে যজ্ঞ আরম্ভ করতে হবে, 'ঠাকুর, তুমি সর্বশক্তিমান্। সব শক্তি তোমারই শক্তি। যে শক্তিটা এতক্ষণ ঘুমের সময় নিষ্ক্রিয় ছিল এবং যে শক্তিটা আমার ব'লে এখন কাজে লাগাতে যাচ্ছি, সেটি আমার নয়—প্রকৃত প্রস্তাবে তোমারই। ঠাকুর, তোমার শক্তি নিয়ে কাজ হবে, অতএব কাজগুলি তোমার অভিপ্রায় অনুযায়ীই হওয়া উচিত। এই করো ঠাকুর! আমার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথা, প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি ব্যবহার যেন তোমার মনোমত হয়। ঠাকুর, আর কারো পানে চেয়ে চলার থেকে, আর কারো মন জোগানো থেকে আমাকে বাঁচাও। আমাকে তোমার নিত্যদাস করো প্রভু!' এই প্রার্থনার রেশ যেন সারাদিন আমাদের মনের মধ্যে থাকে।

বাঙলা শাক্ত সঙ্গীত

ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

বাঙলা বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীর ভিতরে কতগুলি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মিল রহিয়াছে, কিন্তু এই মিল সত্ত্বেও উভয়বিধ পদাবলীর মধ্যে আকারগত ও প্রকারগত মৌলিক পার্থক্যও রহিয়াছে।

প্রথমেই লক্ষ্য করিতে পারি, বৈষ্ণব কবিতার সহিত সমজাতীয়ত্ব লক্ষ্য করিয়া আমরা শাক্ত কবিতাগুলিকেও 'পদাবলী নাম দিয়াছি বটে, আসলে কিন্তু শাক্ত পদাবলী সবই মূলতঃ শাক্ত সঙ্গীত। বৈষ্ণব পদাবলীও অবশ্য সবই গান, তথাপি তাহার একটা নিজস্ব কবিতার দিক্‌ও আছে। শুধু গানরূপে আস্বাদ না করিয়া গীতি-কবিতা-রূপেও বৈষ্ণব পদাবলীকে আস্বাদ করা যাইতে পারে। শাক্ত পদাবলীর এই গীতি-কবিতার দিক্ অতি অপ্রধান। গান ও গীতি-কবিতার মধ্যে একটা মৌলিক তফাৎ আছে। রবীন্দ্রনাথ গানও রচনা করিয়াছেন, গীতি-কবিতাও রচনা করিয়াছেন। যেগুলি গীতি-কবিতা তাহাদের সঙ্গে সুর-সংযোগ করিলে সেগুলি গানের রূপ ধারণ করে, কিন্তু সুর-সংযোগ ব্যতীতও কবিতার ছন্দে আবৃত্তি দ্বারা তাহার অর্থ গ্রহণ এবং আস্বাদন সম্ভব। কিন্তু যেগুলি মূলতঃ গান সেগুলি হইতে সুর বাদ দিয়া দিলে সেগুলি কবিতা হইয়া ওঠে না, সুর-সংযোগ ব্যতীত তাহাদের অর্থেরই সম্যক্ স্ফুরণ নাই, সুর-সংযোগের দ্বারাই তাহাদের ভিতরে স্ফুট-অস্ফুট সূক্ষ্ম-সুকুমার অর্থসকল ব্যঞ্জিত হইতে থাকে—সুরের মাধ্যমেই তাহাদের যথার্থ আস্বাদন। আমরা যাহাকে 'শাক্ত পদাবলী' নাম দিয়াছি তাহার ক্ষেত্রেও সেই কথা। গীতি-কবিতার প্রকৃতি অপেক্ষা গানের প্রকৃতিই ইহাদের বেশি, এই কারণেই বিশুদ্ধ সাহিত্য হিসাবে এগুলিকে বিচার করিতে গেলে ইহাদের প্রকৃত পরিচয় লাভ করা যায় না। বৈষ্ণব কবিতার বিচার বিশুদ্ধ সাহিত্য হিসাবেও চলে। মূলতঃ গান বলিয়া অধিকাংশ শাক্ত কবিতাই আকারে সংক্ষিপ্ত। গানের ভাব সংহত গাঢ়-বন্ধ বলিয়াই তাহার পরিধিও স্বাভাবিক ভাবেই সংহত।

দ্বিতীয়তঃ দেখিতে পাই, শাক্ত সঙ্গীতগুলি মূলতঃ সাধন-সঙ্গীত। বৈষ্ণব কবিতারও একটা সাধন-সঙ্গীতের দিক্ আছে, কিন্তু সব বৈষ্ণব কবিতার প্রেরণাই মূলতঃ একটা সাধন-প্রেরণা, এমন কথা মনে করিতে পারি না। চৈতন্য-পরবর্তী কালে লীলার স্মরণ-মনন-কীর্তনই বৈষ্ণবগণের একটা প্রধান সাধনারূপে স্বীকৃত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণও কৃষ্ণ-লীলার বা গৌরাঙ্গ-লীলার পরিকরত্ব লাভ করিয়া দূর হইতে লীলা-শুকের ন্যায় লীলা-সঙ্গীতের দ্বারাই লীলা আস্বাদন করিতেন। কিন্তু সকল বৈষ্ণব কবির কাব্য প্রেরণার মূলেই এই সাধন-স্পৃহা বলবতী ছিল, এ কথা বলা যায় না। চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবিগণের সম্বন্ধে তো বলা আরও শক্ত। রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনাস্থলে চৈতন্য-পরবর্তী কালেও কবি-প্রেরণা সাধক-প্রেরণা অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রে বেশি সক্রিয় ছিল—এই কথাই মনে হয়। অবশ্য যাঁহারা বৈষ্ণব সাধক তাঁহারা সব পদই লীলা-সাধনের সহায়রূপে গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু বৈষ্ণব প্রার্থনার পদগুলি ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে এই সাধনার দিকটি প্রত্যক্ষ

নহে। কিন্তু শাক্ত পদাবলীগুলি মুখ্যতঃ সাধন-সঙ্গীত। অবশ্য কিছু কিছু গান কবিওয়ালা বা পাচালিওয়ালা এবং পরবর্তী কালের কবি-নাট্য-কারগণকর্তৃকও রচিত হইয়াছে—সে ক্ষেত্রে সাধারণ ভক্তি-আকূতি-প্রকাশের প্রথাবদ্ধতা প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সঙ্গীতগুলি সাধন-প্রেরণা-প্রসূত। অন্ততঃ শাক্ত-সঙ্গীতের প্রবর্তক রামপ্রসাদ সম্বন্ধে এই সত্যটিকে মুখ্যভাবে গ্রহণ করিতেই হইবে।

অবশ্য শাক্ত গানগুলিকেও আবার দুই ভাবে ভাগ করা যাইতে পারে, লীলা-গীতি ও বিশুদ্ধ সাধন-গীতি। আগমনী ও বিজয়া-সঙ্গীতগুলি মুখ্যভাবে লীলা-গীতি। এই লীলা-গীতিগুলিরও একটি সাধনার দিক্ রহিয়াছে—যেমন রহিয়াছে বৈষ্ণব লীলা-গীতির সাধনার দিক্। আগমনী-বিজয়া ব্যতীত অন্য গীতিগুলি বিশুদ্ধ সাধন-গীতি। আমরা একটু পরেই এই শাক্ত লীলা-গীতির ভিতরকার সাধনা এবং অন্য প্রকারের সাধন-সঙ্গীতগুলির অন্তর্নিহিত সাধন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

একটি জিনিস আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে—পরিমাণ, বৈচিত্র্য ও সাহিত্য-সমৃদ্ধির দিক্ হইতে বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত শাক্ত পদাবলীর ঠিক ঠিক তুলনা হয় না, কিন্তু বাঙলা ধর্মসঙ্গীতের ক্ষেত্রে শাক্ত পদাবলীর প্রবর্তক রামপ্রসাদের একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে বাঙলা দেশের বৈষ্ণব চেতনা ক্রমে ক্রমে একটা গোষ্ঠী-চেতনার রূপ লাভ করিয়াছিল। মহাপ্রভু যখন কৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে বা ভগবৎ-চৈতন্যরূপে বিগ্রহীভূত হইলেন, তখন মহাপ্রভু-প্রভাবিত জন-সমাজে ভগবৎ-সত্তা ও ভগবৎ-কৃপা একরূপ স্বতঃসিদ্ধরূপেই গৃহীত হইতে লাগিল। ভগবৎ-সত্তা ও ভগবৎ-কৃপা তখন ক্রমে বৈষ্ণব সমাজে একটা গোষ্ঠী-চেতনারূপে দেখা দিল। এই ভগবৎ-নিষ্ঠা ও ভগবৎ-লীলায় আসক্তির মধ্যে কোনও রূঢ় ব্যক্তি-জীবনের জিজ্ঞাসা ছিল না। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত কবিগণের মধ্যে কাজ করিয়াছে এই গোষ্ঠী-চেতনা, অন্যান্য ছোট ছোট কবিগণ ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন একটা সামাজিক উত্তরাধিকাররূপে। বৈষ্ণবতা তাহার প্রসিদ্ধি ও ব্যাপকতা দ্বারা যখন এই জাতীয় একটা সামাজিক উত্তরাধিকাররূপে দেখা দিল, তখন বৈষ্ণব কবিতার মধ্যেও দেখা দিয়াছে অনেক-খানি প্রথাবদ্ধতা এবং রীতি-প্রবণতা।

কিন্তু রামপ্রসাদের নামে প্রচলিত গান-গুলিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, রামপ্রসাদের মাতৃ-বিশ্বাস কোনও গোষ্ঠী-চেতনালব্ধ জিনিস নহে, রূঢ় বাস্তব জীবনের অগ্নিদাহে ইহার খাদ পোড়ান হইয়াছে, জীবন-জিজ্ঞাসা-জনিত ঘনীভূত সংশয়ের কষ্টি-পাথরে ইহার সারবত্তা বার বার পরীক্ষিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতকের বাঙালী নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের সমগ্র জীবনব্যাপী বাঁচিবার সংগ্রামের সমস্ত আঘাতকে সহ্য করিয়া তবে রামপ্রসাদকে এই 'মা' নামে অটল থাকিতে হইয়াছে। রামপ্রসাদের একটি প্রসিদ্ধ গানে দেখিতে পাই, জীবনের দুঃখ লইয়া রামপ্রসাদ মাকে রীতিমত 'চ্যালেঞ্জ' দিতেছেন—

আমি কি দুখেরে ডরাই ?
দুখে দুখে জন্ম গেল,
আর কত দুখ দেও দেখি তাই।[১]
আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে
দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই ॥....
প্রসাদ বলে, ব্রহ্মময়ি, বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে,
আমি করি দুখের বড়াই ॥

১ তবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই—পাঠান্তর।

কিন্তু মুখে বড়াই করিলে কি হইবে, বেশ বুঝিতে পারি—এই লোকটি বাস্তব জীবনের দুঃখে দুঃখে বড় শ্রান্ত। এত দুঃখের বোঝা বহিয়া-চলা-জীবনের পশ্চাতে কোনও মঙ্গলময়ী চৈতন্য-শক্তি রহিয়াছে কিনা—এ লোকটি তাহাকে কল্পনায় নয়, একান্ত বাস্তবভাবে অনুভব করিতে চায়। বিশ্বাসের ভিতর দিয়া বাস্তব জীবনজিজ্ঞাসা-জনিত সংশয় বার বার উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। প্রথম জীবনে লোকটিকে কৃষ্ণচন্দ্র রাজার জমিদারিতে মুহুরীগিরি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হইয়াছে, পরবর্তী জীবনে শুধু কিঞ্চিৎ রাজ-অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইয়াছে। সুতরাং দুঃখ-দারিদ্র্যের বোঝাভরা জীবন—তাহার মধ্যেই হৃদয়ে আঁকড়াইয়া রাখিতে হইয়াছে পরম-মঙ্গলময়ী মাতৃ-চেতনা। এই চেতনায় বার বার প্রতিকূল কম্পন দেখা দিয়াছে। কোনও শুভ মুহূর্তে হয়ত এই সাংসারিক সকল তুচ্ছতা—ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করিয়া মন অনেক ঊর্ধ্বে এক সীমাহীন মহা-চৈতন্যের মধ্যে বিচরণ করিবার সুযোগ পায়—'কালীপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়তেছিল।' কিন্তু সেখানে শাশ্বত স্থিতি লাভ করা যায় কই? তাই ত পরমুহূর্তেই আবার—'কলুষ-কুবাতাস পেয়ে ঘুড়ি গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল'[২] তত্ত্বকথার বাঁধাবুলিতে বাস্তব দারিদ্র্যের জ্বালা ভুলিতে না পারায় একদিন রামপ্রসাদকে দারিদ্র্য লইয়া তাঁহার 'মায়ের' সহিত রীতিমত জবাবদিহি করিতে দেখি—

আমি তাই অভিমান করি,
আমায় করেছ গো মা সংসারী ॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি।
ওমা তুমিও কোন্দল করেছ বলিয়ে শিব ভিখারি ॥

২ পদটি রামপ্রসাদের বলিয়াও গৃহীত হয়, আবার নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের ভণিতাতেও গৃহীত হয়।

এই জবাবদিহি শুধু রামপ্রসাদের জবাবদিহি নয়, ধর্মকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে বনাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে অষ্টাদশ শতকের যে নিম্নমধ্যবিত্ত দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট সম্প্রদায় তাহাদেরই চেতনায় একটি চেতনা-দ্বন্দ্বের ভিতরে দেখা দিয়াছে এই জবাবদিহির ইচ্ছা। রামপ্রসাদের ধর্মবোধের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাহার গানের অদ্ভুত একটি পদে, যেখানে তিনি বলিয়াছেন,

এ সংসারে এনে মাগো করলি আমায় লোহাপেটা।
আমি তবু কালী ব'লে ডাকি
সাবাস্ আমার বুকের পাটা ॥

কালী মঙ্গলময়ী আনন্দময়ী মা বলিয়া সমস্ত জীবনটা শুধু মঙ্গলে আর আনন্দেই ভরা—এমন ছেঁদো বুলিতে রামপ্রসাদের মন ওঠে নাই, রামপ্রসাদ সারা জীবনই দেখিয়াছেন, বাস্তব সংসারের ক্ষেত্রে আনিয়া মা নিরন্তর 'লোহা-পেটা'ই করিয়াছেন, কিন্তু রামপ্রসাদ 'সাবাস্' পাইবার দাবি রাখেন কোথায়? এই সমস্ত 'লোহাপেটা'কে এড়াইয়া গিয়া বা অস্বীকার করিয়া তিনি মাকে স্বীকার করিবার চেষ্টা করেন নাই, সেই সমস্ত 'লোহাপেটা'র ভিতরেই তিনি ব্যক্তিজীবন এবং বিশ্বজীবনের পিছনে একটি মহাশক্তিতে বিশ্বাসকে অটুট রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহার রক্তাক্ত দেহমন লইয়া রামপ্রসাদের এই গানের সুরে মানুষের আধুনিক ধর্মবোধের আভাস ফুটিয়াছে। বাস্তব জীবন-সংগ্রাম মনকে সংশয়াচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, ধর্মবোধকে তাই প্রকাশ পাইতে হইয়াছে সংশয়-মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আভাসিত বিশ্বাসের স্বর্ণচ্ছটায়।

রামপ্রসাদের গানগুলির মধ্যে বাস্তব-জীবন-জিজ্ঞাসা যেরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত দেখিতে পাই তাঁহার পরবর্তী শাক্ত সঙ্গীতকারগণের

গানের মধ্যেও ধর্মবিশ্বাসের এই বাস্তবে প্রতিষ্ঠা আমরা নানাভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। আর বাস্তব জীবনের সঙ্গে শাক্তগণের সঙ্গীত এইরূপ ওতপ্রোতভাবে মিলিত ছিল বলিয়াই দেখিতে পাই, শাক্ত সঙ্গীতের ভাষাও হইল সাধারণ জীবনের ব্যাবহারিক ভাষা। তালুক-জমিদারি, বিষয়-সম্পত্তি, মামলা-মোকদ্দমা, লেন-দেন, দলিল-দস্তাবেজ, ঋণ-বন্ধক, নায়েব তফিলদার, ব্যাপারী-ব্যবসায়ী, কলু-কৃষক—কাহারোই এই সঙ্গীতের মধ্যে অনায়াসে স্থান পাইবার কোনও বাধা ছিল না।

পূর্বেই বলিয়াছি, ব্যাপকভাবে সকল শাক্ত সঙ্গীতগুলিকেই সাধন-সঙ্গীত আখ্যা দেওয়া যাইতে পারিলেও সঙ্গীতগুলিকে আবার দুই-ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—লীলা-সঙ্গীত বা লীলাশ্রিত সাধন-সঙ্গীত, আর বিশুদ্ধ সাধন-সঙ্গীত। বিশুদ্ধ সাধন-সঙ্গীতগুলিতে তৎকালে প্রচলিত বাঙলাদেশের বিবিধ মাতৃ-সাধনারই বিবরণ দেখিতে পাই। ভক্তি ও যোগাশ্রিত তান্ত্রিক গুহ্য সাধনার বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে এই সাধকগণের বিবিধ অতীন্দ্রিয় অনুভূতিরও আভাস মেলে। এই সাধনা ও সাধনালব্ধ অনুভূতির বর্ণনায় শাক্ত কবিগণের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি আমরা লক্ষ্য করিতে পারি এবং বিশিষ্ট ভঙ্গির ক্ষেত্রে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম সাধন-সঙ্গীত চর্যাপদগুলির সহিত এই শাক্ত সাধন-সঙ্গীতগুলির একটা মিল অতি সহজেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। সাধনার গুহ্য রহস্য ও সাধন-লব্ধ অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসকলের বর্ণনায় চর্যাকারগণ সর্বদাই কতগুলি রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, আর এই রূপকগুলিও সংগৃহীত চর্যাকারগণের বাস্তব সমাজ-জীবনের আশেপাশে ছড়ানো সকল দৃশ্য ও ঘটনা হইতে। শাক্ত সাধন-সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও আমরা ঠিক সেই জিনিসটিই লক্ষ্য করিতে পারি। এখানেও যে সকল রূপক ব্যবহৃত হইতে দেখি তাহা সমাজ-জীবনের চারিদিকে ছড়ানো দৃশ্য ও ঘটনা হইতেই সংগৃহীত। চর্যাপদের মধ্যে একটি পদে দেখি দাবাখেলার রূপকে সাধন-রহস্য প্রকাশ করা হইয়াছে। পদটি এই—

'করুণাকে পিড়ি করিয়া নয়বল (দাবা) খেলিতেছে, সদ্‌গুরুর বোধে ভববল জিতিলাম। প্রথমে তুড়িয়া বড়িয়া মারিলাম, গজ-বরকে তুলিয়া পাঁচজনকে ঘায়েল করিলাম। মন্ত্রী দ্বারা ঠাকুরকে (রাজাকে) পরিনিবৃত্ত করিলাম, অবশ করিয়া (কিস্তিমাৎ করিয়া) ভববল জিতিলাম।'[৩]

ইহার সহিত তুলনা করিতে পারি রামপ্রসাদের একটি পদ : এবার বাজী ভোর হলো।

মন কি খেলা খেলবে বল ॥
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ, পঞ্চে আমায় দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘরে ভর ক'রে
মন্ত্রীটি বিপাকে মলো ॥
. . .
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে
অবশেষে এই কি ছিল।
ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে
পিলের কিস্তি মাত হইল ॥[৪]

রামপ্রসাদ পাশাখেলার রূপকও গ্রহণ করিয়াছেন, যথা :

ভবের আশা খেলব পাশা,
বড়ই মনে আশা ছিল।
মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজুরি প'লো ॥
প'বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলাম ভাল,

৩ করুণা পিহাড়ি খেল হুঁ নয় বল। ইত্যাদি, ১২ নং।
৪ ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ' গ্রন্থে সঙ্কলিত।

শেষে কচ্চা বার পেয়ে মাগো
পাঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলো ॥[৫]

একটি চর্যাগানে দেখিতে পাই সূর্যকে লাউ করিয়া এবং চন্দ্রকে তন্ত্রী (তার) করিয়া এবং অনাহতকে মধ্যবর্তী দণ্ড করিয়া একটি বীণা-যন্ত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং সেই যন্ত্র হইতে যে সুমধুর ধ্বনি বাহির হইতেছে, তাহা শুনিয়া চিত্ত সমরসে প্রবেশ করিয়াছে।[৬] গোবর্ধন চৌধুরীর একটি শাক্ত সঙ্গীতে দেখি—

মন-সেতারে বাজরে তার, তারা তারা ব'লে।

তোমার দেহরূপী লাউ ছিল, বহুদিনে জীর্ণ হ'ল,
জ্ঞান-পর্দা ছিন্ন ভিন্ন হোল তোর দোষে ॥
ভৈরবী রাগিণী ধ'রে বসাও পর্দা শুবে শুরে,
বাজা রে গৎ মধুর স্বরে, হবে পার এ ভব-দুস্তরে ॥[৭]

একটি চর্যাপদে আমরা শুঁড়ীর ভাঁটিতে মদ চুয়াইবার রূপক দেখিতে পাই।[৮]

রামপ্রসাদের একটি গানে দেখি—

গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞান-শুঁড়ীতে চুয়ায় ভাঁটি,
পান করে মোর মন-মাতালে ॥

ডোম্বীপাদের একটি চর্যায় নৌকা বাহিবার রূপকে সাধন-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে পঞ্চতথাগতরূপ পঞ্চ কেড়ুয়াল (দাঁড), সৃষ্টি-সংহার-রূপ দুই চাকা ও মাঝখানে অদ্বয়-রূপ মাস্তুলের কথা দেখিতে পাই।[৯] কমলাকান্তের একটি গানেও অনুরূপ সাধন-বর্ণনা দেখিতে পাই :

মন-পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বোলে।
মন মহামন্ত্র যন্ত্র যার, সুবাতাসে বাদাম তুলে ॥
মহামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল ,
সুজন কুজন আছে যারা,
তাদের দেরে দাঁড়ে ফেলে ॥[১০]

ইহা ব্যতীত আমরা কোথাও জমিদারির রূপক,[১১] কোথাও তবিলদারের রূপক,[১২] কোথাও মামলা-মোকদ্দমার রূপক,[১৩] কোথাও দিনমজুরের রূপক,[১৪] কোথাও 'কুয়োর ঘড়া'র রূপক,[১৫] কোথাও রোগের রূপক,[১৬] কোথাও কূপের রূপক,[১৭] কোথাও আবার ঘুড়ি উড়াইবার

৫ তুলনীয় রসিকচন্দ্র রায়ের প্রাবৃখেলার রূপক—
সাধন-রূপ প্রাবুখেলা এই বেলা মন খেলিয়ে নে রে।
জিৎ হবে ভবের বাজি, কালীনামের টেকা মেরে ॥
শাক্ত পদাবলী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

৬ সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী। ১৭ সং

৭ শা. প. (ক বি)

৮ এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ
চীঅণ বাকল অ বারুণী বান্ধঅ ॥ ৩ সং

৯ ১৪ সং।

১০ শা প (ক বি.)

১১ শুনরে মন জমিদার, ভাল এবার করলি রে তুই জমিদারি।
যত সব জুয়াচোরে আমলা ক'রে উসুল তহশীল দিলি ছাড়ি।
কবি অজ্ঞাত শা প (ক বি.)।

১২ আমায় দেও মা তবিলদারী,
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।
পদ রত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে,
ইহা আমি সইতে নারি ॥ রামপ্রসাদ শা প।

১৩ মা গো তারা ও শঙ্করি,
কোন্ অবিচারে আমার প'রে করলে দুখের ডিক্রী জারি ?
রামপ্রসাদ, শা প

১৪ ম'লেম ভূতের বেগার খেটে,
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে। রামপ্রসাদ, শা. প

১৫ আর কত কাল ভুগবো কালী হ'য়ে আমি কুয়োর ঘড়া।
এই ভবকূপে কোনরূপে নিবৃত্তি নাই উঠা-পড়া।
প্যারীমোহন কবিরত্ন, শা প

১৬ তারিণি ভবরোগে ব্যথিত জীবন, করি কি এখন ?
কলুষ-পৈত্তিকে অঙ্গ করিছে দহন।
বাসনা বাত প্রবল, টুটাইয়ে জ্ঞান-বল,
প্রবৃত্তি-কফেতে কণ্ঠ করিছে রোধন ॥ রামচন্দ্র রায়, শা প.

১৭ দোষ কারো নয় গো মা,
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।
ষড়্‌রিপু হ'ল কোদণ্ডস্বরূপ,
পুণ্য ক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপে ব্যাপিল কালরূপ জল—কাল-মনোরমা।
দাশরথি রায়, শা. প.

রূপক,[১৮] কোথাও বা কাপড় ধোপ দিবার রূপক[১৯] দেখিতে পাই। এই সকল রূপকের মধ্যে রামপ্রসাদের দুই একটি রূপক জনপ্রিয়তার দ্বারা অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, একটি হইল কৃষির রূপক :

মন রে কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোনা ॥

১৮ শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি, ভব-সংসার-বাজারের মাঝে।
ঐ যে মন-ঘুড়ি, আশা-বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া-দড়ি ॥
রামপ্রসাদ, শা প

১৯ বাসনাতে দাও আগুন জ্বেলে, ক্ষার হবে তায় পরিপাটী।
কর মনকে ধোলাই, আপদ্ বালাই,
মনের ময়লা যাবে কাটি ॥
কালীদহের জলে চল, সে জলে ধোপ ধরবে ভাল।
(আর) পাপকাষ্ঠের আধা জ্বালো,
চাপাও রে চৈতন্য ভাঁটি ॥ নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, শা প.

অপরটি হইল ডুবুরীর রূপক :

ডুব দে রে মন কালী ব'লে,
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন,
দু-চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও
কুল-কুণ্ডলিনীর কূলে ॥

গৃহীর ন্যায় স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসার-যাত্রার একটি রূপকও জন-প্রিয়তা লাভ করিয়াছে :

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরু-তলে গিয়া চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক-নামে জ্যেষ্ঠপুত্র,
তত্ত্ব-কথা তায় সুধাবি।

পূজোর দিনে

শ্রীনবগোপাল সিংহ

অপরাজিতার নীল শাড়ীখানা
পূজোর বাজারে কে দিল কিনে ?
জবার মেয়েও রক্ত চেলিটি নিয়েছে চিনে।
শিল্পী শিউলী রঙীন বোঁটায়
ঘাসের জাজিমে বুটি তুলে যায়
সবুজ ধানের ওড়না উড়িয়ে
কে এল ধরায় এ আশ্বিনে ?

আলো-ঝলমলো আকাশের নীলে
হালকা মেঘের পানসী চলে
রাতের আঁধারে লক্ষ তারার জোনাকি জ্বলে।
কাশ ফোটে আর মাঠে জোটে বক্
যে দেখে সে চেয়ে থাকে অপলক,
সারা রাত ধরে সাপলা ঘুমায়,
জাগে শতদল সকাল হ'লে।

ড্যাম কুড কুড তালে তোলে ঢাক
তার সাথে বাজে কাঁইনানা কাঁসি।
গৌরী, বিভাস, ভাঁয়রো ধ'রেছে ভোরের বাঁশী।
কোনদিন যারা ওঠেনাকো ভোরে
সেই ছেলে মেয়ে জুটলো কি ক'রে ?
মা এসেছে শুনে মাতৃহারার
আশা-আশ্বাসে ফুটেছে হাসি।

এলো ওই এলো আনন্দময়ী
এলোরে বাহিয়া সোনার তরী—
শূন্য ধরণী সোনার ফসলে পূর্ণ করি।
সাজায়ে অর্ঘ্য, বন্দনা গেয়ে
জননীর কাছে কি নিবি নে চেয়ে,
শক্তির কাছে চেয়ে নে শক্তি,
সবার হৃদয় উঠুক ভরি।

বাংলার দুর্গোৎসব

শ্রীমতী রেখা চট্টোপাধ্যায়

সবাই জানেন ভারতবর্ষের অস্থিমজ্জায় রয়েছে ধর্মের প্রবাহ। সুতরাং শিক্ষা-দীক্ষায় সংস্কৃতির প্রবাহে যতই সে গা ভাসিয়ে দিক, তবু নিজের অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধর্মকে সে কোন কালেই বিদায় দিতে পারবে না। কিন্তু এ তো গেল সারা ভারতের কথা, তার মধ্যে এই বাংলা দেশে—যেখানে একদিন মরাই-ভরা ধান, গোয়াল আলো-করা দুগ্ধবতী গাভী থাকত, সেখানে ছিল বার মাসে তের পার্বণ। এদের মধ্যে অনেকগুলি অবশ্য আজ আর টিকে নেই, তবু আজও বরষা-শেষে প্রকৃতি যখন শান্ত স্নিগ্ধ হ'য়ে যায়, পরিষ্কার নীল আকাশের কোলে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘ দেখা যায়, বৃক্ষলতা নব সাজে সজ্জিত হয় আর নবীন মঞ্জরীর ভারে ধানক্ষেত-গুলি সুশোভিত হ'যে ওঠে ঠিক সেই সময়েই বাঙালী করে দুর্গাপূজার আয়োজন। এই দুর্গোৎসব বাংলায় যেভাবে সম্পাদিত হয়, সেভাবে আর কোথাও হয় না। তাছাড়া প্রবাসী বাঙালীর বাস যেখানেই আছে, সেখানেই আজকাল দুর্গোৎসবের আযোজন হয। ফলে ভারত-বর্ষের প্রায় সর্বত্র দুর্গাপূজা প্রচলিত। তবু বাংলার আকাশ-বাতাসের সঙ্গে সুর মিলিয়ে দুর্গোৎসব যেভাবে জমজমাট হ'যে ওঠে, বাংলার বাইরের দুর্গোৎসব সেভাবে জমে উঠতে পারে না।

তাছাডা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে দুর্গা-পূজায় যে মূর্তি কল্পনা করা হয় তাও অন্য প্রকার দেখা যায়। যেমন—কলিঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশে দেবী অষ্টভুজা, অযোধ্যা, সৌরাষ্ট্র, শ্রীহট্ট ও কোশলে দেবী অষ্টাদশভুজা; মথুরা, কেদার ও কুরুদেশে দেবী দ্বাদশভুজা, নেপাল, কচ্ছ ও কঙ্কণে দেবী চতুর্ভুজা।

দশভুজা সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী দেবী, তাঁর সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ এবং তাঁদের বাহনের পূজা বাংলার নিজস্ব। এই ভাবের প্রতিমা তৈরী ক'রে মাতৃ-আরাধনা বাংলাদেশে কতকাল প্রচলিত, তা সঠিক নির্ণয় ক'রে বলা সহজ নয়।

এর ওপর বাংলার দুর্গোৎসব আবার বাৎসল্য-রসে অভিষিক্ত হ'য়ে আরও মধুর হ'য়ে উঠেছে। শরৎসমাগমে দেবীপক্ষের বহু পূর্ব থেকে দেবীর 'আগমনী' সঙ্গীত বাংলার প্রতি নগরে ও গ্রামে যেন নব জীবন দান করে:

গিরি গৌরী আমার এসেছিল
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল।

রাণী মেনকার সঙ্গে বাংলার মাতৃহৃদয়ের অপূর্ব যোগাযোগ, তাঁর মনটিও যে প্রকৃতির এই প্রাচুর্য-সম্ভারের মধ্যে দূরপ্রবাসী কন্যার জন্য আকুল হ'য়ে ওঠে। তাই ঘরের দরজায় ভিখারী যখন গায়—

গা তোল গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল,
এল বুঝি তোর ঈশানী—

তখন ভিখারীর ভিক্ষাপাত্র ভরে উঠতে আর বিশেষ সময় লাগে না।

বৎসরান্তে মাত্র তিনদিনের জন্য পিতৃগৃহে কন্যা আসবে—আনন্দের আর সীমা নেই। তাই মহামায়ার সম্বর্ধনা ও পূজায় বাঙালী যে আনন্দ করে, তার তুলনা ভারতের অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। বাঙালীর দুর্গোৎসবে

বাৎসল্য-রসের প্রাধান্যই তাকে অতুলনীয় ক'রে তুলেছে। সিংহারূঢ়া মহিষমর্দিনী শুম্ভ-নিশুম্ভ-ঘাতিনী দশভুজা অপেক্ষা সন্তান-পরিবৃতা স্নেহ-শীলা মাতৃরূপটি, সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্রী জগজ্জননী অপেক্ষা মেনকারাণীর প্রাণসমা আদরিণী কন্যা উমাই বাঙালীর অধিক আকাঙ্ক্ষিত। চৈতন্য-রূপিণী মা 'স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে' আবার না লুকায়, এই তার ভয় ও ভাবনা। বাৎসল্য-রসজ স্নেহপ্রীতিভক্তিকে ব্রহ্মানন্দে পরিণত করাই ভক্তের সাধনা।

মা আমার শুদ্ধ-সনাতনী মূলা প্রকৃতি। তিনিই সাক্ষাৎ পরব্রহ্মস্বরূপিণী, দেবতাদিগেরও উপাস্যা। তিনিই মাহেশ্বরী শক্তিতে দুর্গারূপে, বৈষ্ণবী শক্তিতে লক্ষ্মীরূপে, ব্রহ্মাণী শক্তিতে সরস্বতীরূপে বার বার দেখা দেন, অর্থাৎ একই শক্তির ত্রিমূর্তি—জ্ঞান, ইচ্ছা, কর্ম। সকলকে একত্র করেই বাঙালীর পূজা। তারও পর ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমার কার্তিকরূপে ও ভগবান বিষ্ণু গণেশরূপে পার্বতীনন্দন নামে খ্যাত হ'য়ে এ পূজার অংশভাগী। প্রতিমায় সিংহবাহিনী দশপ্রহরণধারিণী দেবী দুর্গারূপে মহিষাসুর-নিধনে পরিদৃশ্যমানা।

বাঙলা দেশ যখন ধনধান্যে পরিপূর্ণ এবং বিদ্যা-বুদ্ধি শৌর্যবীর্যে ও ধর্মে কর্মে অতুলনীয় হ'য়ে উঠেছিল, জাতীয় জীবনের সেই গৌরবময় অতীতেই ধনদায়িনী লক্ষ্মী, বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী শৌর্যশালী কার্তিক এবং সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তিসহ মহামহিমময়ী দুর্গামূর্তির পরিকল্পনা করা হয় ব'লে আজ অনেকেরই বিশ্বাস।

ভক্তের কাতর আহ্বানে ভগবান চিরকালই সাড়া দিয়ে থাকেন। তাই মাতৃভাবের সাধনায় ভক্ত এমন তন্ময় হ'য়ে যায় যে সে জোর ক'রে বলতে পারে: আমি দুর্গা দুর্গা ব'লে যদি মরি

আখেরে এ দীনে না তারো কেমনে
দেখা যাবে গো শঙ্করি!

ভক্তের সার কথা: আবাহনও জানি না, পূজাও জানি না, বিসর্জনও জানি না, জানি আমার ভার তোমারই। তাই সে বলতে পারে—

কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা কখন নয়।

মাতৃনামে এই বিশ্বাসই ভক্তকে কোন মন্ত্র-তন্ত্রের বন্ধনে আবদ্ধ ক'রে রাখতে পারেনি।

তা-ছাড়া বাংলার দুর্গাপূজা কেবল পূজা-মাত্রই নয়, অথবা উৎসব করেই এর সমাপ্তি হয় না। পরন্তু দশে মিলে প্রাণ ভ'রে মেলামেশার সুযোগ মেলে এই দুর্গাপূজায়। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সমাজের সকলে একত্র হ'য়ে করে এক অপূর্ব জাতীয় উৎসব। তাই শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে—'জাতিরূপেণ সংস্থিতা।' তিনিই আছেন আমাদের মধ্যে—'শক্তিরূপেণ'। সুতরাং অর্চনা 'বিধিহীনা ভক্তিহীনা ক্রিয়াহীনা' হলেও দেবী তাঁর প্রসাদ আমাদের দেবেন, এ বিশ্বাস বাঙালীর অন্তরে চিরকাল জাগরূক হ'য়ে আছে ও থাকবে। এই হ'ল বাংলার দুর্গোৎসবের বৈশিষ্ট্য।

মাতৃজাতি ও বেদাধ্যয়ন

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

ত্রৈবর্ণিক পুরুষের ন্যায় ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীজাতির বেদে সম অধিকার

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যে পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য বলিয়াছেন—'ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োঃ অলৌকিকম্ উপায়ং যঃ গ্রন্থঃ বেদয়তি, সঃ বেদঃ'—আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্তির এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তু পরিহারের অলৌকিক উপায় যে গ্রন্থ বিজ্ঞাপিত করে, তাহার নাম বেদ। আমার মঙ্গল হউক, অমঙ্গল না হউক, সকল অভীপ্সিত বস্তু আমার হউক, অনভীপ্সিত বস্তু চিরকাল আমা হইতে দূরেই থাকুক—প্রত্যেক মনুষ্যেরই ইহা শাশ্বত কামনা। কিন্তু তাহার ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানবলে সে ইহা প্রাপ্তির নির্ভুল উপায় নিরূপণ করিতে পারে না। উপায় সে যে কিছু একটা নিরূপণ করে না, তাহা নহে, অহরহঃ সে দুঃখ-পরিহারের ও সুখপ্রাপ্তির উপায় নিরূপণ করিতেছে, প্রাণপণে সেই উপায়কে 'রূপদান' করিতেছে, কিন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু দুর্লভই থাকিয়া যায়। অভীষ্ট বস্তু যে সে মোটেই প্রাপ্ত হয় না, তাহা নহে, কিন্তু প্রথমে না বুঝিলেও ফলপ্রাপ্তিকালে সে বুঝিতে পারে, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সহিত অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তুও তাহার ভাগ্যে জুটিতেছে। ইহা হইতে নিষ্কৃতির কোন উপায় সে অনুসন্ধান করিয়াও পায় না, ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান তাহাকে এই বিষয়ে সহায়তা করিতে পারে না। তখন ভগবতী শ্রুতি তাহাকে বলেন: তুমি যাহা চাও, তাহার উপায় আমি বলিতে পারি। তোমার ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানলব্ধ যাবতীয় লৌকিক উপায় তো তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ, আমি তোমাকে এই বিষয়ে 'অলৌকিক' উপায়ের কথা বলিব। এই সুখ-প্রাপ্তির ও দুঃখনিবৃত্তির অভ্রান্ত অলৌকিক উপায় যাহা হইতে অবগত হওয়া যায়, তাহাই আমাদের ধর্মশাস্ত্র 'বেদ'।

আচার্যগণ নিরূপণ করিয়াছেন, যাহার 'অর্থিত্ব' অর্থাৎ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারের আকাঙ্ক্ষা আছে—বেদ তাহার জন্য যে উপায়-সকলের কথা বলেন, তাহা সম্পাদন করিবার 'সামর্থ্য' যাহার আছে, সেই ব্যক্তি যদি 'পর্যুদস্ত' না হয়, অর্থাৎ কোন বিশেষ উপায় অবলম্বনে শ্রুতিকর্তৃক নিবারিত না হয় [যেমন—ব্রাহ্মণজাতি রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠানে নিবারিত হইয়াছে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি সত্রযজ্ঞানুষ্ঠানে নিবারিত হইয়াছে—ইত্যাদি], তাহা হইলে সেই ব্যক্তি বেদকর্তৃক উপদিষ্ট সেই উপায়ের অনুষ্ঠানে অধিকারী। এইরূপে প্রাপ্ত হওয়া গেল যে—অর্থিত্ব, সামর্থ্য এবং অপর্যুদস্তত্ব (শ্রুতিকর্তৃক নিবারিত না হওয়া) এইগুলি অধিকারীর গুণ। এই গুণসকল যাহার থাকে, সেই ব্যক্তি বেদবিহিত সেই অলৌকিক উপায়ের অনুষ্ঠানে অধিকারী।

নারীও মনুষ্য, তাঁহারও সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখ-পরিহার বিষয়ে অর্থিত্ব আছে, তাহার অনুষ্ঠান-বিষয়ে তাঁহার সামর্থ্য কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে। কিন্তু ইদানীন্তন শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতৃগণ বলেন: নারীগণ পর্যুদস্ত, শ্রুতিই তাঁহাদিগকে সম্যক্‌ভাবে না হইলেও কিয়ৎপরিমাণে নিবারিত করিয়াছেন, বেদই তাঁহারা অধ্যয়ন করিতে পারেন না, কারণ শ্রুতি বলিতেছেন, 'ন পত্নীং বেদে বাচয়তি' (শাঙ্খায়ন ব্রাঃ ৭।৩) ইহার অর্থ অনেকে করেন, স্ত্রীজাতিকে বেদাধ্যয়ন করাইবে না। এই প্রকার

অন্যান্য শ্রুতি এবং স্মৃতিবাক্যও প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—'ন স্ত্রীশূদ্রৌ বেদম্ অধীয়াতাম্' (?) স্ত্রীজাতি ও শূদ্রজাতি বেদাধ্যয়ন করিবে না। 'সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রায় নেচ্ছন্তি' (নৃসিংহ পূর্বতাঃ উপঃ ১।৩)—গায়ত্রী প্রণব ও যজুর্লক্ষ্মী মন্ত্র স্ত্রী ও শূদ্রকে বলিবার ইচ্ছা করেন না (পণ্ডিতেরা)। 'স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা' (শ্রীমদ্ভাঃ ১।৪।২৫)—ত্রয়ী (বেদ) স্ত্রীজাতি, শূদ্রজাতি ও দ্বিজবন্ধুগণের কর্ণগোচর হন না, অর্থাৎ বেদ-শ্রবণে তাঁহাদের অধিকার নাই ইত্যাদি। পূর্ব মীমাংসাদর্শনে (৬।১।৪) 'দম্পত্যোঃ সহাধিকারাধিকরণে' পতির সহিত পত্নীর কর্মানুষ্ঠানে অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং পতিসহ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের শ্রুতি-নির্দিষ্ট উপায়ের অনুষ্ঠান তাঁহারা করিতে পারেন, ফলও তাঁহাদের লব্ধ হইয়া থাকে, বেদাধ্যয়ন কিন্তু তাঁহারা করিতে পারেন না—ইহাই ইদানীং হিন্দুসমাজে প্রচলিত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

কেহ কেহ আবার বলেন: পূজ্যপাদ আচার্য শঙ্কর নারীজাতিকে নরকের দ্বারস্বরূপ বলিয়াছেন, যথা—'দ্বারং কিমেকং নরকস্য ? নারী।' (মণিরত্ন-মালা ২-৪)—নরকের একমাত্র দ্বার কি ? নারী। সুতরাং যাহারা নরকের দ্বারস্বরূপ, তাহাদের যে বেদরূপ পবিত্র বস্তুর অধ্যয়নে অধিকার নাই, এই বিষয়ে আর বলিবার কি আছে ?

কর্মানুষ্ঠানে 'দম্পতির সহাধিকার'—এই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বিষয়ে আমাদের বলিবার কিছুই নাই, ইহা যে অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত, ইহা আমরা অঙ্গীকার করি। কিন্তু বেদাধ্যয়নে মাতৃজাতির অধিকার নাই, ইহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কেন এই ধৃষ্টতা ? তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

'ন বেদে পত্নীং বাচয়তি' এই বাক্য হইতেই মাতৃজাতির বেদে অধিকার প্রতিপাদন

মাতৃজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার-নিরাকরণের জন্য 'ন বেদে পত্নীং বাচয়তি' (শাঙ্খায়ন ব্রাঃ ৭।৩) এই যে শ্রুতিবাক্যটি উদাহৃত হইতেছে, তাহা তাঁহাদের বেদাধ্যয়নে-অধিকারের নিবর্তক নহে, পরন্তু তদ্বিষয়ের সাধক—ইহাই আমরা প্রথমে প্রদর্শন করিতেছি। ন্যায়বিদ্গণ বলেন, 'অনন্যলভ্যঃ শব্দার্থঃ'—যাহা লক্ষণাদি অন্যবৃত্তির দ্বারা লব্ধ নহে, পরন্তু শব্দের শক্তিবৃত্তির দ্বারাই লব্ধ হয়, তাহাই শব্দের অর্থ। এই সর্বসম্মত ন্যায়ানুসারে 'পত্নী' শব্দের অর্থ হয়—'দাম্পত্যসম্বন্ধে পুরুষ-বিশেষের সহিত সম্বদ্ধ স্ত্রী-বিশেষ'। পত্নীশব্দের অর্থ স্ত্রীজাতি নহে, সেই হেতু উক্ত বাক্যটি স্ত্রী-জাতির বেদাধ্যয়ন-অধিকারের নিবর্তক, ইহা অঙ্গীকার করা যায় না। আর এখানে লক্ষণা-বৃত্তিবলে 'পত্নী'শব্দের অর্থরূপে স্ত্রীজাতিকে গ্রহণ করিবার প্রতি কোন প্রকার অনুপপত্তিও (লক্ষণাবীজও) পরিদৃষ্ট হইতেছে না।

শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণের যে প্রকরণে উক্ত বাক্যটি পঠিত হইয়াছে, তাহাতে সোমযজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তির জন্য কতকগুলি ব্যবহার বিহিত হইয়াছে, যথা: 'অস্য নাম ন গৃহ্ণাতি' (ঐ ৭।২)—ইহার নাম কেহ গ্রহণ করিবেন না, 'সঃ অন্যস্য নাম ন গৃহ্ণাতি' (ঐ ৭.৩)—তিনি অপরের নাম গ্রহণ করিবেন না, 'যঃ সত্যং বদতি সঃ দীক্ষিতঃ' (ঐ)—যিনি সত্য কথা বলেন, তিনি দীক্ষিত (দীক্ষিত ব্যক্তি সত্য কথা বলিবেন), 'দীক্ষিতঃ অগ্নিহোত্রং ন জুহোতি' (ঐ), 'দীক্ষিতস্য অশনং নাশ্নন্তি' (ঐ)—দীক্ষিতের অন্ন কেহ ভক্ষণ করিবে না, ইত্যাদি। এইরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে—যাহা মনুষ্যের পক্ষে নিত্যপ্রাপ্ত, অথবা কোন ব্যক্তি যাহা করিয়াই থাকেন বা প্রায়ই করেন, এই প্রকার কোন কোন বিষয়ই এখানে দীক্ষিত

ব্যক্তির পক্ষে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। 'অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ হয় না'—ইহা একটি সর্ববাদিসম্মত যুক্তি, কারণ যাহার ধনই নাই এমন ব্যক্তি ধন দান করিবে না, কেহ তাহাকে এরূপে নিষেধ করে না—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কোন ব্যক্তি প্রায়ই যদি কিছু করে, বা তাহা অনুষ্ঠান করিবার সামর্থ্য তাহার থাকে, তবে তাহাকেই সেই কার্য হইতে নিবৃত্ত করা হয়।

প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ 'মনুষ্য মিথ্যা কথা প্রায়ই বলিয়া থাকে', 'অগ্নিহোত্র গৃহস্থের নিত্য-প্রাপ্ত', 'নাম ধরিয়াই পরস্পর পরস্পরকে প্রায় আবাহন করে', ইত্যাদি এই প্রকারে যে বিষয়-গুলি মনুষ্যের পক্ষে নিত্যপ্রাপ্ত, অথবা যাহা সে প্রায়ই অনুষ্ঠান করে, উক্ত শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণবাক্যে এতাদৃশ কতকগুলি বিষয়ই দীক্ষিত ব্যক্তির প্রতি নিষিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত বাক্যগুলি সহ একত্রই 'ন বেদে পত্নীং বাচয়তি' এই বাক্যটি পঠিত হইয়াছে। তাহাতে 'অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ হয় না'—এই ন্যায়বলে ইহাই নির্ণীত হয় যে, ধার্মিক পতি যে পত্নীর সহিত বেদ বিষয়ে আলোচনা করেন, বা তাঁহাকে যে বেদ পড়ান, দীক্ষাকালে তাহাই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এখন দেখুন, পত্নীর যদি বেদাধ্যয়নে অধি-কারই না থাকিত, তাহা হইলে স্বধর্মনিষ্ঠ পতি, যিনি সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তিনি কোন সময়েই পত্নীর সহিত বেদালোচনা করিতেন না বা তাঁহাকে বেদও পড়াইতেন না। আর শ্রুতিরও দীক্ষাকালে তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিষেধ করিবার কোন আবশ্যকতা থাকিত না। অতএব 'অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ হয় না', এই ন্যায়পুষ্ট 'ন বেদে পত্নীং বাচয়তি' এই শ্রৌতনিষেধ-লিঙ্গবলে (নিষেধাত্মক উক্ত শ্রুতিবাক্যের সামর্থ্যবলে) স্ত্রী-জাতির বেদাধ্যয়নে অধিকারই সিদ্ধ হইয়া পড়ি-তেছে। অথবা 'অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ' না হওয়ায় 'ন বেদে পত্নীং বাচয়তি' এই শ্রুতিবচনটি অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণবলে স্ত্রী-জাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার সিদ্ধ হইয়া পড়ে।

নৃসিংহতাপনীবাক্যও মাতৃজাতির বেদে অধিকারের নিবর্তক নহে

'সাবিত্রীং প্রণবং স্ত্রীশূদ্রায় নেচ্ছন্তি'—এই নৃসিংহপূর্বতাপনীবাক্য হইতেও মাতৃজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার নিবারিত হয় না, কারণ উক্ত উপনিষদের ৪।২ কণ্ডিকা ও তাহার ভাষ্য আলোচনা করিলে প্রতিভাত হয় যে—উক্ত শ্রুতিবাক্যটিতে বিশেষদেবতা-সম্বন্ধী একপ্রকার গায়ত্রী মন্ত্র এবং প্রণবসংযুক্ত 'মহালক্ষ্মী যজু-র্গায়ত্রী' নামক মন্ত্র স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। রাজসূয়যজ্ঞে অধিকার না থাকায় ব্রাহ্মণজাতির বেদে অনধিকার কল্পনার ন্যায়—কোন মন্ত্রবিশেষে অনধিকারবশতঃ মাতৃজাতির বেদে অনধিকার উক্ত বচনবলে কল্পনা করা হাস্যাস্পদ কল্পনামাত্র। 'ন স্ত্রীশূদ্রৌ বেদমধীয়া-তাম্' এবং 'স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাম্' ইত্যাদি বচন-দ্বয়ের ব্যবস্থা পরে প্রদর্শন করিতেছি।

'স্ত্রীজাতি নরকের দ্বার' এই আচার্যবাক্যের তাৎপর্য

কেহ কেহ যে আচার্যপাদ শঙ্করের 'দ্বারং-কিমেকং নরকস্য ? নারী'—এই বাক্যাবলম্বনে মাতৃজাতির বেদে অধিকারহীনতা ও আচার্য-পাদের মাতৃজাতিবিদ্বেষিত্ব প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করেন, সসম্মানে বলিব—ইহা তাঁহাদের দুঃসাহসমাত্র। তাঁহাদের এই সাহস সর্বথা উপেক্ষণীয় হইলেও আধুনিক শিক্ষিত সমাজে, বিশেষতঃ শিক্ষিতা মাতৃমণ্ডলীর মধ্যে আচার্য-পাদের এই উক্তিটি অবলম্বনে অত্যন্ত বিরূপ মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। তাহা নিরাকৃত হওয়া উচিত।

আচ্ছা, উক্ত মতাবলম্বিগণকে জিজ্ঞাসা করি : 'স্ত্রীজাতি নরকের দ্বার'—ইহাই আচার্য বলিয়াছেন,

কাহার পক্ষে নরকের দ্বার, তাহা কি বলিয়াছেন?' আধুনিকগণকে আরও জিজ্ঞাসা করিতেছি: 'বল, স্ত্রীজাতি কাহার নরকের দ্বার? তাহার নিজের?—একথা বলিতে পার না; কারণ নিজের অনিষ্ট কেহ নিজে করে না। আর স্ত্রীজাতি যদি নিজের নরকের দ্বার নিজেই হয়, তবে আচার্যের তাহা মুমুক্ষু শিষ্যকে বলিবার আবশ্যকতা কি? অনপেক্ষিত বিষয় অজিজ্ঞাসুকে বলা তো উন্মাদের লক্ষণ। আচার্য শঙ্কর উন্মাদ ছিলেন না নিশ্চয়ই। আচ্ছা, স্ত্রীজাতি কি অপরের নরকের দ্বার?—তাহাও বলিতে পার না, কারণ যে মাতৃজাতি আমাদিগের শরীর নির্মাণ ও তাহা পালন করিয়া আমাদিগের চতুর্বর্গলাভের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন, তাঁহারা আবার আমাদের নরকের দ্বার হইবেন কি প্রকারে? তাহা স্বীকার করিলে মাতৃজাতি আজ পর্যন্ত যত সন্তান প্রসব করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই নরকে গিয়াছেন এবং আমাদেরও যাইতে হইবে, রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ প্রভৃতিও বাদ যাইবেন না, ইহাই অঙ্গীকার করিতে হয়। ইহা হাস্যাস্পদ ও উপেক্ষণীয় কল্পনা। সুতরাং আচার্যবাণীর মর্মজ্ঞানহীন তুমি বলিতে পারিলে না—নারী কাহার নরকের দ্বার?

আবার দেখ, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'মায়া না মেয়ে, ত্রিভুবন দিলে খেয়ে'। বলতো, সন্ন্যাসী শঙ্কর না-হয় নারীজাতির উপর দ্বেষবশতঃ উক্ত প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু মাতৃমূর্তির পূজক মাতৃগতপ্রাণ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ এ কি বলিলেন। স্ত্রীজাতি তো উক্ত প্রকারে নিজদিগকেও খান না, আমাদিগকেও না। সুতরাং এই বাক্যসকলের তাৎপর্য কি? আচার্য শঙ্কর নিজের বাক্যের তাৎপর্য নিজেই বলিয়াছেন। তোমরা চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিয়াছ, কিছুই দেখিবে না। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, মুমুক্ষু শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'কোবাঽস্তি ঘোরঃ নরকঃ?'—ঘোর নরক কি? আচার্য উত্তর দিতেছেন, 'স্বদেহঃ'—নিজের শরীরই ঘোর নরক। আচ্ছা, 'দ্বারং কিমেকং নরকস্য?' —সেই নরকের একমাত্র দ্বার কি? আচার্য বলিলেন, 'নারী'। নারীই সেই দেহরূপ নরকপ্রাপ্তির, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুপ্রবাহে পতিত হইবার একমাত্র দ্বার। আচার্য এখানে কি বলিলেন? দেখ, স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন, 'কামিনীতে করে স্ত্রী-বুদ্ধি যে জন, হয় না তাহার বন্ধন-মোচন' (সন্ন্যাসীর গীতি)। এতদ্দ্বারা তিনি কি বলিলেন? ভোগ্যাবুদ্ধিতে রমণীতে যে আসক্তি, তাহাই বন্ধনের কারণ। বন্ধন কি? পুনঃ পুনঃ শরীর ধারণ করিয়া জন্মমৃত্যু ভোগ করা। এই শরীর কি? আচার্য শঙ্কর বলিলেন, 'নরক'। সুতরাং শরীরপ্রাপ্তিরূপ যে নরক, তাহার দ্বার কি? রমণীতে ভোগ্যাবুদ্ধিতে আসক্তি। ইহাই পুনঃ পুনঃ শরীরধারণরূপ নরকের কারণ। শ্রীরামকৃষ্ণের 'ত্রিভুবন দিলে খেয়ে' এই বাক্যের অর্থও এই প্রকারই বুঝিতে হইবে, যথা—নারীতে ভোগ্যাবুদ্ধিই মোক্ষমার্গ অবরুদ্ধ করিতেছে। স্বামীজী তো শ্রীশ্রীঠাকুরেরই ব্যাখ্যা। অতএব দেখা যাইতেছে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ভঙ্গীতে হইলেও পূজ্যপাদ লোকগুরুগণ একই কথা বলিয়াছেন, 'সব শিয়ালের এক রা'। মাতৃভক্ত আচার্য শঙ্করের উপর যে নারীদ্বেষিত্বের আক্ষেপ, তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত। আচার্য শঙ্করের এই বাক্যকে অবলম্বন করতঃ যাঁহারা মাতৃজাতিকে বেদে অনধিকারী প্রমাণ করিতে প্রয়াস করেন, তাঁহাদিগকে আমরা অজ্ঞ বলিয়াই মনে করিতেছি। এই বিষয়ে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

মাতৃজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার-প্রতিপাদক শ্রুতি স্মৃতি ও যুক্তিপ্রদর্শন

কিন্তু মাত্র পরপক্ষ কর্তৃক প্রদর্শিত প্রমাণ-সকলের নিরাকরণ করিলেই নিঃসন্দিগ্ধভাবে স্বপক্ষ সিদ্ধ হয় না। সেই হেতু মাতৃজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকারের সমর্থক কি কি প্রমাণ আছে, এক্ষণে আমরা তাহাই প্রদর্শন করিব। উপনয়ন-সংস্কারে যাঁহাদের অধিকার আছে, বেদাঙ্গবিহিত ক্রম ও স্বরাদিসহ বৈধ বেদাধ্যয়নে তাঁহারাই অধিকারী, ইহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীজাতির উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার-বোধক সাক্ষাৎ কোন শ্রুতিবাক্য আমরা পাইতেছি না। সম্ভবতঃ তাদৃশ কোন বাক্য শ্রুতিতে নাই, কারণ তাহার কোন আবশ্যকতাও নাই। কেন নাই? বলিতেছি। শাস্ত্রে অবিশেষভাবে সকলের জন্যই শ্রেয়স্কর পদার্থ বিহিত হয় এবং অশ্রেয়স্কর বিষয় নিষিদ্ধ হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। যদি তাহাতে কাহারও পক্ষে কোন বিশেষ বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে শাস্ত্রে তাহা বিশেষ বাক্যে পঠিত হয়। যেমন অর্থিত্ব ও সামর্থ্যরূপ অধিকারীর গুণযুক্ত হওয়ায় উপনয়ন-সংস্কারে শূদ্রেরও অধিকার প্রাপ্ত হইয়া পড়িলে 'বসন্তে ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত, গ্রীষ্মে রাজন্যম্, শরদি বৈশ্যম্' (তৈঃ ব্রাঃ ১।১।২।৬) ইত্যাদি বাক্যবলে উপনয়ন-সংস্কার বর্ণত্রয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, শূদ্রজাতি নিরাকৃত হইয়া পড়ে। অর্থিত্বাদিপ্রযুক্ত রাজসূয়-যজ্ঞ সকলের জন্য প্রাপ্ত হইয়া পড়িলে 'রাজা রাজসূয়েন যজেত' (আপস্তম্ব শ্রৌঃ ১৮।৮।১।৪) ইত্যাদি বাক্যবলে তাহা ক্ষত্রিয় জাতিতে সঙ্কুচিত হয়, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য নিরাকৃত হইয়া পড়ে। ত্রৈবর্ণিক স্ত্রী-জাতির উপনয়ন-সংস্কার-পক্ষে এতাদৃশ কোন বিশেষ নাই। সেই হেতু বর্ণত্রয়ের জন্য উপনয়ন-সংস্কার যে সাধারণ বচনসকলের বলে সিদ্ধ হয়, সেই সাধারণ বচনসকলের বলেই তত্তৎ বর্ণান্তর্গত স্ত্রীজাতিরও উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার সিদ্ধ হইয়া পড়ে।[১] সূত্রকার কাত্যায়নও বলিয়াছেন, 'স্ত্রী চাবিশেষাৎ' (১।১।৭) স্ত্রীজাতিও অধিকারী, কারণ (তাঁহাদের পক্ষে) কোন বিশেষ নাই।

যদি বলা হয়, 'অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত', 'তম্ অধ্যাপয়ীত' ইত্যাদি বাক্যে 'তম্' পদটি পুংলিঙ্গ 'তদ্' শব্দের রূপ। তাহা হইতে পুরুষেরই বেদাধ্যয়নে অধিকার সিদ্ধ হয়[২], স্ত্রী-জাতির নহে। সেই হেতু এই প্রবল শ্রুতিবাক্য-বলে 'স্ত্রী চাবিশেষাৎ' (কাঃ শ্রৌঃ ১।১।৭) এই পৌরুষেয় ব্যবস্থা বাধিত হইয়া পড়ে। ফলে তাহার বলে মাতৃজাতির বৈধ বেদাধ্যয়নে অধিকার স্থাপিত হইতে পারে না। তদুত্তরে বলা যায়, 'তম্ অধ্যাপয়ীত', ইহার অর্থ—'পুরুষকে বেদ অধ্যাপন করিবে' ইহাই উক্ত বেদবাক্যের সাক্ষাৎ অর্থ। 'স্ত্রীজাতিকে বেদ অধ্যাপন করিবে না'—ইহা তো উক্ত বেদবাক্যটির অর্থতঃ লব্ধ অর্থ, সাক্ষাৎ অর্থ নহে। একই বাক্যের উভয় প্রকার সাক্ষাৎ অর্থ অঙ্গীকার করিলে বাক্যভেদে দোষ হইয়া পড়িবে।[৩] আর এই যে বেদবাক্যের

১ শাস্ত্রদীপিকা-কারের মত আলোচনাকালে ইহা আমরা পরে প্রদর্শন করিব।

২ 'তম্ অধ্যাপয়ীত' এইস্থলে পুংলিঙ্গ তদ্‌শব্দ প্রযুক্ত হইলেও পুংলিঙ্গ বিবক্ষিত কি না—এই বিষয়ে ভট্টদীপিকা-কার ও শাস্ত্রদীপিকা-কারের মতভেদ আছে। ভট্টদীপিকা-কার বলেন—পুংলিঙ্গ বিবক্ষিত, সুতরাং পুরুষেরই অধিকার সিদ্ধ হয়, স্ত্রীজাতির নহে। শাস্ত্রদীপিকা-কার তাহা অঙ্গীকার করেন নাই। ইহা আমরা পরে আলোচনা করিব।

৩ একই বেদবাক্যের নানাপ্রকার অর্থ স্বীকার করাকে বলে 'বাক্যভেদ'। পৌরুষেয় বাক্যে ইঙ্গিতাদির দ্বারাও অর্থ প্রকাশিত হয় বলিয়া একই বাক্যের নানা অর্থ দোষাবহ নহে। অপৌরুষেয় বেদে ইঙ্গিতাদির কোন সম্ভাবনা না থাকায় একই বাক্যের নানা অর্থ অঙ্গীকৃত হয় না। কারণ তাহা হইলে কোন্‌টি বেদের যথার্থ অর্থ, তাহা নির্ণীত হইবে না, ফলে বেদই ব্যর্থ হইয়া পড়িবেন। এইহেতু বেদার্থনিরূপণে বাক্যভেদ একটি গুরুতর দোষ, ইহা উত্তরমীমাংসাশাস্ত্র সম্মত।

অর্থতঃলব্ধ অর্থ, ইহা পৌরুষেয় অর্থ, কারণ বেদ-বাক্যের অর্থ বিচার করিয়া এই প্রকার প্রাসঙ্গিক অর্থ পুরুষই কল্পনা করে। এই পৌরুষেয় অর্থ এবং মহর্ষি কাত্যায়ন কর্তৃক কথিত উক্ত পৌরুষেয় ব্যবস্থা, উভয়ই সমবল হইয়া পড়ে বলিয়া কেহ কাহাকেও বাধিত করিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে যাহার সমর্থনে অন্য প্রমাণ থাকিবে, তাহাই অপরকে বাধিত করিবে। ইহা পরে আলোচিত হইবে।

প্রসঙ্গতঃ এইস্থলে পুনরায় আশঙ্কা হয়—ইহাই যদি পরিস্থিতি হয়, অর্থাৎ বেদবাক্যের সাক্ষাৎ অর্থরূপে সমর্পিত না হইলে, তাহা যদি কোন কিছুর ব্যবস্থাপক, অথবা নিবর্তক না হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত 'বসন্তে ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত' ইত্যাদি উপনয়নবোধক বাক্যের অর্থতঃ লব্ধ— সুতরাং পৌরুষেয় অর্থবলে শূদ্র-জাতিকে উপনয়ন-সংস্কার, তথা বৈধ বেদাধ্যয়ন হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে কেন? শূদ্রজাতির উপনয়ন-সংস্কারের ও বেদাধ্যয়নের নিষেধপর সাক্ষাৎ কোন শ্রুতি-বাক্য তো নাই। তদুত্তরে বলা যায়—'বেদসন্ন্যাসতঃ শূদ্রঃ' (বাসিষ্ঠ সং ১০) —বেদত্যাগ করিলে [ব্রাহ্মণাদি জাতিরই] শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়। সুতরাং যে স্বেচ্ছায় বেদত্যাগ করিয়াছে, বেদাধ্যয়নের পক্ষে আবশ্যক উপনয়ন-সংস্কারে তাহার অধিকার শ্রুতি কি প্রকারে ব্যবস্থা করিবেন? আর যে ব্যক্তি বেদই ত্যাগ করিয়াছে, পিষ্টপেষণের ন্যায় বেদাধ্যয়নে তাহাকে নিষেধ করিবারই অজ্ঞাতজ্ঞাপিকা শ্রুতির আবশ্যকতা কি? উপরন্তু শূদ্রের উপনয়ন-নিরাকরণপর 'শূদ্রঃ একজাতিঃ' (মনু সং ১০। ১২৬), 'ন চ সংস্কারম্ অর্হতি' (ঐ ১০।৪) বহু স্মৃতিবচন আছে। উক্ত বাসিষ্ঠ বচন, এই সকল মনুবচন এবং 'বসন্তে ব্রাহ্মণম্' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থতঃ লব্ধ অর্থ, এই সকল মিলিত হইয়া শূদ্রের উপনয়ন-সংস্কারের অধিকারকে নিরাকরণ করে। পক্ষান্তরে মাতৃজাতির উপনয়ন-সংস্কারের সমর্থক বহু স্মৃতি এবং শ্রৌত লিঙ্গপ্রমাণ আছে, তাহা আমরা পরে প্রদর্শন করিতেছি। সেই সকল প্রমাণপুষ্ট উক্ত 'স্ত্রী চাবিশেষাৎ' এই কাত্যায়নোক্ত পৌরুষেয় ব্যবস্থা 'অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, তম্ অধ্যাপয়ীত' এই বেদবাক্য হইতে লব্ধ উক্ত পৌরুষেয় অর্থ হইতে বলবান্ হইয়া পড়িতেছে। ফলে তাহার বলে ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীজাতির উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার অবশ্যই সিদ্ধ হয়, এবং উপনয়নের উদ্দেশ্য বেদাধ্যয়ন।

(ক্রমশঃ)

আবির্ভাব

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

আনন্দের দীপ্ত ছটা বিকিরিয়া নিঃসীম আকাশে,
আসিয়াছ বিশ্বমাতা এ বিশ্বের সন্তানেরে স্মরি'!
তোমার বক্ষের স্নেহ দিকে দিকে মধুর আশ্বাসে,
মন্দাকিনী-ধারা সম ধরণীতে পড়িতেছে ঝরি'!

সন্তান-বৎসলা তুমি, দূরে কভু পার না রহিতে,
তাই ছুটে আসিয়াছ, জুড়াইছ মরু-তপ্ত প্রাণ !
করুণার মধু-স্পর্শ অজানিতে প্রাণে জাগাইতে,
আবেগে আকুলা হ'যে আপনারে করিয়াছ দান !

সংসারের কীর্ণতায় ভুলে থাকি তোমার মহিমা,
তবু নাই অভিমান, তবু নাই কিছু তব রোষ ;
ল'য়ে থাকি পঙ্ক-গ্লানি—বক্ষভরা কলুষ-কালিমা,
তবু ক্ষমা করিয়াছ, ভুলিয়াছ সন্তানের দোষ !

তোমার সমান কেহ নাহি মাগো, বিপুল ভুবনে,
তাই তব এত স্নেহ, তাই এত প্রাণের প্রেরণা !
প্রাণের সম্পদ তাই বিলাইতে চাহ জনে জনে,
তোমার বিপুল বক্ষে তাই এত জাগে উন্মাদনা !

তোমারে ভুলি মা মোরা, আমাদের তুমি নাহি ভোল',
বিশ্বময় রূপ ধ'রি আসো তুমি মোদের নিকটে।
আসো তুমি কত কাছে —করুণার দ্বার তব খোল',
জাগো তুমি অনিবার সুখে দুঃখে সম্পদে সংকটে।

মা তুমি, সন্তান মোরা—আসিযাছ দানিতে আশ্রয,
আসিযাছ সুধা-সিন্ধু—সুধা-স্বাদ মোরা যাতে পাই !
দাঁড়াযেছ পুরোভাগে করে ধরি বর ও অভয়,
চরণ বাড়াযে দে'ছ সকলেরে দিতে শান্তি-ঠাঁই !

জাগিয়াছ বিশ্বমাতা, আসিয়াছ মহাবিশ্ব জুড়ি',
আপনারে প্রকাশিছ স্থলে জলে নিঃসীম গগনে !
ডুবাইছ স্নেহ-রসে পাছে মোরা দুঃখানলে পুড়ি',
হইয়াছ অধিষ্ঠিতা সন্তানের জীবনে জীবনে !

প্রভাত যেমন হয়, কেটে যায় রাত্রির তিমির,
তেমনি সহজ হ'য়ে আসিয়াছ তুমি মা অধরা !
আসিয়াছ জগন্ময়ি, টুটি' সর্ব বাধার প্রাচীর,
নন্দনের রম্য দৃশ্যে ধন্যা তাই মৃত্তিকার ধরা !

কৃপার পথ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তোমার কৃপা, তোমার দয়া--
দয়াল, যে পথ দিয়ে আসে।
সেই পথই যে সরল সহজ
ঘুরি তাহার আশে পাশে।
মধুর তোমার বাঁশীর স্বরে
শুনি সকল বেদন হরে,
সুদূরকে হায় করতে নিকট—
সেই পথই তো ভালবাসে।

সাধন ভজন তপস্যাতে—
তোমার কাছে কঠিন যাওয়া,
তাহার চেয়ে ডাকাই ভাল,
তোমার তরে এ পথ চাওয়া।
সকল শক্তি যায় যে ক্ষয়ে,
কেউ ডাকে না, যায় না লয়ে,
কঠিন বড জটিল বড
জপ করিয়া তোমায় পাওয়া।

বলে, ও-সব দুর্গম পথ
হেঁটে খেটে দিবস গোঙা।
সাবা পথই কৃচ্ছ্র সাধন
উপবাস আর হোমের ধোঁয়া।
দুর্বলের পথ নয় ও মোটে
পদে পদে পাথর ফোটে,
ক্লান্ত কাতর দেহ ও মন—
পরশ-পাথর দেয় না ছোঁয়া।

পথ চিনি না, পথ জানি না—
বাজে না তো কই বাঁশরী?
অন্ধ বিল্বমঙ্গলের পথ--
হাত ধর, হাত ধর হরি!
এ পথে ভার আর কে লবে,
ডাকি তাই সর্ব-সম্ভবে,
নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হে—
অধমে লও আপন করি।

নব-উদ্বোধন

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সে বিশ্বাস কোথা গেল—শ্রেয় লাগি আত্মনিবেদন,
সে আশ্বাস কর্মযাগে ইষ্টনাম স্মরিয়া অন্তরে—
ক্ষণিক সুখের মোহ সবলে করিয়া বিসর্জন
আপনারে দেওয়া বলি সকলের কল্যাণের তরে।
কোথা গেল ব্রহ্মনিষ্ঠ স্থিতপ্রজ্ঞ সেই বীরগণ—
আশা ও ভরসা সব সমর্পিয়া যাহাদের 'পরে
দুর্গম জটিল পথ পার হব মোরা সাধারণ
যাদেরে চিনিয়া মোরা চিনে নেব পরম ঈশ্বরে।

স্বার্থের নিবিড় মেঘ অন্তরাল করেছে আকাশ,
তাই এত আত্মঘাত, পরস্পর তাই এ কলহ—
যাদের আদর্শে মোরা ভুলে যাব আত্ম-অবিশ্বাস,
কোথা তারা? চারিদিকে ঘনাইছে তম ভয়াবহ।
অভী-মন্ত্র দিয়ে যারা ভয়ার্তের ঘূচাইবে ত্রাস,
তাদের অভাব আজ বঙ্গদেশে হয়েছে অসহ।

* * *

কোথা নব ভারতের পথিকৃৎ শ্রীরামমোহন,
বেদান্তের মহাবাণী কে শোনাবে মায়ের ভাষায়,
পঞ্চোপনিষৎ-ধৃত ক্ষীরধারা করিয়া দোহন
ভারতে প্রতিষ্ঠা পুনঃ কেবা দিবে ব্রহ্মমহিমায়।

কোথায় ঈশ্বরচন্দ্র নিবারিতে নারীর পীড়ন,
কে সরাবে আবর্জনা অভিনব বিজ্ঞান-শিক্ষায়—
বামনের দেশে আজ কোথা পাব শালপ্রাংশু মন,
নির্ভয় করিবে সবে কাঁধে নিয়ে সকলের দায়।

কোথা প্রভু, রামকৃষ্ণ, বিদ্বানের সন্দেহ, সংশয়,
কুতর্কের বাক্যজাল কে ছেদিবে সরল বিশ্বাসে?
কে শিখাবে সেই ধর্ম, ঘোচে যাতে সর্বদ্বিধাভয়—
শুধু আত্মসমর্পণে পৌঁছে ভক্ত দেবতাসকাশে।
প্রচণ্ড জ্ঞানের বহ্নি হয় যবে চিত্তে জ্বালাময়
নিভে যাবে সব জ্বালা, কে শিখাবে, ভাল যদি বাসে॥

* * *

কোথায় বঙ্কিমচন্দ্র, মাতৃমন্ত্র কে গাহিবে আজ,
মৃন্ময়ে চিন্ময়-জ্ঞানে বন্দিবে কে দেশ-জননীরে—
শিখাবে সন্তান-ধর্ম পতিতের ঘুচাইতে লাজ,
'বন্দে মাতরং'-ডাকে মজ্জমানে ভিড়াইবে তীরে।

কোথায় শ্রীঅরবিন্দ দিব্যজীবনের অধিরাজ,
কার যোগ-তপস্যায় মর্ত্যভূমি স্বর্গ হবে ধীরে—
ক্রমশঃ দেবতা হ'য়ে উঠিবে এ মানব-সমাজ
কে বলিবে—দিব্য দীপ্তি শোভা পাবে মানুষের শিরে।

কোথায় বিবেকানন্দ, দিগ্বিজয়ী সে মহাসন্ন্যাসী,
'ওঠ, জাগ' যে বলিবে, 'প্রেয় ছেড়ে শ্রেয় কর সার'।
জীমূতনির্ঘোষে কার যুগান্তের জড়তা বিনাশি'
বহু রূপে জীব রূপে এক ব্রহ্মে চিনিয়া আবার
সেবাধর্মে দিব প্রাণ পতিত-অন্ত্যজে ভালবাসি,
পুনঃ নব-উদ্বোধনে ধন্য হবে এ বঙ্গ-সংসার॥

ভিড়িল কি ?

'বনফুল'

আকাশের অন্তহীন নীল পারাবারে
দেখিয়াছি দূর হ'তে আসিছে তরণী,
　　অন্ধকারে নিস্তব্ধ
　　শুনেছি দাঁড়ের শব্দ
উষায় দেখেছি তারে অরুণ-বরণী।

আধো-আলো-আঁধারিতে
সাগ্রহে উৎসুক চিতে
　　সন্ধ্যার আকাশে
দেখেছি নয়ন ভরি'
সে অপূর্ব আশা-তরী
　　সোনার সাগরে যেন ভাসে।

গভীর নিশীথকালে
লাগায়ে জ্যোৎস্নার পালে
　　দক্ষিণা পবন
সে তরণী ভেসে ভেসে
এসেছে মানস দেশে
　　পুলকিয়া সর্ব দেহমন।

ভেবেছি উন্মুখচিতে
এল কি আশ্বাস দিতে
　　সিদ্ধিদাতা প্রসন্ন গম্ভীর ?
শক্রুরে করিয়া জয়
আনিল কি বরাভয়
　　কার্ত্তিকেয় বীর ?

আনন্দে আশায় মগ্ন
দেখেছি যাহার স্বপ্ন
　　আকাশ-বিরাটে,
সে স্বপ্ন-তরণীখানি
লয়ে শক্তি, লক্ষ্মী, বাণী
　　ভিড়িল কি আমাদেরই ঘাটে ?

'জ্যান্ত দুর্গা'

শ্রীমতী শোভা হুই

শ্রীভগবান যখন নররূপে অবতীর্ণ হন তখন শক্তিও প্রায়ই নারীবেশে তাঁহার সহগামিনী হন, শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সীতাদেবী, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকা, বুদ্ধদেবের সহিত যশোধরা, শ্রীচৈতন্যের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়ার আগমনই ইহার প্রমাণ। শক্তিরই লীলা। শক্তিকে বাদ দিলে অবতারের জীবন ও বাণী আমাদের নিকট অবোধ্য হইয়া পড়ে। অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তির ন্যায় অভিন্ন ঈশ্বর ও ঈশ্বর-শক্তির শরীর-গ্রহণ একই উদ্দেশ্যে, একই কালে, একই নিয়মে হইলেও উহার কার্য পুরুষ-দেহাবলম্বনে একপ্রকার এবং নারী-দেহাবলম্বনে অন্যপ্রকার হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী আশ্বাস দিয়াছেন :

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।

তদা তদাঽবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।

—এইরূপে যখনই দানবগণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, তখনই আমি আবির্ভূতা হইয়া শত্রু বিনাশ করিব। পুরাকালে অত্যাচারী দানবকুলের ধ্বংস-সাধন প্রয়োজন ছিল, কিন্তু অসুরদিগের তাণ্ডবলীলা শুধু বহির্জগতে সীমাবদ্ধ নয়, অন্তর্জগতে অবিরাম কুবৃত্তি ও সুবৃত্তির যে সংগ্রাম চলিতেছে তাহাও দেবাসুর-সংগ্রাম।

বর্তমান যুগে ভোগপরায়ণতা, অশ্রদ্ধা, জড়বাদপ্রিয়তা, পরধনলিপ্সা, প্রভৃতি আসুরিক প্রবৃত্তি বাড়িয়াই চলিয়াছে। যাহার ফলে ধর্মের গ্লানি, অধর্মের বৃদ্ধি, হিংসা, দ্বেষ, লোকক্ষয়কারী যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদিতে মানবকুল আতঙ্কিত, হত-চকিত, বিভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মের অধোগতি যেমন চরম হইয়াছে, শক্তির অবতরণও তেমনি এবার সর্বোত্তম হইয়াছে। এই সাক্ষাৎ শক্তির পূজার ভিতর দিয়াই নবীন সভ্যতার ভিত্তিপত্তন হইবে—শ্রীরামকৃষ্ণ যেন তাহাই দেখাইয়া গেলেন।

* * *

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী সেই মহাশক্তির মানবী মূর্তি, মা আনন্দময়ী, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় 'জ্যান্ত দুর্গা'।

শ্রীশ্রীমা সংসারলীলায় দুহিতা, ভগিনী, বধূ, গৃহিণী, মাতা রূপে আদর্শের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহ্যশক্তি, ধৈর্য, ক্ষমা এবং করুণার অন্ত ছিল না।

শ্রীশ্রীমায়ের সাংসারিক জীবন ছিল অবিশ্রান্ত কর্মপ্রবাহে গতিময়। তাঁহার লৌকিক সংসার ছিল না, কিন্তু জগৎ তাঁহার আপনার—অতএব সকলকে লইয়াই তাঁহার সংসার।

ভাই-ভাজের সংসারে ঝগড়া-ঝাঁটির অন্ত ছিল না, পাগলী ভাজ—যাহা মুখে আসিত তাহাই বলিত। শ্রীশ্রীমায়ের অর্থ সাহায্যেই সংসার চলিত, অথচ তাঁহাকেই সকলে কথা শুনাইত, আর রাধুর জ্বালার তো অন্ত ছিল না। সকল জ্বালা, সকল যন্ত্রণা শ্রীশ্রীমা নীরবে সহ্য করিয়া গিয়াছেন।

কেবলমাত্র একদিন জয়রামবাটীতে উত্ত্যক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'ছাখ্, তোরা আমাকে বেশী জ্বালাতন করিসনি, এর ভেতর যিনি আছেন, যদি একবার ফোঁস করেন তো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—কারও সাধ্য নেই যে তোদের রক্ষা করে।'

আর একবার কোয়ালপাড়ায় রাধুর অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'দেখ, এ শরীর (নিজের শরীর দেখাইয়া) দেব-

শরীর জেনো, এতে আর কত অত্যাচার সহ্য হবে? মানুষ কি এত সহ্য করতে পারে?··· দেখ, আমি থাকতে এরা কেউ আমাকে জানতে পারবে না, পরে বুঝবে সব।'

দেবী হইয়া মানবীরূপে অবতীর্ণা শ্রীশ্রীমাকে সাধারণ লোকে কি করিয়া বুঝিবে, যদি তিনি স্বয়ং না বুঝাইয়া দেন? ভগবতী এসেছেন নরলোকে মানুষকে প্রেম-ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি অল্প, এই জন্যই তাঁহার পূর্ণ ভগবৎ-সত্তা আবৃত রাখিতে হয় তাহাদেরই কল্যাণে। সৌভাগ্যবান্ দু-চার জনের নিকটেই তিনি ধরা দেন।

শুধু কি সংসার? ভক্তের উৎপাতও তিনি বহু সহ্য করিয়াছেন। দূর দেশ হইতে আগত কোন ভক্ত আসিয়াই আবদার ধরিলেন, ধূলাপায়ে মায়ের পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিবেন না। অতএব সকল কর্ম ফেলিয়া মাকে পিঁড়ির উপর দাঁড়াইতে হইল। ভক্তটি ভক্তি-অর্ঘ্য অর্পণ করিলেন। তাহার পর মা ছুটিলেন তাঁহারই আহারের ব্যবস্থা করিতে।

একজন আবদার ধরিলেন, মায়ের প্রসাদ তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতে হইবে। মা খাওয়াইয়া দিলেন, আবদার রক্ষা হইল।

আর এক ভক্ত মাকে ধরিলেন, মৃত্যুসময়ে তিনি যেন নিজে আসেন। ভক্তের পীড়াপীড়িতে মা সম্মত হইলেন।

এক ভক্ত প্রণামের সময় মায়ের পায়ের আঙুলে জোরে মাথা ঠুকিয়া দিলেন, উদ্দেশ্য মা যেন তাঁহাকে মনে রাখেন। সদানন্দময়ী মা পরবর্তীকালে এই কথা লইয়া পরিহাস করিতেন।

উদ্বোধনে একবার এক ভক্ত লজ্জাপটাবৃতা মাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিতেছে, স্তব-স্তুতি করিতেছে, এদিকে মা গরমে ঘামিয়া গিয়াছেন। গোলাপ-মা আসিয়া ভক্তটিকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'এ কি মাটির না পাথরের ঠাকুর পেয়েছ?'

নানা রকম ভক্তের নানা প্রকার অত্যাচার! একটি ভক্ত মায়ের অন্নপ্রসাদ শুকাইতে দিয়া বাহিরের ঘরে ঘুমাইয়া পড়িলেন, আর মা বিশ্রাম না করিয়া দ্বিপ্রহরে বসিয়া বসিয়া কাক তাড়াইলেন। বেলা তিনটার পর ভক্তটির ঘুম ভাঙিল। তিনি আসিয়া দেখেন, মা সেই ভাবে বসিয়া আছেন। ইহাতে মায়ের কোন অসন্তোষ নেই। ভক্তটি আসিতে বলিলেন, 'বাবা, তোমার ঐটি নিয়ে বসে আছি।'

করুণাময়ী মা করুণায় বিগলিতা। পাপী, তাপী, ব্যাধিগ্রস্ত—যে কেহ তাঁহার সামনে আসিয়াছে, নির্বিবাদে, নির্বিচারে সকলকে তাঁহার পদে স্থান দিয়াছেন, অসুস্থ শরীরেও তিনি কাহাকেও কৃপা হইতে বঞ্চিত করেন নাই। ইতরপ্রাণী, পশু-পক্ষীও তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত নয়; কাহারও কষ্ট তিনি দেখিতে পারিতেন না। উচ্চ নীচ তাঁহার নিকট ভেদ ছিল না। সন্তানের মঙ্গলের জন্য অসুস্থ শরীরেও অধিকাংশ সময় জপ করিতেন। সেবক অনুযোগ করিলে বলিতেন, 'কি ক'রব বাবা, ওদের জন্যে না ক'রে থাকতে পারি না। আমারই সন্তান—কে কোথায় আছে, কিছু হয়তো করতে পারছে না, আমাকেই তো দেখতে হবে।'

এই সব লক্ষ্য করিয়া স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম মহারাজ) বলিয়াছিলেন, 'তোমরা দেখেই তো এলে, রাজরাজেশ্বরী মা কেমন সাধ ক'রে কাঙালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন মাজছেন, চাল ঝাড়ছেন, ভক্তদের এঁটো পরিষ্কার করছেন। তিনি অত কষ্ট করছেন গৃহীদের গার্হস্থ্যধর্ম শেখাবার জন্য। কি অসীম ধৈর্য, অপরিসীম করুণা, আর সম্পূর্ণ অভিমান-রাহিত্য।' এক পত্রেও *তিনি লিখিয়াছিলেন: শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? ঐশ্বর্যের লেশ নেই।*···

শুদ্ধচিত্ত আধার কোন কোন ভাগ্যবান্ শ্রীশ্রীমাকে জগদ্ধাত্রীরূপে, গৌরীরূপে, কালীরূপে দর্শন করিয়াছেন। কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত এক ভক্তকে মা তাহার ইষ্ট-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শুনাইতে বলিলেন। মায়েব আদেশ পালন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে তাঁহাকে অশেষমহিমান্বিত শ্রীদুর্গারূপে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল।

কলিকাতার পথে শ্রীশ্রীমা বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে গাড়ীর অপেক্ষায় বসিযাছিলেন, এমন সময় এক পশ্চিমা কুলি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিল এবং বলিল : 'তু মেরী জানকী' —কতদিন ধরে তোমায় খুঁজছি, এতদিন কোথায় ছিলে ?

কখন কখন শ্রীশ্রীমায়ের মুখে স্বীয় ভগবৎ-স্বরূপ ব্যক্ত হইয়া পড়িত। একদিন এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, ঠাকুর যদি স্বয়ং ভগবান্ হন, আপনি তাহলে কে ?' মা বলিলেন, 'আমি আব কে, আমিও ভগবতী'। জগদম্বা আশ্রমে কেদার-দাদা একদিন মায়েব সঙ্গে কথা বলিতেছেন, অদূরে বটতলায় ঢাক পিটাইয়া ষষ্ঠীপূজা দিতে লোকজন আসিয়াছে, কথাবার্তায় অসুবিধা হওয়ায় কেদার-দাদা, বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'আঃ থাম্ না রে বাপু'। অমনি মা বলিয়া উঠিলেন, 'ওকি কেদার, সবই যে আমি, তুমি বিরক্ত হচ্চ কেন ?'

একদিন মা পুরাতন বাড়ীর বারান্দা ঝাঁট দিতেছিলেন, এমন সময় এক ভিখারী হাঁকিল, 'মাগো, ভিক্ষা পাই গো'। ভিখারীর কণ্ঠ শুনিয়া মা আপন মনে 'আর পাচ্চি না, অনন্ত হাতে কাজ করেও শেষ করতে পাচ্চি না'— বলিয়াই থামিয়া গেলেন। অদূরে বসিয়া এক ভক্ত জলখাবার খাইতেছিলেন, তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'ছাখ তো, আমার দু হাত, আমার আবার অনন্ত হাত বলচি' ? হাসিতে হাসিতে মা আবার ঝাঁট দিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীমা না আসিলে গিরিশবাবুর দুর্গাপূজা হইত না। বাবুরাম মহারাজের মাতা আঁটপুরে দুর্গাপূজা করিতেছেন শুনিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন, 'বাবুরাম-দার মায়ের কি বুদ্ধি। জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির প্রতিমাপূজা।'

'ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিঃ'

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায

তুমি বৈষ্ণবী পালনী শক্তি
বিশ্বের বীজ পরমা মায়া,
তুমিই তৃষ্ণা, তুমিই তৃপ্তি,
তুমিই রৌদ্র, তুমিই ছায়া।

তোমার খড়্গ শুভ হোক মাগো
অসুরদলনে ত্রিশূল হানো,
হে বরদাত্রি হে মহারাত্রি
নিখিল বিশ্বে অভয় দানো॥

ষষ্ঠীদেবী

অধ্যাপক শ্রীসৌবীন্দ্রকুমার দে

বাংলার দেবদেবীর ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনুসন্ধান সহজ নয়। শুধু বাংলার কেন জগতের সর্বত্রই দেবদেবীর রূপ ও কল্পনার পিছনে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে যুগ-যুগান্তের কত ধ্যান-ধারণা, কত বিশ্বাস, জড়িয়ে আছে কত বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাবধারার মিলন-সংঘাতের ইতিবৃত্ত।

ষষ্ঠীদেবী ষোড়শ-মাতৃকার অন্যতমা। শিশুদের প্রতিপালনই এই দেবীর কাজ। এঁরই প্রসাদে মর্ত্যবাসীদের পুত্রপৌত্রাদি লাভ হ'য়ে থাকে। ইনি কার্তিকের ভার্যা এবং প্রকৃতির ষষ্ঠীকলা। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে ষষ্ঠীদেবীর পরিচয় সম্বন্ধে আছে :

প্রধানাংশস্বরূপা যা দেবসেনা চ নারদ।
মাতৃকাসু পূজ্যতমা সা ষষ্ঠী পরিকীর্তিতা॥
শিশূনাং প্রতিবিশ্বেষু প্রতিপালনকারিণী।
তপস্বিনী বিষ্ণুভক্তা কার্তিকেয়স্য কামিনী॥
ষষ্ঠাংশরূপা প্রকৃতেস্তেন ষষ্ঠী প্রকীর্তিতা।
পুত্রপৌত্রপ্রদাত্রী চ ধাত্রী ত্রিজগতাং সতী॥

সূতিকাগারে শিশু জন্মাবার ষষ্ঠদিন রাত্রে ষষ্ঠীদেবীর পূজার বিধি আছে। একে সূতিকা ষষ্ঠী বা গ্রামাঞ্চলে 'ষেঠের বা ষেঠেরা পূজা' বলে। কোন কোন ক্ষেত্রে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার একুশদিন বা একত্রিশ দিন পরে, আবার কোথাও বা মাসান্তে সূতিকাশৌচ অপনোদনের পর ষষ্ঠী-পূজা হ'য়ে থাকে। বিবিধ উপচার, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি সহ ষষ্ঠীদেবীর পূজাপদ্ধতি বিস্তৃতভাবে অবশ্য বর্তমান প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লেখ করবার অবকাশ নেই, কৃত্যতত্ত্ব, তিথিতত্ত্ব প্রভৃতিতে তা বিশদ লিপিবদ্ধ আছে। দেবীর পবিত্র রূপ সম্বন্ধে ধ্যানমন্ত্রে আছে :

ষষ্ঠাংশাং প্রকৃতেঃ শুদ্ধাং সুপ্রতিষ্ঠাঞ্চ সুপ্রভাং
সুপুত্রদাঞ্চ শুভদাং দয়ারূপাং জগৎপ্রসূং।
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাং
পবিত্ররূপাং পরমাং দেবসেনামহং ভজে॥

নানা বিঘ্ন থেকে শিশুদের রক্ষা করবার শক্তিও দেবীর কম নয়, এর পরিচয় প্রণাম-মন্ত্রের মধ্যে অনেকখানি পরিস্ফুট। মন্ত্রের এক স্থানে আছে :

ওঁ ধাত্রী ত্বং কার্তিকেয়স্য ষষ্ঠীদেবীতি বিশ্রুতা।
দীর্ঘায়ুষ্টঞ্চ নৈরুজ্যং কুরুষ মম বালকে॥
জননীং সর্বভূতানাং সর্ববিঘ্নক্ষয়ঙ্করী।
নারায়ণস্বরূপেণ মৎপুত্রং রক্ষ সর্বতঃ॥
ভূতদৈত্যপিশাচেভ্যো ডাকিনীভ্যোঽপি সঙ্কটাৎ।
সুতং মেঽস্য শুভং দত্বা রক্ষ দেবী নমোঽস্তুতে॥

দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ ষষ্ঠীর নাম : বৈশাখে চন্দনষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠে অরণ্যষষ্ঠী, আষাঢ়ে কর্দমষষ্ঠী, শ্রাবণে লুণ্ঠনষষ্ঠী, ভাদ্রে চাপেটি ষষ্ঠী, আশ্বিনে দুর্গাষষ্ঠী, কার্তিকে নাড়ীষষ্ঠী, অগ্রহায়ণে মূলক-ষষ্ঠী, পৌষে অন্নষষ্ঠী, মাঘে শীতলষষ্ঠী, ফাল্গুনে গোরূপিণী ষষ্ঠী এবং চৈত্রে অশোকষষ্ঠী। এদের মধ্যে কতকগুলি আবার খুবই প্রচলিত। যেমন জ্যৈষ্ঠে অরণ্যষষ্ঠী, এই ষষ্ঠী সাধারণতঃ জামাই-ষষ্ঠী নামেই সুপরিচিত। ভাদ্রে শুক্লাষষ্ঠী অক্ষয়-ষষ্ঠী নামেই প্রসিদ্ধ। এই দিনে স্নানদানাদি অনুষ্ঠান অক্ষয় হ'য়ে থাকে। চৈত্রে অশোকষষ্ঠীর অপর নাম স্কন্দষষ্ঠী, এই তিথিতে কার্তিকপূজা করলে শুধু সৌভাগ্যই নয়, বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি পর্যন্ত হয়।

সাধারণতঃ ষষ্ঠীদেবীর মূর্তির পূজার কোন বিধি নেই। তবে কোথাও প্রতিমা পূজা হ'লে প্রতিমা জলে বিসর্জন দিতে বড় দেখা যায় না, অশ্বত্থগাছের তলায় ঐ প্রতিমা রেখে

আসবার প্রথা প্রচলিত। দেবীর পূজার শেষে, দেবীর বাহন কৃষ্ণমার্জার ও অশ্বত্থগাছের পূজারও বিধি আছে।

ষষ্ঠীদেবীর পূজার প্রথম প্রবর্তনা সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে সুন্দর একটি উপাখ্যান পাওয়া যায়: স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তপস্যানিরত রাজা প্রিয়ব্রত ব্রহ্মার আদেশে দারপরিগ্রহ করেন। ক্রমে পত্নীর সন্তান-সম্ভাবনায় আশাহীন হ'য়ে তিনি কশ্যপ মুনির দ্বারা 'পুত্রেষ্টি' যজ্ঞ ক'রে যজ্ঞের চরু পত্নীকে ভোজন করান। যথাসময়ে রাণী পুত্র প্রসব করলেন, কিন্তু মৃতপুত্র। শিশুকে শ্মশানে নেওয়া হ'লে সহসা উজ্জ্বল বিমানে ক'রে এক দেবী আবির্ভূতা হলেন। রাজার প্রশ্নে দেবী উত্তর দিলেন যে তিনি ব্রহ্মার মানস-কন্যা, কার্ত্তিকের ভার্যা, মাতৃকার মধ্যে শ্রেষ্ঠা, এবং প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ সম্ভূতা ব'লে ভূমণ্ডলে ষষ্ঠীদেবী নামেই সুপরিচিতা। দেবী মৃত শিশুকে সঞ্জীবিত করলেন এবং রাজা প্রিয়ব্রত, ত্রিলোকের মধ্যে তাঁর পূজা প্রতিষ্ঠা করবেন—এই শর্তে রাজাকে পুত্র সমর্পণ ক'রে দেবী অন্তর্হিতা হলেন। সেই থেকেই প্রতি মাসে শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে ষষ্ঠীপূজা হ'য়ে আসছে।

পুরাণাদির মধ্যে, নানা দেবদেবীর সঙ্গে ষষ্ঠীদেবীকে সগৌরবে অবস্থান করতে দেখা গেলেও এঁকে কিন্তু বৈদিক বা পৌরাণিক দেবদেবীর গোষ্ঠীভুক্ত করা সঙ্গত হবে না। সম্ভবতঃ ইনি প্রাক্-আর্যসমাজ-সম্ভূতা মনসা, শীতলা, জাঙ্গুলী, বনদুর্গা, সুবচনী, বাসুলী, করমপুরুষ প্রভৃতি দেবদেবীদেরই সমগোত্রীয়া। দেশে দেশে লৌকিক দেবদেবীর পূজা-প্রচলনের ইতিহাস অনুসন্ধান ক'রে দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষের দুর্বলতাকে আশ্রয় ক'রে নানা লৌকিক দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে। এই ভাবেই সন্তান-কামনায় এবং সন্তানের মঙ্গলার্থে মাতা বা মাতামহীর দুর্বলতা আশ্রয় ক'রে ষষ্ঠীদেবীও হয়তো একদিন প্রকৃতির প্রজনন-শক্তির উপাসক বাংলার অনার্য আদিবাসীদের সমাজে আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

ক্রমে খৃঃ পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতকে আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবাহ যখন প্রবলতর হ'য়ে বাংলায় প্রবেশ ক'রল, তখন আর্য সংস্কৃতি তৎকালীন বাংলার অনার্য সংস্কার ও দেবদেবীদের মেনে নিতে প্রথমতঃ অস্বীকারই করেছিল। তবে সেই আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সংঘাতের মধ্যেও যে সব লৌকিক দেবদেবীরা আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ক্রমশঃ তাদের স্বীকার না ক'রে পারেনি। এইভাবে অনুমান করা যায় যে খৃঃ তৃতীয় শতক থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ গড়ে-ওঠা পুরাণগুলির মধ্যে বাংলার আদিবাসীদের যে-সব দেবদেবীরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্বীকৃতি ও অনুমোদন লাভ ক'রে ঐ ধর্মের কুক্ষিগত হ'য়ে পড়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ষষ্ঠীদেবীও একজন। ষষ্ঠীদেবী যে বাংলারই নিজস্ব দেবী—তার ইঙ্গিত ষষ্ঠীদেবীর ব্রতানুষ্ঠান ও পূজার উপচারগুলির মধ্যেও অনেকখানি লক্ষ্য করা যেতে পারে। বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু ক'রে পরবর্তী ধর্মশাস্ত্রাদির মধ্যেও এ জাতীয় ব্রতানুষ্ঠানাদির সন্ধান পাওয়া যায় না।

অন্যদিকে আবার সাংস্কৃতিক জনতত্ত্বের গবেষণায় এই তথ্যই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে, বর্তমানে বাংলার নারীসমাজের মধ্যে যে-সব ব্রতানুষ্ঠান ও স্ত্রী-আচার আজও বর্তমান, সে-গুলির অধিকাংশই অবৈদিক ও অব্রাহ্মণ্য এবং বাংলার গ্রাম্য সংস্কৃতির সঙ্গে একান্ত সম্পৃক্ত। এ প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ষষ্ঠীদেবীর পূজা ও ব্রতানুষ্ঠান অধিকাংশ ক্ষেত্রে

মেয়েরা নিজেরাই ক'রে থাকেন। ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য অপরিহার্য নয়। পুরাণে অনার্য দেবদেবীদের স্বীকৃতির সময় থেকেই হয়তো ব্রাহ্মণেরা ষষ্ঠীপূজাদিতে হস্তক্ষেপ করেছেন। এ অনুমান যে মিথ্যা নয়, তার প্রমাণ: যে সকল ব্রাহ্মণ প্রথম অনার্য দেবদেবীদের পূজা-অনুষ্ঠানাদিতে পৌরোহিত্য করতেন, আর্য সংস্কৃতি তাদের ব্রাত্য বলেই একঘরে করতে চেয়েছিল এবং মনুও তাঁদের 'পতিত' বলেই আখ্যা দিয়েছেন। এটি অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক তথ্য।

সে যাই হোক, ষষ্ঠীদেবী বাংলাদেশের বহু-পূজিতা সুপ্রাচীন দেবদেবীদেরই একজন। শুধু তাই নয়, বাহ্য আড়ম্বর না থাকা সত্ত্বেও হিন্দুধর্মের সম্প্রদায়-নির্বিশেষে তিনি যেভাবে বাংলার ঘরে ঘরে অধিষ্ঠিতা হ'য়ে আছেন, তাতে তাঁর কম গৌরব বা প্রতিষ্ঠার কথা নয়, এবং মানুষের যে বিশিষ্ট বিশ্বাসবোধের উপর তিনি প্রতিষ্ঠিতা, তাতে তাঁর আসন যে সহজে বিচলিত হবে না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।*

* কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রের সৌজন্যে

পঞ্চায়ুধ-জাতক

শ্রীমতী বেলা দে

দান, দয়া, প্রেম ও অহিংসার বাণী প্রচার করেছিলেন ভগবান বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধদেব, তিনি পূর্ব পূর্ব জীবনের বহু ঘটনাই তাঁর শিষ্য-দের গল্পচ্ছলে বলতেন। এগুলিকে 'জাতক' বলা হয়। সেই ধরনের একটি জাতকের গল্প পঞ্চায়ুধ-জাতক।

একবার বোধিসত্ত্ব বারাণসী-রাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। জাতকের নামকরণ-দিনে রাজা আট-শ ব্রাহ্মণকে ডেকে এনে প্রচুর খাদ্য ও মহামূল্য দানসামগ্রী উপহার দিলেন এবং জাতকের ভাগ্য কেমন হবে, জানতে চাইলেন। ব্রাহ্মণগণ জাতকের দেহে সর্ববিধ সুলক্ষণ দেখে বললেন, 'এই কুমার সর্বগুণান্বিত রাজা হবেন। পঞ্চবিধ আয়ুধ বা অস্ত্রের প্রভাবে সমস্ত জম্বু-দ্বীপে কেউ আর এঁর সমকক্ষ ব'লে গণ্য হবে না।' ব্রাহ্মণদের মুখে কুমার-সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্-বাণী শুনে পিতামাতা কুমারের নাম রাখলেন পঞ্চায়ুধকুমার।

কুমার যখন বড় হ'তে লাগল, রাজা একদিন পুত্রকে ডেকে বললেন, 'গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিলা নগরে এক সুবিখ্যাত আচার্য আছেন। তুমি হাজার মুদ্রা দক্ষিণা নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে বিদ্যাভ্যাস ক'রে এস।

পিতার কথায় পঞ্চায়ুধকুমার তক্ষশিলা চলে গেলেন। কিছুকাল তথায় বিদ্যাভ্যাস ক'রে সর্ববিদ্যানিপুণ হ'য়ে যখন তিনি বারাণসী ফিরে আসবেন, তখন আচার্য তাঁকে পঞ্চবিধ আয়ুধ দান করলেন। পঞ্চায়ুধকুমার গুরুর আশীর্বাদ এবং পঞ্চবিধ আয়ুধ নিয়ে এক বনপথ দিয়ে বারাণসীর দিকে এগোতে লাগলেন। ঐ বনে এক ভীষণ যক্ষ বাস ক'রত। পথিকরা পঞ্চায়ুধ-কুমারকে বারবার সাবধান ক'রে দিল, তারা ব'লল, 'এই বনে যে যক্ষ বাস করে সে মানুষ দেখলেই মেরে ফেলে, কাজেই এই বনপথে এগোবেন না।' পঞ্চায়ুধ তাদের কথায় ভয় না পেয়ে, নিজের শক্তির কথা মনে রেখে সেই বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। দুঃসাহসী মানুষকে একাকী বনের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে ভীষণ মূর্তি ধ'রে যক্ষ এগিয়ে এল। তার দেহ শাল-গাছের মতো, মাথা চিলেকোঠার মতো, চোখ

দুটি গামলার মতো, উপরের দাঁত দুটো মুলোর মতো, মুখ বাজপাখীর মতো, হাতপায়ের রং নীল আর উদরের রং বিচিত্র।

এই বেশে পঞ্চায়ুধকুমারের সামনে এসে যক্ষ ব'লল, 'কোথায় যাচ্ছ, দাঁড়াও, তুমি তো আমার খাদ্য।' যক্ষের কথায় পঞ্চায়ুধকুমার ভয় পেলেন না। তিনি বললেন, 'তুমি যক্ষ হ'তে পার, কিন্তু সাবধানে আমার কাছে এস। আমি আমার বল বুঝেই এই বনে ঢুকেছি। মনে রেখ, আমার যে কোন একটি তীর দ্বারা তোমায় আঘাত করলে এখুনি তোমার মৃত্যু হবে।'

এই ব'লে কুমার যক্ষের দিকে এক অতি বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য—এই তীর যক্ষের দেহ স্পর্শও ক'রল না। বরং তা যক্ষের দেহের রোমের সঙ্গে আটকে রইল। কুমার তখন একে একে পঞ্চাশটি শর নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু সব তীরই আগের মতো যক্ষের রোমের মধ্যে আটকে রইল। তখন যক্ষ একবার গা ঝাড়া দিল, আর ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে সব তীরগুলি তার দেহ থেকে মাটিতে পড়ে গেল।

এদিকে যক্ষ ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে—কুমারকে সে খাবে। কুমার তাঁর যে সমস্ত অস্ত্র সম্বল ছিল, একে একে সবগুলিরই ব্যবহার করলেন, কিন্তু কিছুই হ'ল না, তখন তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন যক্ষের উপর। ডান হাত দিয়ে যখন আঘাত করলেন, তখন তাঁর ডান হাত যক্ষের রোমে আটকে গেল। তারপর বাঁ হাত, ডান পা, বাঁ পা এবং শেষ পর্যন্ত মাথা দিয়ে আঘাত করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত, পা, মাথা সমস্ত যক্ষের রোমে আটকে গেল। কুমার যক্ষের দেহে ঝুলতে লাগলেন। কিন্তু তখনও তাঁর মনে ভয় জাগেনি।

কুমারের এই অদ্ভুত সাহস দেখে যক্ষ অবাক্ হ'ল। এতদিন ধ'রে সে মানুষ ধ'রে ধ'রে খাচ্ছে, কিন্তু কোন মানুষই তো এতটা সাহস দেখায়নি। যক্ষের নিজের মনেও একটু ভয় হ'ল—সে পঞ্চায়ুধকুমারকে খেতে সাহস ক'রল না. তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রল, 'তোমার প্রাণে ভয় নেই কেন? মৃত্যুকেও কি তুমি ভয় কর না?' নির্ভয়চিত্তে কুমার উত্তর দিলেন, 'মরণকে ভয় ক'রে লাভ কি? জন্ম হলেই মরণ হবে—এ তো নিশ্চিত, তবে আর ভয় কেন? আর তুমিও মনে রেখ, আমাকে খেলেও তুমি নিষ্কৃতি পাবে না। আমার উদরে যে বজ্রায়ুধ আছে, তা হজম করবার ক্ষমতা তোমার নেই। ঐ অস্ত্রগুলি তোমার পেটের নাড়ীভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলবে, কাজেই আমার মৃত্যু হ'লে তোমারও মৃত্যু হবে।' কুমারের কথা শুনে যক্ষ ভয় পেল। তার মনে হ'ল কুমারের কথাই সত্যি। এই ভেবে সে কুমারকে ছেড়ে দিয়ে ব'লল, 'তোমাকে মুক্তি দিলাম, তুমি দেশে ফিরে যাও।' তখন কুমার বললেন, 'আমি তো মুক্তি পেলাম, কিন্তু তোমার মুক্তির উপায় কি হবে? এমনি ক'রে যদি জীবন কাটাও আর তবে কোন জন্মেই তুমি মুক্তি পাবে না।

এই ব'লে কুমার যক্ষকে দান, দয়া, অহিংসা প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিলেন। যক্ষ হিংসা, ক্রোধ আদি ত্যাগ ক'রে সংযমী হ'ল। এর পর সে বনের দেবতারূপে অধিষ্ঠিত হ'ল। যক্ষের পরিবর্তনের কাহিনী সবাইকে ব'লে কুমার সানন্দে বারাণসীতে ফিরে এলেন।

গীতার শিক্ষা

ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষাল

শ্রীভগবান বলেছেন: এই জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়—নিষ্কাম কর্মযোগ আমি পূর্বে বিবস্বান্‌কে বলি, তিনি মনুকে, মনু ইক্ষ্বাকুকে এই উপদেশ দেন। এইভাবে ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের মধ্যে এই যোগরহস্য জ্ঞাত ছিল। কিন্তু কালক্রমে তা লুপ্ত হয়েছে। ক্ষত্রিয়কুলতিলক অর্জুন, আজ তোমাকে আমি সেই সর্বোত্তম যোগরহস্য জানালাম।

শ্রীভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়েই অর্জুনকে বলেছিলেন, 'বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ'—যাঁরা বলেন যে বেদের কর্মকাণ্ড ও মন্ত্রাদি ছাড়া আর কিছু ধর্তব্য নয়, উপনিষদ্‌-ভাগ বা জ্ঞানকাণ্ডকে তাঁরা প্রাধান্য দেন না, সেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা স্বর্গসুখকামনায় বেদের কর্মকাণ্ডের যে সব উপদেশ দিয়েছেন, হে অর্জুন, তুমি তাঁদের সে সকল উপদেশ গ্রহণ ক'র না। তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও, নির্দ্বন্দ্ব হও, নিত্যসত্ত্বস্থ হও।'

শ্রীভগবানের এই গুহ্য বিদ্যা প্রবল রজোগুণী কর্মবীর ক্ষত্রিয়দের দ্বারাই আচরিত ও উপদিষ্ট হ'ত। আর যখনই অধর্মের অভ্যুত্থানে—দুষ্কৃতকারী-দের প্রতাপে সাধুসজ্জনেরা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছেন, তখন ভগবান নিজে অবতীর্ণ হ'য়ে ধর্ম সংস্থাপন করেছেন, দুষ্কৃতির উচ্ছেদ করেছেন। নিষ্কাম কর্ম-যোগ সংসারীদের পক্ষে পালনের কথা মনে হ'লে আমরা শিউরে উঠি। 'নিরাশীর্নির্মমঃ' হওয়াই এর আদর্শ। স্থিতপ্রজ্ঞের স্বরূপের কথায় ভগবান্‌ বলেছেন, 'প্রজহাতি যদা কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্‌ আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ'। বহু শিক্ষিত ব্যক্তির অভিমত এই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিলে আমাদের সমস্ত পুরাণ-ইতিহাসে এক রাজর্ষি জনক ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উদাহরণ মিলবে না।

মহাভারতের যুগেও অশ্বমেধাদি যজ্ঞবিহ্বল আড়ম্বরে স্বর্গরৌপ্যগবাদি ধনরত্ন ব্রাহ্মণদের দান ক'রে স্বর্গে স্থান সুদৃঢ় করা চলিত ছিল। সেই সময়ে অর্জুনকে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ যে নিষ্কাম কর্মযোগ-রহস্য শুনিয়েছিলেন, কতকাল তা ভারত-সন্তানদের কানে বেজেছিল, তা সঠিক জানা যায় না। তবে এক হাজার বছর যে গীতা-সিংহনাদ শ্রুত হয়েছিল, তা অনুমান করা যায়।

আমাদের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসমন্বয়ের বাণী প্রচার ক'রে গিয়েছেন, খৃষ্ট ও বুদ্ধের মতো তাঁর সরল কথাগুলি যে জ্ঞানী ও মূর্খের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে সমভাবে রেখাপাত করেছে, তা সকলেই স্বীকার করেন। কালে তাই যে সর্বত্র সম্মতি ও আদর লাভ করবে, এখনই তার শুভচিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ক্ষুরধার বুদ্ধি, বাগ্মিতা ও তর্কযুক্তির সহায়ে উপনিষদের শুষ্ক দার্শনিক তত্ত্বের সাথে শ্রীশ্রীঠাকুরের অমূল্য হৃদয়স্পর্শী বাণীর সংমিশ্রণে যে বীজ বপন ক'রে গিয়েছেন, পাশ্চাত্য বিদ্বৎসমাজে তার ফল ক্রমশঃ ফলছে। বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে, ক্রমে তা বিশাল মহী-রুহের আকার ধারণ করবে।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের দ্বন্দ্ব বহুকাল ভারতবর্ষ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। মুসলিম ও ইংরেজ রাজত্বে জাতি-বৈষম্য, পৌরোহিত্য-প্রভাব, বর্ণাশ্রম-বিভাগ প্রায় বিলুপ্ত। সামান্য যেটুকু এখনও আছে তা বর্তমান আর্থনীতিক সংকটে অন্ন-বস্ত্রের অভাবে একেবারে দূর হ'তে চলেছে।

গত দুহাজার বছরের বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে দেখা যায়—সামন্ত স্বেচ্ছাচারী রাজন্যবর্গ, তারপরে ধর্মযাজক ও পুরোহিতকুলের দ্বারা শাসিত জনসাধারণ বরাবরই শোষিত ও কুসংস্কারে জর্জরিত। ধনী-দরিদ্রের, উচ্চ-নীচের ভেদ, বিষয়ের প্রতি লোভ, পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ-হিংসা, এই পরিবেশেই পৃথিবীর শতকরা ৯০ জন জীবনযাত্রা নির্বাহ ক'রে এসেছে। এই আবহাওয়ার মধ্যে নিষ্কাম কর্মযোগ হাসির কথা।

নিষ্কাম কর্মযোগ প্রাচীন ভারতে শুধু ক্ষত্রিয় রাজাদের দ্বারাই আচরিত হ'ত। বহু শতাব্দী পরে বর্তমানের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ঘোষিত নীতি ও কর্মধারার বিবরণ পাঠে মনে হচ্ছে, এ যুগেও নিষ্কাম কর্মযোগের বাণী বিস্মৃত নয়। শ্রীভগবানের বাণী পুঁথির কথা নয়, ব্যাপকভাবে, সমাজগতভাবে তার প্রত্যক্ষ প্রয়োগ সম্ভব। সমাজসেবার ভেতর দিয়ে আমরা এর পৃথিবীব্যাপী প্রয়োগ দেখতে পাব। নিষ্কাম কর্মযোগের ভিত্তি এ যুগেও স্থাপিত হয়েছে—একথা জোর করেই বলা যেতে পারে।

সমুদ্র-সৈকতে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মহামিলনের অন্তরালে
মিশেছে আকাশ যেন সমুদ্রের সাথে।
গেল সূর্য অস্তপারে, রাঙা মেঘ দিক্‌-চক্রবালে
করে খেলা। ফিরে-চলা ঢেউগুলি ডাকিছে সন্ধ্যাতে
কারে যেন। থেমে গেছে পাখীর কূজন,
রাত্রির স্পন্দন জাগে।
এ কুণ্ঠা-বিহীন ডাক শুনে
তুষার পড়েছে গলে,—প্রপাতের ধারা
নেমে এলো সিন্ধুবুকে। মরুভূমি কাঁদে কাল গুনে
সমুদ্রসঙ্গম লাগি, নিশীথে সান্ত্বনা দেয় তারা
ছায়াপথ হ'তে, মরু যেন বন্দী রহে
দুঃখ ব্যথা স'য়ে থাকে।

এক প্রান্তে দুষ্প্রাপ্যের তরে
চিরন্তন দুর্ভাগ্যের বোঝা নিয়ে তার
সাগরের ধ্যান সৃষ্টি করি মরীচিকা উত্তপ্ত অন্তরে
বালু-ঝড় বহে অহরহ আর ওঠে হাহাকার।
এ পথে নাহিক মেঘ, বহ্নি-শিখা জ্বলে
ডাকে মরু বিধাতাকে।
আমারো জীবন মরুভূমি সম।
বেলা-শেষে সমুদ্র-সৈকতে
বসি ভাবিতেছি সেই কথা, কাছে নাই কেহ,
প্রাণের প্রাঙ্গণে মোর, আর হৃদয়ের পথে পথে
কই, কারো নয়নের বারিবিন্দু পড়ে নাই কভু।
এ সংসারে—কেবা কারে মনে রাখে?

সাধু শ্রীসুন্দরর্

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

এর আগে আমরা দু'জন বিখ্যাত শৈবসাধক শ্রীজ্ঞানসম্বন্ধর্ ও শ্রীআপ্পার্ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।* তেষট্টি জন শৈবসাধক বা নয়নারের মধ্যে চারজন সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এখন যে বাকী দুজনের সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী বর্ণনা করতে চেষ্টা ক'রব, তাঁরা শ্রীসুন্দরর্ ও শ্রীমাণিক ভাসগর্। এই প্রবন্ধে সুন্দররের কথা আলোচনা করছি।

শ্রীসুন্দররের পুরা নাম শ্রীসুন্দরমূর্তি স্বামী—কিন্তু 'সুন্দরর্' এই নামেই তিনি সকলের কাছে বেশী পরিচিত। মাদ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণ আরকট জেলার তিরুনাভালুর গ্রামে এক প্রসিদ্ধ আদিশৈব ব্রাহ্মণবংশে শ্রীসুন্দরর্ খৃঃ নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন। সাধু জ্ঞানসম্বন্ধর্ ও আপ্পার্ তাঁর পূর্বগ। চেরামন পেরুমল নামে এক রাজা তাঁর বিশেষ বন্ধু ও ভক্ত ছিলেন।

কথিত আছে, তিনি মাত্র আঠার বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে, কারণ এত অল্প বয়সের মধ্যে তাঁর প্রায় একশতটি তীর্থস্থান দর্শন এবং দুইবার বিবাহ সম্ভব কিনা তা ভাববার বিষয়। তখনকার দিনে পদব্রজেই সব তীর্থ দর্শন করতে হ'ত। তাঁর বয়স নিয়ে এই যে মতদ্বৈধ—এর কোনও সুষ্ঠু মীমাংসা আজ পর্যন্ত হয়নি।

বাল্যকালে তাঁর নধর গৌরকান্তি চেহারা দেখে সে দেশের রাজপুত্র নরসিংহ অত্যন্ত আকৃষ্ট হন এবং তাঁকে রাজপ্রাসাদে এনে রাখেন। উপযুক্ত অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে তিনি শাস্ত্রাদি পাঠ করেন। অল্প বয়সেই তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা হয় এবং পুত্তুর গ্রামে এক আত্মীয়া কন্যার সহিত বিবাহ নির্ধারিত হয়।

বিবাহবাসরে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। যখন পাত্র ও পাত্রী বিবাহের জন্ম নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট, তখন হঠাৎ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে দাবি করলেন যে সুন্দর তাঁর ক্রীতদাস, সুতরাং স্বাধীনভাবে বিবাহ করার তার কোনও অধিকার নেই। বাধ্য হ'য়ে বিবাহ স্থগিত রাখতে হ'ল এবং ঠিক হ'ল যে দাবিদার ব্রাহ্মণের গ্রাম তিরুভেন্নাইনালুরে নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মণদের এক পঞ্চায়েৎ দাসখৎ পরীক্ষা ক'রে দেখবেন যে ওটি আসল বা নকল। তাঁরা যে রায় দেবেন উভয় পক্ষ তা মেনে নেবেন। পুঁথিপত্র দস্তখৎ ইত্যাদি পরীক্ষা ক'রে সাব্যস্ত হ'ল যে দাসখৎ আসলই বটে।

বিবাহ আর হ'ল না। সুন্দর অতঃপর কোথায় থাকবেন, তা জানবার জন্য তাঁর প্রভু ব্রাহ্মণের অনুসরণ করেন। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সুন্দরকে নিয়ে গ্রামের বিখ্যাত শিবমন্দিরে প্রবেশ করেই অন্তর্হিত হ'য়ে যান। শিবের নাম তিরু আরুল তুরাই। সুন্দর বুঝতে পারলেন যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আর কেহই নন, তিনি তাঁরই ইষ্টদেব স্বয়ং শিব। ভূমিতে নতজানু হ'য়ে সুন্দর ভাবাবেগে ব'লে উঠলেন, 'হে চন্দ্রশেখর ভোলানাথ, হে প্রভু, হে দয়াল ভগবান!' সুন্দর বুঝলেন যে তিনি মানুষের দাস হ'তে চলেছিলেন, দয়াল প্রভু কৃপা ক'রে তা নিবারণ করেছেন। জনমে জনমে তিনি যে ঈশ্বরেরই দাস' এ জ্ঞানও তাঁর জাগ্রত হ'ল।

* উদ্বোধন আষাঢ় শ্রাবণ, ১৩৬৪ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫

যে মেয়েটির সুন্দরের সঙ্গে বিবাহ হবে ঠিক হয়েছিল, তিনি তাঁর বাকী জীবন সুন্দরকেই তাঁর আরাধ্য দেবতারূপে পূজা ক'রে অন্তিমে স্বর্গলাভ করেন, এইরূপ কথিত আছে।

সুন্দর প্রচার করলেন যে সত্যই তিনি আজীবন ঈশ্বরের ক্রীতদাস। কিছুকাল সেখানে থাকার পর সুন্দর তীর্থভ্রমণে নির্গত হন। প্রতি মন্দিরে গিয়ে মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশ্যে স্তব রচনা করেন। অতঃপর তিনি তিরু-ভাটিগাই বিরাট্টনম্ গ্রামের বিখ্যাত শিবমন্দিরে গমন করেন। সাধু আপ্পার্ পূর্বে অশেষ ভক্তি সহকারে বহুপূর্বে ঐ শিবের আরাধনা করে-ছিলেন। সুন্দরের প্রতি কৃপাবিষ্ট হ'য়ে ভগবান সেখানে রাতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে দর্শন দান ক'রে তাঁকে ধন্য করেন।

অতঃপর তিনি বিখ্যাত নটরাজের মন্দির চিদাম্বরমে যান। এদেশের শিবভক্তেরা চিদাম্ব-রম্‌কে দক্ষিণ কৈলাস ব'লে অভিহিত করেন। সেখানে তাঁর প্রতি বিখ্যাত শৈবতীর্থ তিরুবালুর যাওয়ার জন্য দৈবাদেশ হয় এবং অচিরেই তিনি তথায় পৌঁছেন। তিরুবালুরের শিবমন্দিরে তিনি সাধনায় ডুবে যান এবং কঠোর সাধনার ফলে ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন। এর পর থেকেই তিনি ঈশ্বরাবিষ্ট মহাপুরুষরূপে পরি-চিত হন।

অতঃপর সুন্দরর্ ভানমিকানাথার মন্দিরে পারাভাই নাচিয়ার নামে এক দেবদাসীর পাণিগ্রহণপূর্বক কিছুকাল বিবাহিত জীবন যাপন করেন। তখনকার দিনে দাক্ষিণাত্যে প্রায় প্রত্যেক বিখ্যাত শিবমন্দিরে দেবদাসী থাকত। অনেক জায়গায় এখনও তাদের বংশধরেরা বিদ্যমান।

সুন্দররের কোন স্থায়ী আয় না থাকাতে তিনি কঠোর দারিদ্র্যের সম্মুখীন হন। ভক্তাধীন ভগবান দৈব উপায়ে তাঁকে প্রচুর ধান্য ও মণিমুক্তাদি প্রেরণ করেন। যখনই সুন্দর কোন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন তখনই বিপদভঞ্জন ভগবান অলৌকিক উপায়ে তাঁর দুঃখ দূর করেছেন। ভক্তকে রক্ষা করা যেন ভগবানের এক দায়।

কিছুকাল পরে আবার সুন্দরর্ তীর্থভ্রমণে নির্গত হন এবং মাদ্রাজ শহরের সন্নিকটে তিরুবাত্তীযুর নামক স্থানের বিখ্যাত শিবমন্দিরে গমন করেন। এখানে তিনি সাঙ্গলি নাচিয়ার নামে এক কৃষক-কন্যার সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। কথিত আছে—সুন্দররের এই দুই স্ত্রী পার্বতীদেবীর দু-জন সহচরী। এই বিবাহের পূর্বে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে কখনও তিনি নূতন পরিণীতা পত্নীর সঙ্গ পরিত্যাগ করবেন না। কিন্তু তীর্থদর্শনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়।

তিনি তিরুবালুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-জনিত অন্যায়ের দরুন তাঁর দুই চক্ষু অন্ধ হ'য়ে যায়। এতে নিস্তেজ না হ'যে তিনি ভগবানের গুণকীর্তন করতে করতে তাঁর যাত্রাপথে অগ্রসর হ'তে থাকেন। কয়েকদিন পথ চলার পর একজন তাঁকে একখানি লাঠি দিয়ে গেল। তার সাহায্যেই তিনি এগোতে লাগলেন—মুখে অহরহঃ ভগবানের গুণগান, তাঁরই চিন্তায় মন প্রাণ ভরপুর, জগৎ যেন সব ভুল হ'য়ে গেছে। কাঞ্চীপুরমে পৌঁছে সেখান-কার বিখ্যাত একাম্বরনাথের মন্দিরে প্রার্থনার পর তিনি দৈবানুগ্রহে বাম চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান এবং তিরুবালুরে পৌঁছে স্তব দ্বারা সেখানকার দেবতাকে প্রসন্ন ক'রে তিনি ডান চোখের দৃষ্টিও লাভ করেন।

সুন্দরের দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা শুনে তাঁর প্রথমা স্ত্রী তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেননি।

কিন্তু দেবতার ইচ্ছা ও অনুগ্রহে আবার তাঁরা মিলিত হন।

পুনরায় সুন্দরর্ ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে যান। তাঁর মহত্ত্বের কথা শুনে তদানীন্তন চেরা রাজা চেরামন পেরুমল তাঁর প্রতি খুব আকৃষ্ট হন এবং তাঁকে নিজ রাজধানীতে নিয়ে যান। পেরুমলও ভক্ত লোক ছিলেন। উভয়ে একসঙ্গে বহু তীর্থস্থান দর্শন করেন। পথে তাঁরা শুনলেন যে একটি ছোট ছেলেকে কুমীরে মেরে ফেলেছে। পিতামাতার দুঃখ দেখে সুন্দররের হৃদয় দ্রবীভূত হয়। ঈশ্বরোদ্দেশ্যে হৃদয়ের সমস্ত শুক্তি দিয়ে তিনি এক স্তব রচনা করেন। প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হ'য়ে ভগবান ছেলেটিকে পুনর্জীবন দেন।

এরপর তাঁরা তিরুবানচিয়াকুলমে আসেন। সেখানে সুন্দরর্ ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ করার জন্য এক তীব্র প্রেরণা অনুভব করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৮ (?) বছর। ভক্তের আকুল প্রার্থনায় ভগবানের সিংহাসন টলে ওঠে এবং তাঁর কৃপায় সুন্দরর্ চিরবাঞ্ছিত শিবলোকে গমন করেন।

শ্রীসুন্দরর্ প্রায় এক শত স্তব রচনা করেন, তন্মধ্যে পনরটি বিশেষ খ্যাত। এঁর রচিত স্তব-গুলিও তেবারম্ নামে পরিচিত এবং কতকগুলি স্তব মন্দিরে বিশেষ বিশেষ পর্ব উপলক্ষে গীত হ'য়ে থাকে। শেষের দিকে তাঁর বৈরাগ্যের জোয়ার যখন পরিপূর্ণ, তিনি তখন সুন্দর একটি স্তোত্রের মাধ্যমে জগতের ও জীবনের অনিত্যতা বর্ণনা করেছিলেন, তার অর্থ :

জীবন ও অভিজ্ঞতার কোন মূল্য নাই; উহা একান্তই অলীক। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, এই অনিত্য সংসারে তিনিই একমাত্র আশ্রয়। জীবনের পরিণতি ধুলায়—জন্মের পরিণতি ধ্বংসে, যন্ত্রণায় ও মোহে, কাজেই সৎকাজ করতে মোটেই দেরি করা উচিত নয়। এক-মাত্র দেবাদিদেব মহাদেবের ভজনা কর, যাঁর ঊর্ধ্ব ও অধের ইতি করতে গিয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ও রক্ষাকর্তা বিষ্ণু পর্যন্ত বিফল পরিশ্রম করেছিলেন।

তেষট্টি জন নয়নারের মধ্যে সুন্দররই সকলের শেষে এসেছিলেন, তাঁর রচিত স্তোত্রেই পূর্বগ বাষট্টি জন নয়নারের প্রশংসা দেখতে পাওয়া যায়। সুন্দররের প্রতি শিবের বিশেষ কৃপা ছিল, কথিত আছে একবার তিনি নটরাজের বিশ্বনৃত্য তাঁর নিজ হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন। সংসারে প্রবেশ করলেও সংসারের কালিমা তাঁকে কোনও দিন স্পর্শ করতে পারেনি, কারণ তাঁর অন্তর ছিল ইষ্টচিন্তায় অহরহঃ ভরপুর।

তোমারে প্রণাম

শ্রীনরেন্দ্র দেব

তোমার করুণা নিখিল বিশ্বে অহরহ বহমান,
প্রভাত সন্ধ্যা আনে সুন্দর তোমার অমিত দান।
করুণা তোমার আকাশে বাতাসে,
অরুণ আলোর মধুর প্রকাশে,
প্রাবৃট্-ধারায় করুণা-কারায় তৃপ্ত তৃষিত প্রাণ।
বহে নদীজলে করুণা-লহরী কল্লোলে স্তবগান,
চন্দ্রতারায় জ্যোতির ধারায় ধরণী দীপ্যমান।
কৃপায় তোমার হে করুণারাজ,
মর্ত্য ধরেছে অমর্ত্য সাজ,
অণুতে রেণুতে মিশে আছ তুমি 'অণোরপি অণীয়ান্'!

তোমার করুণা-ধারাই জাগায় শাখায় শাখায় প্রাণ,
তরু-তৃণলতা নব কিশলয়ে সবুজের অভিযান;
জীব-জীবনের স্পন্দন মাঝে
তব সকরুণ করুণা বিরাজে,
শরণাগতেরে বিপদবারণ, কৃপায় কর হে ত্রাণ।

নাম-যশ-খ্যাতি-প্রীতির প্রসাদ আশাতীত ধনমান,
না চাহিতে পাই, ওগো দয়াময়, তব দয়া অফুরান।
পথের কাঙালে রাজা করো নাথ,
প্রসারিত সদা বরাভয় হাত,
দেখা দাও প্রভু, ধ্যানলোকে তুমি, ভক্তের ভগবান।

অনন্ত তব করুণা অপার, নাহি তার অবসান,
কীট পতঙ্গ প্রতি প্রাণী লভে তব প্রেমকল্যাণ,
করুণা তোমার মাখা ফলে ফুলে,
বর্ণে গন্ধে গানে ওঠে দুলে,
রূপের তোমার সীমা কেবা পায়, হে অরূপ রূপবান্।

তুমি নাই যেথা ত্রিভুবন মাঝে, নাহি তো এ হেন স্থান,
সকল হৃদয়ে জানি সুগোপনে তোমার অধিষ্ঠান।
হ'লেও অবাঙ্-মনসোগোচর
তুমি চরাচরে চিরনির্ভর,
তোমার করুণা যে লভে সে পায় অমৃতের সন্ধান।

কেউ চেনে, কেউ চেনে না তোমায়, কেউ বা সন্দিহান,
কারো বা হৃদয়ে তব রূপ-শিখা নিয়ত অনির্বাণ।
করুণা যাচিয়া ফেরে যেবা কেঁদে
তারে তুমি নাও প্রেম-ডোরে বেঁধে,
পলে পলে সে যে অনুভব করে তোমার স্নেহের টান।

মাটির প্রতিমা, শিলা-বিগ্রহ, নহে জড়, না পাষাণ!
কত নাম তব, রূপ নব নব, কে জানে সে অভিধান?
জনমে জনমে জীবনে মরণে,
ঠাঁই দিও তব অভয় চরণে,
প্রণাম তোমারে, তোমারে প্রণাম, হে চির জ্যোতিষ্মান্!

দক্ষিণের বৃন্দাবন

[গুরুবায়ুর শ্রীকৃষ্ণ-মন্দির]

স্বামী ধর্মেশানন্দ

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে কেরল প্রদেশে গুরুবায়ুর-মন্দির একদা রাজনীতিক কারণে বিখ্যাত হইয়াছিল। এই স্থানের পৌরাণিক পটভূমিকা বঙ্গদেশে প্রায় অজ্ঞাত ; তাই এই ভ্রমণকাহিনীর মুখবন্ধে তাহা সংগৃহীত হইল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় উদ্ধবকে দিয়া একবার গুরু বৃহস্পতির কাছে সংবাদ পাঠান : সমুদ্র শীঘ্র দ্বারকা গ্রাস করিবে, তৎপূর্বেই তিনি যেন বসুদেব-দেবকী-পূজিত শ্রীকৃষ্ণ-মূর্তিটি কোন সুরক্ষিত পবিত্র স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। ভগবান্ আরও বলিয়া দিলেন, এই মূর্তি সাধারণ নহে, সৃষ্টির পূর্বে ভগবান্ বিষ্ণু ইহা ব্রহ্মাকে দেন, শ্রেষ্ঠ পুত্রপ্রাপ্তির জন্য তপস্যারত প্রজাপতি সুতপাকে ব্রহ্মা ইহা দান করেন। কঠোর তপস্যাসহ ঐ মূর্তিকে পূজা করার ফলেই ভগবান্ প্রথম জন্মে সত্যযুগে সুতপা ও পৃশ্নির কাছে পৃশ্নিগর্ভরূপে, দ্বিতীয় জন্মে কশ্যপ ও অদিতির কাছে বামনরূপে, তৃতীয় জন্মে দ্বাপরে বসুদেব ও দেবকীর কাছে কৃষ্ণরূপে আসিয়াছেন, সমাগত কলিযুগে এই মূর্তি পরম কল্যাণদায়ক হইবে।

সংবাদ পাইয়া দেবগুরু বৃহস্পতি দ্বারকা গিয়া দেখেন সব শেষ ; তখন তাঁহার শিষ্য বায়ুর সাহায্যে সমুদ্র হইতে ঐ মূর্তি উদ্ধার করিলেন। উহা প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে ভারতভূমির দক্ষিণ প্রান্তে আসিয়া দেবগুরু দেখিলেন, এক কমল সরোবরে শিব-পার্বতী ক্রীড়ারত। তাঁহারা ভগবানের এই মূর্তির জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মহাদেবের আদেশে দেবগুরু বায়ুর সহায়তায় উপযুক্ত স্থানে ঐ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই দিন হইতে ঐ স্থানের নাম গুরুবায়ুর, দেবতার নাম গুরুবায়ুরাপ্পা। নিকটেই মমীয়ুর নামক স্থানে শিবও শক্তির সহিত বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীআদ্য শংকরাচার্য কিছুকাল এখানে ছিলেন ও তাঁহারই প্রবর্তিত পূজাপদ্ধতি এখনও চলিতেছে। শ্রীলীলাশুক (বিল্বমঙ্গল) সাধনাকালে বহুদিন এখানে ছিলেন, ভগবান্ বালকরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত খেলা করিতেন। বহু সাধু সন্ত ও ভক্তসেবিত পুণ্যতীর্থ—দক্ষিণের এই বৃন্দাবন। —উঃ সঃ

দক্ষিণ মালাবারে পুন্নানী তালুকে সমুদ্র হইতে ৩ মাইল দূরে সর্বজনপ্রিয় গুরুবায়ুর-মন্দির। উহা শোরনুর জংশন হইতে ৩০ মাইল ও ত্রিচুর হইতে ২০ মাইল দূরে, বাসে যাওয়া যায়। ১৯৫৭ খৃঃ ৮ই মে বুধবার জনার্দন নামক কিশোরকে গাইড করিয়া সকালেই ত্রিচুর হইতে বাস্-এ গুরুবায়ুর আসিলাম, ৯॥টার মধ্যে দেবস্থান চৌলট্রীতে দ্বিতলে দুটাকা দিয়া একদিনের জন্য একটি ঘরভাড়া ও জলের ব্যবস্থা করিয়া মন্দিরে চলিলাম, সঙ্গে শুদ্ধ মহারাজ। যে গুরুবায়ুর-মন্দিরের বর্ণনা শুনিয়া একদিন শ্রীবৃন্দাবনের বাঁকেবিহারীর কথাই মনে হইয়াছিল, আজ সেই দক্ষিণের বৃন্দাবন গুরুবায়ুর-তীর্থে কত কল্পনা লইয়া সত্যসত্যই উপস্থিত! এতদূর আশা করি নাই, কারণ কোথায় কাশীধাম, কোথায় বৃন্দাবন, আর কোথায় দক্ষিণ-পশ্চিমের সমুদ্রতীরে দুই হাজার মাইল দূরে—উত্তর ভারতে প্রায় অজ্ঞাত 'গুরুবায়ুর'।

গোপুরমের সম্মুখে গরুড়-স্তম্ভটি বেশ বড়। তারপর ৩টি মহল বা দেউড়ি অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-মন্দির। মন্দির ছোট, কিন্তু সর্বদা ভক্তের স্রোত বহিতেছে। সকালের পূজা তখন হইয়া গিয়াছে। কর্পূর-আরতি দেখিলাম। পরে বেলা ১২টা হইতে ১টার পূজা ভোগরাগ ও আরতি দর্শন করিলাম। ভারতের সর্বত্র ভোগ-রাগের সময় মন্দিরের দ্বার বন্ধ করা হয়। মূর্তি ছোট, আমরা দেখিলাম ৬।৭ বৎসরের শিশু, বালগোপাল বেশ, কোমরে লাল কৌপীন। কেরলদেশে শিশুদের কোমরে ঐরূপ লাল কৌপীন থাকে। মস্তকে মুকুট টোপরের মতো, মণি জল্‌জল্ করিতেছে, এত উজ্জ্বল যে মুখ দেখা যায় না। বক্ষেও একটি রত্ন এবং চারিটি স্বর্ণস্তবক, উহাও খুব উজ্জ্বল। দক্ষিণ হস্তে নাড়ু ও বামহস্তে পদস্পর্শ মুদ্রা। ১টায় মন্দির বন্ধ হইল। দ্বিতীয় মহলে দেখিলাম ব্রাহ্মণ-মণ্ডপে অনেক ভক্ত ভাগবত পাঠ করিতেছে, বেশির

ভাগ দশম স্কন্ধ, কেহ বা কাত্যায়নীর স্তবটি পড়িতেছে। আর্ত ও অর্থার্থী ভক্তের ভিড়ে কাতরকণ্ঠে ধ্বনিত 'গুরুবায়ুরাপ্পা' এই নামই কানে বেশী আসিতে লাগিল। ডান দিকে খানিকটা গিয়া উঠান (মথিলকম্) পার হইয়া দেখিলাম কুণ্ডের নিকট বিরাট ব্রাহ্মণ-মণ্ডপে ২।৩ শত ব্রাহ্মণ শ্রোতা ভাগবতপাঠ শ্রবণ করিতেছেন। দুর্গাদেবীর ক্ষুদ্র মন্দিরের সম্মুখে ছোট মণ্ডপে একজন স্থূলকায় পণ্ডিত হাত-মুখ নাড়িয়া বেশ ভাবভক্তির সহিত ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। একটি ২১।২২ বৎসর-বয়স্ক ছিপ্‌ছিপে সুপুরুষ ব্রাহ্মণযুবক আমার সম্মুখে বসিয়া তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল। পরে তাহার সঙ্গ করিয়া জানিলাম, সে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। ভগবানে ভক্তি হইবে বলিয়া কালিকট হইতে এই মন্দিরে আসিয়া রহিয়াছে। বন্ধুর বাড়ীতে থাকে। তাহার প্রকৃতি বড় মধুর।

চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি মনোরম। শ্রীকৃষ্ণের বেশ, চন্দনচর্চিত, কেবল মুখটি দেখা যাইতেছে, গলায় দুইটি স্বর্ণহার, কোমরে কোমর-পাটা, গলায় ৩।৪টি গোড়েমালা, রঙ্গন ও তুলসীর স্তবকমালা, রঙ্গন ও পদ্মের পাঁপড়ির মালা, রঙ্গনের গোড়েমালা। সকালে—যেন নাড়ু-গোপাল-মূর্তি। বৈকাল ৫টায় মন্দির খুলিলে দেখিলাম যেন বিষ্ণুমূর্তি, যুবকের বেশে সজ্জিত, মুখটি খোলা, সর্বাঙ্গ চন্দনে ঢাকা। তারপর সন্ধ্যাবেলা যেন প্রৌঢবেশ, সর্বাঙ্গে চন্দন, বক্ষে স্বর্ণ ও রত্ন জলজল্ করিতেছে। গলায় ২টি রঙ্গনফুলের গোড়েমালা। দুপুরে ও সন্ধ্যায় আরতির পর এবং বড় ২টি পূজার পর জয়দেবের অষ্টপদী কীর্তন হয়, নহবৎ বাজে। সন্ধ্যার পর একদল গায়ক কীর্তন করেন, মৃদঙ্গ ও করতাল সহ। ঢাকের মতো মৃদঙ্গ। পরদিন ভোরে ৪টার সময় মন্দিরে গিয়া অনাবৃত মূর্তির অভিষেক দর্শন করিলাম। মূর্তি কৃষ্ণপ্রস্তরের চতুর্ভুজ বিষ্ণু।

শুনিলাম—পুরাণে আছে, উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঐ মূর্তি দিয়া যান, উদ্ধব দেবগুরু বৃহস্পতিকে দেন। তিনি বায়ুর (মরুৎগণের) সাহায্যে ঐ স্থানে লোককল্যাণে ঐ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন, সেজন্য নাম গুরুবায়ূর গুরু+বায়ু+উর, 'উর্' অর্থে স্থান।

ভোরে অভিষেকে যে সুগন্ধি তৈলে স্নান করানো হয়, উহা যাত্রী-গণকে বিক্রয় করা হয়। উহাতে কুষ্ঠ, পক্ষাঘাত, সর্পদংশনবিষ নষ্ট হয়।

এই স্থানে আসিয়া পাণ্ড্য বংশীয় কোন রাজা নির্ঘাত সর্পদংশন হইতে গুরুবায়ুবাপ্পার কৃপায় রক্ষা পাইয়া ছিলেন। ৪০০ বৎসর পূর্বে মেল পাথুর নারায়ণ ভট্টগিরি নামে একজন তপস্বী ব্রাহ্মণ পক্ষাঘাত ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া 'নারায়ণীয়ম্' নামক স্তুতিতে পরম কারুণিক গুরুবায়ুর-শ্রীকৃষ্ণে নিজ হৃদয়ের ভক্তি ও আর্তি নিবেদন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে ভক্ত-সমাগম বৃদ্ধি পায়—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। 'নারায়ণীয়ম্' স্তবের বই কিনিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব দিকের গোপুরম্ দিয়া গেলে দেবমন্দির সম্মুখে পড়ে। পশ্চিম দিকের গোপুরম্ হইতে বাহির হইলে বাজার। পূর্বেও কিছু দোকান-পাট আছে। প্রতিদিন দুইবেলা ব্রাহ্মণ-মণ্ডপে প্রায় ১৫০ ব্রাহ্মণ ভোজন করানো হয়।

হস্তী-পৃষ্ঠে উৎসব-বিগ্রহ বসাইয়া প্রতিদিন রাত্রে মন্দিরের চারিদিকে অর্থাৎ 'নালম্বলমে' ভক্তগণ গীতবাদ্যসহ তিনবার প্রদক্ষিণ করে। ইহাকে 'শিবেলি' বলে। বহুদিন পরে কীর্তন ও নৃত্যে যোগদান করিয়া শিশুসুলভ আনন্দ অনুভব করিলাম। কার্তিকের একাদশী এবং সারা বৈশাখে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়। দক্ষিণের সর্বদেশের ভক্ত-সমাগমে ১২ মাস

মন্দির উৎসবময়। একবার মন্দিরে গমন করিলেই মনস্তাপ ও অশান্তি কোথায় পলায়ন করে। প্রতি বৎসর মন্দির-প্রতিষ্ঠার উৎসব-দিবসে মন্দিরের দুই পার্শ্বে একাদশটি হস্তীকে সজ্জিত করিয়া পূর্বে গোপুরমের সম্মুখে ধ্বজ-স্তম্ভে পতাকা উড্ডীন করা হয়। উহা পৌষ মাসে পড়ে। ১০দিন উৎসব চলে; পূজা, ভজন, ভোজন, শোভাযাত্রা প্রভৃতিতে 'গুরুবায়ুর' মুখরিত হইয়া থাকে। দশম দিনে আরাত (স্নান) উৎসবে তীর্থে (পুষ্করিণীতে) মন্দিরের বিগ্রহের স্নান হয়। কার্ত্তিক একাদশী ও পৌষের এই উৎসবের ৬ষ্ঠ দিবসে মন্দিরে উদয়াস্ত পূজা হইয়া থাকে। একাদশী উৎসব অষ্টাদশ-দিবসব্যাপী হয়। ইহার প্রধান বিশেষত্ব— 'ভিলাক্' অর্থাৎ আলোকসজ্জা। ঐ 'ভিলাক্'র খরচ ভক্তগণ বহন করে। উহার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়,—কে অগ্রে ঐ সৌভাগ্য লাভ করিবে। ৬/৭ হাজার বড় বাতি দেওয়া হয়। ২৫০৲ টাকা খরচ পড়ে। এ ছাড়া অসংখ্য ছোট প্রদীপ দেওয়া হয়।

ক্ষুদ্র মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে একটি অল্প-পরিসর ব্রাহ্মণ-মণ্ডপ (কেবল ব্রাহ্মণগণ ওখানে বসিতে পারিবেন—অপর জাতি স্পর্শ করিতে পারিবেন না) থাকায় পুলিশের সাহায্যে ভিড় কমানো হয়। প্রধান পুরোহিত 'মেল শান্তি' পালাক্রমে নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ-পরিবার হইতে গৃহীত হয়। এক বৎসরের জন্য তিনি ব্রহ্মচর্য-পালনে ব্রতী হন ও মন্দির-চত্বরের বাহিরে গমন করিতে পারেন না। তাঁহার স্বতন্ত্র বাসস্থান মন্দিরমধ্যে নির্দিষ্ট ঘরে। পুরোহিতগণ ৪টি নম্বুদ্রী পরিবার হইতে নির্বাচিত হয়, তন্মধ্যে মন্দিরের ভিতরে মাত্র ৪জন বিশিষ্ট পুরোহিত প্রবেশ করিতে পারেন।

মন্দিরমধ্যে রৌপ্যপাত্রে অসংখ্য দীপাবলী প্রতিদিন প্রজ্বলিত থাকে। উহার গাওয়া ঘিয়ের গন্ধে চারিদিক সুবাসিত। ভোর হইতে বেলা একটা পর্যন্ত কতবার যে পূজা হয়! পুরোহিতেরা সর্বদা পূজায় ব্যাপৃত এবং মাঝে মাঝে চন্দন, পুষ্প, প্রসাদ দর্শনার্থিগণকে দিতেছেন।

পুষ্পাঞ্জলিকে 'অর্চনা' বলে। অনেক রকম অর্চনা আছে—তন্মধ্যে সহস্রনাম, অষ্টোত্তর, পুরুষসূক্ত ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। ১ টাকা খরচ করিয়া আমরা অষ্টোত্তর অর্চনা করিলাম। তজ্জন্য দেবস্থান হইতে টিকিট কিনিতে হয়। নিবেদিত পুষ্প আশীর্বাদ পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রসাদ গ্রহণের জন্যও টিকিট কিনিতে হয়। আমরা বৈকালে 'পরমান্ন' টিকিট কিনিয়া সকালে বিতরণ-গৃহ হইতে গরম গরম পায়েস-প্রসাদ একটি বাটি করিয়া লইয়া আসিলাম। বেশ সুমিষ্ট প্রসাদ। খুব তৃপ্ত হইলাম। মন্দিরের মধ্যে একটাকা দিলে অন্নপ্রাশন ও ৭।০ দিলে বিবাহ সম্পাদিত হয়। ১২ আনায় প্রায় ১পোয়া অভিষেকের তিল তেল পাওয়া যায়। শোনা যায়, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আচার্য শঙ্করকে ঐখানে আসিতে হয় ও তিনি শুদ্ধ তান্ত্রিক পূজার প্রচলন করেন।

১৯৩১খৃঃ হরিজন মন্দির-প্রবেশ আন্দোলনের সময় হইতে গুরুবায়ুর সর্বভারতে সুপরিচিত হয়। হরিজন যদিও মন্দিরে এখন প্রবেশ করে, তথাপি ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য যায় নাই। কেরলের কথা-কলির মতো জামুরিন-রাজের খরচে প্রতি বৎসর যে কৃষ্ণনাট্যম্ হয় তাহা উপভোগ্য।

টিপুর রাজত্বকালে মন্দির আক্রমণের ভয়ে ত্রিবাঙ্কুরে (Trivandrum) শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতি-র্বিগ্রহ আনীত হয়। কিন্তু টিপু সুলতান মন্দির আক্রমণ করেন নাই, দেবাদিষ্ট হইয়া রাজকোষ হইতে মন্দিরে স্বর্ণমুদ্রা দিতেন। যাহা হউক মন্দিরমধ্যে আরও তিনটি দেবালয় আছে, যথা— দুর্গা, শাস্তা, গণপতি। শাস্তার একাধারে ভীম বিক্রম ও পরম দয়া। যাহা হউক ২৪ ঘণ্টা গুরুবায়ুর-মন্দিরে অধিকাংশ পূজা ও নৃত্যগীত দর্শন করিয়া পরদিন ১০টায় আমরা ত্রিচুর শহর হইতে ৪ মাইল দূরে আমাদের ভিলাঙ্গন আশ্রমে ফিরিলাম, শ্রীমান্ জনার্দন সঙ্গে। সেখান হইতে পালপুরম্ হইয়া উটকামণ্ডের পথে যাত্রা করি।

মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

স্বয়ং মহাপ্রভুর যিনি দীক্ষাগুরু, তাঁর গৌরবের তুলনা কোথায়? কবি কর্ণপুর গোস্বামী সেজন্যই ঈশ্বরপুরীর মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে আত্মহারা হ'য়ে বলেছেন :

ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে।
জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকম্॥

ঈশ্বরপুরী কৃষ্ণপ্রেম-কল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর অন্যতম শিষ্য।

ঈশ্বরপুরীর নিবাস ছিল কুমারহট্ট বা হালিসহরে। তাঁর পিতার নাম শ্যামসুন্দর আচার্য। তিনি বেদবেদান্তাদি সর্ববিদ্যায় ছিলেন নিষ্ণাত। 'প্রেম-বিলাসে' উক্ত হয়েছে :

পরম পণ্ডিত ঈশ্বর ছাড়ি গৃহবাস।
মাধবেন্দ্র-শিষ্য হৈঞা করিলা সন্ন্যাস॥
ঈশ্বরপুরী নাম হৈল সন্ন্যাস-আশ্রমে।
মাধবের সদা করে চরণে সেবনে॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যখন নবদ্বীপে বিদ্যাবিলাসে মত্ত, তখন ঈশ্বরপুরী একদিন অদ্বৈতপ্রভুর গৃহে উপস্থিত হন। এই প্রসঙ্গে চৈতন্যভাগবতে :

অদ্বৈত বলেন বাপ তুমি কোন্ জন।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তুমি হেন লয় মন॥
বলেন ঈশ্বরপুরী আমি ক্ষুদ্রাধম।
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ॥

ঈশ্বরপুরীর প্রেম দেখে সকলে 'হরি হরি' ধ্বনি করতে লাগল।

একদিন মহাপ্রভুর সঙ্গে পথে ঈশ্বরপুরীর দেখা হ'লে তিনি তাঁকে তাঁর বাড়ীতেই ভিক্ষার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। গৌরাঙ্গের সঙ্গে ঈশ্বরপুরীর এই প্রথম সম্ভাষণ। চৈতন্য ভাগবতে :

ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ প্রভু করিলেন তানে।
সমাদরে গৃহে সেই বসিলা আপনে॥

নবদ্বীপে গোপীনাথ আচার্যের গৃহে ঈশ্বরপুরী এর পরে কিছুকাল বাস করেছিলেন। সে সময় তিনি 'কৃষ্ণলীলামৃত' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থ তিনি নিমাইয়ের বন্ধু গদাধর পণ্ডিতকে শোনাতেন। 'ভক্তিরত্নাকর' বলেন :

শ্রীঈশ্বরপুরী কিছুদিন এথা ছিলা।
কৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থ এথাই রচিলা॥
গদাধরপণ্ডিতে পরম স্নেহ করে।
তার প্রেমচেষ্টা দেখি পঢাইলা তারে॥

ঈশ্বরপুরী শ্রীগৌরাঙ্গকে নিজের পুস্তক সংশোধন করার জন্য বার বার অনুরোধ করায় শ্রীগৌরাঙ্গ একটি উত্তর দিলেন, কৃষ্ণের বর্ণনে যে দোষ দেখে সে পাপী। ভক্তের কবিত্বে ভগবান্ কোন দোষ নেন না—

অতএব তোমার যে কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে দোষিবে কোন্ সাহসিক জন?

ভক্তিরসে উচ্ছল ঈশ্বরপুরী অতঃপর 'ক্ষিতি পবিত্র' ক'রে পর্যটনে চললেন।

'উজ্জ্বলনীলমণি'-গ্রন্থে শ্রীল রূপগোস্বামী ঈশ্বরপুরীর 'রুক্মিণীস্বয়ংবর' নামক গ্রন্থ[১] থেকে দুটি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। এ গ্রন্থ কখন কিভাবে লেখা হয়েছিল, তা আজ জানবার উপায় নেই। এই গ্রন্থ ও 'কৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থ এক কিনা, তাও বিবেচ্য।

শচীমাতার নিকট ঈশ্বপুরীর ভিক্ষাগ্রহণের বৎসর দুই তিন পরে মহাপ্রভু গয়াতীর্থে গমন করেন। সেখানে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম-দর্শনে মহাপ্রভুর ভাবান্তর উপস্থিত হয়। দৈবক্রমে ঈশ্বরপুরী ঐ সময়ে গয়াতে ছিলেন, তাঁকে দেখে মহাপ্রভুর

১ এই গ্রন্থ এখনও অনাবিষ্কৃত। শ্লোকদুটির জন্য 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের সাত্ত্বিক প্রকরণ দেখুন (১২।১২, ১৭)।

সংজ্ঞা ফিরে এল, নিমাই তাঁকে প্রণাম করলেন। 'অদ্বৈত-প্রকাশ' বলছেন :

তিঁহো সসম্ভ্রমে গৌরচন্দ্রে আলিঙ্গিলা।

মহাপ্রভু নিজে স্বহস্তে রন্ধন করলেন, এমন সময় ঈশ্বরপুরী সেখানে উপস্থিত হওয়ায় তাঁকেই খাদ্য প্রদান করলেন। পুরী গোস্বামী বললেন, যে অন্ন রাঁধা হয়েছে, তাই দু-ভাগ ক'রে দু-জনে খেলে বেশ হবে।' মহাপ্রভু তাতে রাজী হলেন না। স্বয়ং পুনরায় রন্ধন ক'রে ভক্ষণ করলেন। এই সময়েই গয়াধামে মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। 'অদ্বৈত-প্রকাশ'-মতে ঈশ্বরপুরী নিমাই-এর ভগবত্তা তখনই জানতে পেরেছিলেন। যথা :

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুঁহু চিদানন্দময়।
তব মায়া-নাটে কার ভ্রম নাহি হয় ?

ঈশ্বরপুরী এর পর গয়াধাম ত্যাগ ক'রে বের হ'য়ে গেলেন। নিমাইও ফেরার পথে ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান পরিদর্শন ক'রে নবদ্বীপে যান,

'তবে কুমারহট্টে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
পুরীরাজের জন্মস্থান অতি পুণ্যতর॥'

গয়া থেকে ঈশ্বরপুরী বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে অবধূত নিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'লে তিনি তাঁকে বৃন্দাবনে 'কানাই'এর খোঁজ না ক'রে নবদ্বীপে তাঁর অনুসন্ধানে যেতে বললেন।

ঈশ্বরপুরীর তিনটি কবিতা রূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলী'র নামমাহাত্ম্য-প্রকরণে (১৮নং কবিতা), ভক্তগণের দৈন্যোক্তি-প্রকরণে (৬২নং শ্লোক) এবং ভক্তগণের নিষ্ঠা-প্রকরণে (৭৫নং শ্লোক) উদ্ধৃত হয়েছে। প্রথম শ্লোকে তিনি বলছেন : 'দ্বিজাতিগণ যোগ, বেদানুশীলন, নির্জন বনে ধ্যান ও তীর্থভ্রমণাদি দ্বারা নির্ভয়ে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে মুক্ত হ'তে চান—তা ভাল, আমরা কিন্তু কদম্বকুঞ্জে বিদ্যমান 'ইন্দিবর নিন্দি' শ্যাম-সুন্দরের নামসেবক। আমাদের জন্মের ভয় নেই, লক্ষ লক্ষ জন্ম হ'ক—

যোগশ্রুত্যুপপত্তি-নির্জনবনধ্যানাধ্বসংভাবিতাঃ
স্বারাজ্যং প্রতিপদ্য নির্ভয়মমী মুক্তা ভবন্তু দ্বিজাঃ।
অস্মাকন্তু কদম্বকুঞ্জকুহর-প্রোন্মীলদিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলধামনাম জুষতাং জন্মাস্তু লক্ষাবধি॥

কাতর দৈন্যোক্তি সহকারে ঈশ্বরপুরী দ্বিতীয় কবিতায় বলছেন :

'হে মুকুন্দ! তোমার স্মরণে ব্রজের আম্রবৃক্ষও বায়ুবিঘূর্ণিত শাখায় করছে নৃত্য, ভ্রমরগুঞ্জনের মাধ্যমে করছে গান, মকরন্দবিন্দুর ছলে করছে অশ্রুপাত এবং নব অঙ্কুর উদ্গমের ছলে হচ্ছে তার রোমাঞ্চ—এভাবে সেও মূর্ছিত হচ্ছে, কিন্তু হে প্রাণসম! বল দেখি তোমার নামটিও কেন আমার মনে আসছে না ?

নৃত্যন্ বায়ুবিঘূর্ণিতৈঃ স্ববিটপৈর্গায়ন্নলীনাং রুতৈঃ
মুঞ্চন্নশ্রুমরন্দবিন্দুভিরলং রোমাঞ্চনবাঙ্কুরৈঃ।
মাকন্দোঽপি মুকুন্দ মূর্ছতি তব স্মৃত্যা সু বৃন্দাবনে
ব্রূহি প্রাণসমান চেতসি কথং নামাপি নায়াতি তে॥

তৃতীয় কবিতায় তাঁর ভক্তহৃদয়ের অগাধ নিষ্ঠা হয়েছে সূচিত—এখানে ব্রহ্মজ্ঞানাপেক্ষা শ্রবণ-স্মরণাদি ভক্তি-অঙ্গের প্রাধান্যই হয়েছে সুপ্রকট :

ধন্যানাং হৃদি ভাসতাং গিরিবরপ্রত্যগ্রকুঞ্জৌকসাং
সত্যানন্দরসং বিকারবিভবব্যাবর্তমন্তর্মহঃ।
অস্মাকং কিল বল্লবীরতিরসো বৃন্দাটবীলালসো
গোপঃ কোঽপি মহেন্দ্রনীলরুচিরশ্চিত্তে মুহুঃ ক্রীড়তু॥

অর্থাৎ পর্বতগুহাবাসী ধন্য পুরুষদের হৃদয়ে সত্যানন্দরসঘন বিকার-বিরহিত পরম ব্রহ্ম স্ফুরিত হউন। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে যেন বৃন্দাবনপ্রিয় গোপী-রতিরস ইন্দ্রনীলকান্তি শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করেন।

'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নাটকে বর্ণিত আছে শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ পণ্ঢারপুর-নামক তীর্থস্থানে গমন করেন এবং সেখানে অদ্ভুতভাবে অন্তর্হিত হন।

অন্তর্ধানকালেও শ্রীকৃষ্ণরূপী গৌরহরির কথা ঈশ্বরপুরীর হৃদয়ে জাগরূক ছিল। তাঁর অন্তর্ধানের পর তাঁর ভক্ত গোবিন্দদাস একদিন

মহাপ্রভুর নিকটে এসে বললেন যে ঈশ্বরপুরীর আদেশেই তিনি তাঁর কাছে এসেছেন—কেননা পুরীজী তাঁকে ব'লে গেছেন, 'কৃষ্ণচৈতন্য নিকট রহি সেব যাই তারে।' আর এও বললেন যে কাশীশ্বরও তীর্থ দেখে ফিরবেন, প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দদাস নিজে ছুটে এসেছেন (—চৈতন্য-চরিতামৃত)। সেখানে সার্বভৌম ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

'পুরী গোসাঞি শূদ্রসেবক কাঁহাতে রাখিলা ?'

এই প্রশ্নের উত্তরে

'প্রভু কহে ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র ॥
ঈশ্বরের কৃপা জাতিকুলাদি না মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে ॥'

এই বলেই ভক্তমানপ্রবর্ধন গৌরহরি গোবিন্দ-দাসকে আলিঙ্গন ক'রে ভট্টাচার্যকে ছোট ছেলের মতোই জিজ্ঞাসা করলেন,

'গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য সে আমার।
ইহাকে আপন সেবা করাইতে না জুয়ায়।
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন, কি করি উপায় ?'

তদুত্তরে সার্বভৌম বললেন, 'আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া'। সেই থেকে গোবিন্দ সেখানে স্থিত হলেন। কাশীশ্বরও কিছুদিন পরে এসে উপস্থিত হলেন। কাশীশ্বর মহাপ্রভুর নৃত্যের সময় রথের অগ্রভাগে লোকের ভিড় বারণ করতেন।

মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য অদ্বৈতপ্রভু, পুণ্ডরীক, ঈশ্বরপুরী। এঁদের প্রত্যেকের গুণের সীমা নেই। এক একটি যুগে ভগবানের অশেষ কৃপা দৃষ্ট হয়। শুধু তিনি নিজে অবতীর্ণ হন না—তাঁর পরিপার্শ্বস্থ সকলকে নিয়েই তিনি ভূতলে আগমন করেন। ঈশ্বরপুরীর অলৌকিক জীবন অধিকাংশই অজ্ঞাত। সাধু সন্ন্যাসীর জীবন প্রায়ই তাই। তা হলেও যেটুকু আমরা জানতে পারি, তা থেকেই তাঁর অপরিসীম মাহাত্ম্য আমাদের অভিভূত করে।

মুরারি গুপ্তের পদাবলী

ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন

শ্রীচৈতন্যের সুহৃদ ও অনুচর কেহ কেহ দুই-চারিটি করিয়া গান রচনা করিয়াছিলেন। দুই-একজন ধারাবাহিক পদাবলী রচনা করিয়া-ছিলেন। ইহারাই চৈতন্য-পদাবলী রচনার পথপ্রদর্শক। চৈতন্যের মহিমাপূর্ণ পদ প্রথম রচনা করিয়া প্রকাশ্যে নীলাচলে গাহিয়াছিলেন অদ্বৈত আচার্য।

চৈতন্যের আদ্য অনুচরদের মধ্যে মুরারি গুপ্তকেই প্রথম পদাবলী-রচয়িতা রূপে পাই। ইহার লেখা চৈতন্যজীবনীর আলোচনা যথাস্থানে করিয়াছি। মুরারি গুপ্তের কড়চা যাহা ছাপা হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে মুরারি আগে গান লিখিতেন। দামোদর পণ্ডিত তাঁহাকে গান রচনা ছাড়িয়া দিয়া জীবনী রচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বাংলায় ও ব্রজ-বুলিতে মুরারি সাত-আটটির বেশী গান (পদাবলী) লিখিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।[১] তাহার মধ্যে দুইটি[২] খুব ভালো,

১ History of Brajabuli Literature পৃষ্ঠা ১৮ দ্রষ্টব্য।
২ পদকল্পতরু ৭৫১,১৩৯৯।

বৈষ্ণব-পদাবলীর শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম। পূর্বগামী পদাবলী-রসিকেরা, বোধ করি ভনিতায় পরিচিত নাম না দেখিয়া পদদুইটিকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথম গানে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ নাই, দ্বিতীয় গানে শুধু "রাই" আছে।

প্রথম গানে প্রেম বিপন্নার সর্বত্যাগী দুঃসাহসের অভিব্যক্তি :

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও
জিয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও।
নয়নপুতলী করি লইলোঁ মোহনরূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ
পিরীতি-আগুনি জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান।
না জানিয়া মূঢ়লোকে কি জানি কি বলে লোকে
না করিয়ে শ্রবণগোচরে
স্রোত-বিথার জলে এ তনু ভাসাইয়াছি
কি করিবে কুলের কুকুরে।
খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়
মুরারি গুপতে কহে পিরীতি এমতি হৈলে
তার যশ তিন লোকে গায়॥

দ্বিতীয় গানটিতে বিরহিণীর গভীর মর্মপীড়া প্রকাশিত। কবি যে চিকিৎসক-ব্যবসায়ী তাহাও জানা যায়।

কি ছার পিরীতি কৈলা জীয়ন্তে বধিয়া আইলা
বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই
শফরী সলিল বিন গোঙাইব কত দিন
শুন শুন নিঠুর মাধাই।
ঘৃত দিয়া একরতি জ্বালি আইলা যুগবাতি[৩]
সে কেমনে রহে অযোগানে[৪]
তাহে সে পবনে পুন নিভাইলো বাসোঁ হেন[৫]
ঝাট আসি রাহ পরাণে।
বুঝিলাম উদ্দেশে[৬] সাক্ষাতে পিরীতি তোষে[৭]
স্থান-ছাড়া বন্ধু বৈরী হয়
তার সাক্ষী পদ্ম-ভানু জল ছাড়া তার তনু
শুখাইলে পিরীতি না রয়।
যত সুখে বাড়াইলা তত দুখে পোড়াইলা
করিলা কুমুদবন্ধু-ভাতি[৮]
গুপ্ত কহে একমাসে দ্বিপক্ষ ছাড়িল দেশে
নিদানে হইল কুহূ-রাতি॥[৯]

৩ যে বাতি এক যুগ ধরিয়া জ্বলিবে, অর্থাৎ সুবৃহৎ প্রদীপ। অথবা যুগ্ম বর্তিকা, যুগল বাতি।

৪ তৈল না যোগাইলে। ৫ এমনি বুঝিতেছি।

৬ প্রকারান্তরে। ৭ দেখাদেখি হইলে প্রেম তৃপ্তি দেয়।

৮ চন্দ্রের দশা করিলে। চন্দ্র যেমন এক পক্ষ ধরিয়া বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাহার পরপক্ষে আবার ক্ষয় পাইতে থাকে, সেইরূপ পূর্বে তুমি আমাকে (রাধাকে) স্নেহ করিয়া বাড়াইয়া এখন বিরহে পোড়াইতেছ।

৯ একমাসের মধ্যে চন্দ্র দেশ ছাড়িল, অর্থাৎ লুপ্ত হইল। আর নিদানে অর্থাৎ রোগের সঙ্কটাবস্থায় অমাবস্যা আসিল। পীড়ার সঙ্কটাবস্থায় অমাবস্যা পড়িলে রোগীর জীবনের আশঙ্কা থাকে। এই উৎপ্রেক্ষাটি হইতে বোঝা যায় যে কবি চিকিৎসক বৈদ্য ছিলেন।

স্বামী সদানন্দ

[সেবাকার্য-প্রসঙ্গে]

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর অনেকেই জানেন যে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সর্বপ্রথম সন্ন্যাসী-শিষ্য স্বামী সদানন্দ। সাধারণতঃ গুপ্ত মহারাজ নামেই তিনি অভিহিত হইতেন। তাঁহার আকৃতি ছিল উন্নত, দীর্ঘ শরীরের অবয়ব—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিষ্ঠ, সতেজ পেশীবহুল, প্রসারিত বক্ষঃস্থল—গায়ের রং শ্যামবর্ণ, ঈষৎ উজ্জ্বল। কথাবার্তায় মাঝে মাঝে হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিতেন। স্বামীজী তাঁহাকে ডাকিতেন হিন্দীভাষীর মতো 'সদানন্দ্।' তিনিও হিন্দীতে উত্তর দিতেন, 'জী মহারাজ।' স্বামীজীর পোষাক-পরিচ্ছদ আবশ্যকীয় বিষয়ে যাহা করিবার, তাঁহাকে উপদেশ দিতেন; তিনিও তাহাই করিতেন। গুরু-শিষ্যের ব্যবহার আমাদের চোখে আকর্ষণীয় ছিল।

এই সময়েই স্বামী সদানন্দ মহারাজের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল, কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ হয় কলিকাতায় প্লেগের সেবা-কার্যের সময়। রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগের সেবা-কার্যের ইতিহাসে স্বামী সদানন্দের নাম চির-স্মরণীয়। প্রকৃতপক্ষে এই সেবাকার্যের তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। আমি প্রতিদিন বাগবাজারে বলরাম-মন্দিরে যাইতাম। এই সেবাকার্য-প্রবর্তনের জন্য স্বামীজীর আবেগপূর্ণ উৎসাহ বাক্য, কার্যের নির্দেশ এবং প্রতিরোধকল্পে তাঁর প্রাণের ব্যাকুলতা নিরীক্ষণ করিতাম, তবুও আমি সেবাকার্য করিতে আরম্ভ করি নাই। স্বামী সদানন্দই আমাকে তাঁহার সহিত কার্য করিতে আহ্বান করেন এবং তাহার সঙ্গে আমিও সেবাকার্য করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করি।

একদিন প্রাতঃকালে গ্রে স্ট্রিটে মেথরপাড়ায় দেখি স্বামী সদানন্দ কয়েকজন মেথর ছোকরাকে ডাকিতেছেন, আমি তখন বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া। তিনি আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এটা কি তোমাদের বাড়ী? আমি উত্তরে বলিলাম, 'হ্যাঁ মহারাজ'। তিনি আমাকে কখন 'ভেইয়া' কখন 'ভাই' বলিয়া ডাকিতেন। তিনি আমাকে বলিলেন, 'চল আমার সঙ্গে'। পাড়ার প্রত্যেক বাড়ীতে ভিতরের পায়খানা নর্দমা Disinfectant (রোগ-জীবাণুনাশক) ঔষধগুলি বালতির জলে গুলিয়া মেথর ছোকরা-দের দিয়া সাফ করাইতে আদেশ করিলেন।

কয়েকজন ভদ্র গৃহস্থ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাদের ভিতরে লইয়া গেলেন। স্বামী সদানন্দ আমার উপর উক্ত পল্লীর ভার দিয়া একটি মেথরদলকে সঙ্গে লইয়া অন্যত্র কাজ করিতে গেলেন। আমি কার্যকালে দেখি—অনেক ভদ্রলোক ব্যঙ্গ বা তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাদের জ্যাঠামি করতে হবে না। ঔষধগুলি আমাদের দিয়ে দাও, তোমাদের বাড়ীতে ঢুকতে হবে না।' কেহ বলিলেন, 'যাও যাও ছোকরা বাড়ীতে গিয়ে পড়াশুনা করগে যাও, তোমার এখানে মুরুব্বিগিরি করতে হবে না' ইত্যাদি। কিন্তু আমরাও নাছোড়-বান্দা—তর্ক আলোচনা করিয়া কতক বাড়ীতে কাজ করিলাম, আবার কতক বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেয় নাই।

এই সব কাজ করিয়া ফিরিয়াছি, তখন বেলা প্রায় দুইটা—দেখি গুপ্ত মহারাজ আমাদের

বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া আছেন। তাঁকে সব কথা জানাইলাম। তিনি সব শুনিয়া বলিলেন, 'ওতে ভয় পেও না। সমাজের এই অবস্থা। আমাদের তথাকথিত শিক্ষিতেরা নিজেদের ভাল-মন্দ বুঝতে শেখেনি। কাজ ক'রে যাও।'

পরদিন তিনি আমাদের দরজীপাড়ায় যাইতে বলিলেন। সেখানেও সেই এক অবস্থা! ধনী লোকেরা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। গুপ্ত মহারাজ শুনিয়া বলিলেন, 'কাল বস্তিগুলি দেখতে হবে। চল, কাঠমার বাগানে কাল ভোরে কাজ করতে হবে—আমিও তোমাদের সঙ্গে কাজ ক'রব।' অতি প্রত্যুষে মেথর-জমাদার যোগাড় করিয়া তিনি আমাকে ডাকিলেন।

কাঠমার বাগানের বস্তি—প্রকাণ্ড বস্তি, মস্জিদবাড়ী স্ট্রিটে। বাইরে মুদিখানার আর খাবারের দোকান ইত্যাদি। ভিতরের দৃশ্য ভয়াবহ দুর্গন্ধময়, আর দরিদ্র শ্রমজীবীদের দারুণ দারিদ্র্যের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছিল। যেদিকে উৎকট দুর্গন্ধ, গুপ্ত মহারাজ সেইখানে আমাদের ডাকিয়া লইলেন। বস্তির সংলগ্ন একটা সংকীর্ণ খালি জমি—সেখানে স্তূপাকার আবর্জনা। এই খালি জমির পাশেই দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকাশ্রেণী। যতকিছু আবর্জনা সব পচিয়া দুর্গন্ধ!

গুপ্ত মহারাজ দুঃখ ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়া হিন্দীতেই বলিতে লাগিলেন—উক্ত অট্টালিকা-বাসীদের উদ্দেশ্য করিয়া গালিগালাজ দিয়া বলিলেন: দেখছ—এই তো ভদ্র সমাজের কাণ্ড। এই সব রোগের বীজ এই গরীবদের বাসস্থানে ফেলে মহামারীর বীজ ছড়াচ্ছে। প্লেগ বসন্ত কলেরা—যতকিছু ব্যারাম এই আবর্জনা পচে হয়।

মেথরদের তিনি কোদাল-ঝুড়ি নিয়ে ময়লা-গুলি বড় রাস্তায় ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন, —তাহারা উহা পরিষ্কার করিতে অস্বীকার করিল। গুপ্ত মহারাজ তখন তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন: বেশ ভেইয়া—তোমরা ব'সে ব'সে দেখ, আমরা সাফ করছি।

তাদের একটা বড় ঝুড়ি আমাকে আনিতে বলিলেন এবং তিনি নিজে কোদাল লইয়া উহা ভরতি করিয়া আমাকে রাস্তায় ফেলিতে বলি-লেন। আমি তাঁহার আদেশে একটা চাদর মাথায় বাঁধিয়া ঝুড়ি বহিয়া ময়লা রাস্তায় ফেলিয়া দিলাম। মেথরেরা হাঁ করিয়া দেখিতেছে! দুই তিনবার এইরূপ করিবার পর দেখি, তাহারা বসিয়া পরস্পর কি বলাবলি করিতেছে। আমি আসিতে না আসিতেই গুপ্ত মহারাজ আর একটা ঝুড়ি ভরতি করিয়া রাখিয়াছেন!

এই রকম ৮।১০ বার করিবার পর দেখি, মেথরের দল স্বামী সদানন্দের পায়ে ধরিতেছে এবং কাঁদকাঁদভাবে বলিতেছে, 'বাবাজী মহা-রাজ—আমাদের ক্ষমা করুন, কোদাল আমাদের দিন, আমরা সব পরিষ্কার করছি।'

তিনি হিন্দীতে বলিতেছেন: না—না আমরা সাফ ক'রব, তোমরা ব'সে ব'সে দেখ—আমি তোমাদের যে মজুরি দেব বলেছি তা সন্ধ্যাবেলায় প্রতিদিনের মতো দেব।

কিন্তু তারা স্বামী সদানন্দের পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'না–না বাবাজী, তুমি যখন ক'রছ তখন আমরা করতে পারব না কেন?' শেষে কোদালটি একরকম কাড়িয়া লইল এবং আমার হাত হইতে ঝুড়িটি লইতে গেল। আশ্চর্য তাহারাও তখন মহা উৎসাহে কাজ করিতে লাগিল।

স্বামী সদানন্দ মহারাজ আমাকে একপাশে লইয়া বলিলেন: দেখছ ভেইয়া—ভদ্রলোকদের চেয়ে এদের প্রাণ কতটা তাজা। তুমি ক'রছ তো ক'রছ—তারা গ্রাহ্যও করে না। মুখে হয়তো কেউ বলবে, 'বেশ মশায়—বেশ কাজ করছেন'।

এই পর্যন্ত। দেখ প্রাণে লাগলো বলেই হাত থেকে ঝুড়িকোদাল কেড়ে নিয়ে এরা কাজ আরম্ভ ক'রে দিলে।

আমি বলিলাম, 'এতো পাহাড়প্রমাণ আবর্জনার স্তূপ কতদিনে শেষ হবে?' তিনি বলিলেন, 'এই বস্তির কাজ শেষ হ'তে ৮।১০ দিন লাগবে। এস আমরা দাঁড়িয়ে থাকি কেন? রোগজীবাণুনাশক ঔষধগুলি বালতিতে গুলে ছড়িয়ে দিই।'

বস্তিবাসীরা এই সব দেখিয়া নির্বাক্, বিস্ময়াবিষ্ট। তাহারা একে একে তাহাদের দুঃখদুর্দশার কথা জানাইতে লাগিল। স্বামী সদানন্দের মুখ-চোখ দেখিয়া বোধ হইল—সমবেদনায় তিনি ব্যথিত। তখন তিনি কাহাকেও চাউল বা পথ্যাদির জন্য সাহায্য করিলেন।

সন্ধ্যাবেলায় যখন আমরা ফিরিতেছি, তখন সেই সব মেথরদের জন্য খাবার ও মিঠাই আনিয়া দিতে লাগিলেন, কাহাকেও ছোট ছেলেদের পিঠ চাপড়াইবার মতো আদর করিতেছেন, কাহাকেও বকসিস দিতেছেন—তাহাদের দিনমজুরির টাকা দিবার পর।

এই অপূর্ব ভাব দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিল। আমি বলিলাম—আপনি তো কিছু খাননি। কিছু আহারের ব্যবস্থা করি। তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'নেই ভেইয়া, বেশ ঠাণ্ডা জল আন—তুমিও স্নান ক'রে কিছু খাও, সারাদিন উপবাসে রয়েছ।' আমি তাঁকে এক গ্লাস ডাবের জল আনিয়া দিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, 'স্বামীজীর কথা কাজে পরিণত করাই—তাঁকে দর্শন করার ও তাঁর উপদেশ শোনার সার্থকতা।'

শ্রীশ্রীমায়ের কাছে

ভক্ত নলিনীকান্ত বসু

শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দর্শন পাই জয়রামবাটীতে বাংলা ১৩১৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। ইতিপূর্বে শ্রীমায়ের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতাম না, তখনকার মনের অবস্থায় জানারও বিশেষ কারণ ছিল না। তখন ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া তাঁহাদের ভাবেই ভাবিত হইতেছিলাম। দেবদেবীর পূজা-অর্চনা পৌত্তলিকতা, উহাতে কোন সত্য নাই এইরূপই ধারণা ছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ ভক্তদের পৌত্তলিক বলিয়াই ভাবিতাম। শ্রীভগবানের অপার কৃপায় এই মোহ দূর হইতে বেশী দেরী হয় নাই।

একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত একজন অন্তরঙ্গ ভক্তের দর্শন পাই। তাঁহার কথায় এবং ভক্তোচিত আকৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া প্রায়ই তাঁহার নিকট যাইতাম। তাঁহারই উপদেশে মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বর এবং বেলুড় মঠে যাতায়াত আরম্ভ করি। ক্রমশঃ সাধুদের স্নেহ করুণা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি টান অনুভব করিতে থাকি। সাধু ভক্তদের সঙ্গগুণে ঠাকুরকেই আপনার মনে হইতে থাকে। নিশিদিন ভগবৎপ্রেমে মাতোয়ারা, কাম-কাঞ্চন-ত্যাগী, সত্যনিষ্ঠ, সরলতা ও করুণার মূর্ত প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ভক্তেরা যে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা ঠিক বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। একাধারে এত গুণ কোন মানুষে সম্ভব নহে।

এইরূপে ধীরে ধীরে দীক্ষার জন্য মন ব্যাকুল হয়। শুনিয়াছিলাম—ঠাকুরের সময়-কার যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমা-ই সর্বশ্রেষ্ঠ। আরও যখন শুনিলাম যে শ্রীমা কোন কোন ভাগ্যবান্‌কে দীক্ষাও দিয়া থাকেন, তখন শ্রীমাকে দর্শন করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিল। শ্রীমায়ের উদ্বোধন-বাড়ী তখনও হয় নাই। অধিকাংশ সময়ই তিনি জয়রামবাটীতে থাকেন। সেখানে যাওয়ার একাধিক রাস্তা ভক্তদের নিকট জানিয়া লইয়া বিষ্ণুপুর হইয়া যাওয়াই স্থির করিলাম।

সেই সঙ্কল্পানুসারে একদিন হাওড়া হইতে ট্রেনে চাপিয়া রাত্রি ১২টা।১টার সময় বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। বিষ্ণুপুর হইতে জয়রাম-বাটীতে যাওয়ার তখন কোন বাস বা অন্য কোন যানবাহন ছিল না। হয় পদব্রজে, না হয় গরুর গাড়ীতে যাইতে হইত। ভাগ্যক্রমে একজন গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান পাওয়া গেল। সে আমাকে কোতলপুর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে রাজী হইল। তখনই বিছানাপত্র সহ তাহার গাড়ীতে উঠিলাম। খুব সকালে কোতলপুর পৌঁছিয়া, এই গাড়োয়ানের সাহায্যে একটি কুলী ঠিক করিয়া তাহার মাথায় বিছানাপত্র দিয়া জয়-রামবাটী রওনা হইলাম। কুলীটি জয়রামবাটীর অনেক কিছু সংবাদ জানে, বুঝিলাম।

আজ শ্রীমায়ের দর্শন পাইব—এই আনন্দে মন ভরপুর। পথের দুধারে গাছপালা ঘরবাড়ী যাহা যাহা দেখিতেছি—তাহাতেই যেন আনন্দ। মনে মনে একটু শঙ্কাও হইতে লাগিল, শ্রীমাকে কিভাবে কি বলিব, তিনি কি ভাবিবেন, আমার যাওয়াতে তাঁহার কোন অসুবিধা হইবে না তো—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে চলিতে চলিতে জয়রামবাটী আসিয়া গেলাম।

এই সেই জয়রামবাটী—যেখানে শ্রীমা এখনও নরদেহে বর্তমান, শ্রীমা তখন বড়মামার (প্রসন্ন মামার) বাড়ীতে থাকেন, নিজের বাড়ী তখনও হয় নাই। পূর্বদিকের দরজা দিয়া কুলীটি আমাকে একেবারে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল।

আমাদের দেখিয়া একটি প্রশান্ত করুণাময়ী মূর্তি কাছে আসিলেন, দেখিয়াই মনে মনে বুঝি-লাম ইনিই আমাদের মা। আরও কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথা থেকে আসছ?'

—কলকাতা থেকে, আমাদের মা এখানে থাকেন, তাঁকে দর্শন করতে এসেছি।

—আমিই তো তোমাদের মা, বাবা!

সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করিলাম।

—তোমার বিছানা বৈঠকখানা ঘরে রেখে এস, পরে সব শুনব।

শ্রীমায়ের জন্য কলিকাতা হইতে আনীত মিষ্টি তাঁহার হাতে দিয়া, বিছানা বৈঠকখানা-ঘরে রাখিয়া কুলীকে বিদায় করিয়া পুনরায় মায়ের কাছে গেলাম। শ্রীমা ততক্ষণ দরজার ধারেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। কাছে যাইতেই বলিলেন, 'এবার বলো কিজন্য এসেছ?'

—আপনাকে দর্শন করতে, আর জয়রামবাটী ও কামারপুকুর দর্শন করতে।

মায়ের প্রসন্ন দৃষ্টি, মৃদু মৃদু হাসিমুখ। অপূর্ব এবং অবিস্মরণীয় দৃশ্য। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর কিছু?' বুঝিলাম, আমার দীক্ষা লওয়ার গোপন ইচ্ছাটি বুঝিয়া ফেলিয়াছেন। বলিলাম, 'মা, শ্রীশ্রীঠাকুরের একটু নাম করার ইচ্ছা হয়, কিন্তু কেমন ক'রে করতে হয় তা তো জানি না। আপনি যদি দয়া ক'রে ব'লে দেন, তা হ'লে বেশ হয়।' 'আচ্ছা তালপুকুরে স্নান ক'রে এস'—এই কথা বলিয়া পথ দেখাইয়া দিলেন। কিছু দূর গিয়াই একটা পুকুর পাইলাম। এইটি তালপুকুর কিনা জানি না। নিকটে লোকও

নাই যে জিজ্ঞাসা করি। পুকুরের পাড়ে কয়েকটি তালগাছ দেখিয়া ঐটিই তালপুকুর ভাবিয়া তাহাতে স্নান করিলাম, পরে শুনিলাম—ঐটিই তালপুকুর।

বৈঠকখানা-ঘরে ভিজা কাপড় ছাড়িয়া মায়ের কাছে যাইতেই মা আমাকে তাঁহার ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে দুখানা আসন পাতা ছিল, মা একখানাতে বসিয়া আমাকে অন্যখানায় বসিতে বলিলেন, বসিলে মা আমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তর শুনিয়া 'ঠিক হয়েছে' বলিয়া মহামন্ত্র দান করিলেন, এবং কি করিয়া জপ করিতে হয়—নিজ করে জপিয়া দেখাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকার পর মায়ের আদেশে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সামনের ঘরের দাওয়ায় গিয়া বসিলাম।

একটু পরে মা মুড়ি আনিয়া খাইতে দিয়া বলিলেন, 'বাবা, এখানে এ ভিন্ন ভাল জলখাবার কিছু পাওয়া যায় না। এই খাও।' আমি বলিলাম, 'কলকাতার কথা আলাদা, দেশে পাড়া গাঁয়ে আমরা ঐ সবই তো খাই, মা।'

লক্ষ্য করিলাম শ্রীমা যেন পা একটু টান করিয়া হাঁটিলেন। মনে মনে ভাবিতেছি, মায়ের পা একটু বাঁকা বোধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাইলাম, 'বাবা, অনেকদিন বাতে ভুগে ভুগে ঠিক ভাবে চলতে পারি না।' আমি তো অবাক্! কি করিয়া মা আমার মনের কথা বুঝিলেন। বাতের ঔষধ পাঠাইতে চাহিলে মা বারণ করিয়া বলিলেন যে তিনি অনেক ঔষধ ব্যবহার করিয়াও কোন উপকার পান নাই। মুড়ি খাইবার কিছুক্ষণ বাদে ঐ একই দাওয়ায় বসিয়া ভাত খাইয়া সেই বৈঠকখানায় যাইয়া একটু বিশ্রাম করার পর গ্রামের এদিক ওদিক একটু ঘুরিয়া আসিলাম।

মনে মনে ভাবিতেছি যে মা তো এত কৃপা করিলেন, দয়া করিয়া এখন যদি তাঁহার পায়ে একটু হাত বুলাইয়া দিতে বলেন তবে কৃতার্থ হই। সন্ধ্যার পর শ্রীমা তাঁহার শয়ন-ঘরে পূর্বদিকে মাথা রাখিয়া শুইয়া আমাকে ডাকাইলেন। যাইতেই বলিলেন, 'বাবা, আস্তে আস্তে একটু পা টিপে দাও তো।' আমি তো স্তম্ভিত! শুনিয়াছিলাম মা অন্তর্যামী। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ একই দিনে তিনবার পাইলাম। তক্তাপোশের নীচে পশ্চিম দিকে বসিয়া মায়ের পা টিপিতেছি, তাঁহার অপার কৃপার কথা ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে ধারা বহিতেছে। কখনও পা টিপিতেছি, কখনও পায়ে হাত বুলাইতেছি, কখনও বা সেই পা-দুখানি নিজের মাথায় ঠেকাইতেছি, কেমন যেন হইয়া গিয়াছি! কিছু সময় বাদে মা বলিলেন, 'হয়েছে, আর না।' পরে মাকে বলিলাম, 'এবার আমার দেরি করবার উপায় নেই, কালই কামারপুকুর দর্শন ক'রে আসার ইচ্ছা।' মা বলিলেন, 'বেশ, তাই হবে।'

পরদিন সকালে মাকে প্রণাম করিয়া কামারপুকুর রওনা হই। কলিকাতা হইতে মায়ের জন্য যে মিষ্টি আনিয়াছিলাম, তাহা হইতে আমার হাতে কিছু দিয়া মা বলিলেন, 'রঘুবীরকে দিও এবং সেখানে রাত্রিবাস কোরো।'

ডোঙায় আমোদর পার হইয়া হাঁটা পথে কামারপুকুর যাইতে যাইতে মানিকরাজার আম্রকানন দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। তখন ইহার স্বাভাবিক দৃশ্য অতি সুন্দর ছিল। দেখিলেই চক্ষু জুড়াইত। এখানেই শ্রীশ্রীঠাকুর খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে কতভাবে লীলাখেলা করিয়াছেন। এখন আর মানিকরাজার সে আম্রকানন নাই। গাছ কাটিয়া এখন জমি করা হইয়াছে। বিক্ষিপ্তভাবে ৩/৪টি আমগাছ মাত্র এখনও আছে।

তারপর ভূতির খাল। এই শ্মশানে ঠাকুর রাত্রে কত রকম সাধন-ভজন করিয়াছেন। এখন খালে পুল হইয়াছে, তখন ছিল না।

ভূতির খালের অনতিদূরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাড়ী। বেলা আন্দাজ ৯টায় সেখানে পৌঁছি। পূজনীয় রামলাল দাদা, লক্ষ্মীদিদি, শিবুদা তখন দক্ষিণেশ্বরে, বাড়ীতে থাকিতেন এক বৃদ্ধা মামীমা। তিনি মন্দিরে ভোগরাগাদির বন্দোবস্ত করিতেন। শ্রীশ্রীরঘুবীরের জন্য শ্রীমায়ের দেওয়া মিষ্টি তাঁহার হাতে দিয়া প্রথমে রঘুবীরকে এবং পরে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। শান্ত নির্জন স্থান। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতি-বিজড়িত লীলা-স্থান দর্শনে মন আনন্দে আপ্লুত হইল।

একটু বিশ্রাম করিয়া তখনই ঠাকুরের জন্মস্থান (ঢেঁকিশাল—এখন যেখানে তাঁহার মন্দির হইয়াছে), তাহার পূর্বদিকে ছোট পুকুর, যাহার পাড়ে ঠাকুরের নিজহাতে রোপিত একটি আমগাছ আছে, যুগীদের শিবমন্দির, হালদারপুকুর ইত্যাদি স্থান—একে একে দর্শন করিতে লাগিলাম। মন অনির্বচনীয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল। ফিরিয়া আসিয়া স্নানাহার এবং একটু বিশ্রাম করিয়া ধারে-কাছে কতক কতক স্থান দেখিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রে আহারের পর মামীমা আমাকে ঠাকুরের ঘরেই রাত্রিবাস করিবার নির্দেশ দিলেন। শুইয়া শুইয়া ঠাকুরের নানা লীলা-খেলার কথা চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সকালে জয়রামবাটী ফিরিয়া মাকে সব কথা বলিলাম। সেদিন জয়রামবাটীতে থাকিয়া পরদিন সকালে ফিরিবার পালা। শ্রীমা ঘরের দাওয়ায় চরণযুগল মাটিতে রাখিয়া বসিয়া আছেন। যাত্রাকালে মাকে প্রণাম করিতেছি; এই দুদিনেই মা বড় আপনার হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিতে মনে খুব কষ্ট হইতেছে! প্রণাম করিবার সময় মা যে আমার মাথায় কর জপ করিতেছেন—তাহা প্রথমে বুঝি নাই, মাথা তুলিতেই তাঁহার পদ্মহস্ত যখন মাথায় ঠেকিল তখন বুঝিলাম। মা মধ্যে মধ্যে চিঠি দিতে বলিলেন, বিশেষ করিয়া বলিলেন, 'যা ব'লে দিয়েছি তা (অর্থাৎ মহামন্ত্রটি) কাউকে ব'লো না।' তখন বিষয়-বুদ্ধি খুবই কম ছিল, তাই বুঝি মা সতর্ক করিয়া দিলেন। আমি কুলীর সঙ্গে অগ্রসর হইতেছি, আর মা একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া আছেন। কি করুণ সে চাহনি! ক্রমে তাঁহার দৃষ্টির বাহিরে আসিয়া পড়িলাম।

ইহার পর প্রায় আড়াই বৎসরের মধ্যে আর শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পাই নাই। চিঠিপত্রাদি তাঁহাকে লিখিতাম, উত্তরও পাইতাম। ১৯০৯ খৃঃ বাংলা ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে উদ্বোধন-বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা প্রথম পদার্পণ করেন। তখন প্রায় প্রত্যহই ঐ বাড়ীতে যাইতাম এবং সুবিধামত দোতলায় গিয়া মাকে প্রণাম করিতাম, কোনদিন বা নীচে থেকেই তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিতাম।

বিজ্ঞপ্তি ঃ

কার্তিকের পত্রিকা ঐ মাসের মাঝামাঝি পৌঁছিবে। তৃতীয় সপ্তাহেও না পাইলে জানাইবেন।—**কার্যাধ্যক্ষ**

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

বোম্বাই ঃ রামকৃষ্ণ মিশন শাখা-কেন্দ্রের ১৯৫৭ ও '৫৮ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৩ খৃঃ প্রতিষ্ঠা-কাল হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ ও বেদান্তের সার্বভৌম ভাব শিক্ষা ও সেবামূলক কর্মের মাধ্যমে বোম্বাই শহরে ও রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এই কেন্দ্র কর্তৃক প্রচারিত হইতেছে। গত দুই বৎসরে বিশিষ্ট পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ্‌গণের দ্বারা গীতা, বেদান্ত-দর্শন, উপনিষৎ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বাণী, বাল্মীকি-রামায়ণ ও বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ে ৩২৮টি ('৫৭ খৃঃ ১৬১টি) আলোচনা ও বক্তৃতা-সভার ব্যবস্থা হয়। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ বোম্বাই শহরে এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও পাকিস্তানে জনসভায় ১৬০টি ('৫৭ খৃঃ ৫৯টি) বক্তৃতা দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব এবং শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট ও শংকরাচার্যের জন্মতিথি যথারীতি অনুষ্ঠিত ও উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজাও সাড়ম্বরে এবং শুচিসুন্দর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বর্তমানে শিবানন্দ-গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৭,৪০০, '৫৮ খৃঃ ২,০০০ বই পঠনার্থে প্রদত্ত হইয়াছিল। পাঠাগারে ৭০টি দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা লওয়া হইয়া থাকে। ১৯৫৭-৫৮ খৃঃ ছাত্রাবাসে ৮০ জন ছাত্র ভরতি করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৬৫ জন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা দেয় এবং ৪১ জন উত্তীর্ণ হয়।

আশ্রমের দাতব্য চিকিসালয়ে চিকিৎসিতের সংখ্যা :

সংখ্যা :	১৯৫৭	'৫৮
হোমিওপ্যাথিক বিভাগ	১,৬৬,৯৭৯	১,৩৫,৩৯২
অ্যালোপ্যাথিক "	৪৫,৩৪৭	৩১,১০২
আয়ুর্বেদিক "	১১,৪৮৭	১১,৯০০
বহির্বিভাগে মোট	২,২৩,৮১৩	১,৭৮,৩৯৪
অন্তর্বিভাগে	৫১	২৮

আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে রোগনির্ণয়-পরীক্ষাগারে ৮১০ ও ৯১৪টি নমুনা পরীক্ষা এবং এক্স্-রে বিভাগে ৯,৩১৭ ও ৫,০৪৬ জন রোগী পরীক্ষা করা হয়। সাধারণ অস্ত্রচিকিৎসা—২,০৭১ ও ২,৪৪৪টি এবং বিশেষ অস্ত্রচিকিৎসা—১২ ও ৮টি। চক্ষু ও দন্ত বিভাগে '৫৮ খৃঃ ৫,৪৪৮ ও ৪০২ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-জন্মোৎসব

মাদ্রাজ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ২রা ও ৯ই আগষ্ট পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর ৯৭তম শুভ জন্মোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ২রা আগষ্ট রবিবার জন্মতিথি-দিবসে প্রত্যূষে মঙ্গলারতি ও ভজনের পর রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ গীতা ও উপনিষদ্ আবৃত্তি করে। অতঃপর নবনির্মিত রান্নাঘর ও প্রশস্ত ভোজনাগারে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ভোগারতি ও হোমের পর নরনারায়ণ-সেবা হয়। সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও ভজনের পর আয়োজিত সভায় বক্তাগণ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর জীবনের বিভিন্ন দিক্ তামিল ও ইংরেজীতে আলোচনা করেন।

৯ই আগষ্ট রবিবার সকালে নূতন ভোজনাগারে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত হয়, পূজা ও রামনাম-সংকীর্তনের পর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ আনুষ্ঠানিক ভাবে উহার উদ্বোধন করেন এবং সমবেত ভক্ত নরনারীকে আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন সম্বন্ধে সারগর্ভ একটি ভাষণ দেন।

অপরাহ্নে তামিলে প্রহ্লাদচরিত্র-বিষয়ক হরি-কথার পর স্বামী চিদ্ভবানন্দ বাংলায়, বিবেকানন্দ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরাঘবশাস্ত্রী ইংরেজীতে এবং সভাপতি স্বামী মাধবানন্দজী তাঁহার ব্যক্তিগত স্মৃতি হইতে পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর জীবনের অনেক ঘটনা বিবৃত করিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন। সভার কার্য সমাপনান্তে 'শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপা এমেচার' সুমধুর ভজন গান করেন। সভায় প্রায় এক হাজার নরনারী উপস্থিত ছিলেন।

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার

সানফ্রান্সিস্কো: প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় এবং বুধবার রাত্রি ৮টায় বেদান্ত-সোসাইটির নিজস্ব ভাবণগৃহে স্বামী অশোকানন্দ, স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন:

এপ্রিল: মন—চেতন ও অধিচেতন, ধ্যানের ফল, প্রেমের মাধ্যমে জ্ঞান, ধর্ম—ঈশ্বরানুভূতির কলা ও বিজ্ঞান, অদ্বৈতবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগ, খৃষ্টীয় বনাম বৈদান্তিক দৃষ্টিতে মানুষ, বৈদান্তিক দৃষ্টিতে মৃত্যু, 'আমি'র স্বরূপ, চঞ্চল মন শান্ত করিবার উপায়।

মে: মন ও ইহার অবস্থাসকল, বেদান্তের মহান্ আচার্য শঙ্কর, কিভাবে অনাসক্তি অভ্যাস করিতে হয়, মানুষ ও ঈশ্বরের অজ্ঞাত সম্বন্ধ; তুমিও ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট হইতে পার; ধর্মের বিজ্ঞান বনাম বিজ্ঞানের ধর্ম; বিশ্বাস ও ভক্তির গূঢ় অর্থ; আমিই পথ, সত্য এবং জীবন।

জুন: পবিত্রতালাভের উপায়, অনাসক্তি অভ্যাস; জ্ঞান, প্রজ্ঞা, স্বজ্ঞা, বুদ্ধ ও তাঁহার মানব-ধর্ম, বিশ্বাস যখন শক্তিতে পরিণত হয়। মন কেন তার গতি অনুযায়ী চলে? বেদান্ত ও খৃষ্টধর্ম, মহাজাগতিক জ্ঞান।

জুলাই: স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির স্বরূপ, কিরূপে আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসিতে পারি? ঈশ্বরানন্দের মাধ্যমে জীবনানন্দ, গুরু ও দীক্ষা; মানবীয় চেতনা-রহস্য।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে নলিনীকান্ত বসু

গত ৫ই ভাদ্র, শনিবার সকাল ৭টা ১২মিঃ সময় ৭৯ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য নলিনীকান্ত বসু বাগবাজারে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত ৩।৪ মাস যাবৎ শ্বাসকষ্টে এবং বার্ধক্যজনিত পীড়ায় তিনি ভুগিতেছিলেন। শেষ দিন সকালে নিত্যকর্ম সারিয়া তিনি সযত্নে সংরক্ষিত শ্রীশ্রীমায়ের চরণধূলি ও চরণামৃত গ্রহণ করেন এবং ইষ্টনাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন।

১৮৭৯ খৃঃ আশ্বিন মাসে যশোহর জেলার কোলা-দিঘলিয়া গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার মাতা পরম ভক্তিমতী ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার মধ্যে বাল্যকাল হইতেই ধর্মভাব লক্ষিত হইত। কলেজে শিক্ষাকালেই তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। জীবিকাহিসাবে কোন চাকরি গ্রহণ না করিয়া তিনি শাল ও সেগুনের কাঠের ব্যবসা করেন। ১৯০৫।৬ খৃঃ স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। ইহার পর তিনি শ্রী'ম'-এর সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁহার পুণ্য সঙ্গলাভে ধন্য হন।

এই সূত্রে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের সহিতও পরিচিত হন। ১৯০৭।৮ খৃঃ তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ করেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। এই সংখ্যায় অন্যত্র তাঁহার স্মৃতিকথা 'শ্রীশ্রীমায়ের কাছে' প্রকাশিত হইল।

পরলোকে প্রভাময়ী মিত্র

গত ১০ই শ্রাবণ, সোমবার (ইং ২৭শে জুলাই, ১৯৫৯) ভূতপূর্ব জেলা জজ ৺সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের পত্নী সুলেখিকা প্রভাময়ী মিত্র পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের কৃপাধন্যা। ত্যাগ ও সেবার আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিতা ছিলেন।

পরলোকে প্রহ্লাদচন্দ্র বসু

'বসু ব্যানার্জি এণ্ড কোং' নামক কলিকাতার সুপরিচিত অডিট ফার্মের অন্যতম অংশীদার, চার্টার্ড একাউণ্টেণ্ট ও অডিটার প্রহ্লাদচন্দ্র বসু প্রায় দুই মাস কঠিন মূত্রবিকার রোগে ভুগিয়া গত ১লা সেপ্টেম্বর ৫৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মূলকেন্দ্রের এবং বহু শাখা-কেন্দ্রের তিনি হিসাব-পরীক্ষক ছিলেন। তাঁহার সরল সুন্দর সহজাত ভক্তিভাব, বন্ধুবাৎসল্য, অমায়িকতা ও সেবাপরায়ণতার জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। তাঁহার পূর্বনিবাস ছিল ঢাকা জিলার কেওটখালি গ্রামে, দেশবিভাগের পর তিনি হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বরে নবনির্মিত সারদাপল্লীতে বসবাস স্থাপন করেন। পল্লীর সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করিতে-ছিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্তা সহধর্মিণী ও পুত্রকন্যাকে আমাদের অন্তরের সমবেদনা জ্ঞাপন করত প্রার্থনা করি, ভক্তের আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিদেশে ভারতীয় ছাত্রসংখ্যা

ব্রিটেনে :

বিদেশী ছাত্র	৪০০,০০	(কমনওয়েলথ-২৭,০০০)
বিভিন্ন বিভাগে	মোট	ভারতীয়
যন্ত্রশিল্পে	৬,৮০০	১,১৩৪
শিক্ষাবিজ্ঞানে	৭৩০	৫২
পুরা ছাত্র বা গবেষণায়	৭,০১৩	১,৪৫৭

যুক্তরাষ্ট্রে :

বিদেশী ছাত্র	৫৭,০৪৫	৩,১৯৮

বিষয়ানুযায়ী—ইঞ্জিনিয়রিং ২৩%, হিউ-ম্যানিটিজ ২০%; অবশিষ্ট প্রাকৃতিক ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এবং ব্যবসা-পরিচালনায়।

হরপ্পা-ধাঁচের গ্রাম আবিষ্কার

বোম্বাই রাজ্যের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের উদ্যোগে রাজকোট জেলার শ্রীনাথগড়ের নিকট সম্প্রতি একটি হরপ্পা-ধাঁচের গ্রাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভাদর নদীর তীরে ১০০০ ফুট× ৩০০ ফুট পাথরের প্রাচীরঘেরা গ্রামটি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান এখানে মিলিবে। নদীর তীরে এরূপ অনেকগুলি ছোট ছোট বসতি ছিল।

সর্বপ্রাচীন বসতির ও কৃষ্টির নিদর্শন পাওয়া যায় উঁচু মৃত্তিকা-প্রাচীরের অভ্যন্তরে, সম্ভবতঃ এই প্রাচীর বাঁশের সাহায্যেই খাড়া করা হইত। মাটির উপর চাটাইএর ছাপ দেখিয়া প্রত্ন তাত্ত্বিকেরা মনে করেন বাঁশের চাটাইএ মাটি মাখাইয়া এই সব ঘরের ছাদ করা হইত।

এই প্রাচীন অধিবাসীরা নরম পাথরের দানা প্রস্তুত করিয়া তাহার মালা গাঁথিতে পারিত, শঙ্খ ও তামার বালা পরিত, একটু ভাল পাথরের চৌকা আকারের বাটখারা ব্যবহার করিত। বাটী থালা ও কলসীর কানাগুলি বুটিদার। আর এক বিশেষ ধরনের মাটির প্রস্তুত পাত্রও কিছু দেখা যায়, এক জোড়া সোনার আংটি ও এক জোড়া সোনার ইয়ারিং ঐস্থানে পাওয়া গিয়াছে।

খননের দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নততর সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়: বাড়ীঘর মাটি ও পাথরের, স্নানাগার রান্নাঘর এবং বারান্দা দেখা যায়। জ্যামিতিক আকৃতি-বিশিষ্ট মাটির বাসন, ছোট ছোট পাথরের ফলা, তামার অস্ত্র—যথা বাটালি, বঁড়শি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে।

তৃতীয় পর্যায়ে দেখা যায়—বাড়ীঘর সম্পূর্ণ-ভাবে পাথরের তৈয়ারী এবং বাসনপত্র প্রভাস পাটনে সোমনাথের নিকট আবিষ্কৃত বাসনপত্রের অনুরূপ।

উদ্বোধন

কে তুমি মা?

কা ত্বং শুভে শিবকরে সুখদুঃখহস্তে
আঘূর্ণিতং ভবজলং প্রবলোর্মিভঙ্গৈঃ।
শান্তিং বিধাতুমিহ কিং বহুধা বিভগ্নাম্
মাতঃ প্রযত্নপরমাসি সদৈব বিশ্বে॥

[স্বামী বিবেকানন্দ-কৃত 'অম্বাস্তোত্রম্'—১ম শ্লোক]

কে তুমি মা, মঙ্গলময়ি, কল্যাণকারিণি! এক হাতে সুখ,
আর এক হাতে দুঃখ বিতরণ করিতেছ,—কে তুমি?

সংসার ও সমাজ অভাবনীয় ঘটনাস্রোতে নব নব প্রবল
চিন্তাতরঙ্গসম্পাতে মুহুর্মুহুঃ আঘূর্ণিত—বিপর্যস্ত।

সর্বদা নানা প্রকারে ভগ্ন শান্তিকে জগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত
করিতেই কি তুমি আজ এত যত্নপর হইয়াছ?

*　　*　　*

বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্বাঘাতজনিত বৈষম্য দূরীভূত করিয়া
সাম্য প্রতিষ্ঠা করাই কি শান্তি?

শুভ ও অশুভ শক্তির অফুরন্ত সংগ্রাম—
সেও কি তোমারই ইচ্ছা?

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গকে আমরা ৺বিজয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

বিজয়া

জীবন সংগ্রাম এবং সংগ্রামই জীবন। সংগ্রাম শেষে হয় সিদ্ধি, নয় মৃত্যু। সিদ্ধি—সে তো এক উচ্চতর জীবনের সূচনা, আর মৃত্যু—সে তো নবতর এক জীবনের প্রস্তুতি।

যে জীবন আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে বিস্তৃত, তার সবখানিই সংগ্রাম, কোথাও এতটুকু শান্তি নাই, এতটুকু স্বস্তি নাই। সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দন ঘোষণা করে তার সংগ্রাম পৃথিবীর এই পরিবেশের সহিত, প্রতিকূল আবহাওয়ার সহিত, প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের আস্ফালন—সে তার রণহুঙ্কার,—বীরভোগ্যা বসুন্ধরাকে জয় করিয়া ভোগ করিবার। অভিজ্ঞ প্রৌঢ়ের ধীর পদবিক্ষেপ জীবনযুদ্ধে জয়লাভেরই শেষ কৌশল।

* * *

ব্যক্তিগত জীবনে যাহা সত্য বলিয়া অনুভূত জাতিগত জীবনেও তাহার সত্যতা প্রতিভাত। নবীন জাতিসমূহের মনে শৈশবের আশা ও ভয়, তরুণ জাতিগুলি দুর্বার, পরপীড়া-পরায়ণ, যৌবনমদে মত্ত, প্রবীণ জাতিসমূহ ধীর স্থির, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি একাধারে তাহাদের দুর্বলতা ও শক্তি।

জীবন যখন সংগ্রাম, তখন অবশ্যই সেখানে দুই বিপরীত শক্তির সংঘর্ষ ঘটিতেছে। এই বিপরীত শক্তিদ্বন্দ্ব কখনও বাহিরে শীতাতপরূপে দেখা দিতেছে, কখনও প্রাকৃতিক দুর্যোগরূপে, বন্যা মহামারীরূপে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে, কিন্তু মানুষ স্বীয় শক্তিবলে বুদ্ধিবলে সে সকল নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রতিকূলকে অনুকূলে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে।

অন্তর্জগতেও এই সংগ্রাম দেখা দেয় সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তিরূপে—ইহাই পুরাণাদিতে দেবাসুর সংগ্রামরূপে বহুভাবে রূপায়িত। সত্ত্বগুণান্বিত দেবতাশক্তি রজস্তমোগুণাশ্রয়ী অসুর-শক্তির নিকট পরাভূত। ইহা তো পুরাণের কোন বিস্মৃত ঘটনা নয়, ইহা তো আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত ঘটনা। কি সংসারে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে—সর্বত্রই দেখা যায় সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে অন্যায়েরই জয়, ন্যায় পরাজিত। অধর্মেরই অভ্যুদয়, ধর্ম রাহুগ্রস্ত। কিন্তু দেব-স্বভাবের মধ্যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে উচ্চতর এক শক্তিতে বিশ্বাস—অসুর-প্রকৃতিতে যাহা অজ্ঞাত। ন্যায়ানুগ-রোষপরায়ণ (righteous indignation) দেবগণের সম্মিলিত শক্তি অবশেষে দম্ভ-দর্প-অভিমানযুক্ত অসুরশক্তিকে বিপর্যস্ত করিতে সমর্থ হয়। কখন বা দেখা যায়—উৎপীড়িত দেবগণের কাতর আহ্বানে স্বয়ং মহাশক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন দুর্ধর্ষ অসুরশক্তি বিধ্বস্ত করিতে। উচ্চতর শক্তির কাছে নিম্নতর শক্তি হয় পরাজিত, সূক্ষ্ম শক্তির কাছে স্থূল শক্তি হয় পরাভূত।

জয় পরাজয় বারংবার হয়, কিন্তু সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে আসে বিজয়োৎসব, সিদ্ধির মহানন্দ, তাহারই জন্য প্রয়োজন শক্তির সাধনা।

মানুষের যাবতীয় দুঃখের মূলে অজ্ঞতা, তাই জ্ঞানকেই বলা হইয়াছে শক্তি। জ্ঞানের

সহায়েই মানুষ পারে দুঃখজয়ের অভিযানে অগ্রসর হইতে। জ্ঞান তাহার মনের বল, হাতের অস্ত্র। জ্ঞানের সহায়ে মানুষ জয় করে জীবন-পথের সকল বাধা, সকল বিপদ। জগতের ও প্রকৃতির নিয়মানুসারেই দিনের পর রাতের মতো, জোয়ারের পর ভাঁটার মতো আসে সুখের পর দুঃখ, এই জ্ঞান যাহার আছে, সে কি রাত্রি আসিলে কাঁদিতে বসে, না ভাঁটার সময় হাল ছাড়িয়া দেয়, না দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হইলে সে জীবনের সকল আশা ছাড়িয়া দেয়?

জ্ঞানশক্তি-সম্পন্ন মানুষ বিপদের সময়ই বেশি হুঁশিয়ার হয়, এবং পৌরুষ-সহায়ে সংগ্রাম করিয়া বিপদ অতিক্রম করে।

নৈরাশ্য নয়—অনন্ত অফুরন্ত আশা যে জীবনের জয় অনিবার্য, ইহাই মানুষকে জয়ের পথে আগাইয়া লইয়া যায়।

এই জ্ঞানের সাধনাই, এই জিগীষা ও আশা-শীলতাই হিংস্রজন্তু-ভীত মানবকে গুহা হইতে টানিয়া আনিয়া নদী-উপত্যকায় কৃষ্টির ও সভ্যতার পত্তন করাইয়াছে, শুধু মাত্র পশুবৎ প্রাকৃতিক জীবনে তাহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে দেয় নাই, সাংস্কৃতিক জীবনের উচ্চতর গতির অভি-মুখে লইয়া গিয়াছে। জয় হইতে জয়ের পথেই তাহার এই জয়যাত্রা। পরাজয় শুধু তাহার জয়ের পথ দীর্ঘতর করিয়াছে।

যে মানব আজ *সূক্ষ্ম বিজ্ঞান* ও *জটিল* যন্ত্রের সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণের নিম্নাভিমুখী আকর্ষণ জয় করিয়া চন্দ্রলোকে গ্রহলোকে পঁহুছিবার সাধনায় সিদ্ধপ্রায়, সে কি পারিবে না সূক্ষ্মতর বিজ্ঞান-সহায়ে মনের নিম্নাভিমুখী পাশব প্রবৃত্তি জয় করিয়া শান্ত উর্ধ্বলোকে উঠিতে? সে কি পারিবে না শক্তি-সহায়ে শান্তিলাভ করিতে? বিজাতীয় জন্তুভয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া সে কি চিরদিন সজাতীয় জন্তুভয়ে ভীত হইয়া জীবন যাপন করিবে? সে কি কোন শক্তিবলে মানুষের অন্তর্নিহিত সেই পশুকে নির্জিত করিয়া সংসারে সমাজে ও রাষ্ট্রে চির শান্তি স্থাপন করিতে পারিবে না?

শক্তি ও শান্তি—বিপরীতধর্মী, সমধর্মী না পরিপূরক? না কি শক্তিরই অপর নাম শান্তি? ক্ষমতা যাহার আছে ক্ষমাগুণ তো তাহারই অলঙ্কার। বাম করে যাঁহার অসিমুণ্ড, তাঁহারই দক্ষিণ করে শোভা পায় বরাভয়।

কল্যাণশক্তি-সহায়ে বিপরীত অশান্তিকারী শক্তি বশীভূত করিয়া মানুষ শান্তির অধিকারী, সিদ্ধির অধিকারী হইতে পারে। মহাশক্তি সংগ্রামে অজিতা—অপরাজিতা, তাঁহারই সহস্র নামের দুটি নাম জয়া, বিজয়া! যে কেহ শুদ্ধভাবে সাত্ত্বিকভাবে এই মহাশক্তির আরাধনা করে অন্তরের ও বাহিরের সংগ্রামে সে অজিত ও অপরাজিত। বিজয়ার এই মহাভাব—'মহাশক্তির শরণাগত' ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমরা অগ্রসর হই জীবনের বিজয়াভিযানে।

রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যাসেবাকার্য ও আবেদন

সম্প্রতি অত্যধিক বৃষ্টির ফলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য বন্যায় ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন এ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বন্যাপীড়িতদের যে সেবা করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মুখ্যকেন্দ্র বেলুড়ের অর্থসাহায্যে মিশনের শিলং শাখাকেন্দ্র জুলাইএর প্রথম সপ্তাহ হইতে আগষ্টের শেষ পর্যন্ত আসামের কামরূপ জেলার রঙ্গিয়া বরখোলা অঞ্চলে বন্যাসেবাকার্য চালাইয়াছেন। শিলচর কেন্দ্রও ঐ শহরে জুনের শেষ হইতে জুলাইএর শেষ পর্যন্ত উক্ত সেবাকার্য করিয়াছেন। মিশনের করিমগঞ্জ কেন্দ্র কাছাড় জেলার শনবিল অঞ্চলে বন্যার্ত গরীব চাষীদের মধ্যে জুলাই মাস হইতে টেষ্ট রিলিফ কার্য সফলতাপূর্বক করিতেছেন।

মিশনের বোম্বাই শাখা রাজকোট আশ্রমের সহযোগে জুলাইএর শেষ সপ্তাহে কচ্ছের ৪টি তালুকে সেবাকার্য করিয়াছেন। ভুজ শহরকে প্রধান কেন্দ্র করিয়া ৪টি শহর ও ৩১১টি গ্রামে এই সেবাকার্য চলিতেছে। কিছুদিন খাদ্যসামগ্রী বিতরণের পর সেপ্টেম্বর হইতে ঘর মেরামত বা পুনর্নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। সমগ্র কাজটিতে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ইতিমধ্যে বোম্বাই রাজ্যের সুরাট জেলা ভীষণভাবে বন্যাক্রান্ত হওয়ায় সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে সেখানেও ব্যাপকভাবে সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

বাংলায় মিশনের ২৪ পরগনা জেলায় রহড়া, বেলঘরিয়া, নরেন্দ্রপুর শাখাগুলি ঐ ঐ অঞ্চলে বেলুড়ের আর্থিক সাহায্যে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হইতে বন্যার্তদিগের সাময়িক সেবা করিয়াছেন। বালি থানার অন্তর্গত নিশ্চিন্তা উদ্বাস্তু কলোনীতেও মিশনের সারদাপীঠ শাখা সেবাকার্য করিয়াছেন। বর্তমানে হাওড়ার ডোমজুড় অঞ্চলে, ২৪ পরগনার বোড়াল, নালুয়া বেড়গুম এবং পানাকো ইউনিয়নে এবং মেদিনীপুরের কুকড়াহাটী ইউনিয়নে অনুরূপ সেবাকার্য চলিতেছে।

বন্যার ধ্বংসলীলার তুলনায় আমাদের লোক ও অর্থবল অকিঞ্চিৎকর। তাই সহৃদয় দেশবাসিগণের নিকট আমরা এই কার্যের জন্য অর্থভিক্ষা করিতেছি। সাহায্য—'সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া'—এই ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে।

স্বামী মাধবানন্দ
সাধারণ সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ মিশন

বেলুড় মঠ, ১৫।১০।৫৯

চলার পথে

'যাত্রী'

৺পুরীধাম থেকে ভুবনেশ্বরে পৌঁছলাম।

শরতের আকাশ নীলে নীল। মাঝে মাঝে বিরাট হংসবলাকার মতো সাদামেঘ আকাশের দূরবিসারী বিস্তৃতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। তা ছাড়া, এক অপূর্ব প্রসন্ন আনন্দ এখানকার পুরাতন স্মৃতির সঙ্গে বিস্ময়ে জড়িয়ে রহস্যময়। মন, রুচি ও প্রবণতা থাকলে এই সবের অনন্ত স্বাদ, মনকে কেমন এক অর্থ-ব্যাপ্তিতে ভ'রে তোলে। এদের সঙ্গে আত্মীয়তাও গ'ড়ে ওঠে। তবে এ ছবি দেখার চোখ চাই—অনুরাগ চাই। পৃথিবী সবচেয়ে যে রঙে বেশী রঙীন তা হচ্ছে অনুরাগের রঙে। অনুরাগ বাদ দিয়ে দেখ, সব কিছুই তা'হলে আলুনি লাগবে।

ভাবছিলাম, আমার দুদিকেই তো হাজার, দু হাজার বছরের পুরাকীর্তি ও ইতিহাস ছড়িয়ে রয়েছে। পুরাতন স্মৃতির এই আদিহীন, অন্তহীন অস্তিত্বের মহাসমুদ্রে আমি তো এক নগণ্য বুদ্বুদ। আমার এই ক্ষণিকের জীবন ও নিমেষের অস্তিত্ব রেখে পলকে কোথায় মিলিয়ে যাব। তবুও এই দিগন্ত-ছোঁয়া সুপ্রাচীন মঠ-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের দেশে কি আহ্বানে এলাম, তা কে জানে? ঐ তো সুমুখেই 'ধবলগিরি', স্থানীয় লোকের কাছে যা 'ধউলি' নামে পরিচিত। ওর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক সর্বস্বপণ ও পূর্ণাহুতির ইতিকথা। ইতিহাসের সেই বাস্তব স্বপ্নটাকেই এখানে একটু নিংড়ে দিই:

কলিঙ্গ বিজয় ক'রে অশোক ফিরছেন। পর পর যুদ্ধজয়ের উন্মাদনায় রক্তে তাঁর কেমন এক নেশা ধরেছে। তাঁকে স্থির থাকতে দেয় না, ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আবার মাঝে মাঝে, যুদ্ধের মর্মান্তিক হাহাকার অশোককে বিমনা ক'রে তোলে। কিন্তু ঐ ক্ষণিক ঔদাসীন্য মুহূর্তেই মিলিয়ে যায়। দেহের রক্তে মরণ-মারণের লেলিহান জিহ্বা পরক্ষণেই আবার রক্তাস্বাদনের জন্য জেগে ওঠে। চণ্ডাশোক তাই ছোটেন রণোন্মাদনার ঘোরে—দেশ থেকে দেশান্তরে। সেই চণ্ডাশোক আজ পৌঁছেছেন 'ধবলগিরির' প্রান্তরে।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। রক্ত-রশ্মির তপ্ত আভা সন্ধ্যার কোমলতায় তার প্রখরতা হারাল। 'বেদনার আবির মেখে সূর্যের আহ্নিক যাত্রা' সেদিনের মতো হ'ল শেষ। আত্মভুক হিংসার আগুন সব মন থেকেই বোধ হয় ঐ সময়ে নিভে যেতে চায়। অশোকের মনেই বা ঐ ক্ষণের সন্ধ্যা কি খবর জানিয়েছিল, তা কে জানে। কিন্তু এই সন্ধিক্ষণেই আশ্চর্য এক ব্যাপার ঘটে গেল:—

অশোক তাঁর সমস্ত সৈন্যদের সে-রাতের মতো বিশ্রাম নিতে ব'লে নিজেও বিশ্রামের জন্য তাঁর তাঁবুর মধ্যে যাবেন এমন সময় শুনতে পেলেন, অপূর্ব সন্ধ্যা-আরাধনার সুর—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।'—চমকে উঠে, পাশেই দণ্ডায়মান

সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও কি সুর ভেসে আসছে?' সেনাপতি বললেন—কাছেই বৌদ্ধবিহারের শ্রমণদের গান।

অশোক—'ওরা ওখানে কি করে? আমি এসেছি, আমি দুর্ধর্ষ সম্রাট অশোক। আমার পৌরুষের, আমার বীরত্বের কথা, আমার ধ্বংসের রুদ্র-মূর্তি ওদের জানা নেই বুঝি? চল, ওদের প্রধানের সঙ্গে কথা ব'লে ওদের ঐ বিহার ধ্বংস ক'রে দেবার ব্যবস্থা ক'রে আসি।'

অশোক ও তাঁর সেনাপতি চললেন। তাঁর জীবনের এ এক অদ্ভুত অভিযান। এই অভিযানই অশোকের মনে তাঁর অতীত কীর্তির জন্য আক্ষেপ ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য এক আনন্দময় প্রস্তুতির প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সেই জীবন্ত কাব্যের আখ্যায়িকার আবার সূত্র টানি:

অশোক এসে দাঁড়ালেন সঙ্ঘস্থবিরের সুমুখে। বিশাল প্রান্তরে বাতাস ব'য়ে চলেছে হু হু ক'রে। আকাশে চাঁদ নেই। তারাভরা আকাশের বুকে কেমন এক আন্তর জ্যোতি প্রকাশ পাচ্ছে। আর চারিদিকের নিবিড় প্রশান্তি প্রকৃতিকে রেখেছে পেলব ক'রে। এমন সময়ে দুর্দান্ত অশোকের আহ্বানে সঙ্ঘ-নেতা এসে দাঁড়ালেন। এতটুকু ভয়ও তাঁকে স্পর্শ করেনি। আর ঐ ধীর, স্থির, স্মিতহাস্যে ভরা, ভাস্বর-তনু সঙ্ঘনেতাই তাঁদের প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙলেন। ঊর্ধ্বে একবার কাকে যেন দেখলেন, একবার অন্তরের অনুমতিও নিলেন, তারপর মধুক্ষরা ভাষায় প্রশ্ন তুললেন:

"আচ্ছা সম্রাট, তোমার এই বিধ্বংসী লোকক্ষয়কারী অভিযানে তুমি তোমার নিজের মনে আনন্দ পেয়েছ তো? পেয়েছ তো এরই মাঝে তোমার জীবন-জিজ্ঞাসার সব ক'টি প্রশ্নের উত্তর? মনুষ্যদেহের রক্ত-বন্যায় তোমার অন্তর-পদ্ম সৌন্দর্যে লাল হ'য়ে ফুটে উঠেছে তো?"

এ কি প্রশ্ন! অশোক নিস্তব্ধ, তাঁর ঔদ্ধত্য নিশ্চল, তাঁর আসুরিক বীরত্বও আজ কেমন এক ক্লীবতায় নির্জীব। তাঁর তখন মনে হচ্ছে, কে যেন তাঁর অন্তরের এতদিনের চাপা-কান্নার উৎসকে দিয়েছে খুলে। তিনি যেন এই শ্রমণের কাছে হয়েছেন বালক, শিশু—একেবারে অসহায় শিশু। অশ্রু-ঝরানো চোখে কেমন এক অস্ফুট শব্দ উঠল অশোকের কণ্ঠে—কিন্তু তা আর স্পষ্ট ক'রে বোঝা গেল না। শ্রমণ তখন এগিয়ে এসে অশোককে জড়িয়ে ধরলেন—এক অনাস্বাদিত আত্মিক দ্যুতি অশোকের সমস্ত মন উদ্ভাসিত ক'রে দিল। চণ্ডাশোক সেই মুহূর্তেই হ'য়ে গেলেন ধর্মাশোক।

তাই বলি পথিক, এই মাহেন্দ্রক্ষণ না এলে আমরাও আমাদের সত্যকার মূল্য, যথার্থ স্বরূপ বুঝতে পারি না। ঐ সত্য-স্বরূপ বুঝবার জন্যই তো আমাদের সর্বদাই চলতে হবে—তাই চল পথিক, তোমার জীবনের ঐ মৃত্যু-তীর্থ পর্যন্ত অনলস ভাবে চল। চল, আশ্বাস নিয়ে, ভরসা রেখে। দেখবে তোমার মধ্যেকার চণ্ডাশোকও একদিন ধর্মাশোকে রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

পথ-নির্দেশ

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

ঠাকুর এবার এসেছিলেন সর্বধর্ম সমন্বয় করতে। তিনি বলেছেন, যে নামেই তাঁকে ডাকো সবই সেই এক জায়গায় পৌঁছায়। সংসারী মানুষকে তিনি আবার আশ্বাস দিয়ে বলেছেন: ঈশ্বরকে আরাধনা করার জন্য সকলের পক্ষে সংসার ত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না, কর্মের মধ্যে থেকেও তাঁকে লাভ করা যায়, যদি তুমি আসক্তি-মুক্ত হ'য়ে খানিকটা মন তাঁর দিকে দিতে পার। একটি হাতে তাঁর চরণ ছুঁয়ে থেকে আর এক হাতে কাজ ক'রে যাও। ঠাকুর আবার কত সহজ ক'রে তাই বলেছেন—যখন তুমি কাঁঠাল ভাঙো, তখন যদি হাতে একটু তেল মেখে নাও, তাহলে যেমন হাতটায় আঠা লাগতে পারে না, তেমনি মনটাকে যদি তাঁর দিকে ফিরিয়ে রেখে আসক্তিশূন্য ভাবে শুধু কর্মের জন্যই কর্ম ক'রে যাও তাহলে জানবে তিনি তোমার সহায় আছেন, এই জাগতিক সুখ দুঃখ তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না।

তিনি তো আমাদের নিয়ত আকর্ষণ কর-ছেন, যেমন চুম্বক একটা ছুঁচকে টানে, কিন্তু সেটাতে যদি মাটি মাখানো থাকে, কিছুতেই সে তখন চুম্বকের কাছে যেতে পারবে না, তেমনি মহামায়ার মায়ায় রজঃ ও তমোগুণ আমাদের আচ্ছন্ন ক'রে থাকে ব'লে আমরা সে ডাক শুনতে পাই না, সে আনন্দময় জ্যোতি দেখতে পাই না।

সংসারে যা কিছু আমরা 'আমার আমার' ব'লে মনে করি—যেমন এই স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সুখ, ঐশ্বর্য—এ সবের এতটুকু ক্ষয়-ক্ষতিতে কত ব্যথা পাই, কিন্তু সবই যদি তাঁর জিনিস ব'লে মনে করতে পারি। এ সবের জন্য যা করছি সবই তাঁর কাজ ক'রে যাচ্ছি, আমার কিছু নয়, একমাত্র তিনি আমার,—একান্ত আমার, আমার প্রিয় হ'তে প্রিয়তম। এই অনুভূতির যে অখণ্ড আনন্দ, সেই আনন্দের নেশায় মন তখন ডুবে থাকে, তখন নশ্বর জগতের ক্ষয়-ক্ষতি সামান্য ধুলা-মাটির মতো ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায়।

সন্তান কোন অন্যায় কাজ করলে মা যেমন তারই মঙ্গলের জন্য কঠিন ভর্ৎসনা করেন, আঘাত করেন, আবার সেই মায়েরই গলা জড়িয়ে ধ'রে সন্তান মাকেই 'মা, মা' ব'লে ডাকে, মায়েরই কাছে কাছে থাকে। তেমনি ঈশ্বরও আমাদের মনের জড়তাকে আঘাতে আঘাতে ভেঙে দেন, নয়তো সুখের মধ্যে মজে থেকে আমরা সেই চরম চাওয়া-পাওয়াকে ভুলে যাই, তাঁর থেকে বহু দূরে সরে যাই, তাই তিনি মায়ের মতন আমাদের ব্যথা দিয়ে তাঁকে স্মরণ করান, কাছে ডাকেন।

ঠাকুর এবার তাই মাতৃভাবেই সাধনা করে-ছিলেন, এই ভাবেই তাঁকে সহজে কাছে পাওয়া যায়। সাধক রামপ্রসাদও মধুরতম মাতৃভাবে তাঁকে ডেকেছেন, তাঁকে কাছে পেয়েছেন। সেই 'মায়ের' সঙ্গেই যত মান অভিমান, হাসি কান্না, ছিল সাধক রামপ্রসাদের। কখন তাই অভিমান ক'রে বলছেন, 'মা, আমায় লোহা পেটা করলি কত।' আবার কখন পরম বিশ্বাসে বলছেন: আমি 'জয় কালী জয় কালী' ব'লে যাব চলে। শমন তোরে ভয় করিনে।—এই যে ঈশ্বরকে একান্ত আপন জন ব'লে মনে প্রাণে উপলব্ধি

করতে পারা, এ কি সবার হয়? তবে চেষ্টা করো, নিশ্চয় তাঁর কৃপা পাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে সকলভাবে তাঁর উপাসনা ক'রে, ঈশ্বরের শাশ্বত সত্তা উপলব্ধি ক'রে তবে সকলকে সেই অমৃত বিতরণ করতে দু হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জ্ঞানী, মূর্খ—সকলের জন্য ঠাকুরের উদার অভয়-বাণী: ওরে তোরা যে পথ দিয়েই চলিস, সকল পথ মিলেছে শেষে একই জায়গায়।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, 'সম্ভবামি যুগে যুগে'। তিনি বুদ্ধাবতারে এসেছিলেন মানবকে দুঃখ, শোক, জরা, মৃত্যুর ভয় থেকে ত্রাণ পাবার পথের নির্দেশ দিতে। আবার যখন ঈশ্বরকেই দূরে রেখে শুষ্ক তর্ক বিচার নিয়ে মানুষ নিজেদের মধ্যে হানাহানি করছিল, তখন তিনি এসেছেন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যরূপে। প্রেমের বন্যায় তাদের মনের ক্লেদ ধুয়ে দিয়ে, কঠিন মাটিকে ভক্তিরসে সিক্ত ক'রে তাতে এমন বীজ তিনি বপন করলেন, যাতে তাঁকে পাওয়া সহজ হয়। 'ভজ গোবিন্দ, জপ গোবিন্দ, লহ গোবিন্দের নাম রে'—নামজপই জীবের মুক্তির পথ। তাই তিনি নিজে ধূলায় লুটিয়ে, চোখের জলে ভেসে, নামের মহিমা পথহারা মানবকে জানিয়ে গেছেন।

আর এবার এসেছিলেন সামান্য পূজারী ব্রাহ্মণের বেশে, কাছের মানুষটি হ'য়ে, যাতে ভয়ে তাঁকে দূরে রাখতে না হয়। তিনি পুঁথির ভাষায় উপদেশ দেননি, নিজে আগে ঈশ্বরকে জেনে সবাইকে ডেকে ডেকে বলেছেন: ওরে সত্যি বলছি তিনি আছেন, ডাকার মতো ডাকলে তাঁকে পাওয়া যায়। অজ্ঞান, তমসাচ্ছন্ন মানুষকে এমন ক'রে পথের সন্ধান, মুক্তির বাণী এর পূর্বে কেউ শোনায়নি। তিনি বলেছেন, 'আমি ষোল টাং করেছি, তোরা এক টাং কর্।' সকল কাজের মধ্যে তাঁকে স্মরণ কর, তাতেই তাঁর কৃপা পাবে। সকলের জন্য ঠাকুরের এত কৃপা, এত প্রেম। নরেনের জন্য ঠাকুর পথ চেয়ে থাকেন, কেশব সেনের অসুখে তিনি ডাবচিনি মানত করেন মায়ের কাছে। এই অহেতুকী কৃপা, ভালবাসা—এর আগে কি কেউ দেখেছে?

তাই বলছি, ঈশ্বরকে মায়ের মত ভালবাসো, তাঁকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে কাজ ক'রে যাও।*

---

* রাঁচি মোরাবাদি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের ধর্মপ্রসঙ্গ—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী অনুলিখিত।

বিজয়া-প্রণাম

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

জননি গো, তোমার পরশ আজকে যে পাই সর্ব ঠাঁই,
কে বলে গো চ'লে গেছ, মোদের মাঝে তুমি নাই?
উঠেছিলে উজ্জলিয়া, ভ'রেছিলে সকল হিয়া,
তোমার দিব্য রূপের দ্যুতি সবার মাঝে তাইতো পাই।

সকল জনে প্রণাম করি, সবারে দিই আলিঙ্গন,
জননি গো, তোমার স্নেহে ভ'রে ওঠে আমার মন।
এই তো তুমি আছ শিবে, জনে জনে নিখিল জীবে,
সবার মাঝে আজকে মাগো তোমায় করি দরশন!

উদার ধর্মবোধ

অধ্যাপক রেজাউল করীম

বহুযুগ ধরে পৃথিবীতে ধর্মের নামে মারামারি রক্তারক্তি ও তর্কবিতর্ক হ'য়ে আসছে। এক একটা ধর্মের ধ্বজা তুলে মানুষ মনে ক'রে বসে যে আসল সত্য সেই পেয়েছে, যত সত্য সব কেবল তার ধর্মের মধ্যে আছে, আর অন্য সব ধর্ম একেবারে বাতিল। যারা তার পতাকার তলে সমবেত হ'তে সম্মত হ'ল না, তাদের বলা হ'ল অবিশ্বাসী, পথভ্রষ্ট; এবং সেই বিপথগামীদের সুপথে (?) আনবার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে বহু উদ্যোগ-আয়োজন করা হয়েছে।

এই ভাবে একে একে নানা ধর্মমতের আবির্ভাব হ'ল। এক একটা ধর্মের মধ্যে আবার সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে মতভেদ দেখা দিল। একই ধর্মের বিভিন্ন শাখা দাবি ক'রল যে তার ব্যাখ্যা ও ভাষ্যই ঠিক, অপর শাখার ব্যাখ্যা ও ভাষ্য ঠিক নয়। মানুষ যদি কেবল অপরের আদর্শের সমালোচনা করেই ক্ষান্ত থাকত, তবে হয়তো পৃথিবীতে খুব বেশী গণ্ডগোল হ'ত না। কিন্তু সমালোচনা থেকে এল প্রতিবাদ, প্রতিবাদের প্রতিবাদ, তস্য প্রতিবাদ। তারপর প্রত্যেকে মারমুখী হ'য়ে সাজ-সাজ-রবে অপরের বিরুদ্ধে রণ-হুঙ্কার তুলে অস্ত্র উঁচিয়ে এগিয়ে এল। এই ভাবে ধর্মকে নিয়ে পৃথিবীতে ঘোর বিবাদ-বিসম্বাদ হ'য়ে আসছে। তর্ক-বিতর্ক, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তারক্তিতে সারা পৃথিবী টলমল ক'রে উঠল। ঐতিহাসিকদের মতে—ধর্মের নামে যত রক্তপাত হয়েছে, রাজনৈতিক কারণে না কি তত রক্তপাত হয়নি।

আজ যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে পট-পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের চিন্তাধারাতেও এসেছে পরিবর্তন ও বিবর্তন। সঙ্কীর্ণতার স্থানে এসেছে উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতা। আজকের যুগের মানুষ স্থিরভাবে শান্ত হ'য়ে ধীর-মস্তিষ্কে বিভিন্ন ধর্মের ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানতে চাইছে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কোথায় পার্থক্য আছে, কোথায় ঐক্যসূত্র আছে, তা জানবার আগ্রহ তাদের বেড়ে চলেছে। ধর্মের তুলনামূলক সমালোচনা দ্বারা তাদের পরস্পরের মধ্যে সমন্বয়ের সূত্র খুঁজে বের করতে চাইছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যারা ধর্মালোচনা করছে, তারা দেখে স্তম্ভিত হচ্ছে যে, ধর্মে ধর্মে মূলের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই, তবে কেন সেখানে ধর্মের নামে এত রক্তপাত হয়েছে, কেন এক ধর্মের অনুবর্তী লোক অপর ধর্মের অনুবর্তী লোককে ঘৃণা করতে, হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয় না?

মানুষ পশু নয় যে, সে সব বিষয়ে অপরের সঙ্গে একই রূপ হবে। একজনের চিন্তার সঙ্গে অপরের চিন্তার পার্থক্য তো থাকবেই। মানুষের চিন্তাশক্তি আছে, বিবেক আছে, বিচারবুদ্ধি আছে। নিজ নিজ বিবেক ও বিচারবুদ্ধি অনুসারে মানুষ চলতে জানে। সুতরাং পরমার্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন প্রকার ধারণা তো থাকবেই। আজ ধর্মকে নূতন ও বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে হবে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে মৌলিক ঐক্য আছে—সেটা আবিষ্কার ক'রে জন-সমাজকে দেখিয়ে দিতে হবে।

ধর্মের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সকল ধর্ম মূলতঃ এক। সকল ধর্মের মূল নীতি, শিক্ষা ও লক্ষ্য এক। *এখানে কোন পার্থক্য নেই। সমস্ত ধর্মের মধ্যে*

একটা আভ্যন্তরীণ ঐক্যভাব বিদ্যমান। অবশ্য কতকগুলি আচার-পদ্ধতি ও খুঁটিনাটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। কিন্তু সেগুলি আসল বা মৌলিক নয়। যারা এই সব পার্থক্যকে বড় ক'রে দেখে, তারা ধর্মের মূলে প্রবেশ করতে পারেনি। সার সত্য সকল ধর্মে আছে,—এটা এত স্পষ্ট ও এত সর্বজনীন শাশ্বত সত্য যে এ বিষয়ে কারো মনে কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়। সমাজে কেবল যে ধর্ম নিয়েই বিবাদ হয়, তা নয়। ধর্ম ব্যতীত আরও বহু বিষয়ে মানুষে মানুষে ঝগডা-বিবাদ বাগ্‌বিতণ্ডা হ'য়ে থাকে। পার্থিব নানা বিষয়ে ব্যক্তিগত মতামত নিয়ে মানুষ ঝগডা ক'রে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদ হয় হ'ক, মতান্তর হ'ক, কিন্তু মতান্তর থেকে মনান্তর কেন হবে?—মারামারি, কাটাকাটি কেন হবে? বড বড় মৌলিক ব্যাপারে—যেখানে সত্যই ঐক্যসূত্র আছে, সেখানে বিবেকবান্ মানুষ যদি আত্মকলহে লিপ্ত হয়, তবে এ-দুঃখ কোথায় রাখব? সহস্র সহস্র বছর পরেও কি মানুষ তার আদিম পশু-প্রবৃত্তির বশীভূত হয়েই চলতে থাকবে? সুতরাং যেমন করেই হ'ক, ধর্মের পার্থক্য সত্ত্বেও মানুষকে পরস্পরের সহিত ঐক্যসূত্রে বন্ধনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। যাঁরা এ চেষ্টা করেছেন, তাঁরা সকল সম্প্রদায়ের নমস্য।

ধর্মবিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, অন্ততঃ তিনটি বিষয়ে প্রচলিত ধর্মগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই,—(১) ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, (২) উপাসনা, (৩) প্রেম ও সৎকর্ম।

সকল ধর্ম শুধু যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তাই নয়,—ঈশ্বর সম্বন্ধে তাদের মৌলিক ধারণাও এক ও অভিন্ন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্, তিনি প্রেমময়, তিনি করুণার আধার। তিনি সর্বব্যাপী, তিনি জ্ঞান ও চৈতন্যস্বরূপ, তিনি সর্বলোক জুড়ে অবস্থিত; তাঁর সাম্রাজ্য স্বর্গ মর্ত্য পাতাল পর্যন্ত বিস্তৃত, তিনি ত্রিকালজ্ঞ—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই তিনকাল তাঁতে বিধৃত। ঈশ্বরের এই বিরাট্ স্বরূপ সম্বন্ধে কোন ধর্মে কোন মতভেদ নেই। তিনি অনন্ত শক্তির মালিক, সমগ্র সৃষ্টির মূলীভূত কারণ। ঈশ্বর সম্বন্ধে এই বিশ্বাস সকল ধর্মেই স্বীকৃত।

ঈশ্বরকে বিশ্বাস করলে, তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করলে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস ও স্বীকার করতে হয় উপাসনার প্রয়োজনীয়তাকে। আর সকল ধর্মই ঈশ্বর-উপাসনায় বিশ্বাসী। যত গণ্ডগোল পদ্ধতি নিয়ে, কিন্তু পদ্ধতি তো বড কথা নয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসনা-পদ্ধতি যাই হ'ক না কেন, উপাসনার প্রয়োজনীয়তা তো কেউ অস্বীকার করে না। কেউ সাকারবাদী, কেউ নিরাকারবাদী, কেউ মূর্তি গড়ে ঈশ্বরের উপাসনা করে, কেউ করে মূর্তিহীন উপাসনা। কিন্তু যে-ভাবে যে-কোন প্রকারে উপাসনা করুক না কেন, সব উপাসনার লক্ষ্যস্থল সেই অনাদি অনন্ত ঈশ্বর। লক্ষ্য যখন এক, তখন পদ্ধতির জন্য কেন মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি ক'রব?

ধর্মের আর একটা অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে—সৎকর্ম। সৎকর্মের মধ্যে আছে প্রেম ও জীবসেবা। ঈশ্বর মান্‌ব, উপাসনাও ক'রব, কিন্তু সৎকর্ম ক'রব না,—এ হতেই পারে না। সৎকর্ম ব্যতীত ধর্মের কোন অনুষ্ঠানই পূর্ণ হ'তে পারে না।

এই তিনটি বিষয় যখন সকল ধর্ম স্বীকার করে, তখন তো আমরা এই তিনটির উপর লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করতে পারি। ঈশ্বর দেখতে কেমন? সাকার না নিরাকার? মূর্তি গড়ে

তাঁর উপাসনা ক'রব, না বিনা মূর্তিতে তাঁর ধ্যান ক'রব ?—এ-সব নিয়ে তো বহু মত আছে ও চিরকাল থাকবে। এই সব বিভিন্ন মতের জন্য দুঃখ করার কোন কারণ নেই। বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় করাই তো মানুষের সাধনা। এই সব পার্থক্য মানুষের স্বাধীন চিন্তার পরিচায়ক। মানুষ যে পশু নয়, এ তার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

সর্বধর্ম-সমন্বয়ের প্রধান ঐক্যসূত্র হচ্ছে—ঈশ্বরে বিশ্বাস। ঈশ্বর আছেন, যে নামেই তাঁকে ডাকি না কেন, যে ভাবেই তাঁর উপাসনা করি না কেন, তিনি আছেন। তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত, তিনি অনাদি অনন্ত কাল থেকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনা ক'রে আসছেন, ও বরাবর তা করতে থাকবেন—এই সত্য যখন স্বীকার করি, তখন ধর্মে ধর্মে বিবাদ ও বিতর্কের অবসান হওয়া উচিত। ঈশ্বরই হচ্ছেন যোগসূত্র, সোনার সুতা (Golden thread)—যা সকল ধর্মকে, সকল মানুষকে এক করতে পারে, এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বেঁধে দিতে পারে। এই সত্যকে যখন আমরা জীবনের প্রধান মৌলিক বিষয় ব'লে গ্রহণ করতে পারব, তখন দেখা যাবে যে, পার্থক্যের সামান্য কারণগুলি গুরুতর ব'লে মনে হবে না। তখন সঙ্কীর্ণতা, কুসংস্কার এবং আরও বিবিধ প্রকার হাস্যাস্পদ আচার-অনুষ্ঠানগুলি একেবারেই অকিঞ্চিৎকর ব'লে মনে হবে। তারপর অবস্থা এমন হ'তে পারে যে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মন্দির, মসজিদ, গির্জাগুলিতে আর সাম্প্রদায়িকতার ছাপ থাকবে না। সেগুলি হবে সকল সম্প্রদায়ের মিলন-কেন্দ্র, এবং পরম শান্তির সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায় বাস করবে। যে নামেই হ'ক না কেন, যে পদ্ধতি-তেই হ'ক না কেন, সর্বত্র সকলেই নির্বিঘ্নে ঈশ্বরোপাসনা করতে পারবে। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস আর মানবীয় আত্মায় বিশ্বাস থাকলে সমস্ত মানব-সমাজ ভায়ের মতো একত্র মিলিত হ'তে পারবে। দেশ, ধর্ম, ভাষা, জাতির পার্থক্য—কোন কিছুই আর মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারবে না। রামকৃষ্ণের কাছে এ যুগের মানুষ বিশেষভাবে ঋণী—এইজন্য যে তিনি সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যটি নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাদের মূলগত ঐক্যটি সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছেন।

যারা ধর্ম মেনে চলে, তারা তো এই বিশ্বাসই পোষণ করে যে তাদের ধর্ম ঈশ্বর-প্রদত্ত। ধর্ম মানুষের মাধ্যমে প্রচারিত হ'তে পারে, কিন্তু ধর্ম মানুষের রচনা নয়। মানুষ আরও বিশ্বাস করে যে মূল ধর্মশাস্ত্রগুলি অপৌরুষেয় বা ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত। সুতরাং ধর্মশাস্ত্রের আদি উৎপত্তি-স্থান ঈশ্বর। যাঁরা ঈশ্বরভক্ত, যাঁরা ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তাঁদেরই কণ্ঠে মানব-কুলের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের বাণী ধরাধামে প্রচারিত হয়েছে। সুতরাং সেই এক ঈশ্বর থেকে পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব, বিভিন্ন আদর্শ বা নীতি কি ক'রে সম্ভব ?

অবশ্য দেশকালপাত্রভেদে ধর্মাচারের খুঁটি-নাটি বিষয়ে কিছু তারতম্য থাকতে পারে, কিন্তু মূল নীতির দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। আদর্শ সব ক্ষেত্রেই একই মৌলিক বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে। সুতরাং আমাদের এতদূর সঙ্কীর্ণ ও অন্ধ হওয়া উচিত নয় যে আমরা সিদ্ধান্ত ক'রব—ঈশ্বর কেবল মুষ্টিমেয় লোককে উদ্ধার করবার জন্য তাদের নিকট একটা বিশেষ ধরনের বাণী পাঠিয়ে দিয়েছেন, আর অপর সকল লোকের জন্য তিনি সরাসরি নরকবাসের ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। করুণাময় ঈশ্বরের দ্বারা এরূপ অসম ব্যবস্থা হ'তে পারে না। এ ভাবে তিনি পক্ষপাতপূর্ণ কাজ করেন না।

তিনি যেমন বিরাট্ বিশাল, তাঁর কাজও তেমনি বিরাট্ বিশাল।

বিভিন্ন ধর্ম আলোচনা ক'রে একটি সত্য এই বুঝেছি যে ঈশ্বর সকলের জন্য সমান। তিনি বিশেষভাবে কারো খাতির করেন না, আবার বিশেষভাবে কারো ক্ষতিও করেন না। যে-কোন ব্যক্তি তাঁকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে, সেই ঈশ্বরের দ্বারা গৃহীত হবে। সুতরাং বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের ধর্মই কেবল সত্য হবে—এরূপ ব্যবস্থা বা বিধান ঈশ্বরের হ'তে পারে না।

আমরা যদি এইভাবে ধর্মকে গ্রহণ করতে পারি, ধর্মের সার সত্যকে অকপটে উপলব্ধি করতে পারি, তাহলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন ধর্মের পার্থক্যগুলি আর ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। যে কোন মানুষ, যে কোন ধর্ম পালন ক'রে চলুক না কেন—সাকার উপাসনাই করুক, আর নিরাকার উপাসনাই করুক না কেন—তাতে কিছুই যায় আসে না। বরং এইটাই দেখতে হবে যে মানুষ যে ধর্মকে আশ্রয় করেছে, সে যেন তার আদর্শ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন ক'রে চলে। আমরা যে-পরিমাণে স্বার্থের কথা কম চিন্তা ক'রব, যে-পরিমাণে মূল সত্যকে ভালবাসব—সেই পরিমাণে আমরা মনুষ্যত্ব ও সত্য অর্জন করতে পারব। আজ অপরকে ধর্মান্তরিত করার কথা কম ক'রে ভাবতে হবে। আমরা যেন এইটাই বেশী ক'রে লক্ষ্য করি, যেন নিজের অবলম্বিত ধর্মাদর্শকে অধিকতর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন ক'রব। নিজের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস থাকলেই অপরের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস জাগবে। হৃদয়ের পবিত্রতা, আচরণে শুচিতা, কর্মে নিষ্ঠা, সত্যের প্রতি আগ্রহ ও সকলের সহিত উদার ও অপক্ষপাত ব্যবহার—এইগুলি হবে আমাদের চলার পথে আলোক-বর্তিকা। সকল ধর্মের (great fundamental Truth) মহান্ ও মৌলিক সত্য এক ও অভিন্ন। তার মধ্যে কোন ভেজাল নেই, কোন গরমিল বা অসামঞ্জস্য নেই। তাদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা আমাদের সর্বজনীন সত্য পেতে দেয় না। আর যাকে সত্য বলি, তা যদি সর্বজনীন না হয়, তবে তা সত্য হ'তে পারে না। সুতরাং মনে করতে হবে, জগতে ধর্ম একটিই আছে—যে পথ ধরেই চলি না কেন, সেই একই লক্ষ্যে সকলকে যেতে হবে,—সেই লক্ষ্য হচ্ছেন ঈশ্বর। তাই রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'যত মত তত পথ।' —সত্যিই তো মত আলাদা, পথও আলাদা, কিন্তু লক্ষ্য সকলের এক। বিভিন্ন পথ ধ'রে সেই একই লক্ষ্যে সকলকে পৌঁছতে হবে।

ধর্মে বিশ্বাসী প্রত্যেক মানুষকে ঘোষণা করতে হবে: আমার ধর্মবোধ—উচ্চনীচ, ছোটবড়, ধনী-দরিদ্র—কারো মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করে না,—আমার ধর্ম আকাশের মত বিশাল, উদার, মহান্—এতে সকলের স্থান আছে। আমার ধর্ম জলের মতো—এ সকলকে ধৌত করে, পবিত্র করে, এ সকলকে আনন্দ দেয়, সকলকে আপন ক'রে তোলে। কাউকে আলাদা করে না।

বাস্তবিক যারা উদারচিত্ত, তারা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে ঐক্যসূত্র আছে, সেইটাকেই দেখতে চায়, আর যারা সঙ্কীর্ণমনা তারাই কেবল ধর্মের বিভিন্নতা ও পার্থক্যটাকে বড় ক'রে দেখে। সঙ্কীর্ণমনা বলে, 'ঐ লোকটাকে অপর সম্প্রদায়ের লোক ব'লে মনে হচ্ছে', আর নিজ সম্প্রদায়-ভুক্তকে দেখলে ব'লে উঠে, 'হ্যাঁ এই লোকটা আমার নিজের লোক'। কিন্তু যাদের মনে প্রেমের বসতি, যারা উদারভাবে ধর্মকে উপলব্ধি করতে শিখেছে তারা এমন কথা বলে না, তাদের নিকট সমস্ত পৃথিবী এক পরিবারভুক্ত। বাস্তবিকই, পূজার বেদীতে যে ফুল থাকে, তা নানা রকমের ও নানা রঙের, কিন্তু সমস্ত পূজাই একই মহান্ প্রভুর উদ্দেশ্যে।

আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে স্বর্গের অনেক দ্বার আছে, যে পথে যার সুবিধা সে সেই পথ দিয়ে স্বর্গের দিকে যাত্রা করবে। প্রত্যেকে তার নিজের নিজের পথ দিয়ে স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে। পৃথিবীর সকল মানবই তো একই ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর একই উপাদান থেকে সমস্ত মানব-জাতি সৃষ্টি করেছেন। জীবতত্ত্ব তো এই কথাই বলে যে মানব-জাতি আদিযুগে একই মূলবস্তু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সেই মানব-সমাজ আজ ধর্মের নামে কেন ভিন্ন ভিন্ন হ'য়ে পরস্পর মারামারি করবে?

ধর্ম আনন্দময়, ধর্ম মনে আনে শান্তি, প্রাণে দেয় তৃপ্তি, অন্তরে জাগায় ভক্তি। মানুষ যখন খাঁটি ধর্মকে বুঝবে তখন সে দেখবে, ধর্ম তাকে দেবে শান্তি আনন্দ ও সুখ। ধর্ম কখনও (gloomy-dark-faced sadness) গোমড়ামুখের বিষণ্ণতা আনে না,—আনে আনন্দ ও প্রীতি। ধর্মের এই মহান্ ভাবটা মনে জাগ্রত হ'লে দেখা যাবে যে ধর্ম সকলের নিকট আকর্ষণের বস্তু হ'য়ে উঠেছে, কারো নিকট অপ্রীতিকর মনে হবে না। ধর্মকে এইরূপ উদারভাবে বুঝতে পারলে মানুষ পরস্পরের বন্ধু হবে এবং অনন্ত ঈশ্বরের আস্বাদ পাবে। তখনই সাম্প্রদায়িক দেওয়াল ভেঙে যাবে এবং মানব-সমাজে অবিরত প্রবাহিত হবে আনন্দের সুরলহরী। আজ একান্ত প্রয়োজন এইরূপ উদার ধর্মবোধের, যা পৃথিবীকে এক স্বর্গরাজ্যে পরিণত করবে।

বেদান্ত-প্রচারের ক্ষেত্র—জাপান

ডক্টর শ্রীসচ্চিদানন্দ ধর

স্বামীজী জাপান দেখে খুব খুশী হয়েছিলেন। জাপানকে দেখে এশিয়ার পরাধীন জাতির জন্য অনেক আশা পোষণ করেছিলেন। সত্যি, জাপান প্রাচ্যের বিস্ময়,—পাশ্চাত্যের ঈর্ষা। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার কলাকৌশল তার আয়ত্ত। অশ্রান্ত ও দ্রুতগতিতে চলছে তার আবিষ্কার ও গবেষণা। জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ক'রে এগিয়ে চলেছে—জাপানী জাতি। এই অগ্রগতি একদিকে যেমন যন্ত্র ও শিল্পকে আশ্রয় ক'রে—তেমনি অপরদিকে শিল্প, সাহিত্য ও সুকুমার চিত্তবৃত্তিকে অবলম্বন করেও সমান তালে চলেছে। একই পীঠে পূজা চলেছে যন্ত্র-ভৈরবের আর সৌন্দর্যলক্ষ্মীর। বিরাট ইস্পাতের কারখানার ভিতর সুন্দর একটি উদ্যান,—প্রশান্ত একটি বুদ্ধমন্দির! এমনি কঠোর-কোমলের, রুদ্র-শিবের সমন্বয় দেখা যাবে জাপানী ব্যক্তিচরিত্রে আর প্রকৃতিতে। অন্তরে তপ্ত আগ্নেয়গিরি, কিন্তু বাইরে শান্ত সমাহিত শুভ্র-হিমানী।

মহাযুদ্ধ ও জাপান—জাপান কি শান্তিকামী?

জাপান যুদ্ধে লিপ্ত ছিল বহুদিন। সাম্রাজ্য-লিপ্সা নিয়ে জাপান ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজ-রুশ প্রভৃতি জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে এসেছে প্রায় একশ' বছর। চীন, কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়াতে জাপান সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রে দীর্ঘকাল শাসন ও শোষণ করেছে। তাই বিগত মহাযুদ্ধে জাপানের মহাপতন (!) প্রতিবাসী রাষ্ট্রের পক্ষে আনন্দ ও কল্যাণের ব্যাপারই হয়েছে। জাপানের পরাজয় দ্বীপময় এশিয়া ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু জাতির স্বাধীনতা

লাভের পক্ষে সহায়ক হয়েছে। তবু জাপানের পরাজয় যেন এশিয়াবাসীর মনে কেমন একটা গোপন অজ্ঞাত বেদনার সঞ্চার করে, যেমন করে মহাকাব্যের প্রতিনায়কের পতন। কারণ মনে হয়, জাপান ছিল সমগ্র এশিয়ার মুখপাত্র-হিসাবে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ, যন্ত্রসভ্যতা ও দাম্ভিকতার যথার্থ প্রত্যুত্তর। তাই জাপানের পতনে আজ আমাদের স্বস্তিবোধের সঙ্গে সঙ্গে বেদনাময় দীর্ঘশ্বাস। শত্রু হলেও জ্ঞাতি তো!

গত মহাযুদ্ধের বিয়োগান্ত পরিণতিতে জাপানের যে শিক্ষা হয়েছে—তাকে সে ভবিষ্যতের স্থায়ী কল্যাণে লাগাবার চেষ্টা করছে। আজ জাপান সত্যি সমগ্র এশিয়াবাসীর আন্তরিক সৌহার্দ্য চায়। যুদ্ধের সমগ্র খেসারত দিয়েও জাপান আজ সব রকম শিল্পে স্বাবলম্বী, তথা 'মহাজন' হয়েছে। এশিয়ার সব দেশকে জাপান যান্ত্রিক উন্নতির জন্য সাহায্য দিচ্ছে—যন্ত্রপাতি দিয়ে, দক্ষ কারিকর ও উপদেষ্টা দিয়ে। জাপানের এ শুভেচ্ছাকে সন্দেহ না ক'রে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। আর দেখতে হবে কি ক'রে এ সম্পর্ককে লৌকিকতার পরিবর্তে যথার্থ 'আন্তরিক' করা যায়। ভারতবর্ষ নৈতিক বলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি,—এটা শুধু আমাদের আত্মম্ভরিতা নয়, সচেতন বিশ্বাস—পৃথিবীও তা স্বীকার করছে। আর্থিক সম্পদেও ভারতের অগ্রগতির বিপুল সম্ভাবনা সমগ্র বিশ্ব বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষ বিশ্বকে যদি কিছু দিতে চায়, তবে বিশ্ব শ্রদ্ধার সঙ্গেই তা গ্রহণ করবে। শক্তিমান্‌কে সকলেই খাতির করে। জাপান আজ অন্তরে বাহিরে শান্তিকামী। ভারত এই শুভেচ্ছাকে কাজে লাগাক্।

পঞ্চশীল ও সহ-অস্তিত্বের বাণী—বেদান্তের সুরে

পঞ্চশীলের 'ফরমুলা' আজকাল উচ্চস্তরের রাজনীতির বাণীতে বেশ জায়গা ক'রে নিয়েছে। 'সকলের সঙ্গে ভাগ ক'রে দুনিয়াটাকে ভোগ করতে হবে'—এই সাধারণ কথাটা বিশ্বের কাছে একটা 'বাণী'র মতো! অথচ বেদান্ত-শাসিত ভারতের কাছে 'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্'—কথাটা অতি সরল,—অর্থটা জীবনে সুপরিস্ফুট। 'কেন সকলের সঙ্গে ভাগ ক'রে খাব, কেন একলা সম্ভোগ ক'রব না?'—এর সদুত্তর রাজনীতি দিতে পারে না। এর যথার্থ উত্তর বেদান্তে—বিশ্বের সঙ্গে আত্মার আত্মীয়তা সংস্থাপনের প্রচেষ্টায়। আধুনিক সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদীরা শুধু আইনের দ্বারা সাম্য প্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টা করছেন। সাম্যবাদের, সহ-অস্তিত্বের একমাত্র ভিত্তি হ'তে পারে বেদান্ত। জোরগলায় বিনা-দ্বিধায় বলা যেতে পারে, 'ইহা ছাড়া নাই অন্য পথ—নান্যঃ পন্থাঃ।' তবু আনন্দের কথা সহ-অস্তিত্বের বাণী ভারতীয় নেতার মুখ-নিঃসৃত। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির বংশধর ব'লেই—নিজের সাধনার উপলব্ধি না থাকলেও তাঁর পঞ্চশীলের মন্ত্রটা আজ কাজ করছে। অন্ততঃ বিশ্বের রাজনৈতিক নেতারা কথাটা নিয়ে ভাবছেন।

যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও আধুনিক ভোগ-বিলাসের প্রচুর উপকরণ সত্ত্বেও ক্লান্তি এবং অবসাদবোধ জাপানী জাতিকে সহজেই বেদান্তের পথে শান্তির সন্ধানে অনুপ্রাণিত করবে। যুদ্ধ-শ্রান্ত ভোগক্লান্ত যন্ত্রদানব-পীড়িত জাপান আজ সত্যকারের শান্তি চায়। পাশ্চাত্যে স্বামীজীর নির্ধারিত কর্মধারায় বেদান্ত-প্রচারের কেন্দ্র আছে। জাপানেও সেইরূপ কেন্দ্র শীঘ্রই খোলা দরকার। জাপান-প্রবাসকালে আমার সেখান-কার কয়েকজন বিশিষ্ট চিন্তাশীল অধ্যাপক ও

যুবক ছাত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা ও ভাবের আদান-প্রদান করার সৌভাগ্য হয়েছিল। দেখলাম, কয়েকজন অধ্যাপক নিজেদের প্রচেষ্টায় সেখানে ভারতীয় দর্শন ও বেদান্তের বাণী প্রচার করতে চেষ্টা করছেন। প্রাচ্যবিদ্যা, ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা জাপানের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বহুকাল ধ'রে আছে। অনেক ছাত্র ভারতের দর্শন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য ভারতে আসতে ইচ্ছুক। এই শ্রেণীর চিন্তাশীল অধ্যাপক, সমাজসংস্কারক, মঠাধ্যক্ষ ও ছাত্রেরা ভারতের বেদান্তের বাণীকে সহজেই গ্রহণ করতে উৎসাহী।

সাধারণ লোকের ভারত সম্পর্কে আগ্রহ

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও অধ্যাপক-শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ছাড়া সাধারণ লোকের মধ্যেও ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রচুর আগ্রহ দেখা যায়। ভারত শান্তিপ্রিয় অহিংস এবং প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ—এই ধারণা সাধারণ লোকের মধ্যেও বদ্ধমূল। ভারতে অতি অল্প শ্রমে জীবিকা অর্জন করা চলে—এইরূপ ধারণা জাপানী শ্রমিকদের আছে। ভারতের বর্ণভেদ, বাল্যবিবাহ, গোপূজা, যাদুবিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণাও সাধারণ লোকের মধ্যে আছে। ভারতের দূতাবাস ও জাপানস্থ ভারতবাসীরা যথার্থ প্রচারের দ্বারা জাপানীদের ভারত সম্পর্কে ভ্রান্তি দূর করতে পারেন। সব মিলিয়ে ভারতকে সবাই শ্রদ্ধা করে, ভারতের সঙ্গে জাপানের ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত সংযোগ আছে ব'লে, গর্ববোধ করে।

জাপানের সাধারণ লোক ও ধর্মচর্চা

জাপানের অধিকাংশ লোক ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন। বৌদ্ধ, সিণ্টো ও খৃষ্টান—এই তিন ধর্মমতের লোক জাপানে আছে। প্রাত্যহিক জীবনে অনুষ্ঠানমূলক ধর্মীয় আচার বলতে বিশেষ কিছু নেই। কোন কোন গৃহে পূজার বেদী আছে। সাধারণতঃ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সিণ্টো পুরোহিতরাই ধর্মকর্ম নিয়ে থাকেন। বৎসরের বিশেষ বিশেষ ঋতুতে ঋতু-উৎসব বা প্রকৃতির বিশেষ কোন শক্তির স্থানীয় পূজা ও উৎসব হয়। বৌদ্ধেরা এবং সিণ্টোরা অনেক লৌকিক দেবতার পূজাও করেন। ধর্ম সম্বন্ধে কারও মনে গোঁড়ামি নেই। ধর্মের জন্য বিবাহ সম্পর্ক বা সামাজিকতা আটকায় না। একই পরিবারে খৃষ্টান বৌদ্ধ এবং সিণ্টো মতের লোক আছেন। উহাতে পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট হয় না। পুনর্জন্মবাদে ও কর্মফলে অনেকেই বিশ্বাসী। পূর্বপুরুষদের সমাধির প্রতি ও পরলোকগত আত্মার প্রতি সবাই শ্রদ্ধা প্রকাশ করে। কোন বিশেষ ধর্মমতের উপর এদের বিরাগ বা আসক্তি নেই।

জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিবোধ

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান কম হলেও জাপানীদের মধ্যে এক অসাধারণ নীতিবোধ দৃষ্ট হয়। চুরি, ভিক্ষাবৃত্তি, প্রতারণা, মিথ্যাভাষণ, খাদ্যে ভেজাল দেওয়া—খুব কমই দেখা যায়। কাজে কর্মে ফাঁকি নেই। জাতি বা সমাজের নামে তারা অতি সহজেই বড় রকমের স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে। জীবনকে খুব সহজভাবেই নেয়। খুব বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতেও হা-হুতাশ নেই। প্রয়োজনবোধে অনায়াসে আত্মহত্যা করতে পারে। 'হারাকিরি' নামক আত্মহত্যার কথা আমরা সবাই জানি। আগ্নেয়গিরির গহ্বরে বা জলপ্রপাতে ঝাঁপ দিয়েও অনেকে আত্মহত্যা করে। জীবনটা ও মৃত্যুটা যেন একটা খেলা! নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। বিধবা-বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন-সম্মত। নারী-পুরুষের

সমান অধিকার আইনতঃ স্বীকৃত, বাস্তবে রূপায়িত।

আধুনিক শহর ও শিল্পাঞ্চলে ভোগবিলাসের প্রাচুর্য। নৃত্যশালা, পানশালা, টেলিভিসন ও বহু প্রকারের ভোগবিলাসের উপকরণ বিদ্যমান। সবাই আপ্রাণ পরিশ্রমে অর্থ উপার্জন করে, দুই হাতে খরচও করে। 'খাও, দাও, ফূর্তি কর'—এই যেন ভাব! কিন্তু অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ভোগোপকরণের প্রাচুর্য জাপানী মনকে ক্লান্ত, রিক্ত ও নূতন পথের সন্ধানী করেছে মনে হয়।

বেদান্তের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র

জাতিগত ভাবে জাপান যুদ্ধের চরম ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে—হিরোসীমা আর নাগাসাকির ধ্বংসে। বহু বিধবার ও পুত্রহারা জননীর হাহাকার এখনও জাপানের আকাশে বাতাসে। যুদ্ধের বাহ্য ক্ষয়ক্ষতি আর ধ্বংসকে পূরণ ক'রে জাপান আবার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে উঠেছে। জাপানী যুবকযুবতী আজ সত্যি যুদ্ধ বা সাম্রাজ্য-বিস্তার চায় না। সবাই চায়—শান্তি। ভোগের উপকরণ, কর্মে নিয়োগের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সামাজিক ক্ষেত্রে অবাধ মেলামেশা, প্রচুর ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও সবাইকে শ্রান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন মনে হয়। সাধারণ মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি কর্মক্ষমতা, সভ্যতা, উন্নত ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এদের মনে কেন যে শান্তি নেই—এর উত্তর দিতে পারে একমাত্র বেদান্ত।

স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল—এশিয়ার অনুন্নত জাতিরা জাপানের যান্ত্রিক উন্নতির দক্ষতাকে গ্রহণ ক'রে নিজেদের জীবনযাত্রাকে সহজতর করবে। যুদ্ধোত্তর এশিয়া জাপানের কাছ থেকে তার শিল্পকৌশল নিচ্ছে। এই লেনদেনের যুগে ভারত জাপানকে বেদান্তের বাণী দিয়ে সাহায্য করতে পারে। জাপানী মনে কোন ধর্মীয় গোঁড়ামি বা দৃঢ় পূর্বসংস্কার নেই। সুতরাং এই পরিস্থিতি বেদান্তপ্রচারের পক্ষে সহায়ক। বৌদ্ধ দর্শনের মাধ্যমেও বেদান্তকে সহজেই জাপানী জাতির গ্রহণযোগ্য ক'রে তোলা যায়।

সুখের বিষয় কয়েকজন জাপানী চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রচেষ্টায় ও রামকৃষ্ণ মিশনের দু' এক জন সন্ন্যাসীর উপদেশে ও অনুপ্রেরণায় টোকিও ও ওসাকায় বেদান্ত-কেন্দ্র গড়ে উঠছে। এ কাজকে আরও ত্বরান্বিত করা যায় না কি? প্রাচ্যের সর্বপেক্ষা শিল্পোন্নত দেশ জাপানে, ভারতের প্রাচীন ভাবধারাপুষ্ট জাপানে বেদান্ত মূর্ত হয়ে উঠলে একটি আদর্শ মানব-সমাজের বাস্তব রূপায়ণ দেখে মানুষ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হ'তে পারবে।

I would wish that every one of our young men could visit Japan once at least in his life time The Japanese think that everything Hindu is great, and believe that India is a holy land.

Japanese Buddhism is entirely different from what you see in Ceylon. It is the same as Vedanta. It is positive and theistic Buddhism, not the negative atheistic Buddhism of Ceylon.

—*Swami Vivekananda*

বিজ্ঞানের বল

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

এ বিশ্বের আদ্যাশক্তি সৃষ্টিকর্ম করি সমাপন—
মানুষ, তোমাব হাতে এ ধবাবে কবেছে অর্পণ।
পূর্ণরূপে অধিকাবি' নতুন কবিয়া তাবে গড়ো,
অথবা বিজ্ঞানবলে বিধ্বংস করিবে, তাই করো।

ধবারে সর্ষপকণা ভাবি চিবদিন
মহাশক্তি রবে উদাসীন।
যতই বিস্তার করো মানবমহিমা
তোমাব ও বিজ্ঞানের ক্ষমতাব আছে পরিসীমা।

ক্ষণজীবী পতঙ্গ মানুষ।
যতই উড়াও তুমি লুনিকে ও স্পুটনিকে খেলার ফানুস
বিহিত সীমারই মাঝে তাব লীলা চলে,
সীমার লঙ্ঘন কভু তাবে নাহি বলে।

যে বুদ্ধিতে কব তুমি দুঃসাধ্য সাধন,
তাব বীজ মহাশক্তি—তব দেহে করিল বোপণ।
এ অসীম ব্রহ্মাণ্ডেব গ্রহান্তব জিনিবাব আশা
জেনো তাবে বিজ্ঞানেব বকাণ্ড-প্রত্যাশা।

জীবলোক সংহাবিতে পারে তব বিজ্ঞানেব বল
সাধিতে মানসলোকে পাবে সার্বজনীন মঙ্গল ?
বিশ্বজিৎ, তবু তুমি জীবনান্ত সীমার অধীন,
বিজ্ঞান লঙ্ঘিতে সেই সীমা শক্তিহীন।

প্রকৃতিরে জিনিয়াছ, ধরণী তোমার ক্রীড়াভূমি,
মৃত্যুবিজয়ের কথা ভেবেছ কি তুমি ?
বিজ্ঞানের বলে নয়, লভি বল অন্য সাধনার
মানুষই জিনিয়া মৃত্যু রথী হয় সাবথ্যে তাহার—
যুগে যুগে, দেশে দেশে, গ্রহে গ্রহে অভিযান যার।

প্রাচীন ভারতে স্বরের সাধনা

স্বামী মৈথিল্যানন্দ

প্রাচীন ঋষিগণ শব্দব্রহ্ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। শব্দের অন্তর্নিহিত যে স্বর আছে এবং স্বরের পশ্চাতে যে অনির্বচনীয় উৎস আছে তাহা তাঁহারা স্বরের সাধনা করিয়া অবগত হইয়াছিলেন। জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে একটি কাহিনী আছে, তাহা আলোচনা করিলে এই তত্ত্বটি আরও বিশদ হইবে। কাহিনীটি এই :

মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দেবতারা স্বরশূন্য 'ঋক্ মন্ত্রে' প্রবেশ করিলেন। মৃত্যু বুঝিতে পারিলেন যে দেবতারা ঋক্-মন্ত্রের মধ্যে নিজেদিগকে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, যেমন একটি রত্নের মালার মধ্যে সূত্রটি লুক্কায়িত থাকে। মৃত্যুর ভয়ে তখন দেবতারা মন্ত্রের মধ্যে যে 'স্বর' আছে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মৃত্যু তখন স্বরের মধ্যে ঢুকিয়া দেবতাদের আক্রমণ করিবার প্রয়াস পাইলেন। দেবতারা তখন স্বরের মধ্যে যে শাশ্বত অমর 'ওঁ' আছে তাহার মধ্যে আশ্রয় লইলেন। মৃত্যু তখন আর কিছুই করিতে পারিলেন না।

এই কাহিনীতে শিক্ষণীয় এই যে 'ওঁ' সমস্ত শব্দ এবং স্বরের পশ্চাতে মৃত্যুহীন শব্দাতীত, এবং স্বরাতীত সত্তাভাবে বর্তমান আছেন। গৌতমীয় তন্ত্রে আছে যে স্বরযুক্ত শব্দের অসীম শক্তি এবং ইহা আকাশের মতো সর্বব্যাপী —

'ব্যাপিনী ব্যোমরূপা স্যুরনন্তাঃ স্বরশক্তয়ঃ'।

ঋষিগণ ঋক্-মন্ত্রের মধ্যে স্বরযুক্ত সঙ্গীত যোগ করিয়া সামবেদ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেইজন্য অধিকাংশ সামবেদের মন্ত্র ঋগ্বেদে পরিদৃষ্ট হয়। ঋগ্‌বেদ ও সামবেদে এই প্রভেদ যে সামমন্ত্রের মধ্যে সঙ্গীতের স্বর দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত বেদের মধ্যে সামবেদকে এই-জন্যই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন, 'বেদানাং সামবেদোঽস্মি।' তিনি সামবেদের মধ্যেই বিশেষভাবে প্রকটিত আছেন।

ঋষিগণ যোগসহায়ে শব্দের ও সঙ্গীতের শক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এই সমগ্র বিশ্ব বিধাতার চিন্তা হইতে উদ্‌ভূত হইয়াছে। তাই বেদে আছে, 'যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।' বিধাতা পূর্ব পূর্ব যুগের ন্যায় তাঁহার চিন্তা হইতে এই বিশ্ব উৎপাদন করিয়াছেন। চিন্তা মানস ব্যাপার— 'সঙ্কল্পঃ কর্ম মানসম্।' চিন্তা বা সঙ্কল্প মানসিক কর্ম হইতে সঞ্জাত হইয়াছে। চিন্তা কি? কতকগুলি বর্ণের সমষ্টিমাত্র। বর্ণ ব্যতিরেকে কোন চিন্তা সম্ভব নয়। আর বর্ণগুলি কি? কতকগুলি ধ্বনিমাত্র। অতএব সমগ্র বিশ্বটি বর্ণ ও ধ্বনি লইয়া সংগঠিত। 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্'—অর্থাৎ যাহা কিছু বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, সে সকল বর্ণ ব্যতীত কিছুই নহে।

তন্ত্রানুসারে শব্দ চতুর্বিধ। আমরা মুখে বা বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে শব্দ করি তাহা 'বৈখরী'। বর্ণসমষ্টির উচ্চারণ না করিয়া আমরা যে চিন্তা করি তাহা 'মধ্যমা'। 'মধ্যমা'র ভিতরে সূক্ষ্ম শব্দ যাহা ধ্বনিত হয় অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গে— তাহার নাম 'পশ্যন্তী'। 'পশ্যন্তী'কে যোগিগণ ধ্যানসহায়ে অনুভব করিয়া থাকেন। 'পশ্যন্তী'র পশ্চাতে এক অনির্বচনীয় সূক্ষ্মতম শব্দতরঙ্গ আছে, উহার নাম 'পরা'।

ভগবান্ বিষ্ণুর করে যে শঙ্খ আছে তাহা শব্দের প্রতীক। ইহা দ্বারা এই প্রদর্শিত হয়

যে বিধাতার করে অনন্ত শব্দের শক্তি বর্ত্তমান আছে। এই শব্দ সর্বব্যাপী এবং বিশ্বসৃষ্টির আদিকারণ ও অনাদি। যোগিগণ গভীর ধ্যানে হৃদয়-গহ্বরে এই শব্দের অনুভূতি লাভ করেন। অনাহত চক্রের মধ্যে উহা অনাহত ধ্বনি বলিয়া খ্যাত।

সাধারণতঃ শব্দ দুই ভাগে বিভক্ত: একটি ধ্বন্যাত্মক, যাহা শঙ্খ ভেরী প্রভৃতি হইতে উত্থাপিত হয়। অন্যটি শব্দাত্মক যাহা কেবল বর্ণ-সমষ্টি হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের নিনাদিত শঙ্খ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছিল,—শব্দের এমনই শক্তি। শব্দশক্তি সৃজনশীল, পালনশীল এবং ধ্বংসক্ষম।

ঋষিগণ স্বরের বা সঙ্গীতের সাধনা করিয়া সামবেদ গাহিতেন। সামগানের দ্বারা লৌকিক নানা বিপদ্ দূরীভূত করিতেন। অদৃষ্টজনিত আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক তাপ সামসঙ্গীতের দ্বারা দূরীকৃত হইত। আধি ও ব্যাধি সামগানে বিনষ্ট হইত। ইহা ছাড়া মানুষের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত আত্মশক্তি আছে তাহাও সামগানের দ্বারা জাগ্রত হইত।

বাত, পিত্ত এবং কফের বৈষম্যে মানুষের মেজাজ ও শরীর মলিন হইয়া থাকে। সামগানের সাহায্যে মালিন্যযুক্ত মন ও দেহ মালিন্যমুক্ত হইয়া প্রশান্ত হইত। প্রাচীন ভারতে ঋষিগণ এই তত্ত্ব বিশেষভাবে অবগত ছিলেন বলিয়া ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হয়।

ত্রিপুরতাপিনী উপনিষদে উক্ত আছে, 'স্বরেণ সংলয়েদ্ যোগী'—যোগী স্বরের দ্বারা নিজের মনকে সমাহিত করিবে। ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদে আছে, 'স্বরেণ সন্ধয়েদ্ যোগী'—যোগী স্বরের দ্বারা যোগ-সন্ধান করিবে। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, 'প্রাণো বৈ স্বরঃ'—যখন মন্ত্র স্বরসংযুক্ত হয় তখনই উহা প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। তখনই মন্ত্রে প্রাণ জাগিয়া উঠে। যোগোপনিষদে আছে, 'সদা নাদানুসন্ধানাদ্ সংক্ষীণা বাসনা ভবেৎ'—সর্বদা নাদ বা স্বরের চর্চা করিলে মানুষের বাসনানিচয় ক্ষীণ হইয়া নষ্ট হইতে থাকে।

আজকাল সঙ্গীতের সাহায্যে ব্যাধির চিকিৎসাও হইতেছে। এ তত্ত্বটি ঋষিগণ কত সহস্র বৎসর পূর্বে শুধু আলোচনা নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারও করিয়াছিলেন। শুধু আধি ও ব্যাধির ব্যাপারে নয়, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ব্যাপারেও সামবেদের প্রচেষ্টা কম নয়। অধুনা এইসব সাধনা মন্দীভূত এবং বিরল বলিয়া অনেকের ইহাতে আস্থা নাই।

সামগানে বিক্ষিপ্ত মন সমাহিত হয়। বিষয়-লোলুপ ইন্দ্রিয়গুলি সামগানে সংযত হয়। সুপ্ত আত্মশক্তি সামগানে উদ্বুদ্ধ হয়। দৈব উৎপাত—যথা অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প এবং প্লাবনাদি সামগানে প্রশমিত হয়। মানবের কল্যাণে যদি পরমাণু-শক্তি ব্যবহৃত হইতে পারে, পরীক্ষিত এবং ঋষি-দৃষ্ট সামগানের শক্তির প্রয়োগ কি চলিতে পারে না? যেহেতু ইহা ধর্মগ্রন্থের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে এবং যেহেতু ইহা বর্তমান বিজ্ঞানাগারে উদ্ভূত হয় নাই, বা যেহেতু ভারতীয় ঋষিদের দ্বারা ইহা আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত হইয়াছিল, সেই হেতুই কি স্বরের সাধনা ও প্রয়োগ অবহেলিত হইবে?

তন্ত্রোক্ত মহাবিদ্যা

অধ্যাপক শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার

তন্ত্রশাস্ত্রে 'বিদ্যা' শব্দের অর্থ মন্ত্র। মন্ত্রবিশেষের কথা বলিতে গিয়া বিশ্বসারতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 'একাক্ষরী সমা নাস্তি বিদ্যা ত্রিভুবনে প্রিয়ে।' এখানে 'বিদ্যা' শব্দটি 'মন্ত্র' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

মন্ত্র, যন্ত্র এবং দেবতা অভেদ। মন্ত্রে যে শক্তির সূক্ষ্মতম রূপ, তাহারই স্থূলতর প্রকাশ যন্ত্রে এবং স্থূলতম প্রকাশ দেবতার মূর্তিতে। এইজন্য তন্ত্রে—যন্ত্র থাকিতে প্রতিমা স্থাপন নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং যন্ত্র সত্ত্বেও প্রতিমা স্থাপন করিলে দ্বিগুণ পূজা, জপ হোমাদি বিহিত হইয়াছে।

বাংলা তন্ত্রের দেশ। এইজন্য এদেশে সকলেই দশ মহাবিদ্যার নামের সহিত পরিচিত। শাক্তগণ যে নামাবলী ব্যবহার করেন, তাহাতে দশ মহাবিদ্যার নাম অঙ্কিত থাকে যথা :

কালী তারা মহাবিদ্যা যোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধ-বিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

এই দশ মহাবিদ্যা ব্যতীত তন্ত্রে আরও অষ্ট মহাবিদ্যার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, ত্রিপুরা, সরস্বতী প্রভৃতি আদ্যাশক্তির বিভিন্ন প্রকাশও মহাবিদ্যারূপে কথিত হইয়াছে।

এই সমস্ত মহাবিদ্যার মন্ত্র-সাধনায় সাধারণ ক্ষেত্রে করণীয় বিচারাদির কোন প্রয়োজন নাই। আদ্যাবিদ্যা শ্যামামায়ের মন্ত্রের কথা বলিতে গিয়া ভৈরব তন্ত্রে শ্রীশিব বলিতেছেন :

অথ বক্ষ্যে মহাবিদ্যাঃ কালিকায়াঃ সুদুর্লভাঃ।
যাসাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥
নাত্র চিন্তা-বিশুদ্ধিঃ স্যান্ন বা মিত্রাদিদূষণম্।
ন বা প্রয়াসবাহুল্যং সময়াসময়াদিকম্।

—অনন্তর কালিকাদেবীর সুদুর্লভ মন্ত্রাদির কথা বলিতেছি। এই সকল মন্ত্রের জ্ঞানমাত্র মানুষ জীবন্মুক্ত হইতে পারে। এই সমস্ত মন্ত্রগ্রহণে মন্ত্রশুদ্ধি বিবেচনা ও অরিমিত্রাদি বিচার নাই। এই মন্ত্রের উপাসনাতে প্রয়াসবাহুল্য অথবা সময়-অসময় বিবেচনা নাই।

মহাদুর্গা মন্ত্রের মাহাত্ম্যকীর্তনে বর্ণিত হইয়াছে, 'চতুর্বর্গপ্রদং সাক্ষান্মহাপাতকনাশনম্'। এই বিদ্যার সাধনায় গন্ধ, পুষ্প, হোম প্রভৃতি আয়াস গ্রহণের প্রয়োজন নাই। 'জপমাত্রেণ সিদ্ধিদা' কেবলমাত্র জপের দ্বারাই—সিদ্ধিলাভ হয়। সমস্ত সিদ্ধবিদ্যার মন্ত্রেরই এইরূপ মাহাত্ম্য তন্ত্রশাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে।

দশ মহাবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে 'প্রাণতোষিণী'কার কয়েকটি আখ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন। আদ্যাবিদ্যা কালীদেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে 'মার্কেণ্ডেয় পুরাণ'-কথিত বৃত্তান্ত তন্ত্রেও স্বীকৃত হইয়াছে। হিমালয়সুতা পার্বতী জাহ্নবী-স্নানে গিয়াছেন। এদিকে দেবতারা শুম্ভনিশুম্ভের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া জাহ্নবীতীরে দেবীর স্তব করিতেছেন। পার্বতী তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা কাহার স্তব করিতেছেন?' তখন পার্বতীর শরীরকোষ হইতে এক দেবী নির্গতা হইয়া বলিলেন, 'ইঁহারা আমারই স্তব করিতেছেন।' সেই দেবী কৌষিকী নামে খ্যাত। গৌরবর্ণা পার্বতী তখন কৃষ্ণবর্ণা হইয়া কালিকা নামে হিমালয় পর্বতে অবস্থান করিলেন।

তারা ছিন্নমস্তা ধূমাবতী—মহাবিদ্যার আবির্ভাব সম্বন্ধে তন্ত্রে বিভিন্ন কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মহাদুর্গা জগদ্ধাত্রী দেবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে

কাত্যায়নীতন্ত্রে যে আখ্যান কথিত হইয়াছে, তাহা কেনোপনিষদ্-কথিত উমা হৈমবতী দেবীর আবির্ভাবের কাহিনী-সদৃশ।

পুরাকালে দেবতারা অসুরদিগকে জয় করিয়া মনে করিলেন, 'আমরাই ঈশ্বর। আমাদের অতিরিক্ত ঈশ্বর কেহ নাই।' দেবতাদের এই অভিমান দেখিয়া আদ্যাশক্তি জগন্মাতা তাঁহাদের সংযত করিবার জন্য 'কোটিসূর্যসমপ্রভ' 'কোটি-চন্দ্রসুশীতল' বিরাটরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। দেবতারা বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'ইনি কে?' তাঁহারা বায়ু ও অগ্নিকে তাঁহার পরিচয় লইবার জন্য পাঠাইলেন। অগ্নি ও বায়ু হৃতগর্ব হইয়া, তাঁহাকে জানিতে না পারিয়াই ফিরিয়া আসিলেন। তখন ইন্দ্র বুঝিলেন যে ইনি মহাদেবী। পূজাস্তবাদির দ্বারা ইন্দ্র তাঁহার প্রসন্নতা বিধান করিলেন। দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া সেই মহাদেবী তাঁহার সুগোপ্য মঙ্গলময়রূপ ধারণ করিয়া তাঁহা-দিগকে দর্শন দিলেন :

মৃগেন্দ্রোপরি সুস্মেরা সর্বালংকারভূষিতা।
চতুর্ভুজা মহাদেবী নাগযজ্ঞোপবীতিনী ॥
ত্রিনেত্রা কোটি-চন্দ্রাভা দেবর্ষিমুনিসেবিতা ॥

তন্ত্রোক্ত মহাবিদ্যার পূজায় প্রত্যেক দেবীর ভৈরবের পূজারও বিধান আছে। যিনি যে দেবীর মন্ত্রের ঋষি, তিনি তাঁহার ভৈরব। এই-রূপে আদ্যাবিদ্যা কালিকাদেবীর ভৈরব মহাকাল, তারাদেবীর ভৈরব অক্ষোভ্য, মহাদুর্গার ভৈরব নারদ, ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্র তাহার 'অন্নদামঙ্গলে' দশ-মহাবিদ্যার আবির্ভাবের একটি অপূর্ব কাহিনী লিখিয়াছেন। ইহা সাধারণে প্রচলিত, কিন্তু ইহার মূল কোন তন্ত্রে আছে কিনা, ঠিক জানা যায় না।

দক্ষকন্যা সতী নারদের মুখে শুনিলেন যে তাঁহার পিতা একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহাতে দেবতারা সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, শুধু শিবের নিমন্ত্রণ হয় নাই। দেবী শিবের নিকট পিতৃগৃহে যাইবার অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু শিব বিনা-আমন্ত্রণে যাইবার অনুমতি দিতে সম্মত হইলেন না। তখন দেবী একে একে দশ মহাবিদ্যার মূর্তি ধারণ করিয়া শিবকে আপন মাহাত্ম্য জানাইয়া দিলেন। শিব যে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সেই দিকেই একটি নূতন মূর্তি দেখিতে পাইলেন। ভারতচন্দ্রের সেই মনোজ্ঞ বিবরণ হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃতি দিতেছি :

সতী কন মহাপ্রভু, হেন না কহিবা।
বাপ-ঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা ॥
যত কন সতী, শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ ॥
মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তুরা।
শবারূঢা করকাঞ্চী শবকর্ণপুরা ॥
গলিতরুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে।
গলিতরুধির মুণ্ড বামকরতলে ॥
আর বামকরেতে কৃপাণ খরশান।
দুই ভুজ দক্ষিণে অভয় বরদান ॥
লোলজিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে।
ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে ॥

এই বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে দেবীর ধ্যানানুগা এবং ইহা ভারতচন্দ্রের তন্ত্রশাস্ত্রে নৈপুণ্য সূচিত করে।

দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইল মুখ।
তারারূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ ॥
নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্পবদ্ধা ঊর্ধ্ব এক জটা বিভূষণা ॥
অর্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘ ছাল ॥
নীলপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ড খর্পর।
চারিহাতে শোভে, আরোহণ শিবপর ॥

ক্রমে ক্রমে এইরূপে মহাদেব কর্তৃক ষোড়শী বা রাজরাজেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী ও কমলারূপের দর্শন বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত বর্ণনার ভিতর দিয়া ভারতচন্দ্রের তন্ত্রশাস্ত্রে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

তন্ত্রশাস্ত্র রহস্যশাস্ত্র। ইহার তত্ত্ব ও সাধনা গুরুগম্য। মন্ত্রসমূহও রহস্যভাষায় বর্ণিত, তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিই এই সকল মন্ত্রোদ্ধার করিতে পারেন। তন্ত্রসার-রচয়িতা ৺কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহোদয় তাঁহার নিবন্ধে এই সমস্ত রহস্য-মন্ত্র স্ফুটভাবে ব্যাখ্যা করিয়া যে অপরাধ করিয়াছেন তাহার স্খালনের জন্য জগন্মাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন :

বেদার্থশাস্ত্রবিপরীতবিলোকনেন
প্রায়ো ভবদ্ধনলোপমবেক্ষ্য মাতঃ।
তদ্গূঢ়কূটবিশদীকরণেষু জাতান্
মাতঃ ক্ষমস্ব তব পাদযুগেষু যাচে ॥

—মা, তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করিতেছি, পাছে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া তোমার পূজা লোপ পায়, এই ভয়ে আমি নিতান্ত গূঢ় কূটস্থানের ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাতে গুহ্য বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে। মা, তজ্জনিত আমার দোষ তুমি ক্ষমা কর।

তন্ত্রোক্ত দেবীর মূর্তিসমূহ রহস্যাবৃত। সাধন-সিদ্ধ রহস্যবিদ্ আচার্যই এই রহস্যের মর্মোদ্ঘাটন করিতে পারেন। স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী তাঁহার 'জপসূত্রম্' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে যে তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, পাঠককে তাহার কিঞ্চিৎ উপহার দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। তন্ত্রোক্ত ছিন্নমস্তা বা প্রচণ্ডচণ্ডিকা দেবী আপাতদৃষ্টিতে অতি ভয়ঙ্করী। ভারতচন্দ্রের ভাষায় :

বিকসিত-পুণ্ডরীক-কর্ণিকার মাঝে
তিনগুণে ত্রিকোণমণ্ডল ভাল সাজে।
বিপরীত রতে রত রতিকামোপরি।
কোকনদবরণা দ্বিভুজা দিগম্বরী ॥
নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে।
খড়্গে কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে ॥
কণ্ঠ হইতে রুধির উঠেছে তিন ধার।
একধারা নিজ মুখে করেন আহার ॥
দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী।
দুই ধারে গিয়ে তারা শব-আরোহণী ॥
চন্দ্রসূর্য অনলশোভিত ত্রিনয়ন।
অর্ধ চন্দ্র কপালফলকে সুশোভন ॥

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ দেবীর ছিন্নমস্তা-মূর্তির রহস্য নিম্নোক্ত শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন :

ব্রহ্মাস্মীতি প্রমাণাৎ
পদতলদলিতা বিপ্রতীপা রিরংসা,
প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম পূর্ণা-
দিতিপদ-গমনাচ্ছাস্তিকৃন্মন্ত্রবর্ণৈঃ।
আত্মায়ং ব্রহ্ম চেতি
শ্রুতিষু নিগমনাৎ **তত্ত্বমস্যাদি**তত্ত্বম্,
নাদৈস্ম গ্যন্তদর্থঃ
স্ফুটিতপরিচয়া ছিন্নমস্তাঽস্তু গুহ্যা ॥

মায়ের একটি রহস্যমূর্তি ছিন্নমস্তা, ইহার মধ্যে বেদান্তের চারিটি প্রসিদ্ধ মহাবাক্য লুকাইয়া রহিয়াছে, সংক্ষেপে তাহা ব্যাখ্যাত হইতেছে :

'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যে বিপ্রতীপ রিরংসা পদ-দলিত, কারণ ঐ বোধ নিশ্চয় হইলে পরমাত্মাতেই পূর্ণ রতি হয়। ভূমা আত্মাই আত্মার নিরতিশয় প্রিয়, অল্প অনাত্মবস্তুতে প্রিয়বুদ্ধি স্বাভাবিক নহে, অথচ তাহাতেই জীবের ভোগেচ্ছা—ইহাই বিপরীত রিরংসা। ছিন্নমস্তার পদতলে ইহাই দলিত। 'আমি স্বরূপতঃ আনন্দ-ব্রহ্মই, এবং ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নাই'—এই ভাব নিশ্চয়

হইলে বিপরীত রতি দূর হইয়া আত্মরতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

শান্তিপাঠের মন্ত্র 'ওঁপূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং··' ইত্যাদি পদের দ্বারা লক্ষিত 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' ছিন্নমস্তার প্রতীকে প্রকাশিত। আপন মস্তক আপনি ছেদন করিয়া, আপন রক্ত আপনি পান করিয়া তিনি দেখাইতেছেন—ইহাও পূর্ণ, উহাও পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণকে লইলে পূর্ণই থাকে, পূর্ণ ব্যতীত অপূর্ণ কোথায়?

'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' মহাবাক্যের অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে এইভাবে—দেবীর দিব্য শরীরে যে আত্মা 'রুধির'রূপে রহিয়াছে, তাহাই অন্তর্বহিঃ সর্বত্র।

শ্রুতি যেভাবে নিঃশেষে প্রমাণ করিয়াছেন, সেইভাবে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যরূপ অসি দ্বারা দেবী আপন ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। করের অসি সেই 'অসি'রই প্রতীক। দেহের নিম্নাঙ্গ জীবভাব 'ত্বং' পদার্থ, উত্তমাঙ্গ 'তৎ' পদার্থ, 'অসি' পদটি এতদুভয়ের ভাগত্যাগলক্ষণ প্রদর্শন করিতেছে। উভয়ের বিশেষ ধর্ম ত্যাগ করিয়া উভয়ের সাধারণ 'রুধির' অভিন্ন সত্তারূপে গৃহীত হইতেছে। দেহ হইতে যাহা নির্গলিত, মুণ্ডে তাহাই সমর্পিত। আপন স্বরূপ-পরিচয়ে ছিন্নমস্তা আমাদের বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত হউন। মহাবাক্য-চতুষ্টয়ের এরূপ অর্থ—নাদানুসন্ধান বা ওঁকারের অর্থনির্ণয় দ্বারাই সাধককে লাভ করিতে হইবে।

পূর্বোক্ত গ্রন্থে লেখক এইভাবে কালী, তারা, ধূমাবতী প্রভৃতি মহাবিদ্যার তত্ত্বও উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। তন্ত্রাচার্যেরা বলেন, বেদান্ত-সাধনার ব্যাবহারিক পদ্ধতি তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বেদান্তের অদ্বৈতানুভূতি ও তন্ত্রের শিবত্ব-জ্ঞান একই বস্তু। মহাবিদ্যাগণের সাধনা এই চরম বস্তুলাভের উপায়। পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব। তন্ত্রোক্ত সাধনার দ্বারা জীব যখন ঘৃণা, লজ্জা, জাতি, কুল, মান প্রভৃতি অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হয় তখনই সে অনুভব করে, 'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।'

জয়তু জয়তু মাতর্বিশ্বসৌভাগ্যদাত্রী
জয়তু জয়তু মাতর্নিখিল-প্রেরয়িত্রী
বিতর বিতর ভক্তিং সর্বদা তে পদাব্জে
লুঠতু লুঠতু চেতো ভৃঙ্গকস্তে পদাব্জে॥

চিন্ময়ী এল ঐ

শ্রীকালীপদ সর্খেল

বেগে বয় ভরানদী উচ্ছল ছল ছল,
শারদ শশীর হাসি মধুময় উজ্জ্বল,
মধুর চাঁদিনী রাতে মাতোয়ারা দিবিকুল
তুলিতেছে কলতান, ফুল্ল কানন-ফুল,
দোদুল্ দোদুল্ দুল্, কাশফুল দুলিছে,
শ্যামল ধরণীতলে হিল্লোল তুলিছে,
সুনীল সরসীজলে বিকশিত শতদল,
গাহিছে ভ্রমর সুখে, সমীরণ চঞ্চল।
বিল্ব-বিটপী-মূলে শঙ্খ বাজিল ঐ
মৃন্ময়ীরূপে মোর চিন্ময়ী এল ঐ।

স্বর্ণমুকুট মাথে কানে দোলে কুণ্ডল
সুহাসিনী মুখখানি সুন্দর ঢল ঢল
কোমল কমল-আঁখি করুণায় টলটল,
সমরে শরমহারা আলুথালু অঞ্চল।
লম্বিত কুঞ্চিত এলায়িত কুন্তল
মঙ্গলা দশ হাতে আনিয়াছে মঙ্গল।
করুণা-কাতর হিয়া স্নেহের তুলনা নাই,
দুষ্ট দানব, তবু চরণে দিয়েছে ঠাঁই।
মাটির দেউলে মোর নাশি ঘন-তম-ঘোর
অরুণ উদিল আজি দুখ-নিশি হ'ল ভোর।

প্রার্থনা

শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনে জমেছে অনেক দুঃখ গ্লানি
ব্যথাহত প্রাণে আজি পরাজয় মানি।

এতদিন মনে ছিল এ অহংকার
পেতে পারি সবই শক্তিতে আপনার।
কিন্তু দেখিনু ধরিতে গিয়েছি যারে
কালের প্রবাহে হারায় তা বারে বারে।
এই কাছে টানি, এই পুন দূরে ঠেলি
চাওয়া পাওয়া নিয়ে কতই না খেলা খেলি।

কী যে চাই তাহা নিজেই বুঝি না হায়
খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন যে কেটে যায়।
জ্ঞানে অজ্ঞানে চেয়েছি কতনা কিছু
ছুটিয়া চলেছি মায়া-হরিণের পিছু।
যতই চেয়েছি সম্পদ্ সম্মান
বেড়েছে যাতনা লভিয়াছি অপমান।

সীমাহীন এই চাওয়ার বিরতি করি
চরণে টানিয়া লও দয়াময় হরি।

আমার যা কিছু সকলি তোমার হোক্
ঘুচুক দ্বন্দ্ব বেদনা দুঃখ শোক।

কবে?

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

কতবার চাহিয়াছি ওগো ভগবান্!
তোমার দুয়ারে,
করিয়াছ দান, তাতে নাহি প্রতিদান,
দিয়েছ আমারে
—কুবেরের সম।

আবার চেয়েছি আমি দু'হাত বাড়ায়ে
ফুরায়েছে যবে,
সে চাওয়া হয়নি শেষ, হবে না কখনো,
চিরদিন রবে—
চাতকের সম॥

তোমার আমার মাঝে চাওয়া আর পাওয়া
কবে হ'বে শেষ?
কবে এসে খুলে দেবে প্রাণের দুয়ার
ওগো পরমেশ?
বল দয়া ক'রে।

কবে এসে ভালবেসে বসিবে আমার
হৃদয়-কমলে?
পূজিব তোমায় কবে আঁখিজল দিয়ে
প্রিয়তম ব'লে
চিনিব তোমারে?

প্যারীচাঁদ মিত্র ও বাংলা সাহিত্য

অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

ডিরোজিওর অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় আসন লাভ করেছেন। পূর্বগামী সাহিত্যিকদের মধ্যে কবিতায় মধুসূদন এবং গদ্যে প্যারীচাঁদকেই বঙ্কিমচন্দ্র সবচেয়ে বেশী অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল'[১] বাংলা গদ্যের শৈলী ও বিষয়বস্তু—উভয়ক্ষেত্রেই দিক্‌পরিবর্তনের পরিচায়ক। সাহিত্য-স্রষ্টারূপে তাঁর কৃতিত্বের চেয়ে সাহিত্যের পথিকৃৎরূপেই তাঁর সার্থকতা বেশী। অবশ্য আজ অবধি আমরা তাঁর 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামটিকেই বিশেষভাবে স্মরণ করি এবং 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রাক্‌বঙ্কিম সাহিত্যের বিস্ময়কর সৃষ্টি, তবু সাহিত্যকে পণ্ডিতগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত করার কৃতিত্বের জন্যই তিনি আজ অবধি স্মরণীয়। সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের বিচারে একমাত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' ছাড়া প্যারীচাঁদের আর কোন রচনাই উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু প্যারীচাঁদের সমগ্র রচনাবলী অন্য কারণে আমাদের কাছে আগ্রহের বস্তু।

ডিরোজিওর যুগটিকে অনেকে ভুল ক'রে ভাঙনের যুগ বলেই মনে করেন। কিন্তু ডিরোজিও-শিষ্যদের পরবর্তী জীবনের কর্মধারা অনুধাবন করলেই বুঝতে পারা যায় যে, সমগ্র দেশের চিন্তায় ও কর্মে নূতন উদ্যম ও সংগঠনের প্রেরণা নিয়ে আসাই তাঁদের ব্রত ছিল। রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামতনু লাহিড়ী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, তাঁর ছোট ভাই কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির জীবনকাহিনীর মধ্য দিয়ে নবযুগের বাংলা গড়ে উঠেছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের এই চিন্তা ও কর্মনায়কেরা বাঙালীমানসে কী সম্পদ এনে দিয়েছিলেন, তার কিছুটা পরিচয় মেলে প্যারীচাঁদের রচনাবলীতে। এই প্রবন্ধে আমরা বিশেষভাবে সেদিকটির আলোচনাই ক'রব।

প্রথম জীবনে প্যারীচাঁদ তিনজন মনীষীর নিকট সংস্পর্শে এসেছেন—ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও এবং রামমোহন। প্যারীচাঁদের মননভূমি এই তিনটি মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে গড়ে উঠেছে। ডেভিড হেয়ারের বাংলা ও ইংরেজী দুটি জীবনী তিনি লিখেছেন। 'জীবনী' হিসাবে তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও হেয়ার সাহেবের উদ্দেশ্যে প্যারীচাঁদের স্বতঃ-উৎসারিত ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরিচায়ক গ্রন্থ দুটি পড়ে আমরা বুঝতে পারি যে 'পরহিতায়' উৎসর্গীকৃতপ্রাণ হেয়ার সাহেবের প্রভাব কত গভীরভাবে তাঁর অন্তর্লোকে প্রবেশ করেছিল। হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে ডিরোজিওর আকর্ষণে অন্যান্য অনেক ছাত্রের মতো প্যারীচাঁদও যুক্তিনিষ্ঠ জ্ঞানসাধনার নূতন জগতের সন্ধান পেলেন। দু-বৎসরেরও কম সময় (১৮২৯-এর জুলাই থেকে ১৮৩১-র এপ্রিল)[২] প্যারীচাঁদ এই অসাধারণ শিক্ষকের সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পরবর্তী জীবনের জ্ঞানসাধনা ও জ্ঞানবিস্তারের প্রচেষ্টার মূলে এই 'নব্যবঙ্গে'র অন্যতম শিক্ষাগুরুর প্রেরণাই সবচেয়ে বেশী কাজ করেছে।

হিন্দুকলেজের এই তরুণ অধ্যাপক ইউরোপীয় সাহিত্য ও দর্শনের আলোচনার মধ্য

১ খৃঃ ১৮৫৮

২ কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র—মন্মথনাথ ঘোষ পৃঃ ১৩-১৬

দিয়ে তাঁর ছাত্রদের অন্তরে যে স্বাধীন চিন্তা-শক্তির প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন, তার ফলেই পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে ও সমাজে মানসমুক্তির সংগ্রাম শুরু হয়। ডিরোজিওর ছাত্রদের সত্যানুরাগ ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা শিক্ষিত সমাজে মনুষ্যত্বের নূতন মানদণ্ড সৃষ্টি করে। সেইসঙ্গে তাদের পাশ্চাত্যমুখী ইহজীবনসর্বস্ব মনোভাবও এদেশের চিন্তাশীল মানুষের কাছে উদ্বেগের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। অবশ্য প্রথম জীবনের উন্মাদনা কেটে যাবার পর ডিরোজিওর শিষ্যেরা অনেকেই ভারতীয় চিন্তাধারার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রতি আবার মনোযোগী হন। প্যারীচাঁদের রচনাবলীতে সে মনোযোগের ফল দেখতে পাওয়া যায়, ডিরোজিওর চির অতৃপ্ত জ্ঞানতৃষ্ণার উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন প্যারীচাঁদ।

প্যারীচাঁদের কর্মজীবন তাঁর এই জ্ঞানচর্চার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। সে যুগের ইংরেজী শিক্ষিতদের কাছে সরকারী উচ্চপদের যে লোভনীয় আকর্ষণ ছিল, প্যারীচাঁদ অনায়াসে সেই আকর্ষণ জয় ক'রে গ্রন্থাগারিকের কাজ গ্রহণ করেছিলেন। কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরির সহকারী গ্রন্থাগারিক থেকে ক্রমে তিনি প্রধান গ্রন্থাগারিকের পদে উন্নীত হন। এই গ্রন্থাগারটিকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলার সঙ্গে সঙ্গে প্যারীচাঁদ তাঁর নিজস্ব জ্ঞানভাণ্ডারটিও পূর্ণতর ক'রে তোলেন। কর্মক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ এই গ্রন্থাগারের কাজ ছাড়া কিছুকাল বহির্বাণিজ্যের কাজও করেন। সেকালের অনেক বড় বড় ইংরেজ কোম্পানীতে তিনি অন্যতম ডিরেক্টরও ছিলেন। তবে শেষ অবধি ব্যবসায়ে তাঁর প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়। জ্ঞানার্জনের সাধুতা অর্থোপার্জনের ব্যাবসায়িক ক্ষেত্রে সুফলদায়ী হয়নি। কিন্তু এই ক্ষয়ক্ষতির উর্ধ্বে ছিল প্যারীচাঁদের চিত্তপ্রশান্তি। জীবনের প্রধান ব্রতটি তিনি সাধকের মতোই উদ্‌যাপন ক'রে গেছেন। সে ব্রত জ্ঞানার্জনের ও জ্ঞান-বিতরণের।

স্বদেশসেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সেকালের নব্যবঙ্গের তরুণদের সহায়তায় 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' ধীরে ধীরে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে' পরিণত হয়। প্যারীচাঁদ সেই এসোসিয়েশন বা সমিতির একজন প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের মতো প্যারীচাঁদ দেশের উৎপাদন থেকে শুরু ক'রে শাসনপদ্ধতি অবধি সর্ববিষয়েরই মনোযোগী এবং উন্নতিকামী সমালোচক ছিলেন। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (১৮৩৮ খৃঃ স্থাপিত) প্যারীচাঁদের মতো জ্ঞানান্বেষীকে স্বভাবতই আকর্ষণ করেছিল। 'কলিকাতা রিভিউ' এবং 'এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটি'র মুখপত্রে তিনি যে বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন, সেগুলি স্বদেশ কল্যাণে ব্রতী প্যারীচাঁদের মানস প্রবণতার পরিচায়ক।

বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে 'জ্ঞানান্বেষণ,' 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' এবং 'মাসিক পত্রিকা'র সঙ্গে প্যারীচাঁদের স্মৃতি বিজড়িত। শেষোক্ত পত্রিকাটির প্রকাশক প্যারীচাঁদ ও রাধানাথ শিকদার। ১৮৫৪ খৃঃ যখন এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, তখন বাংলা গদ্যের আর একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীও আবির্ভূত, বিদ্যাসাগর ঐ বৎসরেই তাঁর 'শকুন্তলা' প্রকাশ করেন। প্যারীচাঁদের পত্রিকা-প্রকাশের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার। উদ্দেশ্যের এই মহত্ত্বের জন্য তিনি আজও আমাদের নমস্য। 'মাসিক পত্রিকা'র আদর্শ ছিল:

> 'এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাবসকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্ত এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।'

১৮৬০ খৃঃ প্যারীচাঁদের পত্নীবিয়োগ হয়। এই সময় থেকে তিনি পরলোক-রহস্য সম্বন্ধে আগ্রহশীল হন। কিন্তু অধ্যাত্মপ্রবণতা প্যারীচাঁদের নিজস্ব সংস্কারের মধ্যে আগে থেকেই ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁর 'On the Soul'৩ (১৮৮১) গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন :

ছোটবেলায় আমি মূর্তিপূজকরূপেই গড়ে উঠেছিলাম। হিন্দু কলেজে আমি শিক্ষালাভ করি। একদল মনোমত বন্ধু পেয়ে আমি তাদের সঙ্গে প্রায়ই দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতি এবং অন্যান্য নানা বিষয়ের আলোচনা করতাম। ভগবান ও ভগবৎ-বিধান সম্বন্ধে আমার আন্তরিক আগ্রহ ছিল, সেজন্য আর্য ও খৃষ্ট ধর্মের নানা শাস্ত্রগ্রন্থ এবং সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থাদি পড়েছি। এ সমস্ত পঠন পাঠনের ফলে আমার অন্তরে এই বিশ্বাস জাগ্রত হয়েছে যে এক অনন্ত পূর্ণতাময় ভগবানই আছেন। আমি তখন একেশ্বরবাদী (theist) বা ব্রাহ্ম হ'লাম।

শুধু প্যারীচাঁদ নন, ডিরোজিওর অনেক শিষ্যই রামমোহন-প্রবর্তিত ও দেবেন্দ্রনাথ-বর্ধিত ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজকে আপন ব'লে গ্রহণ করেন। কারণ—দেশাচার ও কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন তদানীন্তন হিন্দুসমাজ নবযুগের বাণীকে তখন অবধি গভীরভাবে গ্রহণ করেনি। তাই প্রচলিত ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে একটি শোভন ও যুক্তিসঙ্গত অধ্যাত্মচিন্তার রূপ দেখা দিয়েছিল ব্রাহ্মধর্মে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ অবধি ব্রাহ্মধর্ম ছিল হিন্দুধর্মেরই যুগোপযোগী সংস্করণ। ব্রাহ্ম ও হিন্দুর কষ্ট-কল্পিত পার্থক্য তখন অবধি দেখা দেয়নি। প্যারীচাঁদও সেই অর্থে হিন্দুধর্মেরই ব্রাহ্মশাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

প্যারীচাঁদের সাহিত্যসৃষ্টির মূল প্রেরণা ছিল স্বদেশ ও সমাজের কল্যাণচিন্তা। আধুনিক কালে কল্যাণচিন্তা গৌণ হ'য়ে শিল্পসৌন্দর্যই লক্ষ্য হ'য়ে উঠেছে। যথার্থ সাহিত্য কল্যাণ ও সৌন্দর্যের সমন্বয়। প্যারীচাঁদের সাহিত্য-সৃষ্টির পটভূমিতে কী ধরনের চিন্তাধারা কাজ ক'রত, তার নিদর্শন পাওয়া যাবে তাঁর গ্রন্থগুলির ভূমিকায়। 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভূমিকায় ইংরেজীতে তিনি লিখেছেন :

The above original novel in Bengali being the first work of the kind, is now submitted to the public with considerable diffidence. It chiefly treats of the pernicious effects of allowing children to be improperly brought up, with remarks *on the existing system of education* .and is illustrative of the condition of the Hindu society, manners and customs, etc and partly of the state of things in the moffussil. The work has been written in a simple style and to foreigners desirous of acquiring an idiomatic knowledge of the Bengali language and and an acquaintance with Hindu domestic life, it will perhaps be useful.

বাংলা সাহিত্যের সভায় প্যারীচাঁদ তাঁর এই উপন্যাসটি উপস্থিত করতে একটু কুণ্ঠাবোধ করেছিলেন। হয়তো বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় রচনা এই প্রথম বলেই তাঁর সংকোচ। এ গ্রন্থ-রচনায় তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং হিন্দুসমাজের আচার আচরণ ও জীবনযাত্রার একটি ছবি ফুটিয়ে তোলা। সেই সঙ্গে বিদেশীদের বাংলা শেখানোর 'ফোর্ট উইলিয়ম'-কলেজীয় সংস্কারও ছিল। তাই প্রবাদ-প্রবচনের দ্বারা 'আলালী' ভাষাকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্ম নামে প্যারীচাঁদের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় ?' (১৮৫৯), বইটির নামকরণেই এর উদ্দেশ্য প্রকাশিত। সেকালের কলকাতার চিত্র-

৩ মূল ইংরেজীর পুরো নাম—On the Soul. Its nature and Development দ্রষ্টব্য—প্যারীচাঁদ মিত্র : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিসাবে এ বইটিরও অসাধারণ মূল্য। মদ খাওয়ার যে জোয়ার নব্যবঙ্গের দল এদেশে এনেছিলেন, তার ফলহিসাবে এই বইয়ের 'ভবানীবাবু' চরিত্রটি লক্ষণীয় :

ভবানীপুরের ভবানীবাবু কালেজে পড়াশুনা করেন। লেখাপড় শিখিলে সকলেরই একটু হিতাহিত বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু নীতি-বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান জন্মাইতে হইলে বিশেষ উপদেশের আবশ্যক হয়, সেরূপ উপদেশ কালেজে হয় না। একে এই ব্যাঘাত, তাতে অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়াতে কতকগুলা বেল্লেল্লা ছোঁড়ার সঙ্গে সহবাস করিয়া ভবানীবাবু কপ্‌চাতে না শিখিতে শিখিতে মদ খেতে আরম্ভ করিলেন।[৪]

শুধু ভবানীবাবুই নয়—'কলিকাতায় যেখানে যাওয়া যায় সেইখানেই মদ খাইবার ঘটা। কি দুঃখী—কি বড় মানুষ, কি যুবা—কি বৃদ্ধ, সকলেই মদ্য পাইলে অন্ন ত্যাগ করে।'[৫]

এ যুগের কলিকাতায় মদের জায়গায় 'সিনেমা' কথাটি বসালে খুব ভুল হবে না। সে যাই হোক, প্যারীচাঁদের উদ্দেশ্য এই পানাসক্তির মূলোচ্ছেদ। ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও সহৃদয় সাবধানবাণীর মধ্য দিয়ে প্যারীচাঁদ যে উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন।

সম্পূর্ণভাবে নারীজাতির মানসিক উন্নতির জন্য লেখা প্যারীচাঁদের 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০) এবং 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা' (১৮৭৮) বই দুটি শিক্ষামূলক। 'রামারঞ্জিকা'র ভূমিকায় প্যারীচাঁদ লিখেছেন, 'হিন্দু নারীদের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব লক্ষ্য ক'রে লেখক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থরচনায় ব্রতী হয়েছেন'।[৬]

এ বইটিতে স্বামীস্ত্রীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সংসারজীবন থেকে অধ্যাত্ম জীবনের আদর্শ তিনি সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। মেয়েদের কথা বলার বিশেষ ভঙ্গীটি প্যারীচাঁদ নিপুণভাবে ফুটিয়েছেন। নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় যে স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করছিলেন, তার প্রমাণ এ গ্রন্থে 'স্বামী'র কথাবার্তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা'-র ভূমিকায় প্যারীচাঁদ লিখেছেন :

আর্যবংশীয় মহিলাগণ। আপনাদিগের জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচিত হইল। ইহা পাঠে প্রতীয়মান হইবে যে, পূর্বকালে এতদ্দেশীয় অঙ্গনাগণ সর্বপ্রকারে সম্মানিত ও পুজিত হইতেন, এজন্য অদ্যাবধিও এই সংস্কার যে স্ত্রীলোক দেবীস্বরূপ —স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ ভগবতী। পূর্বকালের অঙ্গনাগণের শিক্ষা কেবল বাহ্যশিক্ষা হইত না—প্রকৃত অন্তর-শিক্ষা হইত, এই কারণ তাঁহাদিগের ঈশ্বরজ্ঞান ও আত্মার অমরত্ব হৃদয়ে জাজ্বল্যমান ছিল। তাঁহারা অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকিতেন না ও বৈবাহিক বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে বিবাহ করিতেন না। এক্ষণে স্ত্রীলোক-বিষয়ক অনেক প্রণালী বিবেচিত হইতেছে, কিন্তু আসল শিক্ষা ঈশ্বরকে আদর্শ না করিয়া হইতে পারে না। স্ত্রীলোক যে অবস্থাতেই থাকুন—বিবাহিতা কিম্বা অবিবাহিতা, সধবা কিম্বা বিধবা, সম্পদে কিম্বা বিপদে, আত্মা ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত না হইলে ঐহিক কিম্বা পারত্রিক মঙ্গল বা উন্নতিসাধন কখনই হইতে পারে না।

এই ছিল প্যারীচাঁদের স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ।

ভারতীয় নারীত্বের আদর্শরূপে অধ্যাত্ম-সংযম যে সুদূর অতীত থেকেই গৃহীত হয়েছে, সে কথা বৈদিক ও পৌরাণিক নারীদের সংক্ষিপ্ত জীবনালোচনার মধ্য দিয়ে প্যারীচাঁদ প্রমাণ করেছেন। এই আদর্শের অনুসরণেই এ দেশের মেয়েরা ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করতেন, পুনর্বিবাহে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং সহমরণকে শ্রদ্ধেয় জ্ঞান করতেন।[৭]

এ বইয়ের উপসংহারে প্যারীচাঁদ লিখেছেন :

বাহ্য আড়ম্বরীয় শিক্ষাতে সমাজ সুশোভন হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরপরায়ণত্বের ব্যাঘাত, আত্মবলের হ্রাস ও প্রকৃতির

৪ মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়?—১ম পরিচ্ছেদ।

৫ ঐ—২য় পরিচ্ছেদ।

৬ ভাবানুবাদ।

৭ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা (২য় সং)—পৃঃ ১২-১৩ (প্রথম প্রকাশ—১৮৭৮)।

প্রাবল্য। ঈশ্বরপরায়ণত্ব ও আত্মবলের জন্ত এ দেশের মহিলাগণ পূর্ব হইতেই বিখ্যাত। কোন্ দেশে পতির জন্ত স্ত্রীলোক অগ্নিতে গমন করে ও সর্বত্যাগী হইয়া ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান করে? সামাজিক বিবেচনায় ইহা যদিও প্রসিদ্ধ না হইতে পারে, কিন্তু আত্মবলের পক্ষে ইহা বিলক্ষণ প্রমাণ। আর্যজাতীয় মহিলাগণ। সতী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি ঈশ্বরপরায়ণা নারীদের চরিত্র সর্বদা স্মরণ কর। তাঁহাদিগের ন্যায় শম, দম, তিতিক্ষা অভ্যাস কর, ও সমাহিত হইয়া উপরতিতে পূর্ণ হও।'৮

প্যারীচাঁদের এই আদর্শবাদের পাশাপাশি নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল। অতীতের উপনিষদ্-পুরাণেই তিনি এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উদাহরণ পেয়েছেন। তাই আধুনিক কালেও 'বিবাহ', 'স্ত্রীলোকের বাহিরে গমন' প্রভৃতি বিষয়ে স্ত্রীলোকের স্বাধীন অভিরুচিকে তিনি মর্যাদা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে জোর দিয়েছেন অন্তরের পবিত্রতার উপর।

প্যারীচাঁদের কল্পনায় যে আদর্শ নারী ছিলেন, তাঁর বিভিন্নরূপ দেখতে পাই 'রামারঞ্জিকা'র ব্রহ্মময়ী, 'অভেদী'র অভেদী, এবং 'আধ্যাত্মিকা'র আধ্যাত্মিকা চরিত্র তিনটিতে। হিন্দু নারীর জীবনে একটি পবিত্র ও গতিশীল আদর্শ সঞ্চারিত করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। 'বামাতোষিণী' (১৮৮১) গ্রন্থের ভূমিকায় দেখি, প্যারীচাঁদের ইচ্ছা ছিল, যেন এই বইগুলি মেয়েদের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত হয়। শৈশব থেকেই মেয়েদের অধ্যাত্ম শিক্ষার উপরে ভিত্তি ক'রে উপযুক্ত কন্যা, ভগ্নী ও মাতা হ'তে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন—এ কথাটি প্যারীচাঁদ উপলব্ধি করেছিলেন।৯

নারীজাতির উন্নতিপ্রচেষ্টায় রামমোহন ও রাধাকান্তদেবের প্রচেষ্টার সঙ্গে ডিরোজিও-শিষ্যদের আন্তরিক সহযোগিতা এ দেশের স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্যারীচাঁদের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হওয়ার যুগেই বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ-আন্দোলন এবং স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক প্রচেষ্টা বাংলাদেশের সমাজ-চিত্তকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। সেই সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের নারী-স্বাধীনতার আদর্শও ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজকে স্পর্শ করতে থাকে। এ বিষয়ে সবচেয়ে অগ্রণী ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের দল। প্যারীচাঁদের রচনায় আমরা অন্তরের ধর্মনিষ্ঠা ও বাহিরের স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনের শুভ প্রচেষ্টা দেখতে পাই। তবে প্যারীচাঁদের মধ্যবয়স অবধি এ দেশে নারী-স্বাধীনতার বহির্মুখী দিকটি তত প্রবল হয়নি। প্যারীচাঁদের আদর্শ নারীচরিত্রগুলি অধ্যাত্ম উপলব্ধির আলোকে ইহজীবনকে সার্থক ও সমুজ্জল ক'রে তুলতে প্রয়াসী, কিন্তু স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ নয়।

প্যারীচাঁদের অধিকাংশ রচনাতেই আধ্যাত্মিক শিক্ষার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। অধ্যাত্ম-সংস্কারের দিক থেকে প্যারীচাঁদ ঔপনিষদিক জ্ঞান-সাধনার পক্ষপাতী। যদিচ অধিকারী-ভেদে ভক্তি-সাধনার প্রয়োজনও তিনি স্বীকার করতেন। এ বিষয়ে তাঁর মত:

'উপনিষদের জ্ঞানসুধা, পুরাণের ভক্তিসুধার সহিত মিলিত হইয়া ভক্তির প্রবলতায় আত্মার শুদ্ধ জ্ঞান, প্রকৃতি হইতে অতীত হয় নাই, সুতরাং ভক্তির প্রাবল্য ও আত্মার অনন্ত জ্ঞানের খর্বতা করা হইয়াছিল।'১০

জ্ঞানযোগের পথিক হলেও প্যারীচাঁদ ভক্তিযোগের মহিমা একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি। তাই অন্যত্র মন্তব্য করেছেন, 'পুরাণাদিতে ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানের প্রশস্ততা

৮ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা (২য় সং)—ঐ পৃঃ ১৯-২০।

৯ বামাতোষিণীর Preface (ভূমিকা)

১০ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা (২য় সং)—পৃঃ ১১

অনেক খর্ব হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয় ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের বৃদ্ধি হইয়াছে।'[১১]

পরবর্তী যুগে বঙ্কিমচন্দ্র পৌরাণিক ভক্তিবাদকে আরও মর্যাদা দিয়েছেন। ব্রাহ্ম-সমাজ নিরাকার সাধনার জন্য পুরাণকে প্রায় অস্বীকার ক'রে উপনিষদকেই একমাত্র অবলম্বন ক'রে তুলেছিল।

সাকার ও নিরাকার উপাসনাপ্রসঙ্গে প্যারী-চাঁদের মন্তব্য লক্ষ্যণীয় :

'সাকার উপাসকেরা হস্তনির্মিত দেবতা অর্চনা করে। নিরাকার উপাসকেরা দেবতা পূজা করে, উভয়ের ঈশ্বর ফলতঃ সগুণ ঈশ্বর—পৌত্তলিক এবং অপৌত্তলিক উপাসনা সাকার ও নিরাকার ঈশ্বর-অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত হয় না। আত্মার উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অভ্যাসে সাকার উপাসক অধিক পৌত্ত-লিক, ও নিরাকার উপাসক অধিক পৌত্তলিক হইতে পারে।'[১২]

ব্রাহ্ম সমাজের যে উদার ও অপক্ষপাতী মনোভাব সেযুগে ছিল, উপরে উদ্ধৃত মন্তব্যটি তারই পরিচায়ক।

প্যারীচাঁদের অধ্যাত্ম-আদর্শের একটি সামগ্রিক রূপ 'অভেদী' গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায়ে 'অভেদী'-র আত্মকাহিনীর মধ্যে পাই—

'ঈশ্বরকে বিশেষরূপে জানা জীবনের লক্ষ্য। ঈশ্বরের কৃপাতে এক্ষণে পাপ, পুণ্য, নরক, স্বর্গ হইতে আত্মা অতীত—ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক অভ্যাসে আত্মার মুক্ত শক্তি অনেক প্রাপ্ত হইয়াছি। শরীর বিগত হইলে আত্মার কি কার্য হইবে তাহাও বুঝিতেছি। ঈশ্বর জ্ঞান এক্ষণে যে কি মধুময় তাহা আত্মাতে প্রচুর-রূপে জানিতেছি, বাক্যেতে তাহা বলিতে পারি না। 'যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন'।'[১৩]

১১ যৎকিঞ্চিৎ (২য় সং)—পৃঃ ৫৪ (১৮৬৫)

১২ অভেদী (১৮৭১)—পৃঃ ৪০

১৩ ঐ —পৃঃ ৪১-৪২

'যৎকিঞ্চিৎ' আর একটি তত্ত্বালোচনা-প্রধান গ্রন্থ। প্যারীচাঁদ এ গ্রন্থে তাঁর ধর্মচর্চা ও চিন্তার সারসংক্ষেপ দেবার চেষ্টা করেছেন 'জ্ঞানানন্দে'র কথোপকথনে। অধ্যাত্মসাধনার পাশাপাশি ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষার বিস্তার এবং জনহিতব্রতের অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মসমাজের যে প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল 'যৎকিঞ্চিৎ' এবং 'বামাতোষিণী' বই দুটিতে তার পরিচয় মেলে। 'যৎকিঞ্চিৎ' প্রধানতঃ আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যাত্মচর্চার পটভূমিতে লেখা। 'বামাতোষিণী' তে সামাজিক ও পারি-বারিক ক্ষেত্রে নব্যশিক্ষিতদের নবপ্রচেষ্টার বিবরণ মেলে। এই বইটির সপ্তম পরিচ্ছেদটির নাম 'সাধারণ জ্ঞান-উপার্জিকা সভা'। এই সভার একটি অধিবেশনের ছবি আঁকতে গিয়ে প্যারী-চাঁদ তাঁর সহপাঠী ও সমকালীন মনীষীদের পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। ডিরোজিও-শিষ্য রামতনু লাহিড়ী সে সভার সভাপতি, রসিক-কৃষ্ণবাবু মুখ্য বক্তা, শিবচন্দ্র, কৃষ্ণমোহন প্রভৃতিও যোগদানকারী। প্রধান আলোচ্য বিষয় যুগো-পযোগী স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা। কাহিনীর শেষ দিকে এক ব্রাহ্মবিবাহ-সভায় রামতনুবাবু আচার্যের কাজ করছেন।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের শিক্ষিত সমাজে জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানপ্রচারের যে আগ্রহ ও প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল, প্যারীচাঁদের রচনাবলীতে আমরা এতক্ষণ সেই পরিচয়-লাভের চেষ্টা করেছি। সাহিত্যিক প্যারীচাঁদ এই পরিবর্তনশীল জীবন-ধারার যে বিচিত্র পরিচয় নানা চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন, সেদিক থেকে বিচার করলেও তাঁর কৃতিত্ব অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু কৃতিত্বের পরিসর সীমাবদ্ধ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁর চরিত্র-সৃষ্টি রেখাঙ্কনের বেশি অগ্রসর হয়নি। যে ক্ষেত্রে হয়েছে সে ক্ষেত্রেও ভালোকে

অবিমিশ্র ভালো এবং মন্দকে অবিমিশ্র মন্দ রঙে আঁকতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি ভারসাম্য হারিয়েছেন। তবু ছোট ছোট রেখাচিত্রে মানবচরিত্রের একটি দিক[১৪]—সমকালীন সমাজের আংশিক পরিচয় অথবা বাঙালীর বিভিন্ন ভাষাভঙ্গীর বৈচিত্র্য—এ সবই প্যারীচাঁদের সাহিত্যিক নৈপুণ্যের আশ্চর্য নিদর্শন। দু'চারিটি উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে।

'আলালের ঘরের দুলালে'র বাবুরামবাবু—'বাবুরামবাবু' চৌগোঁপ্পা, নাকে তিলক—কস্তাপেড়ে ধুতি-পরা—ফুলপুকুরে জুতা পায়—উদরটি গণেশের মত—কোঁচান চাদরখানি কাঁধে—এক গাল পান—এ হেন বাবুরামবাবু একদিন—

'এক ছিলিম তামাক খাইয়া একখানা ভাড়া গাড়ি অথবা পাল্কির চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভাড়া বনিয়া উঠিল না—অনেক চড়া বোধ হইল। রাস্তায় অনেক ছোঁড়া একত্র জমিল। বাবুরামবাবুর রকমসকম দেখিয়া কেহ কেহ বলিল, 'ওগো বাবু ঝাঁকামুটের উপর বসে যাবে? তাহা হইলে দুপয়সায় হয়?' 'তোর বাপের ভিটে নাশ করেছে'—বলিয়া যেমন বাবুরামবাবু দৌড়িয়া মারি'তে যাবেন, অমনি দড়াম করিয়া পড়িয়া গেলেন…।'

এ জাতীয় বর্ণনার সরসতায় প্যারীচাঁদ সিদ্ধহস্ত। এই বইটির 'ঠকচাচা' ও 'ঠকচাচীর' বর্ণনা তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

ঈশ্বরগুপ্ত যে 'পক্ষীর দলে'র উল্লেখ করেছেন, সেই নেশাখোর পক্ষীর দলের নিখুঁত বর্ণনা 'মদ খাওয়া বড দায়, জাত থাকার কি উপায়?'-এর দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য। এই সামাজিক অসঙ্গতিগুলির বর্ণনায় প্যারীচাঁদের বর্ণনাভঙ্গী এত সজীব ও উচ্চাঙ্গের হাস্যরসময় যে আধুনিক কালের সাহিত্যিকেরাও এ ভঙ্গী থেকে শিক্ষণীয় উপাদান পেতে পারেন।

সুতরাং প্যারীচাঁদের রচনাবলীতে যে জ্ঞানগাম্ভীর্যের পরিচয় আমরা আগে পেয়েছি, সেটি তাঁর রচনার একাংশ, প্যারীচাঁদের আদর্শনিষ্ঠাই তাঁকে অন্যদিকে অসঙ্গতি-সচেতন ও পরিহাস-নিপুণ ক'রে তুলেছে। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে প্রহসনের প্রাচুর্যও অনেকটা এই কারণে।

প্যারীচাঁদের রচনাবলী পাঠে এ কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে প্যারীচাঁদের সাহিত্যপ্রতিভা বাস্তবজীবনের অসঙ্গতি যতটা নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছে, জীবনের সুসমঞ্জস চিত্রাঙ্কনে ততটা সার্থক হয়নি। তাঁর 'আলালের ঘরের দুলালে'র নায়ক মতিলাল বিশেষভাবে সে যুগের প্রতিনিধিই নয়। বড়লোকের অশিক্ষিত খামখেয়ালী ও কুসংসর্গী ছেলের এ ধরনের অধঃপতন চিরকালই হয়। মতিলালের অধঃপতনের কারণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাবসংঘাত নয়। সে হিসাবে 'একেই কি বলে সভ্যতা?' এবং 'সধবার একাদশী' প্রহসন দুটি উল্লেখযোগ্য। তবে ইংরেজ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পরোক্ষ প্রভাবে এবং কলিকাতার হঠাৎ-ধনীদের নাগর-সংস্কৃতির বিকৃত সংসর্গে এসে মদ খাওয়া, উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার, নাস্তিকতা এবং জীবনের মহত্তর আদর্শে শ্রদ্ধাহীনতা কীভাবে একটি শ্রেণীকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছিল, আলালের ঘরের দুলালদের কীর্তিকাহিনী তারই পরিচায়ক। অন্যদিকে চিন্তার জগতে যে নূতন আলোড়ন নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে জ্ঞানস্পৃহা, যুক্তিবাদ, কুসংস্কার-বর্জনের প্রতিজ্ঞা এনে দিয়েছিল সে দিকেও প্যারীচাঁদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নবযুগের আদর্শরূপে এই চরিত্রগুলি ('আলালের ঘরের দুলালে' রামলাল ও বরদাবাবু, 'বামাতোষিণী'র গোপাল ও শান্তিদায়িনী, 'আধ্যাত্মিকা'র হরদেব তর্কালঙ্কার ও আধ্যাত্মিকা প্রভৃতি) প্রাচীন ও নবীন যুগের সদ্‌গুণসমন্বয়ে গঠিত। চরিত্রহিসাবে এরা 'ঠকচাচা'দের মতো জীবন্ত নয়, কিন্তু প্যারীচাঁদ যে মনুষ্যত্বের সন্ধানী ছিলেন—এই চরিত্রগুলি

১৪ প্যারীচাঁদের রচনাবলীতে অজস্র 'টাইপ' চরিত্র সৃষ্টির উদাহরণ মেলে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে উপন্যাসের জীবনজিজ্ঞাসা ব্যাপকতর—তাই চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে টাইপের পরিবর্তে গোটা মানুষের দেখা পাই।

তারই পরিচায়ক। পাশ্চাত্য সভ্যতার সদ্গুণাবলীর প্রতি প্যারীচাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল—তাই এই সব চরিত্রের মধ্যে আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যা কিছু মহৎ ও গ্রহণীয় তার সমাবেশ দেখতে পাই।[১৫] বরদাবাবু বা গোপালবাবু-জাতীয় চরিত্রেরা নিজেদের ভালোটুকু নিয়ে আত্মস্থ হ'য়ে বসে থাকেননি, সংসারসমাজে সেই কল্যাণের আদর্শ সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেছেন। এই কল্যাণপ্রচেষ্টা পাশ্চাত্য রজোগুণের দ্বারা সঞ্চারিত, অন্যদিকে আত্মোপলব্ধির যে আদর্শ প্যারীচাঁদের বিভিন্ন নারী ও পুরুষ-চরিত্রে দেখতে পাই, সে আদর্শ আমাদের সনাতন উত্তরাধিকার।

সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে মননশীলতার উপাদানগুলি সৃষ্টির মধ্যে এমন ভাবে আত্মলীন ক'রে থাকা প্রয়োজন যাতে শিল্পের চেয়ে দর্শন বড না হ'য়ে দাঁড়ায়। প্যারীচাঁদের রচনাবলীর প্রধান ত্রুটি এইখানে। প্যারীচাঁদ মানবজীবনের উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং সংশিক্ষাপ্রচারের জন্য যতটা চিন্তিত, সাহিত্যসৃষ্টির জন্য ততটা নয়। তাঁর সমগ্র রচনাবলী পাঠ ক'রে বিশুদ্ধ নৈতিক জীবনযাপনের প্রেরণা যতটা পাওয়া যায়, জীবনের বহু বিচিত্র ভাবলীলার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-রস ততটা অনুভব করা যায় না। বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রবণতা কেমন ক'রে মহৎ শিল্প-সম্ভাবনাকে ব্যাহত করে, প্যারীচাঁদের রচনাবলী তার উদাহরণ। অথচ সে সম্ভাবনা যে ছিল, একমাত্র 'আলালের ঘরের দুলাল'ই তার যথেষ্ট প্রমাণ।

বাংলা গদ্যের শিল্পরূপ ও বিষয়-বস্তুর ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদের দান আমাদের স্বীকার করতেই হবে। সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল ছায়াতল থেকে বাংলা সাহিত্য-তরুটিকে তিনি আপন আকাশ-বাতাসে শাখা মেলবার সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন।[১৬]

কিন্তু বঙ্কিম-সাহিত্যের অন্য একটি দিকেও প্যারীচাঁদের প্রভাব রয়েছে। 'আধ্যাত্মিকা' 'অভেদী' প্রভৃতি চরিত্রে প্যারীচাঁদ নারীজাতির মধ্য দিয়ে যে আদর্শ মনুষ্যত্বের সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' তারই পূর্ণাঙ্গ রূপ। বস্তুতঃ উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে নারীজাতির যে সশ্রদ্ধ বন্দনায় মুখর, প্যারীচাঁদের রচনাবলীতেই তার সূচনা। যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও উপেক্ষিত নারীসমাজের পক্ষে এই উদ্বোধন-মন্ত্রের প্রয়োজন ছিল।

১৮৮৩ খৃঃ এই সাহিত্য-সাধকের লোকান্তর ঘটে। এ প্রসঙ্গে তাঁর সতীর্থ রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন, প্রবন্ধপ্রান্তে এসে তা বিশেষভাবে উদ্ধৃতিযোগ্য—

'ইউরোপীয় ও ভারতীয় সমাজের মধ্যে তিনি ছিলেন যোগসূত্রস্বরূপ। আজ সেই যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ার বেদনা উভয় সম্প্রদায়ের হৃদয়ে আঘাত করবে। ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর মত উচ্চতম পদপ্রাপ্তির যোগ্য লোক আর কেউ ছিলেন না, তবু জাগতিক উন্নতি ও ব্যক্তিগত স্বার্থকে অনায়াসে অবহেলা ক'রে স্বদেশের উন্নতির জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে গেছেন।'[১৭]

বাংলা সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই সে কথা স্মরণ ক'রে একাধারে কৃতজ্ঞ ও গৌরবান্বিত।

১৫ এই প্রসঙ্গে উৎসাহী পাঠক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'র প্যারীচাঁদ-প্রসঙ্গ দেখতে পারেন।

১৬ দ্রষ্টব্য—'বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান'—বঙ্কিমচন্দ্র; 'লুপ্তরত্নোদ্ধার' বা 'প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলী' (১৮৯২) ক্যানিং লাইব্রেরী প্রকাশিত।

১৭ 'প্যারীচাঁদ মিত্র'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্ধৃতিটি ইংরেজীর অনুবাদ। অন্যান্য বাংলা উদ্ধৃতি 'লুপ্তরত্নোদ্ধার' থেকে নেওয়া।

গীতা-জ্ঞানেশ্বরী

(ভাদ্র-সংখ্যার পর)

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥১১

অধিক আর কি বলিব? যদি সংসারের ভয় হয় এবং যথার্থই আমাকে পাইবার ইচ্ছা হয়, তবে তুমি এই উপপত্তি (বিচার-পদ্ধতি) সম্বন্ধে যত্নবান্ হইবে, (১৪০)

নতুবা চক্ষু পাণ্ডুরোগগ্রস্ত হইলে যেমন চাঁদনিকেও হলুদবর্ণ দেখায়, তেমনি আমার নির্মল স্বরূপেও দোষ দেখা যায়, অথবা জ্বরে মুখ বিস্বাদ হইলে যেমন দুধও বিষের ন্যায় কটু লাগে, তেমনি লোকাতীত আমাকে মর্ত্য মানুষ বলিয়া মনে হয়, সেইজন্য হে ধনঞ্জয়, আমি বারংবার বলিতেছি—এই অভিপ্রায় যেন ভুলিও না, স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা বৃথা হইবে, যদি আমাকে স্থূল দৃষ্টিতে দেখ, তবে তাহা দেখাই হইবে না। ইহা নিশ্চয় জানিবে যে স্বপ্নে লব্ধ অমৃত দ্বারা অমর হওয়া যায় না, সাধারণতঃ মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে স্থূল দৃষ্টিতে দেখিয়া সঠিক জানিয়াছে মনে করে, পরন্তু এই জানা তাহাদের যথার্থ জ্ঞানের অন্তরায় হয়—যেমন (জলে) নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব দেখিয়া, তাহাকে রত্ন মনে করিয়া তাহা পাইবার আশায় হংস জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং প্রাণ হারায়, বল দেখি, মৃগজল (মরীচিকা)-কে গঙ্গা মনে করিয়া তাহার কাছে আসিলে কি কোন ফল হয়? বকুল-বৃক্ষকে কল্পতরু মনে করিয়া হাতে ধরিলে কি কিছু লাভ হয়? নীলমণির (দোস্থতী) হার মনে করিয়া বিষাক্ত সর্পকে হাতে ধরিলে, কিংবা রত্ন মনে করিয়া শ্বেতপ্রস্তর সংগ্রহ করিলে কী লাভ হয়? অথবা গুপ্তধনের ভাণ্ডার প্রকট হইল বলিয়া খদির-বৃক্ষের অঙ্গার ঝোলায় ভরিলে, কিংবা (নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া) ছায়া না বুঝিয়া সিংহ যদি কূয়ায় লাফাইয়া পড়ে তাহার ফল কি হয়? যাহারা এই প্রপঞ্চে আমি আছি এ সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া এই প্রপঞ্চেই নিমগ্ন হয় তাহাদের কি হয়? জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের প্রভাকে ধরিতে গেলে যেমন হয়, তাহাদের চেষ্টা তেমনি নিষ্ফল হয়। (১৫০)

যেমন কেহ কাঁজি পান করিয়া মনে করে অমৃত পান করিলাম, তেমনি বিনাশী রূপ দর্শন করিয়া অবিনাশী আমাকে দেখিল মনে করে। পূর্বদিকের পথে গেলে কি পশ্চিম সমুদ্রের তটে পৌছানো যায়? কিংবা হে বীর অর্জুন, তুষ কুটিলে কি শস্যকণা পাওয়া যায়? তেমনি এই বিকারী বিশ্বপ্রপঞ্চকে জানিয়া কি আমার নির্দোষ স্বরূপ জানা যায়? ফেন খাইলে কি জলপান করার ফল হয়? এই ভাবে মনোবৃত্তি মায়ামোহিত হইলে ভ্রমে পড়িয়া লোকে মনে করে, এই বিশ্বই আমি এবং এই সংসারের জন্ম কর্ম আমাতেই আরোপ করে; এই প্রকারে অনামী আমাকে নাম দেয়, ক্রিয়ারহিত আমাতে কর্ম ও বিদেহী আমাতে দেহধর্ম আরোপ করে, নিরাকার আমাকে আকার প্রদান করে, উপাধিরহিত আমাকে উপাধিভূষিত করে, বিধিবর্জিত আমাতে আচারাদি ব্যবহার আরোপ করে, বর্ণ-হীনের বর্ণ, গুণাতীতের গুণ, চরণবিহীনের চরণ, অপাণির পাণি, অপরিমেয়ের পরিমাণ, সর্বব্যাপকের

স্থান কল্পনা করে,—যেমন শয্যায় নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নে বন দেখা যায়, তেমনি কর্ণ-রহিতের কর্ণ, অচক্ষুর নেত্র, অগোত্রের গোত্র, অরূপের রূপ, (১৬০)

অব্যক্তের ব্যক্তি, অনার্তের (ইচ্ছাহীনের) আর্তি, স্বয়ংতৃপ্তের তৃপ্তি কল্পিত হয়। নিরাবরণকে আবরণ দেয়, ভূষণাতীতকে ভূষণে সজ্জিত করে, সকল বিশ্বের কারণ আমারও কারণ নির্দেশ করে, সহজাত আমার মূর্তি তৈয়ারী করে, স্বয়ংসিদ্ধ আমাকে প্রতিষ্ঠা করে, অখণ্ড ও সর্বব্যাপী আমাকে আবাহন করে ও বিসর্জন দেয়, আমি সর্বদা স্বতঃসিদ্ধ ও একরূপ, আমাতে বাল্য, তারুণ্য ও বৃদ্ধত্ব এইসব অবস্থার সম্বন্ধ স্থাপন করে, অদ্বৈত আমাকে দ্বৈত, ক্রিয়ারহিত আমাকে কর্তা, অভোক্তা আমাকে ভোক্তা মনে করে, কুলগোত্রহীন আমার কুলের বর্ণনা করে, নিত্যস্বরূপ আমার মরণে শোক করে, অন্তর্যামী আমাকে অরিমিত্ররূপে কল্পনা করে, স্বানন্দাভিরাম আমাতে নানা সুখের বাসনা আছে বলিয়া কল্পনা করে, সর্বভূতে সমভাবে স্থিত আমাকে একদেশী বলে, যদিও আমি চরাচরের আত্মা, তথাপি আমি একের পক্ষ লইয়া ক্রোধে অপরকে বধ করি—ইহাই প্রচার করে, কিংবহুনা, এই যে সমস্ত প্রাকৃত মনুষ্যধর্ম—ইহা আমারই স্বরূপ বলিয়া মনে করে, এমনই ইহাদের বিপরীত জ্ঞান। যদি সম্মুখে কোন আকার দেখে—তাহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে, পরন্তু ভাঙিয়া গেলে তাহার দেবত্ব নাই বলিয়া ফেলিয়া দেয়, (১৭০)—এইভাবে নানা প্রকারে আমাকে মনুষ্যের আকারে কল্পনা করে এবং সত্যকে অন্ধকারের ন্যায় আচ্ছাদিত করে।

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥১২

এইজন্য তাহাদের জন্মগ্রহণই ব্যর্থ হয়, যেমন বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য ঋতুর মেঘ বা মৃগজলের তরঙ্গ দূর হইতেই দেখিবার যোগ্য, অথবা 'কোম্বেরী' গ্রামের (মাটির খেলনার) ঘোড়সওয়ার, কিংবা যাদুকরের (প্রদর্শিত) অলঙ্কার, কিংবা গন্ধর্বনগরের প্রাকার যেমন দেখা যায়, শাল্মলী বৃক্ষ যেমন সোজা বাড়িয়া যায়—পরন্তু তাহার ফল হয় না এবং তাহা অন্তঃসার শূন্য, কিংবা ছাগলীর গলায় স্তন যেমন—তেমনি সেই মূর্খ ব্যক্তিগণের জীবন (নিষ্ফল), তাহাদের কৃতকর্মে ধিক—শাল্মলীর ফল গ্রহণ ও দানের অযোগ্য। তাহারা যাহা কিছু পাঠ করে, তাহা মর্কটের নারিকেল পাড়িবার ন্যায়, অথবা অন্ধের হাতে মুক্তা পড়িলে যেমন হয়, তেমনি (নিষ্ফল), কিংবহুনা, তাহাদের (অধীত) শাস্ত্র—শিশুর হাতে অস্ত্র দিলে যেমন হয়, কিংবা অশুচি লোককে বীজমন্ত্র দিলে যেমন হয় তেমনি হে ধনঞ্জয়, তাহাদের সমস্ত জ্ঞান—তাহারা যাহা কিছু আচরণ করে সে সমস্তই ব্যর্থ হয়, কারণ তাহারা 'চিত্তহীন' (তাহাদের চিত্তে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব), যে তমোগুণরূপী রাক্ষসী সুবুদ্ধিকে গ্রাস করে, যে নিশাচরী বিবেকের ভিত্তি পর্যন্ত পুঁছিয়া ফেলে—সেই প্রকৃতির অধীন হইয়া তাহাদের মনের রক্ষা-কপাট খুলিয়া যায়, এবং তাহারা এই তামসী রাক্ষসীর মুখগহ্বরে পড়ে; (১৮০)

যে রাক্ষসীর মুখবিবর হইতে আশার লালাযুক্ত হিংসারূপ জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এবং যে (রাক্ষসী প্রকৃতি) নিরন্তর অসন্তোষরূপ মাংসখণ্ড চর্বণ করিতেছে, যাহার জিহ্বা ওষ্ঠ চাটিতে অনর্থরূপ কান পর্যন্ত বিস্তৃত হইতেছে, যে প্রমাদ পর্বতের গুহায় সর্বদা মত্ত হইয়া

আছে, যাহার দ্বেষরূপ দংষ্ট্রা জ্ঞানকে চিবাইয়া চূর্ণ করে, যাহার অস্থি ও চর্ম মূর্খের স্থূল বুদ্ধিকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, এইরূপ আসুরী প্রকৃতির মুখে যাহারা ভূতবলির ন্যায় পতিত হয়, তাহারা ব্যামোহের (ভ্রান্তির) কুণ্ডে ডুবিয়া যায়, এইভাবে যাহারা তমোগুণের (অজ্ঞানের) গর্তে পড়ে, বিচারের হাত তাহাদের ধরিয়া তুলিতে পারে না। শুধু ইহাই নহে, তাহারা কোথায় যায় কেহই জানে না, সুতরাং এই নিষ্ফল কথা থাকুক,—মূর্খের বিষয়ে এই বৃথা বর্ণনা শুধু বাণীর কষ্ট বাড়াইবে। এই কথা শুনিয়া অর্জুন বলিলেন—যথা আজ্ঞা। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এখন বাণী যাহাতে বিশ্রাম সুখ লাভ করিবেন সেই প্রকার সাধুদের কথা শুন:

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ১৩

আমি ক্ষেত্রসন্ন্যাসী হইয়া যাহার নির্মল অন্তঃকরণে বাস করি, নিদ্রিত অবস্থাতেও যাহাকে বৈরাগ্য সেবা করে, যাহার শ্রদ্ধাযুক্ত সদ্‌ভাবনার মধ্যে ধর্ম রাজত্ব করে, যাহার মন বিবেকের আর্দ্রতায় পূর্ণ, যে জ্ঞানগঙ্গায় স্নান করিয়া পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, যে শান্তির নব পল্লব, (১৯০) যে ব্রহ্মস্বরূপ হইতে নির্গত--পরিণত অঙ্কুর, যে ধৈর্যমণ্ডপের স্তম্ভ, যে আনন্দ-সাগরে ডুবাইয়া তোলা পূর্ণকুম্ভ-সদৃশ, যাহার ভক্তির প্রাপ্তি (গভীরতা) এত বেশী যে সে মোক্ষকে দূরে সরিয়া যাইতে বলে, যাহার লীলার মধ্যেও নীতি জীবিত (জাগ্রত) থাকে দেখা যায়, যাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় শান্তির অলঙ্কারে সজ্জিত, যাহার চিত্ত সর্বব্যাপক আমাকেও আবরণ করিয়া আছে, এইরূপ মহানুভব ব্যক্তি দৈবীপ্রকৃতিসম্পন্ন সৌভাগ্যবান্—যে মহাত্মা আমার সর্বস্বরূপ পূর্ণভাবে জানিয়া ক্রমবর্ধমান প্রেমে আমাকে ভজনা করে, পরন্তু যাহার মনোধর্মে দ্বৈতভাব স্পর্শও করে না—হে পাণ্ডব, এই ভাবে মদ্রূপ হইয়া সে আমার সেবা করে, পরন্তু ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য কথা আছে, শুন:

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥১৪

এইরূপ ভক্ত কীর্তনের নৃত্যানন্দে প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপার চুকাইয়া দেয়, কারণ ঐ কীর্তনে তাহার পাপ নষ্ট হইয়া যায়, যম-দমকে নিস্তেজ করিয়া দেয়, তীর্থে বাস উঠিয়া যায়। যমলোকের সর্বব্যাপার বন্ধ হইয়া যায়, যম বলে, 'কি নিয়ন্ত্রণ করিব?' দম বলে, 'কাহাকে দমন করিব?' তীর্থ বলে, 'কোন্ দোষ ক্ষালন করিব? পাপের লেশ মাত্র নাই।' এই ভাবে আমার নামকীর্তনের শব্দ বিশ্বের দুঃখ নাশ করে, এবং জীবন মহাসুখে ভরিয়া যায়। (২০০)

(এই প্রকার ভক্ত) প্রভাত বিনাই জ্ঞানালোক দর্শন করায়, অমৃত বিনাই লোকের জীবন দান করে, যোগ বিনাই কৈবল্য দর্শন করায়, পরন্তু রাজা ও দরিদ্রের মধ্যে ভেদ করে না, ছোট বড় বিচার করে না, (এই ভাবে) জগতের সকলের পক্ষে সে একেবারে আনন্দের মন্দির হইয়া যায়। ক্বচিৎ কখনও কেহ বৈকুণ্ঠে যায়, পরন্তু ইহারা সারা জগৎকেই বৈকুণ্ঠ করিয়া ফেলে—নামকীর্তনের গৌরবে এমনি ভাবে সারা বিশ্ব শুভ্র আলোকে প্রকাশিত করে (পবিত্র করে), তেজে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল, পরন্তু সূর্যেরও অস্ত যাইবার দোষ আছে, চন্দ্র কেবল এক সময়ে সম্পূর্ণ কলাযুক্ত হয়, এই ভক্ত সর্বদা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; মেঘ উদার বটে, পরন্তু বর্ষণে নিঃশেষিত হয়, এইজন্য উপমার যোগ্য নহে; নিঃসন্দেহে এই ভক্ত মহাবিক্রম সিংহের ন্যায়।

যে-নাম একবার উচ্চারণ করিতে সহস্র জন্ম ধারণ করিতে হয়, সেই আমার নাম তাহার মুখাগ্রে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না, ভানুমণ্ডলেও আমাকে দেখা যায় না, আমি যোগিগণেরও মন উল্লঙ্ঘন করিয়া যাই, পরন্তু হে পাণ্ডব, আমাকে যদি আর কোথাও না পাওয়া যায়, তবে যেখানে প্রেমসহকারে আমার নামসংকীর্তন করা হয়, সেখানে আমাকে নিশ্চয় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, এইরূপ ভক্ত আমার গুণে এমনই তৃপ্ত হয় যে দেশ কাল বিস্মৃত হইয়া কীর্তনসুখে সে আত্মসুখ প্রাপ্ত হয়, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, হরি, গোবিন্দ—এই নামের অখণ্ড গাথার মধ্যে বিশদভাবে অধ্যাত্মচর্চা করিয়া নিরন্তর আমার নাম গান করে। (২১০)

যথেষ্ট বলা হইল, হে পাণ্ডুকুমার শুন, এই ভাবে এই ভক্তগণ আমার (নাম) কীর্তন করিয়া চরাচরে বিচরণ করে, হে অর্জুন, অপর কেহ কেহ অত্যন্ত যত্নপূর্বক মন ও পঞ্চপ্রাণকে সঙ্গে লইয়া, বাহিরে যমনিয়মের কাঁটার বেড়া দিয়া, অন্তরে বজ্রাসনের দুর্গ নির্মাণ করিয়া তাহার উপর প্রাণায়ামের কামান সাজাইয়া দেয়; ঊর্ধ্বমুখী কুণ্ডলিনীর প্রকাশে মন ও প্রাণ-বায়ুর সহায়তায়, কৈবল্য (সপ্তদশকলা)-রূপ চন্দ্রামৃতের সরোবর প্রাপ্ত হয়, তখন প্রত্যাহারের চরম বিকাশে সর্বপ্রকার বিকারের অন্ত হয়, এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বাঁধিয়া হৃদয়ের মধ্যে আনিয়া ফেলে, তখন ধারণারূপ ঘোড়সওয়ার পঞ্চমহাভূতগণকে একত্র করিয়া সংকল্পের চতুরঙ্গ সেনা (মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার)-কে বধ করে, তাহার পর 'জয় জয়' শব্দে ধ্যানের ডঙ্কা বাজিতে থাকে, ব্রহ্মের সহিত ঐক্যের একচ্ছত্র পতাকা ঝক্‌মক্ করিয়া উড়িতে থাকে, তদনন্তর সমাধি-লক্ষ্মীর অখণ্ড রাজ্যসুখের ব্রহ্মৈকরসে পট্টাভিষেক হয়, হে অর্জুন, আমার ভজন এমনি গহন (দুরূহ)। এখন অন্য এক প্রকার ভক্ত কি করে—তাহাই বলিতেছি শুন, বস্ত্রের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যেমন এক তন্তুই থাকে, তেমনি চরাচরে আমাকে ছাড়া সে আর কিছুই জানে না। (২২০)

আদিতে ব্রহ্মা হইতে অন্তে মশক পর্যন্ত মধ্যস্থলের সমস্ত ভূতসৃষ্টি আমারই স্বরূপ বলিয়া সে জানে, ছোট বড় ভেদ করে না, সজীব নির্জীব বিচার করে না, যে বস্তু দৃষ্টিতে পড়ে—আমারই স্বরূপ মনে করিয়া সরলভাবে তাহাকেই সে দণ্ডবৎ প্রণাম করে, আপনার উত্তমত্ব ভুলিয়া যায়, সম্মুখস্থ বস্তুর যোগ্যাযোগ্য বিচার করে না, ব্যক্তি বা বস্তু-মাত্রকেই সে নমস্কার করিতে ভালবাসে, জল যেমন উঁচু হইতে পড়িয়া নীচের দিকেই যায়, তেমনি ভূতমাত্রকে দেখিলেই সে প্রণত হয়, ইহাই তাহার স্বভাব, কিংবা দেখ, তরুর শাখা ফলভারে সহজেই ভূমির দিকে অবনত হয়, তেমনি সেও সমস্ত প্রাণীকেই নত হইয়া প্রণাম করে। এরূপ ভক্ত নিরন্তর গর্বরহিত, বিনয় ইহার সম্পত্তি, 'জয় জয়' মন্ত্রে সে সব কিছু আমাকে অর্পণ করে, প্রণাম করিতে করিতে তাহার অভিমান অহঙ্কার দূর হয়, এবং সে অপ্রত্যাশিতভাবে মদ্রূপ হইয়া যায়, এইভাবে নিরন্তর আমার সহিত মিলিত থাকিয়া সে আমাকে উপাসনা করে, হে অর্জুন, তোমাকে শ্রেষ্ঠ ভক্তের কথা বলিলাম, এখন জ্ঞানযজ্ঞে যে আমাকে ভজনা করে, সেই ভক্তের কথা শুন। পরন্তু হে কিরীটী, এই ভজনার রীতি তুমি অবগত আছ, কারণ ইহার কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। তখন অর্জুন কহিলেন, হাঁ এই দৈব প্রসাদ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, পরন্তু অমৃত সেবন করিবার সময় কি কেহ বলে, 'যথেষ্ট হইয়াছে'? (২৩০)

অর্জুনের এই কথা শুনিয়া শ্রীঅনন্ত তাঁহার ঔৎসুক্য বুঝিতে পারিয়া চিত্তের সন্তোষের জন্য দুলিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 'হে পার্থ, তুমি ভালই বলিয়াছ, বাস্তবিক পক্ষে ইহা

অপ্রাসঙ্গিক হইবে, কিন্তু তোমার আগ্রহই আমাকে বলিতে প্রবৃত্ত করিতেছে।' তখন অর্জুন বলিলেন, —'এ কেমন কথা, চকোর বিনা কি জ্যোৎস্না থাকিতে পারে না? জগৎকে শীতল করাই তো জ্যোৎস্নার স্বভাব। চকোর শুধু আপন গরজেই চক্ষু খুলিয়া চন্দ্রের দিকে তাকাইয়া থাকে, তেমনি হে দেব কৃপাসিন্ধু, আমি আপনার কাছে সামান্য প্রার্থনা করিতেছি, মেঘ আপনার সামর্থ্যেই জগতের আর্তি দূর করে, নতুবা মেঘের বর্ষণের কাছে চাতকের তৃষ্ণা আর কতটুকু? পরন্তু এক অঞ্জলি জলের জন্য যেমন গঙ্গায় যাইতে হয়, তেমনি শ্রবণের ইচ্ছা অল্প হউক বা বেশী হউক, আপনাকেই তাহা পূরণ করিতে হইবে।' তখন ভগবান বলিলেন, 'ক্ষান্ত হও, আমার সন্তোষ হইয়াছে—ইহার পর আর স্তুতি সহ্য করিতে পারিব না। তুমি যে আমার কথা মনোযোগপূর্বক শুনিতেছ ইহাই আমার বলিবার উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেছে'—এইভাবে শ্রীহরি বলিতে আরম্ভ করিলেন:

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥১৫

জ্ঞানযজ্ঞ এইরূপ: ইহাতে আদি সঙ্কল্প যজ্ঞস্তম্ভ (যূপ), মহাভূত যজ্ঞমণ্ডপ এবং ভেদ (দ্বৈতভাব) যজ্ঞের পশু, পঞ্চমহাভূতের বিশেষ গুণ অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাম ও প্রাণ এই যজ্ঞের উপচার (যজ্ঞোপকরণ), এবং অজ্ঞানই ঘৃত, (২৪০)

মন ও বুদ্ধির কুণ্ডের মধ্যে জ্ঞানাগ্নি ধক্ধক্ করিয়া জ্বলে, সাম্য ঐ যজ্ঞের সুন্দর বেদী জানিবে, সবিবেক বুদ্ধিকুশলতা তাহার মন্ত্র, বিদ্যা, গৌরব ও শান্তি স্রুক্ এবং স্রুব (যজ্ঞপাত্র), জীব এই যজ্ঞের (যজ্ঞকারী) হোতা, এই জীব অনুভবরূপ পাত্রে বিবেকরূপ মহামন্ত্র দ্বারা জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া দ্বৈতভাবকে নাশ করে, যখন অজ্ঞানের নাশ হয়, তখন যজ্ঞকর্তা ও যজনকার্য এক হইয়া যায় এবং জীব আত্মানন্দরসে অবভৃত-স্নান করে, তখন ভূত বিষয় ও ইন্দ্রিয়গুলি পৃথক মনে হয় না, আত্মবুদ্ধি তখন সমস্তই একরূপ (ব্রহ্মরূপ) বলিয়া জানিতে পারে, হে অর্জুন, জাগ্রত হইলে মনুষ্য যেমন বলে, 'নিদ্রাবশে আমি স্বপ্নের বিচিত্র সেনা হইয়াছিলাম. এ সৈন্য তো সৈন্যই নহে, আমি একাই সে সমস্ত হইয়াছিলাম' তেমনি জ্ঞান-যজ্ঞকারী সারা বিশ্বে একত্বই দেখে। তখন জীবভাবও নষ্ট হইয়া যায়, আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত পরমাত্মবোধে ভরিয়া যায়। এইভাবে, ইহারা একত্ববোধে জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা আমার ভজনা করে, অথবা জগৎ অনাদি, পরন্তু অনেক (ভিন্ন ভিন্ন রূপের), একটি অন্য একটির সমান হইলেও তাহা হইতে ভিন্ন, তাহাদের নামরূপও ভিন্ন, এইজন্য বিশ্বে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ থাকিলেও জ্ঞানযজ্ঞকারী তাহাদের মধ্যে কোনও ভেদ দেখে না—ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব হইলেও তাহারা একই দেহে থাকে, (২৫০)

যেমন একই বৃক্ষে ছোট বড় শাখা থাকে, অথবা রশ্মি বহু হইলেও সব একই সূর্যের রশ্মি, তেমনি নানাবিধ ব্যক্তির নাম বিভিন্ন ও বৃত্তি পৃথক্ হইলেও এই ভেদের মধ্যে অভিন্ন আমাকেই সে দেখিতে পায়, হে পাণ্ডব, এইভাবে তাহারা ভিন্নতার মধ্যেও উত্তম জ্ঞানযজ্ঞ করে, কারণ তাহারা জানে সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ এবং এইজন্য তাহাদের জ্ঞানে ভেদভাব হয় না, কিংবা তাহাদের এমনই জ্ঞান হয় যে যখন যেখানে যাহা কিছুই দেখুক না কেন, তাহা আমা ভিন্ন কিছুই নহে—ইহাই বুঝিতে পারে, দেখ—বুদ্বুদ যেখানেই উঠুক না কেন, সেখানেই উহা জলের সহিত একরূপ, উহা গলিয়াই যাউক, কি থাকুক, উহা জলের মধ্যেই থাকে, পবন

যে ধূলিকণা উড়ায়, তাহাতে উহার মাটিত্ব নষ্ট হয় না, উহা যখন পুনরায় পড়িয়া যায়, তখন পৃথিবীর উপরই পড়ে, তেমনি যেখানে যেভাবে যাহাই উৎপন্ন হউক বা নষ্ট হউক না কেন, সে সমস্তই মদ্রূপ হইয়া থাকে, আমার যতখানি ব্যাপ্তি ততখানিই ব্রহ্মানুভূতি,—এইভাবে বহুবিধ আকারের মধ্যে জ্ঞানী মদ্রূপ হইয়া থাকে, হে ধনঞ্জয়, সূর্যবিম্ব যেমন দ্রষ্টার সম্মুখেই আছে মনে হয়, তেমনি তাহারা সর্বদা এই বিশ্বকে তাহাদের সম্মুখে দেখিতে পায়. হে অর্জুন, তাহাদের জ্ঞানে অন্তর-বাহির—এই ভেদ নাই, বায়ু যেমন গগনের সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া আছে—সেইরূপ, (২৬০)

আমার পূর্ণ স্বরূপের ন্যায় তাহাদের সদ্ভাবের (ব্রহ্মবোধের) ব্যাপ্তি,—এইজন্য হে পাণ্ডব, ভজন না করিলেও আমার ভজন করা হয়, সর্বত্র সর্বভূতে যখন আমিই আছি, তখন কে কোথায় আমার উপাসনা করে না? শুধু অজ্ঞানী—যাহার এ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই, সেই আমাকে প্রাপ্ত হয় না, যথেষ্ট হইয়াছে। উচিত (যোগ্য) জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া যাহারা আমার উপাসনা করে, তাহাদের কথা বলা হইল. নিরন্তর যে সকল কর্ম সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা সর্বদা এক আমাকেই অর্পণ করা হয়, মূর্খ ব্যক্তিগণ ইহা না জানিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয় না।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥১৬

এই জ্ঞানের উদয় হইলে বুঝিতে পারা যায় যে বেদ, বেদোক্ত বিধিবিধান ও যজ্ঞ সমস্তই আমি। হে পাণ্ডব, সমস্ত কর্মানুষ্ঠানের সহিত যে যথাবিধি যজ্ঞ প্রকট হয় তাহা আমি, আমিই স্বাহা, আমিই স্বধা—সোমলতাদি বিবিধ ঔষধ, আজ্য (ঘৃত), সমিধ, মন্ত্র ও হবি (হোম দ্রব্য), আমিই হোতা, হোমাগ্নি আমারই স্বরূপ, যে যে বস্তু দ্বারা হবন করা হয় তাহাও আমি।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥১৭

যাহার সহবাসে অষ্টধা প্রকৃতি হইতে জগৎ জন্মগ্রহণ করে, আমিই সেই পিতা, অর্ধনারী নটেশ্বররূপে যিনি পুরুষ তিনিই নারী—অতএব আমি এই চরাচর বিশ্বের মাতাও, (২৭০) জগৎ উৎপন্ন হইয়া যাহাতে অবস্থান করে এবং যাহাদ্বারা তাহার জীবন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা নিশ্চিত আমা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, এই দুই বস্তু—প্রকৃতি ও পুরুষ—যে নির্গুণ স্বরূপ হইতে উৎপন্ন, ত্রিভুবন বিশ্বের সেই পিতামহও আমিই, আর হে অর্জুন, সকল জ্ঞানের পথ যে গ্রামে গিয়া মিলিয়াছে—বেদ তাঁহাকে 'বেদ্য' বলিয়া আখ্যা দেন, যেখানে নানা মতের ঐক্য, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের পরস্পর পরিচয় হয়, ভ্রান্ত জ্ঞান যেখানে দূরীভূত হয়, যাহাকে 'পবিত্র' বলা হয়, ব্রহ্মবীজের যাহা অঙ্কুর, নাদাকার ঘোষ-ধ্বনির মন্দির যে 'ওঁকার' তাহাও আমি, সেই 'ওঁকারের' কুক্ষি হইতে 'অ' 'উ' ও 'ম' অক্ষরত্রয় বেদত্রয়ের সহিত উৎপন্ন হইয়াছে, আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—ঋক্ যজুঃ সাম, এই তিনটি বেদ আমিই এবং এই বেদের 'কুলক্রম' (বংশ-পরম্পরা)ও আমি।

(ক্রমশঃ)

নবদ্বীপের রাস-উৎসব

শ্রীনরেশচন্দ্র বসু

[লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস শাখার পরিচালনায় 'বাংলার লোকধর্ম' বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধটি স্থানীয় অনুসন্ধানের ভিত্তিতে রচিত। উঃ সঃ]

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের লীলাভূমি ও সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রস্থল—নবদ্বীপ। যুগে যুগে ভক্ত ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাগম নবদ্বীপের ধূলিকে করেছে ধন্য। আজও শ্রীগৌরাঙ্গের নামে নবদ্বীপের আকাশ বাতাস মুখরিত।

রাসলীলা বলতে আমাদের মানসচক্ষে ফুটে ওঠে গোপিনী-সমাবৃত শ্রীকৃষ্ণের এক অভিরাম লীলার পরিবেশ। কিন্তু নবদ্বীপের রাসলীলা অন্য। এ রাস-লীলায় বৈষ্ণব চিন্তাধ্যানের কোন সংস্পর্শ নেই। নবদ্বীপের রাসলীলা একটা উৎসব সন্দেহ নেই, তবে তা বীর-ভাব প্রধান। লীলার নামে যে জিনিস আত্মপ্রকাশ করে তা উৎকণ্ঠিত শক্তির লীলা। এই শক্তিমূর্তি ও পূজার পেছনে কিন্তু লুকিয়ে আছে ছোট্ট একটু ইতিহাস—যার সঙ্গে মিশেছে কিংবদন্তী। নবদ্বীপের রাসলীলা-প্রসঙ্গে সেই গল্পেরই অবতারণা ক'রব।

নবদ্বীপের প্রাচীনতা সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই। হাণ্টার সাহেব বলেছেন: 'Nadia (Navadwip) is the ancient capital of Nadia district and the residence of Laxman Sen According to local legend the town was founded in 1063 by Laxman Sen. Here in the end of the 15th century was born the great reformer Chaitanya' (Hunter's Imperial Gazetteer, 1880).

নয়টি দ্বীপের সমাবেশ 'নবদ্বীপ' নামের উৎস। গঙ্গা ও সরস্বতী (জলাঙ্গী বা খড়িয়া) এবং তাদের শাখা-প্রশাখা এক সময় স্থানটিকে এমনভাবে বেষ্টন ক'রে রেখেছিল যে নদীবেষ্টিত নয়টি দ্বীপ স্পষ্টই দেখা যেত। কালের আবর্ত্তনে নদীর গতি ধরেছে ভিন্ন পথ, দ্বীপের আকারও হয়েছে পরিবর্তিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের স্থান নির্ণয় করা আজও দুঃসাধ্য নয়। অপর মতে চতুর্দিকে জলধারা-বেষ্টিত ভূমিকে যেমন দ্বীপ বলে, তেমনি শ্রবণ-কীর্তনাদি নয় প্রকার সাধনাঙ্গের নবধাভক্তি-জলধারা-পরিবেষ্টিত এই চিন্ময়ভূমির নাম 'নবদ্বীপ'।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহাপ্রভু আবির্ভূত হন। তাঁহার প্রচারিত ধর্মে—'শান্তিপুর ডুবু ডুবু, (প্রেমে) নদে ভেসে যায়'। সেই প্রেমস্রোতে উন্মত্ত হ'য়ে অধিবাসীরা গার্হস্থ্য ধর্মের সঙ্গে ভুলেছিলেন—শক্তির চর্চা। সমাজ হারিয়ে ফেলছিল প্রতিবোধ করার ক্ষমতা। কলসীর কাণার পরিবর্তে প্রেম বিতরণ করতে গিয়ে কপালে জুটছিল লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা। এই অবস্থার মাঝে এক পক্ষ এই ধর্মের বিরুদ্ধে করলেন বিদ্রোহ। তাঁরা কলসীর কাণার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে বদ্ধপরিকর হলেন। আরম্ভ করলেন শক্তির চর্চা—আরম্ভ হ'ল শক্তির পূজা। অতীতের দিকে তাকালে আমরা দেখি সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রচারের ফলে যখন জগৎ ও জীবনের প্রতি মানুষের নিষ্ক্রিয় ও ঔদাসীন্যের ভাব পুঞ্জীভূত হয়েছিল, তখনই তার প্রতিক্রিয়া-রূপে সমাজে দেখা দিয়েছিল শক্তিপূজা।

বৈষ্ণবদের সঙ্গে শাক্তদের কলহ বহুদিনের। বৈষ্ণবদের সঙ্গে নবদ্বীপে তান্ত্রিক পণ্ডিতদের প্রাধান্য থাকায় শক্তিপূজার সমারোহও খুব বেশী। চৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম বঙ্গীয় রাজা ও পণ্ডিত-মণ্ডলীকে আকর্ষণ করতে পারেনি। বিশেষ ভাবে কৃষ্ণনগরের রাজারা শক্তিপূজারই সমর্থক ছিলেন। 'ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত'-কার লিখে-ছেন, 'তৎকালে এ প্রদেশস্থ প্রায় যাবতীয় লোক শক্তির উপাসক ছিলেন। তন্মধ্যে অনেকে তন্ত্রোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানোপলক্ষে পানাসক্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইতেন।' অন্যত্র—'নবদ্বীপের রাজা বা পণ্ডিতগণ চৈতন্যকে অবতারের মধ্যে কখন গণ্য করেন নাই।' এ কথার সত্যতা নবদ্বীপে তান্ত্রিক শাক্তদের প্রাধান্য হ'তে আজও উপলব্ধি করা যায়। পূর্বেই বলেছি, কৃষ্ণ-নগরের রাজারা শক্তিপূজারই সমর্থক ছিলেন। শোনা যায় যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই প্রথমে নবদ্বীপে জাঁকজমকের সঙ্গে শক্তিপূজার প্রেরণা দেন, এবং তার দিন স্থির করেন বৈষ্ণবদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব—রাসপূর্ণিমার দিন। বিখ্যাত তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয় এই উৎসবের পুরোধা হন। নবদ্বীপের গঙ্গার তীরে বিরাট এক শক্তিমূর্তির পূজা হয়। এই পূজা 'নটহটি' পূজা নামে খ্যাতি লাভ করে। মূর্তির চালচিত্রে যে বিভিন্ন শক্তির লীলা দেখানো হয় তা 'পট' নামে পরিচিত। তার থেকেই কাল-ক্রমে এই উৎসব 'পটপূর্ণিমা' নামেও খ্যাতিলাভ করে। কালের আবর্তনে সেই শক্তিপূজার প্রচার ও প্রচলন হয়েছে বেশী। আজও নবদ্বীপে রাসপূর্ণিমার দিন ছোট বড় প্রায় চারশো শক্তিমূর্তির পূজা হয়। এই উপলক্ষে বহু দূর দূরান্ত থেকে অসংখ্য যাত্রীর সমাবেশ হয়। সুতরাং রাসপূর্ণিমায় কৃষ্ণ ও রাধা উপেক্ষিত!

দশ মহাবিদ্যার মধ্যে তারা, ধূমাবতী, ও ছিন্নমস্তা[১] ব্যতীত অপর সকলেরই আরাধনা করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ পার্থসারথি-বেশে স্থান ক'রে নিয়েছেন এই শক্তিপূজার মধ্যে। এই শক্তিপূজার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ দেবদেবীদের মূর্তির উচ্চতা ও পরিধি। ৩৫ফুট থেকে ৬ইঞ্চি পর্যন্ত উচ্চ মূর্তির পূজা হয়, তার মধ্যে ২০।২৫ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট দেবদেবীদের মূর্তির সংখ্যাই বেশী। এই সকল মূর্তির পরিকল্পনায় ও গঠনচাতুর্যে শিল্পীর শিল্পিজনোচিত ভাব বেশ পরিস্ফুট। এই সকল বিরাট মূর্তি মাচা বেঁধে শিল্পীরা যেভাবে যেরূপ কুশলতার সঙ্গে স্তরে স্তরে গঠন করেন, তা বর্ণনা ক'রে বোঝানো সম্ভব নয়। কোন কোন মূর্তির সঙ্গে ডাকের সাজও থাকে।

পূজার পরদিন এই সকল বিরাট বিরাট মূর্তির শোভাযাত্রা একসঙ্গে বাহির হয়। এই শোভাযাত্রা 'আড়ং' নামে পরিচিত। 'পোড়ামা-[২]তলা' ব'লে খ্যাত অঞ্চলে এই সকল বিরাট মূর্তির একত্র সমাবেশ দর্শকদের ও ভক্তদের প্রচুর আনন্দ দান করে এবং বিচারকদেরও বিচার করবার সুবিধা দেয়। বিচারে শ্রেষ্ঠ মূর্তির শিল্পীকে পুরস্কৃত করা হয়।

বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার শক্তিমূর্তির মধ্যে বঙ্গপাড়ার রণকালী, আগমেশ্বরী পাড়ার (আমড়াতলা) রণচণ্ডী ও মহিষমর্দিনী

১ কয়েক বৎসর পূর্বে সংসারত্যাগী একটি যুবক শাস্ত্রোক্ত মতে ছিন্নমস্তার পূজা করে। কিন্তু পূজার এক বৎসরের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হওয়ায় অদ্যাপি ছিন্নমস্তার পূজায় আর কেহ অগ্রসর হয়নি।

২ পোড়ামাতা বা বিদগ্ধ জননী। এইরূপ নামকরণের পশ্চাতে বিভিন্ন যুক্তি দেখা যায়। (ক) পড়ুয়া বা ছাত্রদের মাতৃস্থানীয়া ব'লে পড়ুয়ার মাতা বা পোড়া মা। তাঁর স্থান ব'লে 'পোড়ামা-তলা' (খ) ভিন্ন এক কাহিনী অনুসারে এক সাধকের একটি মাতৃমূর্তি আগুনে দগ্ধ হয়; সেইজন্য ইহার নাম 'পোড়ামা-তলা'।

('ঘোষমর্দা'—অঞ্চলস্থ অধিবাসীদের চল্‌তি কথায়), হরিসভা-পাড়ার ভদ্রকালী, যোগনাথ-তলার দুইটি সিংহের উপর দণ্ডায়মানা দেবী দুর্গা ('গৌরাঙ্গিনী' নামে এই মূর্তি খ্যাত)। ব্যাধরা-পাড়ার শব-শিব-শিবা মূর্তি, ও মালঞ্চপাড়ার শ্যামাকালী৩ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চারচারি-পাড়ার ভদ্রকালী উচ্চতায় প্রায় ৩৪ ফুট। এত বড় প্রতিমা ভারতে কোন স্থানে তৈরী হয় ব'লে শোনা যায় না।

আগমেশ্বরী পাড়ার বিশিষ্ট অধিবাসী শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে শিল্পীদের মূর্তি তৈরী করবার কৌশল থেকে বিসর্জন পর্যন্ত—প্রতিটি স্তর দেখবার সুযোগ ক'রে দেওয়ায় আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই সকল মূর্তি রথের মতো চাকার উপর স্থাপন ক'রে মোটা দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেকে বাহক নিয়োগ করেন; মূর্তির ওজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ৮০ থেকে ১৫০ জন পর্যন্ত বাহক নিয়োগ করা হয়। কিছুকাল আগেও এই বিসর্জনের দিন উদ্যোক্তাদের মধ্যে পঞ্চ 'ম'-কারের সেবা ও দলগত বা পারিবারিক কলহ এমন চরমে উঠত যে ভক্ত বা দর্শকদের জীবন নিয়ে টানাটানি হ'ত, কিন্তু সুখের বিষয় পুলিশের তৎপরতায় এ বিপদের এখন অবসান হয়েছে। আজও অনেকেই বাংলার এই প্রাচীন নগরীর ঐতিহ্যময় গৌরবের অবশেষ দেখে চোখের ও মনের তৃপ্তি সাধন করতে পারেন।

৩ সাধক বামাক্ষেপা সর্বপ্রথম এখানে একটি মূর্তি তৈরী ক'রে পূজা করেন। সেইজন্য এখানে পূজিত কালী 'বামা কালী' নামে পরিচিত। একটি বাঁধানো বেদী আছে, তার ওপরই মূর্তি স্থাপনা ক'রে পূজা হয়। কিন্তু প্রত্যহ এই বেদীর ওপর স্থাপিত ঘটের পূজা হ'য়ে থাকে।

শক্তি ও সত্তা

শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ

সৃজনের আদি হ'তে যে প্রবাহ চলিছে ছুটিয়া
মরণের পরপারে হয় না তো তার অবসান।
তোমার অনন্তরূপ প্রকাশিছে তারি মধ্য দিয়া
বহুর মাঝারে যেন একই সত্য রহে অনির্বাণ।

কারো মতে মহাশক্তি, কেহ বলে প্রকৃতি চঞ্চলা,
অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তা—আর কিছু নাহি এ ধরায়,
জীবন-বিজ্ঞান হ'তে কল্পনার চতুঃষষ্টি কলা
তোমার শক্তির খেলা—হৃদিপদ্মে বিস্ময় জাগায়।

বারে বারে তবু যেন মনে হয় পার্থিব জগৎ—
এই সব, ইহার অপর প্রান্তে আর কিছু নাই,
প্রকৃতির সোনালি আভায় তব মহিমা মহৎ।
জড়ের চৈতন্যঘন ছবিখানি ধরিবারে চাই।

মায়ামরীচিকাসম এ জগৎ চৈতন্য-সত্তায়
মরু জল হয় যে বিলীন অন্ধ কুজ্ঝটিকা মাঝে,
আবার সহসা ভাসে অধিষ্ঠান উজ্জ্বল বিভায়।
পুরুষ প্রকৃতি কই? সেই এক অদ্বৈত বিরাজে।

পল্‌নীর দণ্ডায়ুধ-স্বামী

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

দাক্ষিণাত্যের প্রধান কয়টি তীর্থস্থানের মধ্যে পল্‌নীর শ্রীদণ্ডায়ুধ স্বামীর মন্দির অন্যতম। মাদ্রাজ শহর হইতে ৩০৪ মাইল দূরে কোয়েম্বাতুর-ডিণ্ডিগল (Dindigul) রেল লাইনে কোয়েম্বাতুর হইতে ৬৭ মাইল দূরে পল্‌নী অবস্থিত। লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী প্রতি বৎসর এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীদণ্ডায়ুধস্বামীকে দর্শন করিতে আগমন করেন। দেবাদিদেব মহাদেবের পুত্র কার্ত্তিকেয়ই এখানে শ্রীদণ্ডায়ুধস্বামী নামে পরিচিত। দক্ষিণ অঞ্চলে কার্ত্তিকের সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত নাম 'মুরুগা'। তিনি সুব্রহ্মণ্য, আরুমুগম্ ও ভেলায়ুধম্ নামেও পরিচিত। তামিলে 'মুরুগা' অর্থ সৌন্দর্য, যৌবন ও সুগন্ধি। দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় সৌন্দর্যে অতুলনীয়, তিনি চিরযুবা এবং তাঁহার শরীর হইতে নির্গত সুগন্ধি সকলকে পরিতৃপ্ত করে। 'আরুমুগম্' অর্থে ছয়টি মুখ-বিশিষ্ট, পুরাণে কার্ত্তিক ষডানন বলিয়াও পরিচিত। 'ভেলায়ুধম্' অর্থ বর্শা-অস্ত্রধারী, 'ভেল' অর্থ বর্শা। 'সুব্রহ্মণ্য' নামটি এদেশে খুবই সাধারণ।

মাদ্রাজ প্রদেশে মুরুগার অসংখ্য মন্দির থাকিলেও তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়টি প্রধান। তামিলে উঁহাদিগকে 'আরুপাডাইভিডু' বলা হয়, ('আরু' ছয়, 'পাডাই' ছাউনি, 'ভিডু' বাসস্থান) অর্থাৎ মুরুগার ছয়টি প্রধান ছাউনি বা বাসস্থান। ইনি দেবতাদের সেনাপতি ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় ছাউনি তাঁহার বাসস্থান। ঐ ছয়টি স্থানের নাম--(১) পল্‌নী, (২) তিরুচেন্দুর, (৩) তিরুপারাংকুণ্ডরম্, (৪) পলমুদিরশোলই, (৫) তিরুভিরগম্ ও (৬) স্বামীমালাই।

'তিরুচেন্দুর' তিরুনেলভেলী জেলায় একেবারে সমুদ্রতীরে, তিরুনেলভেলী শহর হইতে ট্রেনে যাওয়া যায়। অতি সুন্দর মন্দির, মনোরম স্থান এবং মূর্তি নয়নাভিরাম। তিরুপারাংকুণ্ডরম্ ও পল-মুদিরশোলই মাদুরা শহরের সন্নিকটে অবস্থিত। কুম্ভকোণম্ শহরের চারি মাইলের মধ্যে 'তিরুভিরগম্' ও 'স্বামীমালাই' মন্দির। উপরোক্ত ছয়টি বিখ্যাত মুরুগার মন্দিরের মধ্যে 'পল্‌নী' সর্বপ্রধান। এদেশে কার্ত্তিককে দুই রূপে দেখিতে পাওয়া যায়—আকুমার ব্রহ্মচারীরূপে এবং দুই ভার্যা-সমন্বিতরূপে। তাঁর দুই স্ত্রীর নাম 'বল্লী' ও 'দেবযানী'। দেবযানী দেবরাজ ইন্দ্রের কন্যা, বল্লী অর্থে লতা। কোনও শিকারী জঙ্গলে লতামূলে তাঁহাকে পাইয়া কন্যারূপে লালনপালন করেন, সেজন্য ইনি শিকারী-কন্যা নামেও পরিচিতা। ইঁহার অতুলনীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া কার্ত্তিক ইঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। একমাত্র পল্‌নীতেই কার্ত্তিকের ব্রহ্মচারী মূর্তির পূজা হয়, অন্যত্র ইনি দুই ভার্যা-সহিত অধিষ্ঠিত। দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান শিব-মন্দিরের সীমানার মধ্যেও সুব্রহ্মণ্যের মন্দির আছে। পাহাড় মুরুগার অতিশয় প্রিয়, সেজন্য বহুস্থানে ইঁহার মন্দির পাহাড়ের শিখরদেশে অবস্থিত।

পল্‌নী শহর

পল্‌নীও একটি ছোট পাহাড়—৪৫০ ফুট উঁচু। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার এক শাখায় পল্‌নী পাহাড় অবস্থিত—এখান হইতে বিখ্যাত কোডাইকানাল ও বরাহগিরি পর্বতশ্রেণীর দূরত্ব মাত্র পাঁচ মাইল। বায়বীপুরী নামে বিরাট

হ্রদ পল্‌নী-পাহাড়ের পাদদেশ বিধৌত করিতেছে। চারিদিকে ছোট ছোট অনেক পাহাড় ইহাকে যেন অহরহঃ রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ইহা সত্যই অতুলনীয়, দর্শনে চক্ষু সার্থক হয়।

পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত শহরের নামও পল্‌নী। সমুদ্র-বক্ষ হইতে ইহার উচ্চতা ১০৬৮ ফুট। শহরটি ক্রমবর্ধমান, যানবাহনের কোন অভাব নাই। পল্‌নী রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে শহরের দূরত্ব এক মাইলের কিছু বেশী। যাত্রীরা শহরে অবস্থিত চৌলট্রিতে (ধর্মশালায়) রাত্রিযাপন করেন। মন্দির-পরিচালিত সুন্দর দ্বিতল চৌলট্রিতে অল্প ব্যয়ে বেশ আরামে থাকা যায়। শহরের লোকসংখ্যা ৫০,০০০ হইবে। এই শহর প্রথমে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৯২ খৃঃ ইহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে। শহরের মধ্যেও কয়েকটি মন্দির বিগ্যমান—তন্মধ্যে পেরিয়ানায়কী-আম্মন নাম্নী দেবীর মন্দির খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত। এতদ্ব্যতীত কৈলাসনাথ মন্দির ও সুব্রহ্মণ্যের মন্দিরও আছে। সম্প্রতি শ্রীনটরাজের মন্দিরও নির্মিত হইয়াছে। এই শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম 'মরিয়াম্মন্‌'। তাঁহারও মন্দির আছে এবং প্রতি বৎসর মার্চ মাসে বিরাট ধূমধাম সহকারে দেবীর পূজা ও তদুপলক্ষে উৎসব হয়। রোগমুক্তির আশায় অনেকে এই দেবীর বিশেষ পূজাদির ব্যবস্থা করেন।

'পল্‌নী' নামের সার্থকতা

তামিল ভাষায় খ, ঘ ঝ, ঢ, ধ, ফ, ভ প্রভৃতি বর্ণ নাই, ঐগুলি পূর্ব বর্ণের দ্বারাই উচ্চারিত হয়। বাংলা ভাষায় যাহা 'ফল' তামিলে তাহা 'পড়ম্‌' বা 'পলম্‌'। তামিলে 'নী' অর্থে তুমি। 'পল্‌নী' কথাটির অর্থ—'তুমিই ফল'। শিব ও পার্বতী কনিষ্ঠ পুত্র কার্ত্তিককে এই কথা বলিয়াছিলেন, তদবধি তিনি এবং এই শহর ও পাহাড় 'পল্‌নী' নামেই পরিচিত।

পুরাণে আছে: একদিন শিব ও পার্বতী কৈলাসে গণেশ ও কার্ত্তিককে বলেন—তাদের দুজনের মধ্যে যে প্রথমে ত্রিভুবন প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারিবে, তাহাকে একটি ডালিম ফল পুরস্কার দেওয়া হইবে। কার্ত্তিক সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ক্ষিপ্র বাহন ময়ূরের পিঠে চড়িয়া তীরবেগে যাত্রা করিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনিই পুরস্কার লাভ করিবেন। গণেশের শরীরের মধ্যদেশ কিঞ্চিৎ স্থূল এবং বাহনও মূষিক, কাজেই তাঁহার আর জয়ের আশা কোথায়? কিন্তু বুদ্ধিতে গণেশ বৃহস্পতি-তুল্য। কার্ত্তিক রওনা হওয়ার পর গণেশ ধীরভাবে চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে তাঁহার পিতামাতা তো ত্রিলোকেশ্বর ও ত্রিলোকেশ্বরী, তাঁহারাই তো বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিত, কাজেই তাঁহাদের পরিক্রমা করিলেই তো ত্রিভুবন প্রদক্ষিণ করা হইবে। ইহা ভাবিয়া তিনি একটু বিশ্রাম গ্রহণ পূর্বক ধীরে ধীরে তাঁহার পিতামাতাকে পরিক্রমা করিয়া পুরস্কার দাবি করিলেন। তাঁহার যুক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া শিব ও পার্বতী তাঁহাকেই ডালিম ফলটি প্রদান করিলেন এবং মাতা পার্বতী প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রান্ত ক্লান্ত কার্ত্তিক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া দেখেন যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পূর্বেই ফলটি লাভ করিয়া মায়ের ক্রোড়ে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ক্রোধাকুলিতচিত্ত কার্ত্তিক তখনই কৈলাস পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমনোদ্যত হইলেন। মাতা ও পিতা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, 'পল্‌নী—অর্থাৎ তুমিই তো ফল, তুমি আবার অন্য ফলের কি

আকাঙ্ক্ষা করিতেছ ? তোমাকে লাভ করিলেই লোকে মোক্ষ ফল পাইবে।'

কিন্তু কার্তিক ইহাতে শান্ত হইতে পারিলেন না। তিনি দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া প্রথমে পাহাড়ের সন্নিকটে তিরুআভিনান্‌কুডিতে আসেন এবং তথা হইতে পল্‌নী পাহাড়ের উপর যাইয়া স্থায়িভাবে অবস্থান করেন। তদবধি এই পাহাড় পল্‌নী পাহাড় ও তিরুআভিনান্‌কুডি পল্‌নী শহর নামে পরিচিত হয়।

পল্‌নী পাহাড়

পল্‌নী পাহাড়ের পাদদেশে প্রদক্ষিণ করিবার জন্য পথ আছে, দৈর্ঘ্যে তাহা এক মাইল আন্দাজ হইবে, ইহাকে গিরি-বিধি বলা হয়। তামিলে 'বিধি' শব্দের অর্থ পথ। চারিদিকে চারিটি মণ্ডপ আছে এবং চারিটি সুবৃহৎ প্রস্তরনির্মিত ময়ূরের মূর্তি আছে, কার্তিকের প্রিয় বাহন ময়ূর। পথিপার্শ্বে গণেশ ও অন্যান্য দেবতার ছোট ছোট মন্দির এবং বহু সমাধি বিদ্যমান।

অল্প দূরেই ছয়টি শাখাবিশিষ্ট ষণ্মুখ নদী। পাহাড়ের উপর দেবদর্শনে গমনের পূর্বে অনেকেই এই পবিত্র নদীতে অবগাহন স্নান করেন। ঘাটের পাশেই সুন্দরবিনায়ক (গণেশ), কৈলাসনাথ দক্ষিণামূর্তি ও নবগ্রহের ছোট ছোট মন্দির আছে। মে মাসের অগ্নি-নক্ষত্রে গিরি প্রদক্ষিণ অতি পুণ্যকার্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং হাজার হাজার যাত্রী ভক্তিপরিপ্লুত হৃদয়ে শ্রীমুরুগার স্মরণ করিতে করিতে ঐ পবিত্র পল্‌নী পাহাড় প্রদক্ষিণ করেন। এখানকার স্থলবৃক্ষ কদম্ব, উহার পুষ্প মুরুগার অতিশয় প্রিয়। গিরিবিধির দক্ষিণে কদম্বকুঞ্জ বিদ্যমান।

স্কন্দপুরাণে পল্‌নী পাহাড় ও ইহার নিকটস্থ ইড়ুম্বনমালাই নামক ছোট পাহাড়ের ইতিহাস বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। উহাতে লেখা আছে যে পল্‌নী পাহাড় কৈলাস পর্বত হইতে এখানে আনীত হইয়াছিল। স্কন্দপুরাণে কথিত:

ঋষি অগস্ত্য দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিবার জন্য কৈলাসে গমন করিয়াছিলেন, আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে শিবগিরি ও শক্তিগিরি নামক দুইটি পাহাড় প্রদান করেন এবং উহাদিগকে অগস্ত্যের বাস-স্থান দাক্ষিণাত্যে পোডিগাইতে লইয়া যাইতে বলেন। পাহাড় দুইটি বহন করিবার জন্য ঋষি তাঁহার শক্তিশালী শিষ্য অসুর-গুরু ইড়ুম্বনকে নিযুক্ত করেন, এবং যাহাতে সে সহজেই পাহাড় দুইটি বহন করিতে পারে, তজ্জন্য ঋষি তাঁহাকে বিশেষ মন্ত্র প্রদান করেন। বাংলাদেশে বাঁকে করিয়া যেরূপ ভার বহন করে ইড়ুম্বনও তদ্রূপ পাহাড় দুইটিকে একটি দণ্ডের দুইদিকে ঝুলাইয়া উহা কাঁধে করিয়া বহন করিতে থাকেন। বর্তমান পল্‌নী শহরের নিকটে আসিলে ইড়ুম্বন অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করত বিশ্রামের জন্য পাহাড় দুটিকে ভূমির উপর স্থাপন করেন। পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিবার প্রাক্কালে তিনি পাহাড় দুটিকে উঠাইতে অসমর্থ হইয়া শিবগিরি পাহাড়টির উপর উঠিয়া দেখেন যে তথায় কৌপীনমাত্র পরিহিত দণ্ডায়ুধধারী এক সুন্দর যুবাপুরুষ পাহাড়টিকে নিজের বলিয়া দাবি করিতেছেন। যুবক আর কেহই নহেন, ইনিই দেবসেনাপতি মুরুগা, ছদ্মবেশে এখানে রহিয়াছেন।

পাহাড়ের অধিকার লইয়া স্বাভাবিকভাবেই উভয়ের মধ্যে প্রথমে বচসা ও পরে যুদ্ধ শুরু হইল এবং কিছুক্ষণ পরেই ইড়ুম্বনের প্রাণহীন দেহ মুরুগার পদতলে পতিত হইল। ধ্যান-যোগে সর্ববৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঋষি অগস্ত্য ইড়ুম্বনের পত্নী ইড়ুম্বী সমভিব্যাহারে অচিরেই তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দেবসেনাপতির কৃপা ভিক্ষা করিলেন। মুরুগা ইড়ুম্বনকে

পুনর্জীবিত করিলে তিনি করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন, যেন তিনি চিরকাল ঐ পাহাড়ের দ্বারপাল নিযুক্ত থাকেন, এবং যে সব দর্শনার্থী ভক্ত বংশখণ্ড (বাখারি) ও কাগজ নির্মিত কাবাডী স্কন্ধে করিয়া পূজা করিবার জন্য তথায় আগমন করিবেন তাঁহাদের মনস্কামনা যেন পূর্ণ হয়। মুরুগা প্রীত হইয়া ইড়ুম্বনকে প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন।

এখনও সহস্র সহস্র যাত্রী প্রত্যহ কাবাডী স্কন্ধে মুরুগার দর্শনার্থ পল্‌নী পাহাড়ে আরোহণ করেন। কাবাডীর মধ্যে পূজাদ্রব্য রাখা হয়। শ্রীমুরুগা 'দণ্ডায়ুধপাণি স্বামী' নামে তখন হইতে এই শিবগিরি পাহাড়ের শিখরদেশেই অবস্থান করিতেছেন। ক্রমশঃ স্কন্ধে কাবাডী করিয়া পূজাদ্রব্য বহন কবিবার রীতি মুরুগার অন্যান্য মন্দিরেও প্রচলিত হয়।

পল্‌নী পাহাড়ের শিখরদেশে উঠিতে হইলে ৬৫৯টি পাথরের সিঁড়ি অতিক্রম করিতে হয়। প্রায় মাঝামাঝি উঠিলে একটি ছোট মন্দিরে দেখা যায় যে ইড়ুম্বন মুরুগার পদতলে নতজানু হইয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন—পার্শ্বে শিব- ও অগস্ত্যমুনির মূর্তিও বিদ্যমান। পৌরাণিক কাহিনীকে সঞ্জীবিত রাখাই যেন ইহার উদ্দেশ্য। সিঁড়ি ছাড়া পাহাড়ী রাস্তাও আছে। বিশেষ বিশেষ পর্বে অভিষেকের জন্য পাহাড়ী পথে হাতী উপরে জল বহন করিয়া লইয়া যায়। সিঁড়ির মাঝে মণ্ডপ আছে, তাহার তলায় যাত্রীরা বিশ্রাম করিতে পারে। ছোট ছোট অনেক মন্দিরও রহিয়াছে। পাহাড়ের উপর পঞ্চবর্ণ-পাদুকা নামে একটি সুন্দর গুহা আছে। রাত্রে সমস্ত রাস্তা প্রচুর বিজলী বাতির দ্বারা আলোকিত হয়। অন্ধকার রাত্রে পল্‌নী শহর হইতে বিভিন্ন রঙের আলোকমালায় সজ্জিত সমগ্র পাহাড়টি অতি মনোরম শোভা ধারণ করে।

শ্রীদণ্ডায়ুধ স্বামী

পাহাড়ের শিখরদেশে উঠিলেই চারিদিকের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে দর্শকের মন এক দিব্য-ভাবে আবিষ্ট হয়। মন্দিরের চারিদিকে সুউচ্চ প্রাচীর। কয়েকটি প্রাকার অতিক্রমপূর্বক গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিলে হস্তে দণ্ড ও আয়ুধ-বিশিষ্ট কৌপীন-পরিহিত মুণ্ডিতমস্তক নয়নাভিরাম অষ্টধাতু-নির্মিত শ্রীমুরুগার ব্রহ্মচারী মূর্তি ভক্তযাত্রীর অন্তরে এক দিব্যভাবের প্রেরণা জাগায়। ভক্তের ইচ্ছানুযায়ী দিনে একাধিকবার দুধ, চন্দন, মধু, গুড়, বিভূতি প্রভৃতির দ্বারা মুরুগার অভিষেক হয়। মূর্তি প্রায় সাড়ে তিন ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট। বিভিন্ন প্রকার অভিষেকের জন্য বিভিন্ন দক্ষিণা নির্ধারিত আছে। কয়েক শতাব্দী যাবৎ প্রত্যহ বহুবার মধু, গুড় প্রভৃতি দ্রব্যাদির দ্বারা অভিষেক করানোর ফলে মূর্তির কোন কোন অঙ্গ সামান্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। কখনও কখনও সমস্ত শরীরই চন্দন-চর্চিত ও বিভূতি-ভূষিত করা হয়। অনেকে সোনা রূপা ও নানারূপ মণিমুক্তাও নিবেদন করেন। এই দেবস্থানের আর্থিক অবস্থা খুবই সচ্ছল। রোগমুক্তি কামনায়ও বহুলোক এখানে আগমন করিয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস যে প্রসাদী অভিষেকদ্রব্য ভক্ষণ করিলে রোগমুক্ত হওয়া যায়, উহা কিনিতেও পাওয়া যায়। জানুআরি এপ্রিল মে জুন ও নভেম্বর মাসে এখানে বিশেষ উৎসব হয়। ইহার মধ্যে এপ্রিল মাসে দশদিনব্যাপী 'পঙ্গুনী-উত্তিরম্' উৎসব সর্বাপেক্ষা প্রধান। ছিয়াত্তর হাজার টাকা ব্যয়ে বহুদিন পূর্বে নির্মিত রূপার রথ বছরে তিনবার বাহির করা হয় এবং দেবতার উৎসব-বিগ্রহ উহাতে বসাইয়া ঐ রথ মন্দিরের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করানো হয়।

কথিত আছে, শ্রীমুরুগা বহুকাল যাবৎ অসুরাধিপতি সুরপথের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তাহাকে পরাভূত করত স্ববশে আনয়ন করেন। ইহার রূপক অর্থ এই যে 'সুরপথ' হইতেছে আমাদের অহংভাব। শৈবসিদ্ধান্ত শাস্ত্রে বলা হয় যে অহংকারকে একেবারে বিনাশ করা যায় না, তবে উহাকে দাবাইয়া স্ববশে আনা যায়। উহাকে স্ববশে আনিবার জন্য তিনটি শক্তির প্রয়োজন—জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি। মুরুগা ঐ তিন শক্তির আশ্রয় লইয়া সুরপথ বা অহংভাবকে পরাভূত করিয়া বশে আনিয়াছিলেন। মুরুগার হস্তস্থিত ভেল বা দণ্ড জ্ঞানশক্তির প্রতীক এবং তাঁর দুই পত্নী দেবযানী ও বল্লী যথাক্রমে ক্রিয়া ও ইচ্ছাশক্তির প্রতীক।

অহংভাব একটি বহুশিরবিশিষ্ট দৈত্যবিশেষ। উহার একটি শির কাটিলে আর একটি প্রভাব বিস্তার করে। শ্রীমুরুগা বহুশিরবিশিষ্ট দৈত্যকে পরাভূত করিলে সে অবশেষে ময়ূররূপ ধরিয়া চিরকাল তাঁহার বাহনে পরিণত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করে।

ষডাননের ছয়টি মুখের নিম্নরূপ ছয়টি কার্য :

প্রথম মুখ দ্বারা এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে আলোকিত করে।

দ্বিতীয় মুখ প্রিয় ভক্তদের স্তুতিগানে সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দিতচিত্তে তাহাদিগকে বর প্রদান করিয়া থাকে।

তৃতীয় মুখ বৈদিক বিধানানুযায়ী ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক আরব্ধ যজ্ঞসমূহের যাহাতে কোনও বিঘ্ন না ঘটে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখে।

চতুর্থ মুখ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, চারিদিকে স্নিগ্ধ আলোক সম্পাতে মহর্ষিদের কষ্টসাধ্য শাস্ত্রনিহিত সত্য শিক্ষাপ্রদানপূর্বক তাঁহাদের সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত করে।

পঞ্চম মুখ যুদ্ধযজ্ঞে আততায়ী শত্রুকুল সমূলে বিনাশ করে।

ষষ্ঠ মুখ লতার ন্যায় ইচ্ছাশক্তির প্রতীকরূপিণী বল্লীকে ভার্যারূপে প্রাপ্ত হইয়া বিমল আনন্দে হাস্যযুক্ত।

বিভিন্ন পুরাণে মুরুগার অসংখ্য স্তোত্র রচিত হইয়াছে এবং প্রারম্ভে যে ছয়টি বিখ্যাত তীর্থস্থানের উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ সব স্থানে মুরুগার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্তব তামিল ভাষায় পাঠ হইয়া থাকে। ভাবের গাম্ভীর্যে, ভাষার সৌকর্যে ও ভক্তির আতিশয্যে স্তবগুলি অতুলনীয়। একটি মাত্র স্তবের কয়েক পঙ্‌ক্তি অনুবাদ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি :

বিজয়িনী ও জয়দায়িনী দুর্গার দুলাল তুমি,
সুশোভিতা-বনদেবতা-সমুদ্ভূত তুমি,
প্রার্থনাপরায়ণ দেবগণের সেনাপতি তুমি,
যুদ্ধে অজেয়, তারুণ্যে বিজয়ী তুমি,
ব্রাহ্মণদের সম্পদ্ ও জ্ঞানীদের বাগ্‌বিভূতি তুমি,
অশুভবিদারক মহাশক্তিশালী প্রভু তুমি,
সুললিত সঙ্গীতে চারণ-কীর্তিত বীর তুমি,
অপ্রাপ্য স্থাননিবাসী মুরুগা তুমি,
দুঃখদুর্দশাগ্রস্তকে কৃপাবর্ষণ কর তুমি,
পরম জ্ঞানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী তুমি।

শাক্ত পদাবলী

শ্রীমতী উষাদেবী সরস্বতী

শাক্ত পদাবলী বাংলার মানসচিত্রের সুন্দর ও নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। এই সাহিত্য খুব পুরাতন নয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বরাহপুরাণ, দেবী-ভাগবত, মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত 'চণ্ডী' শাক্ত-দিগের প্রাচীন গ্রন্থ। সুপ্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্র শাক্ত-দের অবলম্বন। যাঁরা কালী তারা প্রভৃতি শক্তি-মন্ত্রের উপাসনা করেন, তাঁদের শাক্ত বলা হয়। প্রাচীনকালে প্রকৃত শাক্তগণ জাতিভেদের ঊর্ধ্বে বিরাজ করতেন। তাঁরা সাধারণ মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে সম্মানিত হতেন।

চণ্ডালা ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রাঃ ক্ষত্রিযা বৈশ্যসম্ভবাঃ।
এতে শাক্তা জগদ্ধাত্রি ন মনুষ্যাঃ কদাচন॥
পশ্যন্তি মানুষান্ লোকে কেবলং চর্মচক্ষুষা।

তন্ত্র-উপাসনা কোন্ সময় হ'তে ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়, তা সঠিক জানা যায় না। তন্ত্রের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে যে শাক্ত মত ভারতে প্রচলিত হয়েছিল—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অথর্ববেদই তন্ত্রশাস্ত্রের মূল, এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। সম্ভবতঃ গায়ত্রী-উপাসনা হতেই শক্তিপূজার প্রথম ধারণার উৎপত্তি। নির্বাণ-তন্ত্রে গায়ত্রী-উপাসক ব্রাহ্মণগণকে শাক্ত বলা হয়েছে।

শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
উপাসন্তে যতো দেবীং গায়ত্রীং পরমাক্ষরীম্॥

মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বে 'হ্রীং শ্রীং গার্গীঞ্চ গান্ধারীং যোগিনাং যোগদা সদা' প্রভৃতি দেবী-স্তোত্রের আভাস পাওয়া যায়। উপনিষদেও উমা-হৈমবতীর উল্লেখ রয়েছে। মৃচ্ছকটিকের প্রথমেই শিব-শক্তির বর্ণনা আছে:

পাতু বো নীলকণ্ঠস্য কণ্ঠঃ শ্যামাম্বুদোপমঃ।
গৌরীভুজলতা যত্র বিদ্যুল্লেখেব রাজতে॥

স্কন্দগুপ্তের শিলালিপি হ'তে জানা যায় যে, তিনি শাক্ত ছিলেন। তন্ত্র বেদকে কোথাও কোথাও অস্বীকার করেছে, তাই অনেকের মত—ব্রাহ্মণগণ এই শাক্ত মত উদ্ভাবন করেন নি। বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুন যে সংশোধিত মহাযান-মত প্রচার করেন তাতে শক্তিধর্মের বীজ নিহিত আছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ, উভয়েরই শাক্ত সমাজের প্রধান আরাধ্যা—তারা বা আদ্যাশক্তি। 'চীনাচার' প্রভৃতি তন্ত্রে পাওয়া যায় যে বশিষ্ঠদেব চীন দেশে বুদ্ধের উপদেশে তারার দর্শন পেয়েছিলেন। ইহা হ'তে অনেকেই অনুমান করেন যে তারা বা আদ্যাশক্তির পূজা ভারতের বাহির—উত্তর দেশ থেকে এসেছে। অনেকে আবার অনুমান ক'রে থাকেন যে শকজাতির একটি শাখা ভারতবর্ষে 'শাক্ত' নামে পরিচিত হয়েছিল। তাদের আচার-ব্যবহারের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে তারা মদ্য মাংস প্রভৃতি পঞ্চ ম-কারের পক্ষপাতী ছিল। মহারাজ কণিষ্কের সময়ে সমস্ত এশিয়ায় মহাযান-মত প্রচারিত হয়। মহাযানেরাই সর্বত্র শক্তিপূজা প্রচার করেছিলেন। বেদমার্গ-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ প্রথমে এই মত গ্রহণ করেননি। পরে অবশ্য কেহ কেহ শাক্ততন্ত্রে দীক্ষিত হন।

বেদান্ত-মতে মায়া দ্বারা ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। এই মায়াকেই আদ্যা শক্তি বলা হয়। বৈজ্ঞানিকগণ যাকে বিশ্বশক্তি বলেন, দার্শনিকগণ তাকেই মনঃশক্তি বলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে সেই চিন্ময়ী জগন্ময়ী অজ্ঞেয় মহাশক্তির অতি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। আবার কোন কোন পণ্ডিত বলে থাকেন,

কালী চণ্ডী এঁরা সব অনার্যদের দেবতা। স্ত্রী দেবতার পূজা বিশেষ ক'রে আর্যদের বাইরে প্রচলিত ছিল। আর্যগণ পরে এঁদের স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন।

* * *

বাংলায় চণ্ডীর মাহাত্ম্য-বিষয়ক কাব্যগুলির মধ্যে মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গল', বলরাম চক্রবর্তীর 'কালিকামঙ্গল' উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন বাংলা গানগুলির মধ্যে শাক্তগান ভক্তি ও ভাবমাধুর্যের দিক থেকে বাঙালী জাতির অমূল্য সম্পদ। প্রায় শতাধিক বাঙালী কবি ও ভক্ত শাক্ত গান রচনা ক'রে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে গিয়েছেন। ভক্তের অন্তরের ব্যাকুলতা এই গানগুলিতে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। ভক্ত আপন অন্তরের মাধুরী মিশিয়ে ভগবানে মাতৃত্ব আরোপ ক'রে কতই না অভিমান ও আবদার করেছেন। এই অভিমান বা আবদারের মধ্যে কোন কষ্টকল্পনা নেই—এর ভঙ্গী সারল্যে ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ। কবি শ্যামা-মাকে গালাগালিও দিতে ছাড়েন না—কত অভিমান, অভিযোগ, সংশয়, বিশ্বাস, ক্রোধ, দুঃখ, হর্ষ, অথচ মায়ের কাছে কি অকুণ্ঠ আত্মনিবেদন। এই গানগুলির মধ্যে একটা সর্বজনীনতার সুর ফুটে উঠেছে। উপমা অলংকার এত সাধারণ যে নিরক্ষর পাঠকও তা অনায়াসে বুঝতে পারে। এই গানগুলিতে কোন দার্শনিক জটিলতা নেই—অথচ একটা করুণ বৈরাগ্যের আহ্বান এই গানগুলিকে চমৎকারিত্ব দান করেছে। এই মাতৃভাবের সাধনা ও সঙ্গীত বাঙালীর নিজস্ব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই ভাবের গীতি-কাব্য রচিত হ'তে আরম্ভ হয়। তবুও মনে হয় রামপ্রসাদই এই নতুন সাহিত্যের প্রথম প্রবর্তক। এখানে কয়েকজন পদ-রচয়িতার পদ উল্লেখ করছি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর দুই পুত্র শিবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র এইরূপ গান রচনা করেছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রচিত একটি পদ :

অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণা রজ্জুরূপিনী।
না সরে নিশ্বাস-পাশ, বন্ধনে রয়েছে প্রাণী॥
চমকিত কি কুহক, অজিত এ তিনলোক,
অহংবাদী জ্ঞানী দেখে তমো-রজোতে ব্যাপিনী।
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ,
শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনি।

দেওয়ান নন্দকুমারের রচিত পদ :

কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে।
অহংতত্ত্ব দূরে যাবে সংসার-বাসনা সনে॥
মূলাধারে বরাসনে, ষড়দল লয়ে জীবনে,
মণিপুরে হুতাশনে, মিলাইবে সমীরণে।
কহে শ্রীনন্দকুমার, ক্ষমা দে হেরি নিস্তারি,
পাব ব্রহ্মদ্বার, শক্তি আরাধনে॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায় অনেক সঙ্গীত রচনা ক'রে গিয়েছেন। তাঁর একটি :

তারা কত রূপ জান ধরিতে
জননী গো জ্বালামুখী গিরি-চূড়িতে॥
লোমকূপে ধরাধর, হৈমবতী পরাৎপর,
অসুর বিনাশ কর মা আঁখির নিমিষে।
তুমি রাধা তুমি কৃষ্ণ, মহামায়া মহাবিষ্ণু,
তুমি গো মা রামরূপিণী তুমি অসিতে॥

বর্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্রের গুরু কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্যও একজন বিখ্যাত শাক্ত পদকর্তা। এই বিষয়ে রামপ্রসাদের পরই তাঁর স্থান। তাঁর রচিত একটি পদ :

যখন যেমনরূপে রাখিবে আমারে।
সকলি সফল যদি না ভুলি তোমারে॥
জনম, করম, দুঃখ, সুখ করি মানি।
যদি নিরখি, অন্তরে শ্যামা জলদবরণী॥
* * *
কমলাকান্ত উভয় সম সাধন জননী,
নিবস যদি হৃদয় মন্দিরে গো মা॥

তবে এই কাব্যগুলিতে মন্ময়তার অভাববশতঃ ভক্তিরসের ধারা প্রবাহিত হয়নি। এই অনুভূতির রসধারা প্রবাহিত করেন রামপ্রসাদ সেন। শাক্তধর্মসংগীত রচনাকারিগণের মধ্যে তাঁর স্থান সর্বোচ্চে। কবি ও সাধক রামপ্রসাদ ভাবে

বিভোর হ'য়ে মাতার কাছে শিশু যেমন অভিমান ও আবদার করে মা কালীর কাছে তিনি তেমনই আবদার করেছেন। আরাধ্যা দেবী ও আরাধনাকারী ভক্তের মধ্যে ব্যবধান ছিল না। রামপ্রসাদের গানগুলি এক বিশেষ নতুন সুরে গীত হ'য়ে থাকে। এই সুরের নাম 'রামপ্রসাদী সুর'। মনকে আহ্বান ক'রে তিনি অসংখ্য পদ গেয়েছেন, তার মধ্যে একটির আরম্ভ :

মন তোর এত ভাবনা কেনে ?
একবার কালী ব'লে বস্‌রে ধ্যানে।

রামপ্রসাদের পর অসংখ্য পদকর্তার আবির্ভাব হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার সাধকও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রামলাল দাসদত্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাবের মৌলিকতায় ও বিশুদ্ধ পদ-সংযোজনায় তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল।

শাক্ত পদকর্তাদের মধ্যে মুসলমান সাধকও পাওয়া যায়। আলোয়াল ও মুজা হুসেন আলীর নাম প্রসিদ্ধ। আলীর রচিত একটি পদ :

বলে মুজা হুসেন আলী, যা করেন মা জয় কালী।
পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে, পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি।
যারে শমন এবার ফিরি।
এসো না মোর আঙিনাতে দোহাই লাগে ত্রিপুরারি ॥

সাধক 'প্রেমিকে'র গানগুলি শাক্ত পদাবলীর ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছে, এবং নজরুলের কালী-বিষয়ক সঙ্গীতগুলি বাঙালীর সুর-সাধনায় শক্তি সঞ্চার করেছে।

সাধক কবি রামপ্রসাদ

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

মায়ের নামে ভাসিয়েছিলে এ সংসারে তরীখানি।
মা তোমারি মুখ দিয়ে তাই শুনিয়েছে যে অমর বাণী।
বিষয় সে তো সামান্য ধন, অভয় চরণ চেয়েছিলে।
জমিদারের তবিলদার তো চাওনি হ'তে কোন কালে।
প্রসাদী সুর এমন মধুর, এই নিখিলে আর কোথায় ?
তোমার গানের গঙ্গাধারায় কতই মানুষ শান্তি পায়।
ধরাতলে ধন্য হ'ল তোমার সাধনপীঠের গ্রাম।
ছায়াশীতল পঞ্চমুণ্ডীর আসনটি যে পুণ্যধাম।

'খোদা' ব'লে ডাকে যারে মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী
'কালী' নামে তারেই ডেকে দেখালে কী ভোজের বাজি।
বিমাতা নয় আপন কভু, চাওনি যেতে তাইতো কাশী,
ধ্যানের কালে কালীপদেই দেখ দেখেছ রাশি রাশি।
মন মাতালে মেতেছে যার, মদ-মাতালে বুঝবে কি তায় ?
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ 'কালেরে কলা দেখায়'।
ছিয়াত্তরের হাহাকারে গাইলে, যখন মরণ নাচে—
'অন্ন দে মা অন্নদে। গরিবের বল কি দোষ আছে ?'
মানব-জমিন আবাদ ক'রে তুললে ফসল, ফলল সোনা।
মায়ের রাঙা চরণতলে চিরমুখর ঐ রসনা।

সমালোচনা

গদাধর (দ্বিতীয় খণ্ড)—লেখক : 'অজাত শত্রু', প্রকাশক : শ্রীকমলেশ চক্রবর্তী, কল্পতরু প্রকাশনী, ৮, কে কে. রায়চৌধুরী রোড, কলিকাতা ৮, পৃষ্ঠা : ৩২৬, মূল্য : টাকা ৫·৫০।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য জীবনের বাল্য-কৈশোর অংশের অলৌকিক ঘটনাধারার সংগ্রহ দেখি এই পুস্তকে। পুস্তকখানির প্রথম খণ্ড প্রকাশের অল্পকালের মধ্যেই দ্বিতীয় খণ্ড দেখিয়া আমরা আনন্দিত।

আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণের কৈশোর লীলার একখানি মনোরম চিত্রণ সন্দেহ নাই। বালক গদাধরের পিতৃবিয়োগের পর হইতে ভ্রাতা রামকুমারের সহিত কলিকাতা আগমনের প্রাক্‌কাল পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় দশ বৎসরকালের (১৮৪৩—১৮৫৩খৃঃ) কামারপুকুরের বৈচিত্র্যময় জীবনকাহিনী লেখক খুব প্রাণস্পর্শী ভাষায় ও সহজ ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন। কাহিনী-গ্রন্থ হিসাবে বর্তমান পুস্তকখানিও ইহার পূর্ববর্তী খণ্ডের অনুরূপ সুখপাঠ্য হইয়াছে। তথাপি একথাও অনস্বীকার্য যে লেখকের কল্পনাশ্রয়ী তুলির আঁচড়ে জীবনী-চিত্রের ইতিহাস-ধর্ম অনেকাংশেই ব্যাহত হইয়াছে। যাহা হউক, গ্রন্থখানি সাধারণ পাঠক-পাঠিকার মনে শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যের মূল গ্রন্থাদি পাঠের আগ্রহ জাগাইয়া তুলিতে সক্ষম হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কাগজ ও মুদ্রণ ভাল। প্রচ্ছদপটে রুচির পরিচয় আছে। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করিয়া আমরা ছদ্মনামা লেখককে অভিনন্দিত করিতেছি। —**অক্ষজানন্দ**

Sri Sri Sarada Devi—by P B. Junnarkar—Published by Presidency Library, 15, College Square Calcutta 12, Pp 394+6, Price: Rs. 5 50.

মহান্ জীবনচরিত পরিক্রমার মধ্যে একটা সত্যকারের আনন্দবোধ আছে—বিশেষতঃ তা যদি সুলিখিত ও সুগ্রথিত হয়। আলোচ্য পুস্তকটিতে এইরূপ রূপায়ণের সার্থকতা দেখা যায়।

সহজ সুন্দর ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-আলেখ্য লেখক ভালভাবেই ফুটিয়েছেন। 'জুন্নারকর' নিজে ভক্ত, তাই লেখার মধ্যে একটি ভক্তির ফল্গু-নদী প্রবহমাণ! তা ছাড়া, এই পুস্তকটির ছত্রিশটি পরিচ্ছেদের মধ্যে শেষ পরিচ্ছেদটিতে লেখক কর্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের বিশ্বমাতৃস্বরূপের ব্যাখ্যান নিছক স্বকপোলকল্পিত নয়, তা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের নানা ঘটনা ও উক্তির ভিত্তির উপরেই গড়ে তোলা হয়েছে। এক কথায় পুস্তকটি আমাদের ভাল লেগেছে, এবং অনেকেরই লাগবে।

পুস্তকটির ছাপায় অনেক ভাঙ্গা অক্ষর থাকায় পুস্তকটির সৌষ্ঠব কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে প্রকাশককে এদিকে একটু অবহিত হ'তে অনুরোধ করি। আমাদের চির পরিচিত 'বেলুড়'-এর ইংরেজী বানান লেখক Belur না ক'রে 'Belud' করেছেন, এতে অবশ্য তিনি 'ড়'কে রীতি-অনুযায়ী 'd' দিয়ে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু প্রচলিত বানান 'Belur' রাখলেই চ'লত। —**মহানন্দ**

ভারতীয় তর্কবিদ্যা প্রবেশিকা—লেখক : শ্রীদীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী, তর্কবেদান্ততীর্থ, প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার, নগেন্দ্র গ্রন্থামন্দির, বাঘা যতীন পল্লী, সি ব্লক। মূল্য দুই টাকা; পৃষ্ঠা ৬৭+৭।

আকারে ক্ষুদ্র হইলেও পুস্তিকাটিতে যেরূপ প্রাঞ্জলরূপে ও সংক্ষেপে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা ভারতীয় দর্শনের প্রবেশিকা হইবার একান্ত উপযোগী। কলেজে অধ্যয়নকারী দর্শনের ছাত্রগণও ইহার আলোচনায় উপকৃত হইবেন। গ্রন্থের শেষাংশে 'অন্নংভট্টবিরচিতঃ তর্কসংগ্রহঃ' প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকটির বাঁধাই-বিষয়ে আরও যত্ন লওয়া প্রয়োজন।

দীপশিখা : (আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চতর মাধ্যমিক বিবিধার্থসাধক বিদ্যালয়ের সাময়িক পত্রিকা)—সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে শ্রীআলোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭৮ (ডবল ক্রাউন)।

সুনির্বাচিত সুমুদ্রিত চল্লিশটি প্রবন্ধ কবিতা সম্ভাবে পত্রিকাটি সম্পাদক-মণ্ডলীর সুরুচির স্বাক্ষর বহন করছে। দুতিনটি ইংরেজী প্রবন্ধ, একটি সংস্কৃত এবং একটি হিন্দী কবিতা বিদ্যালয়-পত্রিকাটির রূপ সম্পূর্ণ করেছে। 'মহাকাশ অভিযান' প্রবন্ধটি যদিও ডায়াগ্রাম-সহ, তথাপি অসম্পূর্ণ। পত্রিকাটির উন্নতি কামনা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক

Adventures in Religious Life : by Swami Yatiswarananda, Published by Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras 4. Pp 443+xxi (including Introduction, Index, Glossary and Bibliography) Price Board Rs 4, Calico Rs 5.

স্বামী যতীশ্বরানন্দ প্রণীত 'ধর্মজীবনের অভিযান'—তাঁহার প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্ত্যে ধর্মপ্রচারের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল পুস্তকাকারে রূপায়িত। আধ্যাত্মিক জীবনযাপনে প্রয়াসী মানবের মনে যে সকল প্রশ্ন ওঠে, তাহা এখানে ব্যাবহারিক ভাবে এবং বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তুই পুস্তকটির প্রকৃত পরিচয় প্রদান করে। প্রতিটি অধ্যায়ের অনুচ্ছেদগুলিও বিষয়সূচীতে থাকায় পাঠকের পক্ষে নিজ নিজ প্রশ্ন-অনুযায়ী বিষয়-নির্বাচনের সুবিধা হইবে। অধ্যায়-পরিচয় :

1. Harmony and universalism in true religious life
2. The adventures of spiritual seekers.
3. The pursuit and attainment of happiness.
4. The type of salvation we want.
5. The control of the subconscious mind.
6. Indian Yoga and Western Psychology.
7. Destiny, Human effort & Divine grace.
8. The Hygiene of a peaceful mind.

9-10. Overcoming obstacles in religious life.

11. The significance of religious symbols.
12. The secret stairs to superconscious.
13. How to dehypnotise ourselves.
14. The mystery of religious experience.
15. The power of spiritual vibration.
16. The reality beyond time and space.
17. God and problem of evil.
18. God in everything.
19. How illumined souls live in the world.

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে ও নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রসমূহে প্রতিমায় এ বৎসর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে :

আসানসোল, কামারপুকুর, কাঁথি, জয়রামবাটী, জামসেদপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বরিশাল, বারাণসী (অদ্বৈতাশ্রম), বালিয়াটী, বোম্বাই, ময়মনসিংহ, মালদহ, মেদিনীপুর, রহড়া, শিলচর, শিলং, শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ।

বন্যায় সেবাকার্য

এবার প্রচণ্ড বর্ষার দরুণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বন্যার প্রকোপ দেখা দিয়াছে। অন্যত্র প্রকাশিত আবেদনে ভুজকচ্ছ, সুরাট ও আসামে মিশন-পরিচালিত সেবাকার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। যথাসময়ে বিস্তারিত বিবৃতি প্রকাশিত হইবে।

নিম্নে পশ্চিমবঙ্গে মিশন-পরিচালিত সেবাকার্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদত্ত হইতেছে।

জেলা	থানা	ইউনিয়ন	গ্রাম
২৪ পরগনা		বোড়াল	৩
		বেডগুম	৪+
		মসলন্দপুর	১
		নালুয়া	২
		পানাকো	২
মেদিনীপুর		কুকড়াহাটী	৩+
বর্ধমান			৩+
হাওড়া	উলুবেড়িয়া		১৪
	ডোমজুড়		৭

বন্যার্তগণকে চিঁড়া, চাল, ডাল, গম, আটা, গুঁড়া দুধ, কাপড়, ঔষধ ও ঘরনির্মাণের জন্য কিছু খরচ দেওয়া হইতেছে। এখনও বহু গ্রাম হইতে ডাক আসিতেছে। ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুর জেলার সেবাকার্য নরেন্দ্রপুর কেন্দ্রের মাধ্যমে, এবং হাওড়া ও বর্ধমান জেলার সেবাকার্য যথাক্রমে বেলুড় সারদাপীঠ ও আসানসোল মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইতেছে। ৫৪৮ পৃষ্ঠায় আবেদন দ্রষ্টব্য।

উদ্বোধন-অনুষ্ঠান

পাটনা : গত ৫ই অক্টোবর সন্ধ্যায় একটি বিরাট ও বিশিষ্ট সভায় পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের আবেষ্টনীর মধ্যে ছাত্রাবাসের নবনির্মিত বিরাট ভবন উদ্বোধন করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ। রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী প্রভৃতি অনেকে সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই ছাত্রবাসে ৩০টি ছাত্রের স্থান সঙ্কুলান হইবে, তন্মধ্যে ১৬টি স্থান দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য। ভবন-নির্মাণে ১,০২,০০০৲ খরচ হইয়াছে, তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৪৫,০০০৲ ও রাজ্যসরকার ৪০,০০০৲ দিয়াছেন, বাকী টাকা পাটনার বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীললি সেন দান করিয়াছেন।

পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সহিত পূর্ব সম্পর্ক স্মরণ করিয়া রাষ্ট্রপতি বলেন : অনেক বছর আগে যখন এই আশ্রম স্থাপিত হয়, তখন আমি প্রায় আসতাম। যদিও আজ পাটনা থেকে দূরে আছি—তবু এই আশ্রমটির কথা সর্বদা আমার মনে হয়। মিশনের কাজ আজ দেশের সর্বত্র এবং দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। সপ্তাহখানেক আগে মিশনের রাজকোট কেন্দ্রে অনুরূপ একটি ভবন উদ্বোধন ক'রে এসেছি। যেখানে মানুষের দুঃখকষ্ট সেখানেই এই সন্ন্যাসীদের সেবা, আমিও এঁদের পাশে দাঁড়িয়ে একদিন সেবা করার সুযোগ পেয়েছি।

আশ্রম-সম্পাদক স্বামী বীতাশোকানন্দজীর বিবরণী উল্লেখ ক'রে রাষ্ট্রপতি বলেন : আশ্রমের সেবাকার্য আজ বহুদিকে বিস্তৃত। আজ চারিদিকে দেখি—চরিত্রের অভাব, এই অভাব দূর করবার যেটুকু চেষ্টা হচ্ছে—তা এই স্বামীজীরাই করছেন। দেশে ইঞ্জিনিয়র, ডাক্তার,

শিক্ষক চাই—নিঃসন্দেহ, কিন্তু সবার উপরে চাই চরিত্রগঠন, উৎকৃষ্ট মানুষ। স্বাধীনতা লাভের পর যত অভাব-অভিযোগের কথা শোনা যাচ্ছে, তার মধ্যে প্রধান—চরিত্রের অভাব। স্বাধীনতা-লাভের আগে যে চরিত্র আমাদের ছিল, স্বাধীনতালাভের পর তা আর নেই। যদি দেশকে আলস্য ও নৈরাশ্য থেকে রক্ষা করতে হয়, তবে প্রথম প্রয়োজন চরিত্রগঠন—যাতে সমাজে ভাল ভাল মানুষের আবির্ভাব হয়। এ বিষয়ে পিতামাতারও দায়িত্ব আছে, তাঁরা মিশনের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে ছেলেদের জীবন গড়ে নিতে পারেন।

পরিশেষে রাষ্ট্রপতি বলেন: আমি চাই আমাদের দেশের সব স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মিশনের আবহাওয়া প্রবাহিত হোক, আরও চাই মিশন এমন এক উচ্চতর নৈতিক ভাব বিকীরণ করুক, যাতে চরিত্রবান্ যুবকেরা দেশসেবায় আগিয়ে আসে।

নরেন্দ্রপুর: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের স্কুল-কলেজ যুক্তগৃহের (বাণীভবন) দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় ডক্টর শ্রীমালী গত ২৯শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে আশ্রমে উপস্থিত হইলে ছাত্রেরা তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানায়, প্রথমে তিনি কলেজ ছাত্রদের হস্টেল (ব্রহ্মানন্দ-ভবন) পরিদর্শন করেন। সেখানে তাঁহাকে মাল্য ও তিলকের দ্বারা অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং একজন ছাত্রই তাঁহাকে ছাত্রাবাসের সব কিছু ঘুরাইয়া দেখায়, আশ্রমিকদের জন্য ১৮টি শয্যা-যুক্ত হাসপাতাল (আরোগ্য-ভবন), স্কুলের ছাত্রদের হস্টেলগুলি, নির্মীয়মাণ লাইব্রেরী-গৃহ, খেলার মাঠ, জিমনেসিয়াম প্রভৃতি ঘুরিয়া দেখিয়া সাড়ে পাঁচটায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী স্কুল-কলেজ যুক্তগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হন। এখানে প্রধান শিক্ষক তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতির মাঙ্গলিক ধ্বনির মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী 'বাণীভবন'-এর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন।

এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে আশ্রমে একটি শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীর সব চেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল ছাত্রদের হাতের তৈরী জিনিষগুলি, শিক্ষামন্ত্রী বিশেষ মনোযোগ সহকারে প্রদর্শনীটি দেখেন এবং ছাত্রদের এই উদ্যমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতঃপর ডক্টর শ্রীমালীর সভাপতিত্বে আশ্রমের বহুমুখী বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও অন্যূন দুই সহস্র অতিথি এই সভায় যোগদান করেন। মাননীয় অতিথিদের মধ্যে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক, জাপান ইংলণ্ড ও আমেরিকার দূতাবাসের কর্মচারিবৃন্দের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। ছাত্রেরা গান, আবৃত্তি ও অভিনয় করিয়া অতিথিদের আনন্দ দান করে। একটি অন্ধ ছাত্রের বেহালা-বাদন সকলকে মুগ্ধ করে। পুরস্কার-বিতরণের পর সভাপতি তাঁহার ভাষণ-প্রসঙ্গে আলোচনা করেন—শিক্ষার কি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং সেই উদ্দেশ্য কিভাবে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রূপায়িত হইতেছে।

কার্যবিবরণী

রেঙ্গুন: রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম ভারতের বাহিরে মিশনের একটি উল্লেখযোগ্য শাখাকেন্দ্র, ইহা জাতিধর্ম-নির্বিশেষে আর্ত মানবের সেবারত। এখানে সাধারণ ও দুরারোগ্য রোগসমূহের চিকিৎসা করা হয়। ১৯৫৮ খৃঃ বিস্তৃত কার্য-বিবরণীতে প্রকাশিত: হাসপাতালে মোট শয্যা-সংখ্যা ১৬২, আলোচ্য বর্ষে এই বিভাগে ৩,৬৮৩

রোগী চিকিৎসিত হয়, তন্মধ্যে পুরুষ—২,৩৫০, নারী—১,১০৫ এবং শিশু—২২৮।

বহির্বিভাগ চিকিৎসালয়ের ছয়টি শাখা। সার্জিক্যাল ও মেডিক্যাল ওআর্ড ছাড়া পৃথক ক্যান্সার, চক্ষু, দন্ত, E.N.T. এবং এক্স্-রে ওআর্ড আছে। বহির্বিভাগে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ২,২২,৮২৭ (নূতন ৬৮,৬৮৬), দৈনিক গড়ে ৭০০ রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

অন্তর্বিভাগে ও বহির্বিভাগে অস্ত্রচিকিৎসা করা হয় যথাক্রমে ৪,২২১ এবং ২,৪৭০ রোগীর।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামে সুসজ্জিত ফিজিওথেরাপি বিভাগে বিভিন্ন প্রণালীতে বৈদ্যুতিক চিকিৎসা করা হয় ৪,৮৯০ জনের, ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ১১,২৭৬টি নমুনা পরীক্ষা হয়।

দেশবাসী হিসাবে রোগীর সংখ্যা

বর্মী	১,২২,২৬৯
ভারতীয়	৯১,৮৭৬
পাকিস্থানী	১০,৭৮৪
অন্যান্য	১,৫৮১

আলোচ্য বর্ষে বদান্য জনসাধারণের অর্থে একটি আধুনিক অস্ত্র-চিকিৎসাগার নির্মিত ও সুসজ্জিত হইয়াছে। ৭ই অক্টোবর (১৯৫৮) বিশিষ্ট একটি সভায় বর্মার রাষ্ট্রপতি (President) উহার উদ্বোধন করেন। এই নবনির্মিত ভবনে দুইটি অস্ত্রোপচার-গৃহ (তন্মধ্যে একটি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত), ১টি রোগী-বহনের লিফ্ট্, ৪টি আরোগ্য কক্ষ এবং আলোবাতাসযুক্ত হলে ৪৪টি শয্যা আছে। এজন্য বর্মী মুদ্রায় ব্যয় হইয়াছে K. 4,50,000.

আলোচ্য বর্ষে সাধারণ তহবিলে ব্যয়—K 3,51,810, ঘাটতি K 56,826, পরবর্তী বর্ষে প্রধানতঃ নূতন কয়েকটি বিশেষজ্ঞ নিয়োগের জন্য ঘাটতি দাঁড়াইবে প্রায় K 1,29,575, হাসপাতালের উন্নতির জন্য ইহা অপরিহার্য।

শ্যামলাতাল : শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম আলমোড়া জেলায় হিমালয়ের পাদদেশে প্রকৃতির শান্তিময় লীলানিকেতনে অবস্থিত। ১৯১৪ খৃঃ পূজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ এই আশ্রম স্থাপন করেন। আশ্রমটি উত্তরপূর্ব রেলপথের টনকপুর ষ্টেশন হইতে ১৬ মাইল দূরে ৪,৯৪৪ ফুট উচ্চে অবস্থিত।

আশ্রমের ১৯৫৮ খৃঃ (৪৪তম বার্ষিক) কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য গ্রামগুলির অসহায় অধিবাসিগণকে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া আশ্রমের অন্যতম কার্য। বহু দূর হইতে দিনের পর দিন দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া দরিদ্র পার্বতীয়েরা এখানে দাতব্য চিকিৎসালয়ে ঔষধ লইতে আসে, কারণ ঐ অঞ্চলে ইহাই একমাত্র সেবা-প্রতিষ্ঠান যেখানে পীড়িতেরা বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পায়। প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এ যাবৎ এই সেবাশ্রমে মোট ১,৭৫,৮০১ রোগী চিকিৎসা লাভ করিয়াছে। ১২টি শয্যা-সমন্বিত অন্তর্বিভাগটিতে রোগীরা বিশেষ চিকিৎসা লাভ করিয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে ও অন্তর্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৮,৩৮৮ (নূতন ৬,৫৬৪) ও ১৮৮।

সেবাশ্রমের অপর একটি প্রয়োজনীয় বিভাগ হইল পশুচিকিৎসালয়, ইহা স্থাপিত হয় ১৯৩৯ খৃঃ। এখানে এযাবৎ গরু, মহিষ, ঘোড়া, কুকুর, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি ৪৮,১১৩টি গৃহ-পালিত পশুর চিকিৎসা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ১,৯৬৭টি পশুর চিকিৎসা করা হয়।

বার্লোগঞ্জ : মুসৌরীর নিকট ৫৫০০ ফুট উচ্চে হিমালয়ের ক্রোড়ে বার্লোগঞ্জ সারদাকুটির আশ্রমটি অবস্থিত। সংঘের কর্মক্লান্ত সাধুগণ ও ভজনপিপাসু ভক্তগণ যাহাতে এখানে আসিয়া কিছুদিন থাকিয়া সাধন ভজন করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই আশ্রমটি স্থাপিত।

১৯৫৮ খৃঃ বিভিন্ন সময়ে ৩২ জন সাধু আসিয়া এখানে বাস করিয়া গিয়াছেন। আশ্রমে ১২ জন সাধুর বসবাসের স্থান আছে, কিন্তু অর্থাভাবে এখনও সকলের বাসের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। আশ্রমে একটি ক্ষুদ্র পাঠাগার আছে ও প্রতিদিন সাধু ও ভক্তগণের জন্য ধর্মগ্রন্থ পাঠাদি করা হইয়া থাকে।

আলোচ্যবর্ষে আশ্রমের আয় টাকা ৪৬২৯'৭৫ ও ব্যয় টাকা ৩৫১৬'২৮। আশ্রমের সুষ্ঠু পরিচলানার জন্য আরও আয়বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন।

বক্তৃতা-সফর

গত জানুআরি মাস হইতে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ আসাম ও বাংলায় হোজাই, লামডিং, ধুবড়ী, কলিকাতা, হাওড়া, বর্ধমান, কামারপুকুর, সারগাছি, জিয়াগঞ্জ, কুচবিহার, মেখলীগঞ্জ এবং যুক্ত প্রদেশে কাশী, এলাহাবাদ, লখনৌ, আলমোড়া, বাণীক্ষেত, দ্বারাহাট, শ্যামলাতাল, মায়াবতী, লোহাঘাট, সাহাজাহানপুর, বেরেলী এবং কাশ্মীরে—শ্রীনগর ইত্যাদি স্থানে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে 'শিক্ষার আদর্শ,' 'হিন্দুধর্ম' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে ছায়াচিত্র সহযোগে মোট ৮১টি বক্তৃতা দিয়াছেন, তন্মধ্যে ৪৫টি বাংলায় ও ৩৬টি হিন্দীতে প্রদত্ত।

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার

স্যাণ্টা বারবারাঃ গত আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ার অন্তর্গত স্যাণ্টা বারবারায় অবস্থিত শ্রীসারদামঠে পাঁচজন আমেরিকান ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। বেলুড় মঠের অনুমতি-অনুসারে তাঁহাদের গুরু দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়া বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দই বেলুড় মঠে অনুসৃত পদ্ধতি-অনুযায়ী তাঁহাদের সন্ন্যাস দীক্ষা দেন। এতদুপলক্ষে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত অন্যান্য কেন্দ্রের ছয়জন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন; যথা: স্বামী পবিত্রানন্দ (নিউ ইয়র্ক), স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ (সেণ্ট লুই), স্বামী বিবিদিষানন্দ (সিএট্‌ল্), স্বামী অশেষানন্দ (পোর্টল্যাণ্ড), স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (স্যানফ্রান্সিস্কো), স্বামী ঋতজানন্দ (প্রাক্তন, নিউইয়র্ক)।

ষাট বৎসরেরও আগে স্বামী বিবেকানন্দ নিউ ইয়র্কে একজন নারী ও একজন পুরুষকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করেন। তাহার পর পাশ্চাত্ত্যে এরূপ অনুষ্ঠান এই প্রথম। স্বামী প্রভবানন্দ-সহ নবদীক্ষিতা সন্ন্যাসিনীগণ ভারত-তীর্থ দর্শনে আসিয়াছেন। গত দুর্গাপূজার সময় তাঁহারা বেলুড় মঠের নবনির্মিত আন্তর্জাতিক অতিথি-ভবনে ছিলেন, এবং সাগ্রহে পূজা দর্শন করেন।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে যুগলকিশোরী দেবী

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬-২০ মিঃ সময় শ্রীমতী যুগলকিশোরী দেবী ৬২ বৎসর বয়সে জয়রামবাটীতে সন্ন্যাসরোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

অল্প বয়সেই তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কৃপা লাভ করেন এবং তাঁহার অন্যতমা সেবিকারূপে কোয়ালপাড়া ও জয়রামবাটীতে এবং কখন কখন বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে ও নিবেদিতা বিদ্যালয়ে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মহিলা-আশ্রম প্রতিষ্ঠাকালে তিনচার বৎসর তিনি বাঙ্গালোরে ছিলেন। জীবনের শেষ ৩০ বৎসর তিনি জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির-সংলগ্ন মায়ের বাড়ীতে থাকিয়া সাধন ভজন ও সমাগত মহিলাভক্তদের সাধ্যমত সেবাযত্ন করিতেন। তাঁহার সলজ্জ ও সরল ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হইত। স্বামী সারদানন্দ মহারাজের তিনি বিশেষ স্নেহপাত্রী ছিলেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা শান্তি লাভ করুক।

পরলোকে মতীশ্বর সেন

গভীর দুঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছি যে গত ১৯শে অক্টোবর বেলা ১টার সময় ৬৯ বৎসর বয়সে হৃদ্রোগের আক্রমণে শ্রী মতীশ্বর সেন (শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীতে 'টাবুবাবু' নামে পরিচিত) দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি পৈতৃকভূমি বিষ্ণুপুরে জন্মগ্রহণ করেন, এবং বাল্যকালেই বাগবাজার বসুপাড়ায় স্বামী সদানন্দ (গুপ্ত মহারাজের) সঙ্গলাভ করেন। তাঁহারই মাধ্যমে মতীশ্বর শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে উপনীত হন এবং তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হন। মতীশ্বর বা টাবুবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পার্ষদদের প্রায় সকলেরই সান্নিধ্যলাভ করেন এবং তাঁহাদের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। অগ্রজ (বর্তমানে আলমোড়া-নিবাসী বৈজ্ঞানিক) শ্রীবশীশ্বর সেনের সাহচর্যে তিনি স্বামী সদানন্দ মহারাজের অনেক সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

রোগ-নিরাময়ে সঙ্গীত

অসুস্থ দেহ ও মনের উপর সঙ্গীতের যে একটা বিশেষ প্রভাব আছে, এটা সুদূর অতীত থেকেই মানুষের জানা। এই সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকভাবে গবেষণা শুরু হয় মাত্র গত ৩০ বছর আগে।

গত দশ বছর ধরে আমেরিকার বেশ কয়েকটি হাসপাতালে সহায়ক চিকিৎসারূপে সঙ্গীতের প্রচলন শুরু হয় এবং রোগীর দেহ ও মনের উপর সঙ্গীতের প্রভাব সম্পর্কে গভীর-ভাবে নজর দেওয়া হয়।

আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিষদ গান-বাজনা শুনিয়ে কেবল মানসিক রোগই নয়, অন্যান্য রোগও নিরাময়ের জন্য বহু বছর ধরে চেষ্টা ক'রে এসেছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও অনুরূপ প্রচেষ্টা করেছে।

মূক, বধির ও অন্ধ শিশু এবং মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত, শিশু-পক্ষাঘাত, হৃদ্‌রোগাক্রান্ত এবং বিকলাঙ্গ শিশুদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে গান-বাজনা শুনিয়ে সুফল পাওয়া গিয়েছে। যে সব শিশু তোতলা বা যারা দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে পূর্ণতা লাভ করেনি, তাদের চিকিৎসায়ও গান-বাজনা শুনিয়ে ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে। যক্ষ্মারোগী এবং বিকলাঙ্গদের চিকিৎসায়ও গান-বাজনা শুনিয়ে খানিকটা সুফল পাওয়া গিয়েছে। আধুনিক ধরনের অনেক হাসপাতালে দেহের কোনও অঙ্গ বা মেরুদণ্ড অবশ ক'রে দেবার সময় রোগীকে গান-বাজনা শোনানো হ'য়ে থাকে। কোন কোন বড় হাসপাতালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার কালে প্রসূতিদের গান-বাজনা শোনানো হয়।

সঙ্গীত ও ঔষধ সম্পর্কে গবেষণার এখনও বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে এবং এই সম্পর্কে সামান্য মাত্রই গবেষণা করা হয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, আড্রেনালিন এবং পিত্তরসের নিঃসরণের উপরে গান-বাজনার প্রভাব কতটা—তা পরিমাণ করা সম্ভব। কোন কোন গান-বাজনা শোনবার পর অস্ত্রোপচারের তীব্র যন্ত্রণাও রোগী ভুলে যায়। মানুষের মনের উপর গান-বাজনার অসীম প্রভাব রয়েছে। প্রার্থনা-সঙ্গীতে মন ভক্তিতে আপ্লুত হ'য়ে পড়ে, তেমনি কোনও আনন্দ-উৎসবে গান-বাজনা মনকে মাতিয়ে তোলে।

যে সব শিশুর দৈহিক বা মানসিক কোন রকম ত্রুটি আছে এবং কোন চিকিৎসাতেই যেখানে সুফল পাওয়া যায়নি, গান-বাজনা শুনিয়ে সে সব ক্ষেত্রেও সুফল পাওয়া গিয়েছে। দৈহিক বা মানসিক ত্রুটিসম্পন্ন যে সব শিশু কোন শব্দের অর্থ বুঝে উঠতে পারে না, তারাও সঙ্গীতের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পারে। শব্দের ক্ষেত্রে তার অর্থটাই প্রধান, কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তা নয়। কাজেই দৈহিক ও মানসিক ত্রুটিসম্পন্ন রোগীর চিকিৎসায় তার সহজাত ধারণাটা জাগিয়ে তোলাই প্রধান কাজ এবং গান-বাজনার সাহায্যে সেটা সম্ভব হয়।

'আমেরিকান রিপোর্টার' থেকে সংকলিত]

উদ্বোধন

প্রকৃত দর্শন

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥

(শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা—১৩৷২৭, ২৮)

জগৎ সংসার বিনাশশীল, পরিবর্তনশীল—ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূত সত্য, কিন্তু তাহারই মধ্যে সর্বভূতে সমভাবে রহিয়াছেন অবিনাশী পরমাত্মা, সর্বভূতের আধাররূপে, উদয়-বিলয়ের অধিষ্ঠানরূপে। ধ্বংস হইয়া গেলে সব কিছু কোথায় যায়?—যেখান হইতে আসিয়াছিল, যেখানে রহিয়াছে, সেইখানেই লয় পায়—ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ হয়। এই পরিবর্তনের মাঝে যিনি সেই অপরিবর্তনীয়কে অপরোক্ষভাবে দেখেন, অন্তরের অন্তরে অনুভব করেন, তাঁহারই দর্শন প্রকৃত দর্শন।

সর্বস্থানে সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে যিনি অন্তর্যামিরূপে আত্মস্বরূপে অনুভব করেন, তাঁহার আত্মভাব সর্বভূতে ব্যাপ্ত হয়, সকলের প্রতিই তিনি আত্মীয়তা অনুভব করেন, সকলকেই ভালবাসেন, কাহাকেও ঘৃণা বা হিংসা করিতে পারেন না। এই সম্যক্ সমদর্শনের ফলেই সাধক শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন, ক্ষুদ্র সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া বিরাট বিশ্বের সহিত যুক্ত হন। তরঙ্গ যেন তখন বুঝিতে পারে, সমুদ্রই আমার স্বরূপ?

কথাপ্রসঙ্গে

মহাজাতির শক্তি

শান্তির জন্যই শক্তির প্রয়োজন, ইহাই বিংশ শতাব্দীর জটিল সভ্যতার প্রধান শিক্ষা। শান্তির প্রস্তাবের পশ্চাতে যদি শক্তির সমারোহ থাকে, তবেই সে প্রস্তাব বিবেচনার যোগ্য হয়, নতুবা উহা যে পত্রে লিখিত হইয়াছে তাহারই মূল্য অবনমিত করে।

এ যুগের সংকট-স্রোতে জাতীয় জীবন-তরণীর যাঁহারা নাবিক—তাঁহাদের সর্বদা সাবধানে চলিতে হয়। একদিকে আন্তর্জাতিক ঘূর্ণাবর্ত, অপরদিকে আভ্যন্তরীণ বিরোধের গুপ্ত শৈল, এই সংকটের মধ্য দিয়া শান্ত সংযত বীর ইউলিসিসের মতো অদম্য আশা লইয়া তরণী বাহিতে হইবে। তবেই সংকট উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব, নতুবা নৌকা—হয় ঘূর্ণাবর্তে ডুবিয়া যাইবে, নয় গুপ্তশৈলের আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাসিয়া যাইবে।

আন্তর্জাতিক সমস্যার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত জাতীয় সম্মান, সীমান্তরক্ষা ও বহির্বাণিজ্য। সুদীর্ঘকাল পরাধীনতার পর এগুলি আজ ভারতের কাছে অভিনব সমস্যা। তদপেক্ষা কঠিনতর সমস্যা—এতদিনের অধঃপতিত এই জাতিকে সমগ্রভাবে যথার্থ উন্নতির পথে আগাইয়া লইয়া যাওয়া।

আজ যখন কল্যাণমূলক উদ্যোগসমূহের জন্য ঐক্যবদ্ধ কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন, তখন দেখা যায় জনগণ নেতাদের আবেদনের ভাষা বুঝিতে পারে না। জাতীয় উন্নতির জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে বলার পূর্বে অবশ্যই তাহাদের অন্ন বস্ত্র আশ্রয়ের অভাব দূর করিতে হইবে। শুধু আর্থিক মান উন্নয়নই যথেষ্ট নয়, সমানাধিকারের প্রতিশ্রুতিই সব নয়, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও অভিরুচি যদি অবজ্ঞাত হয়, অসংখ্য মানুষের সুখ-সুবিধা যদি অবহেলিত হয়, তবে জাতীয় জীবন ভাঙিয়া পড়িবে।

মহাজাতির শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য অবয়ব জাতিগুলির প্রত্যেকটির পরিপুষ্টি প্রয়োজন। জাতীয় শক্তি-সংহতির জন্য শৃঙ্খলা একান্ত প্রয়োজন হইলেও শৃঙ্খলার নামে যান্ত্রিক জীবন মানুষের স্বচ্ছন্দ সচেতনতাই নষ্ট করিয়া দেয়, ইহা কখনও কোন মানুষের কাম্য হইতে পারে না। স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার যেমন বর্জনীয়, শৃঙ্খলার নামে যান্ত্রিকতাও তেমনই পরিত্যাজ্য। এত কথা আসিয়া পড়িতেছে কারণ আজ মানুষের সম্মুখে দুইটি বিকল্প: গণতন্ত্র অথবা একনায়কত্ব! পৃথিবীর সকল নরম ও গরম লড়াই বিশ্লেষণ করিলে এই দুই বিপরীত ভাবাদর্শেই পর্যবসিত হয়। সমাধানের উপায়স্বরূপ অদূর ভবিষ্যতে তৃতীয় বিকল্প কিছু উপস্থিত হইবে কি না—মহাকালের মৌন মুখেই তাহার উত্তর অনুসন্ধান করিতে হইবে।

* *

ইতিহাসের বিচারে আমরা—ভারতবাসীরা যে কোন্ যুগে বাস করিতেছি, তাহা বলা বড় শক্ত! অর্থনীতির দিক দিয়া অবশ্যই আমরা বিংশ শতাব্দীতে বাস করিতেছি, শিল্পোন্নতির হিসাবে এখনও আমরা উনবিংশ শতাব্দীতে। মনোভাবের বৈচিত্র্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন শতাব্দীতে বাস করিতেছে। কোথাও এখনও রামচন্দ্রের রাজত্ব চলিতেছে, কোথাও বা বিভীষণের। কেহ বা অশোক-শিবাজীর, কেহ বা আকবর-আরংজীবের স্বপ্ন দেখিতেছেন।

এই সমস্ত সংঘাত-সংঘর্ষের শেষে কবে ও কিভাবে আমরা যে জাতি হিসাবে ঠিক ঠিক বর্তমানের স্রোতে আসিয়া পড়িব—তাহাই আজ আমাদের প্রথম প্রশ্ন। কবে আমরা এক

মন লইয়া ভাবিতে শিখিব—এক প্রাণ হইয়া কাজ করিতে শিখিব, ইহাই আজিকার চরম প্রশ্ন। এই একপ্রাণতার অভাবেই আমরা স্বাধীন হইয়াও পরমুখাপেক্ষী, এক দেশের অধিবাসী হইয়াও মনে প্রাণে বিচ্ছিন্ন। ধর্ম আমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছে, ভাষা আমাদিগকে বিভক্ত করিতেছে, ভূগোল আমাদের পৃথক্ করিয়াছে, ইতিহাসও আমাদের এক হইতে দিতেছে না। উপায় কি? তবে কি বিদেশী পণ্ডিতেরা যাহা বলেন তাহাই সত্য?—আমাদের কোনদিন একতা ছিল না? ভারতে শাসনতান্ত্রিক একীকরণ ব্রিটিশের প্রয়োজনে তাহাদেরই কীর্তি।

এ কথার খুঁটিনাটি বিচারে আমরা যাইব না, ভারতের ঐক্যের স্বপক্ষেও সচরাচর যাহা বলা হয় তাহা না বলিয়াও শুধু এইটুকু বলিতে পারি, বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব দর্শন ভারতীয় কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, বহুর মধ্যে—বিপরীতের মধ্যে মিলন-সাধনই ভারতীয় সাধনার লক্ষ্য।

এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই, জাতীয় চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াই আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে সকল সমস্যার সমাধানে।

ধর্ম বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় সে হিসাবে একটি মাত্র ধর্মসাধনা ভারতে কোন দিন ছিল না, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মহাভারতের প্রসিদ্ধ উক্তি: 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।' মত ও পথ, চিন্তাধারা ও বিশ্বাস ভিন্ন হইলেও কতকগুলি প্রাথমিক আচার-আচরণ এবং শেষ লক্ষ্য সকলেরই এক ছিল।

ভাষার দিক দিয়াও সহস্র আঞ্চলিক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষার বিস্তীর্ণ অঙ্গন প্রসারিত ছিল, যেখানে সকল ভাষা স্বচ্ছন্দে পরিপুষ্ট হইয়াছে।

স্বভাবেরই নিয়মে জাতীয় জীবনে যে রজনী আসিয়াছিল, তাহারই প্রভাবে সুপ্তির ঘোরে আমরা আমাদের ঐতিহ্যের অনেক কিছুই বিস্মৃত হইয়াছি। যেটুকু বা অবশিষ্ট আছে, আজ তাহাও আমরা আমাদের বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিতেছি, কারণ তাহা সত্য হইলেও আধুনিক নহে। কি করিয়া তাহা স্বীকার করি! উত্তরে বলিতে হয়—মাতা যখন বৃদ্ধা হন, তখন কি কেহ তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া কোন আধুনিকাকে তাঁহার স্থানে বসাইবার জন্য ব্যগ্র হন? অবশ্য মাতাকে আধুনিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া সন্তানের কর্তব্য, সাম্প্রতিক বসন-ভূষণে সুসজ্জিত করাও সন্তানের সাধ। সে হিসাবে অবশ্যই আমরা আমাদের প্রাচীন কৃষ্টির এই দেশকে নবীন যুগের ভাবে সম্পদে ভূষিত করিব, কিন্তু কখনই তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া নহে।

এই অস্বীকার করিবার প্রবৃত্তিই আজ আমাদের জাতীয় শরীর ব্যবচ্ছিন্ন করিতেছে। এ প্রবৃত্তি প্রধানতঃ তাহাদেরই, যাহারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং আধুনিকতার মোহে অন্ধ। তাহারা বোঝে না, তাহাদের এ শিক্ষা বিদেশী ছাঁচে ঢালা, জাতির মৌলিক প্রয়োজনে—ঐক্য সংস্থাপনে ইহা কার্যকরী হইতেছে না। দেখা যায়, উচ্চশিক্ষিত ভারতীয় যুবক একজন অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত ভারতীয়ের সহিত যথোচিত ব্যবহার করিতে পারে না। উভয়ের মধ্যে যেন সমুদ্রের ব্যবধান, একে অপরের নিকট অপরিচিত; ভাবে ভাষায় ভূষায় শিক্ষিত ভারতবাসী অর্ধবিদেশী! এ ক্ষেত্রে কি করিয়া তাহারা অশিক্ষিত দরিদ্র ভারতবাসীকে নিজেদের স্বজাতীয় মনে করিবে? যথার্থ জাতীয় শিক্ষা সহায়ে এই পার্থক্য বোধ দূরীভূত করিতে না পারিলে এই বিরাট জাতির সর্বাঙ্গে শক্তি সঞ্চালিত হইবে না।

জাতীয় জীবনকে সঠিক ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে দুচার জন উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার উকিল ইঞ্জিনিয়র, অথবা পাঁচদশ জন সুসমৃদ্ধ ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিকে সম্মুখে রাখিয়া গর্ব ও গৌরব বোধ করিলে চলিবে না; প্রত্যেকটি মানুষের জীবন সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে।

জাতির প্রতিটি অঙ্গ একটি মহান্ উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হইলে তবেই বলা যায়—জাতীয় জীবন সার্থকতার পথে চলিয়াছে। যখনই দেখা যায়—কোন জাতি তাহার নিজস্ব আদর্শটিকে ধরিতে পারিয়াছে, তখনই সেই জাতি সর্বতোমুখী প্রতিভা লইয়া বিকশিত হইয়াছে। ভারতের ইতিহাসেও দেখা যায়—মানসিক শক্তির স্ফুরণের সহিত জাতীয় গৌরবের যুগ মিলিত হইয়াছে। জ্ঞানের সহিত প্রেমের বাণী দেশ দেশান্তরে বিকীরণ করিয়াই একদিন ভারত গৌরবের আসন অধিকার করিয়াছিল।

আজ তাহা কোথায় দূর দিগ্বলয়ে বিলীন হইয়া গিয়াছে! এখনও সেই প্রাচীন ভারতের মহিমার সামান্য স্ফুরণ দেখা যায়—অশিক্ষিত অর্ধাহারী শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে। দারিদ্র্য, মলিনতা তাহাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে, তবু তাহাদেরই মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় ভারতীয় কৃষ্টির সহজ বৈশিষ্ট্য, শত দুর্গতির মধ্যেও তাহাদেরই কুটিরে জ্বলিতে দেখা যায় মানবতার দীপশিখা, তাহাদের অন্তরে অনুভব করা যায় মনুষ্যত্বের তাপটুকু।

তাহাদের বাদ দিয়া ভারতের অগ্রগতি অসম্ভব! বিদেশের অতটা মুখাপেক্ষী না হইয়া, পাশ্চাত্যের অতটা অন্ধ অনুকরণ না করিয়া, হঠাৎ আধুনিক হইবার এই প্রাণপণ প্রচেষ্টা না করিয়া যদি আমরা স্বাধীনতা-লব্ধ সুযোগ সকলকে দিতে পারি, তবেই সৃজনশীল চিন্তা ও কর্মধারা প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জাতীয় জীবন উর্বর করিবে। যদি অগণিত জনগণকে সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের পথে—শৃঙ্খলাবদ্ধ সেনার মতো উন্নতির পথে অগ্রসর হই, তবেই মনে হয় একদিন দেখিব—সমগ্র জাতি এক সঙ্গে বহু উচ্চ স্তরে উঠিয়া আসিয়াছে, যেখান হইতে আর সহসা পদস্খলন হইবে না, শুধু আর্থিক মানের দিক দিয়া নয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়া, আশা ও আকাঙ্ক্ষার দিক দিয়া, আত্মশক্তি ও বিশ্বাসের দিক দিয়া সমগ্র জাতি উন্নত হইয়াছে—এবং এক মহান্ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া এক মন এক প্রাণ লইয়া চলিয়াছে এক মহান্ জাতি।

মনোভাবের ভিতর এই ঐক্যবোধ না আনিতে পারিলে বিভেদ, বিভাগ, বিরোধ ও ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী, আজ দলগত বিরোধিতা, কাল ভাষা-ভিত্তিক দেশ-বিভাগ, তারপর দিন জাতি-উপজাতির বিভেদ, সর্বশেষ আর্থনীতিক ব্যর্থতা ও মানসিক নৈরাশ্য সব কিছু ছাইয়া ফেলিবে।

মহাজাতি গঠনের স্বপ্ন সফল করিতে হইলে সর্বপ্রচেষ্টায় দূর করিতে হইবে উচ্চ-নীচের, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিকট ব্যবধান। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে—যাহাতে সকলে অনুভব করে, আমরা একটি দেশের অধিবাসী—একটি কৃষ্টির উত্তরাধিকারী, একসূত্রে গাঁথা আমাদের মন প্রাণ, আমাদের উত্থান-পতন, উন্নতি-অবনতি একই সঙ্গে হইয়াছে ও হইবে। এই একত্বের অনুভূতিই আমাদিগকে মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবে। এই একত্ব বোধই মহাজাতির সকল অঙ্গে শক্তি সঞ্চারিত করিবে।

চলার পথে

'যাত্রী'

অগ্রহায়ণ শুক্লা-একাদশী। গোধূলি মায়ায় স্বপ্ন-বলাকা উড়াবার দিন এটা নয়। এই দিনের কথা মনে হ'লেই আজও হৃদয়-সাগরে ঢেউ ওঠে, প্রাণের অন্ধকার-ঘরে দীপ জ্বালাবার শিখা পাওয়া যায়—ঠাণ্ডা বারুদ-মনেও কর্মপ্রেরণার আগুন লাগে।

মানব-সভ্যতার এক অভিনব বার্তা এই দিনটিতেই সূর্য হ'য়ে ফুটেছিল,—তার আলো, তার দীপ্তি, তার প্রখরতা মানব-মনের অনেক ছায়াকেই দিয়েছে সরিয়ে। এ দিনটার কথাই আজ বড় বেশী মনে পড়ছে:

উত্তর ভারতের এক বিশাল প্রান্তর ধূসর-দিগ্বলয়ের সঙ্গে আলিঙ্গনে জড়িয়ে একাকার। মাথার উপরে নীলাকাশেও দু-এক টুকরো মেঘ কি যেন সব বারতা বয়ে নিয়ে এদিকে-ওদিকে ভেসে যাচ্ছে। শীতের হিমেল স্পর্শে চারিদিকে ঘাসের সবুজতাও ধীরে ধীরে যাচ্ছে মুছে। প্রায়-বৃক্ষহীন এই প্রান্তরে তবু জেগেছে অগণিত মানবের পদধ্বনি,—কত অশ্ব, কত গজ, কত রথ-রথী, কত মহারথী আজ এই বিশাল কুরুক্ষেত্রে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে!

আশা-নিরাশার এক অভিনব তরঙ্গ-ভঙ্গ এই প্রান্তরের মৃত্যুনীল সমুদ্রের ফেনিল বেলাকে করেছে উদ্বেলিত। মনের তটরেখায় জয়-পরাজয়ের ঢেউগুলোও আজ অনবরত আছাড় খাচ্ছে। এ যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ফলাফল রয়েছে নিঃশব্দ-প্রতীক্ষায় কুতূহলী হ'য়ে। কি হবে, আর কি হবে না —এমনি একটা উৎসুক ভাব সবার মনেই দোলায়মান। এমন সময়—ঐ মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে, দুই দলের উদ্‌গ্রীব নয়নের সম্মুখে বেগবান্-অশ্বচালিত একখানি কপিধ্বজ-রথ এসে থামল। সকলের দৃষ্টি হ'ল সেই দিকেই আকৃষ্ট:

ঐ, ঐ এলেন অর্জুন! আর ঐ, তাঁর রথের উদ্ধত ঘোড়াকে বল্গাকর্ষণে সংযত ক'রে ঐ, ঐ যিনি রূপচ্ছটায় চারিদিক মাধুরীতে ভরে তুলেছেন, উনিই তো শ্রীকৃষ্ণ! উনিই তো সকলকে চালান, সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করেন, আর তিনিই আজ অর্জুনের রথ চালাচ্ছেন! জগতে এ এক অবিশ্বাস্য সত্য! ভক্তের টানে ভগবানের এ এক অদ্ভুত কৃপা-মনোহর রূপ!

তেজস্বান্ অর্জুনের ঋজু বীর্যবান শরীর কি এক মহাশক্তিতে যেন ফেটে পড়ছে। তাঁর দিকে তাকালেই বোঝা যায়—এ যুদ্ধে জয়ী হবে কে? পরাজয়ের সকল গ্লানি তাই অপর পক্ষের মনে স্বপ্নবৎ ক্ষণিক কুহক তুলে আবার মিলিয়ে যায়। মোহময় আশা-আলেয়ার পেছনে ছুটে অপরপক্ষের মনে আবার যুদ্ধজয়ের মরীচিকা জাগে। যুদ্ধ আরম্ভ হবার তখন আর বেশী দেরী নেই।

সকলেই ভাবছেন, এবার অর্জুন তাঁর বিখ্যাত গাণ্ডীবে টঙ্কার তুলে যুদ্ধের উদ্বোধন করবেন। স্মৃতির পুরাতন পাতা উল্টিয়ে সকলেই দেখছেন—ঐ সেই শ্রেষ্ঠ দ্রোণশিষ্য অর্জুন, যিনি অসংখ্য রাজগণ সমক্ষে লক্ষ্যভেদ ক'রে দ্রৌপদীকে লাভ করেছিলেন; ঐ সেই ধনুর্ধর-শ্রেষ্ঠ

অর্জুন, যিনি স্ববিক্রমে সুভদ্রাকে হরণ ক'রে দিয়েছিলেন নিজের শক্তির পরিচয় ; ঐ সেই অর্জুন' যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও দিব্য-শরজাল বিস্তার ক'রে, খাণ্ডব-বন দহনে সহায়তা ক'রে অগ্নিকে করেছিলেন পরিতৃপ্ত ; ঐ সেই অর্জুন, যিনি কিরাতরূপী ভগবান মহাদেবকে যুদ্ধে প্রীত ক'রে পাশুপত মহাস্ত্র করেছিলেন সংগ্রহ , ঐ সেই অর্জুন, যিনি বরদানদৃপ্ত ও দেবতা-দিগের অজেয় পুলোমপুত্র কালকেয়দিগকে করেছিলেন পরাজিত ; ঐ সেই অর্জুন, যিনি ইন্দ্রলোকে গিয়ে দুর্দান্ত দানবদলকে দমন করেছিলেন , আর ঐ সেই অর্জুন, যিনি কৌরবগণকর্তৃক অপহৃত বিরাট রাজার গোধন একাই কৌরবগণকে পরাজিত ক'রে তা সব আবার বিরাটরাজাকেই দিয়েছিলেন ফিরিয়ে।

কিন্তু এ কি! ধনুর্বাণ ছেড়ে অর্জুন অমন ক'রে রথের ওপরে বসে পড়লেন কেন ? মহাবীরের আজ কেন এই ক্লীবতা! বিষণ্ণসুরে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান ক'রে জানালেন—তিনি যুদ্ধ করবেন না, করবেন না স্বজন হত্যা, ছুড়বেন না একটিও বাণ লোকহত্যার উদ্দেশ্যে। সেই অর্জুনের আজ এ কি পরিবর্তন!

বাহ্যিক বিচারে মনের এই অহিংসভাবের উন্মেষে আমরা আনন্দিত হই—সত্যই একটি সুন্দর পরিণতি হয়েছে ভেবে তার প্রশংসায় হই পঞ্চমুখ। সত্যদ্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের এই আপাতমনোহর আন্তর বিকার দেখে হলেন শঙ্কিত। নিঃশঙ্ক অর্জুনের এই ক্লীবভাব দেখে তিনি তাঁর ভুল ভাঙবার জন্য তাঁর সুমুখে ভাস্বর জ্ঞানের যে উৎসমুখ খুলে দিলেন, তাতে মহাকালও যেন থমকে দাঁড়াল। শুধু সেদিনের সেই কুরুক্ষেত্রে নয়, আজিকার পৃথিবীতেও ঐ অগ্নিমন্ত্র দেহের রক্তে বহ্নি জ্বালায়।

অর্জুনের জন্য সেদিন শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান-গৃহের সবকটি দরজাই একে একে দিলেন খুলে। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, বিভূতিযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি অনেক অপরূপ গুহ্য কথাই তিনি একে একে অর্জুনকে শোনালেন—নিজের বিশ্বরূপও দেখালেন তাঁকে। প্রায় চারদণ্ড পরিমিত সময়ের এই অপরূপ কথা শুনে অর্জুনের মোহ গেল ঘুচে, তাঁর ভুলও গেল ভেঙে। মহতের ভুল ভাঙার অবদানস্বরূপ ভগবদ্গীতার হ'ল সৃষ্টি। আজও সেই গীতার বাণী শুনলে মনে হয় অন্তরে কে যেন গাইছে—'নিশার স্বপন ছুটল রে এই ছুটল রে, টুটল বাঁধন টুটল রে।'

চল পথিক, আমরাও আমাদের জীবনে গীতোক্ত কর্মপ্রেরণার হোমানলে নিজেদের আহুতি দিই—জীবনের কুরুক্ষেত্রে বিবেক-গাণ্ডীব ধরে যুদ্ধ করি—জয়ী হই। শ্রীকৃষ্ণ-সারথি তাহলে এসে আমাদেরও জীবনরথের বল্গা ধরে দেখা দেবেন। তাই বলি ক্লীবতা ছেড়ে জেগে ওঠ, এগিয়ে চল। শুনছ না কি সেই উদাত্ত আহ্বান—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ, নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।' চল, চল, আর দেরী নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

বর্তমান জগতে বেদান্তের দাবি

স্বামী বিবেকানন্দ

এ যুগের মানুষকে বেদান্তের চিন্তাধারা বিচার ক'রে দেখতেই হবে। মানবজাতির এক বৃহদংশ এরই দ্বারা প্রভাবিত। বারংবার কোটি কোটি মানুষ ভারতের বেদান্ত-ধর্মাবলম্বীদের ওপর হানা দিয়েছে, প্রচণ্ড শক্তিতে তাকে চূর্ণ করতে চেয়েছে, তবু এই ধর্ম বেঁচে আছে।

সারা পৃথিবীতে এ রকম আর একটি চিন্তা-পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যাবে কি? অন্যান্য ধর্ম ও দর্শন উঠেছে—এরই ছায়াতলে আশ্রয় নেবার জন্যে। ব্যাঙের ছাতার মতো তারা জন্মেছে, একদিন তারা সব ছেয়ে ফেলেছে, পরদিন তারা শূন্যে মিলিয়ে গেছে। যোগ্যতমই কিন্তু আজও জীবন্ত।

এই দর্শনের চিন্তাপদ্ধতি পূর্ণ পরিণতি লাভ করেনি এখনও। সহস্র বছর ধরে এটি গড়ে উঠছে, এখনও এ গড়তে থাকবে। ⋯ভারতে যখন এই 'দর্শন' উদ্ভূত হয়েছিল, তার আগেই কিন্তু ভারত 'ধর্ম'কে একটি পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছে। অনেক দিন ধরেই এর দানা-বাঁধা চলছিল। আচার-অনুষ্ঠান, জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় নীতি-পদ্ধতিও একটি সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ রূপ নিয়েছিল। কালক্রমে বহু ধর্মেই দেখা দেয় মৃতের উপাসনা, অনেক হাস্যোদ্দীপক অনুকরণের ভাব, তাই তার বিরুদ্ধে জেগে উঠল বিদ্রোহ। দেখা দিলেন মহামানবের দল, বেদের ভাষায় তাঁরা প্রচার করলেন প্রকৃত ধর্ম।

এঁরা আসবার আগে লোকপ্রিয় ধারণা ছিল: বিশ্বের শাসনকর্তা একজন ঈশ্বর আছেন, আর মানুষ অমর। ⋯এইখানেই চিন্তাধারা থেমে গিয়েছিল, মানুষ ভাবত—এর পর আর কিছু জানা যায় না। এমন সময় দেখা দিলেন বেদান্তের সাহসী ব্যাখ্যাতা-রা! তাঁরা জানতেন—যে ধর্ম শিশুদের উপযোগী, তার দ্বারা চিন্তাশীল মানুষের কোন উপকার হবে না।

নৈতিক নিরীশ্বরবাদী বাইরের মৃত জগৎ-টাকেই জানেন। তার থেকেই তিনি বিশ্বের নিয়ম-পদ্ধতি রচনা করেন। তিনি হয়তো আমার নাকটুকু কেটে নিয়ে তার থেকেই আমার শরীর সম্বন্ধে একটা ধারণা ক'রে বসবেন।

তাঁকে ভেতরের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। আকাশে সঞ্চরমান গ্রহ-নক্ষত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাছে একটি বিন্দুমাত্র! নিরীশ্বরবাদী সেই ভূমা ব্রহ্মকে দেখে না, ব্রহ্মাণ্ড দেখেই ভয় পায়।

অধ্যাত্ম জগৎ সকলের চেয়ে বড়!⋯ সাধারণতঃ যাকে আমরা জগৎ বলি সেটা কি? —চারিদিকে দুঃখ। শিশু জন্মাচ্ছে কান্না নিয়ে, ক্রন্দনই তার প্রথম ভাষা! শিশু বড় হয়, দুঃখের আঘাতে আঘাতে সে এমন অভ্যস্ত হ'য়ে যায় যে দেখা যায় হৃদয়ের ব্যথা সে মুখের হাসি দিয়ে ঢেকে রাখে!

এই জগতের সমস্যার সমাধান কোথায়? যারা বাইরে খুঁজছে—তারা কখনও এর সমাধান পাবে না। ভেতরে দেখতে হবে, সেইখানে সত্যকে পাবে! ধর্ম যে রয়েছে অন্তরের অন্তরে।

'মাথাটা কেটে ফেল, তাহলেই মুক্তি পাবে', এ রকম ভাব যে প্রচার করে, তার কি কোন কালে শিষ্য জোটে? যিশু বললেন, 'গরীবদের

সব দিয়ে আমার অনুসরণ কর!' ক'জন তা করেছ? তোমরা তাঁর কথা শোননি, অথচ তিনিই তোমাদের ধর্মগুরু। তোমরা হচ্ছ ইহজীবনে করিতকর্মা, তোমরা জানো—তাঁর এ উপদেশ জীবনে পরিণত করা যায় না।

বেদান্ত কিন্তু এমন কিছু বলে না, যা জীবনে পরিণত করা যায় না। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজস্ব বিষয়বস্তু আছে, যা নিয়ে তার কাজ; সর্বত্রই প্রয়োজন খানিকটা প্রাথমিক জ্ঞান ও অনুশীলন, শুধু ধর্মের বেলাতেই যে কোন লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে পারে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা কর, ধর্মের ক্ষেত্রেও তাই করতে হবে। ঘটনার সম্মুখীন হও, প্রত্যক্ষ অনুভূতির ওপর গড়ে তোল অত্যাশ্চর্য সৌধ! প্রকৃত ধর্মের ক্ষেত্রেও চাই উপযুক্ত যন্ত্রপাতি। বিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, অন্ধ বিশ্বাস দিয়ে কিছু হবে না, যে কোন জিনিসই বিশ্বাস করা যেতে পারে।

বিজ্ঞানে আমরা জানি গতি বাড়লে বস্তুমান কমে যায়, বস্তুমান বাড়লে গতি কমে যায়। অতএব আছে—জড় বস্তু আর গতি। জানি না কেমন ক'রে বস্তু শক্তিতে লয় পায়, আর শক্তি বস্তুতে নিহিত হয়, অতএব এমন একটা কিছু আছে যা শক্তিও নয়, বস্তুও নয়,... একেই আমরা বলি মন—বিশ্বমানস।

তোমার শরীর ও আমার শরীর পৃথক্, কিন্তু আমি মানবজাতির সমুদ্রে একটি ঘূর্ণি মাত্র; একটি ঘূর্ণি—তবে বিরাট সমুদ্রের অংশ।

প্রবাহে প্রতিটি জলকণা পরিবর্তিত হ'য়ে যাচ্ছে, তবু তাকে বলছ—একটি নদী। নদীর জল চঞ্চল বটে, কিন্তু তার তটরেখা স্থির—অপরিবর্তিত! মন বদলাচ্ছে না, শরীরই বদলাচ্ছে—দ্রুত বদলাচ্ছে। শিশু ছিলাম, বালক হলাম, যুবক হলাম, শীঘ্রই প্রৌঢ় হব, তারপর বুড়ো হ'য়ে বেঁকে যাব! শরীর বদলাচ্ছে, মন বদলাচ্ছে না? ছেলেবেলা এক রকম চিন্তা করতাম, বড় হয়েছি—বৃহৎ হয়েছি, তার কারণ মন এখন ভাব ও ধারণার একটি সমুদ্র।

প্রকৃতির পশ্চাতে আছে বিরাট বিশ্বমন। আত্মাই একটি সহজ সরল 'একক', আত্মা জড় বস্তু নয়। মানুষ আত্মাই! 'মানুষ মরে কোথায় যায়?' এ প্রশ্নের উত্তর হবে বালকের সেই প্রশ্নের উত্তরের মতো, 'পৃথিবী পড়ে যায় না কেন?' প্রশ্ন দুটি এক রকম, সমাধানও একই প্রকার—আত্মা যাবে কোথায়?

তোমরা অমৃতত্বের কথা বল; আমি বলি: আজ বাড়ী ফিরে গিয়ে কল্পনা করতে চেষ্টা করো, তুমি মরে গেছ, তোমার মৃত শরীরটার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে একবার স্পর্শ কর তো। পারবে না, কারণ তুমি তোমার বাইরে যেতে পার না। তোমাদের প্রশ্নটা অমৃতত্বের নয়, তোমাদের আসল প্রশ্ন হ'ল: মৃত্যুর পর প্রিয় তার প্রিয়াকে দেখতে পাবে কিনা।

ধর্মের একটি বড় রহস্য হচ্ছে: তুমি নিজে অনুভব কর—তুমি আত্মা। 'আমি কীট, আমি কিছু না'—এই ব'লে চীৎকার ক'রে কেঁদ না। উপনিষদের কবি বলেছেন, 'আমি সৎ চিৎ, সত্যংজ্ঞানমনন্তম্।'

'আমি এ জগতের জঞ্জাল'—এ কথা ব'লে কেউ কখনও ভাল কাজ করতে পারে না। নিজে যত পরিপূর্ণ (সিদ্ধ) হবে ততই তুমি কম অপূর্ণতা (দোষ-ত্রুটি) দেখতে পাবে।*

*'The Oakland Enquirer' পত্রিকায় প্রকাশিত ১৯০০ খৃঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ওকল্যাণ্ডে প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতার বিবরণী হইতে অনূদিত ও সংকলিত। Ref. Complete Works Vol VIII—Swami Vivekananda.

বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

(১)

শ্রাবণ-সংখ্যায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবে আমরা দেখেছি, বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শনে ধর্মের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সমাজ-দর্শনকে আধ্যাত্মিক-বৈজ্ঞানিক সমাজ-দর্শন নামে অভিহিত করলে সর্বাপেক্ষা সঙ্গত হয়। তাঁর যে বাণী আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদীদের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ ব'লে মনে হবে তা হ'ল: The work of Advaita Philosophy is to break down all privileges. —অদ্বৈত বেদান্তের উদ্দেশ্য হ'ল সর্বপ্রকার বিশেষ সুবিধার অবসান ঘটানো। সমাজ-জীবনে ধর্মের এই ভূমিকা মার্ক্সীয় চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত।

হেগেলের দর্শন-ব্যাখ্যায় যুক্তির যে গলদ আছে, তার দরুনই মার্ক্স তাকে খণ্ডন ক'রে বস্তুবাদী ইতিহাস-ব্যাখ্যায় দাঁড় করাতে পেরেছেন। হেগেলের মতে সত্য অর্থাৎ Absolute Idea ইতিহাসের বিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হচ্ছে। কিন্তু যে বস্তুর বিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণতা সংঘটিত হয়—তা কখনই পূর্ণ-স্বরূপ হ'তে পারে না, তা স্বরূপতঃ অপূর্ণ, কারণ অপূর্ণ বস্তু কখনও পূর্ণত্ব অর্জন করতে পারে না। যুক্তির এই গলদের জন্য হেগেলের তত্ত্ব বিশ্বাসযোগ্য হ'য়ে ওঠেনি এবং ধর্ম সম্বন্ধে হেগেলের চিন্তাধারাও সর্বত্র সমর্থনযোগ্য নয়। এই সকল কারণে আদর্শবাদী বা idealistic ইতিহাস-ব্যাখ্যা ত্যাজ্য হয়েছে। মার্ক্স তাঁর সমাজ-দর্শনে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে ধর্মের উৎপত্তি শোষণের যন্ত্ররূপে, মানুষের মনে ভীতির আসনে তার গোপন প্রতিষ্ঠা। মার্ক্স-এর এ তত্ত্ব সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, কিছু সত্য এর মধ্যে অবশ্যই আছে। মার্ক্সীয় তত্ত্বের প্রধান ত্রুটি এই যে এ হ'ল আংশিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এর মধ্যে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে সব দেশেই ধর্মকে শোষণের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে—বিভিন্ন সময়ে। বিবেকানন্দও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন তাঁর 'বর্তমান ভারত' পুস্তিকায়। অন্যত্রও এ সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত আমরা পেয়েছি:

Priestcraft is in its nature cruel and heartless That is why religion goes down where priestcraft arises

কিন্তু পুরোহিত-তন্ত্রের আবির্ভাবে ধর্মকে যখন শোষণের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়, তখন প্রকৃত ধর্মের অবলুপ্তি ঘটে—এই তাঁর সিদ্ধান্ত। অতএব প্রকৃত ধর্মের সঙ্গে পুরোহিত-তন্ত্রের বা শোষণের কোনও সম্পর্ক নেই। মার্ক্স-এর দৃষ্টি এই প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধান পর্যন্ত প্রসারিত হয়নি। তাই ধর্মকে তিনি কেবলমাত্র শোষণের যন্ত্ররূপেই ধরে নিয়েছেন এবং ঘৃণার সঙ্গে তাকে 'opium of the people' ব'লে অভিহিত করেছেন। তাঁর শ্রেণীবিহীন সাম্য-সমাজে ধর্ম থাকবে না, কারণ সে সমাজ হবে শোষণবিহীন সমাজ, শোষণবিহীন সমাজে শোষণের যন্ত্রের প্রয়োজন থাকে না, সেইজন্য ধর্মেরও প্রয়োজন থাকবে না। অথচ বিবেকানন্দের সাম্য-সমাজের ভিত্তিমূলই হবে ধর্ম।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বিবেকানন্দের মতে প্রকৃত ধর্ম শোষণ-অবসানের উপায়, মার্ক্স-এর মতে ধর্ম শোষণের উপায়। এই দুটি মতের

কোন্‌টি যুক্তি-সিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য তাই এখন আমাদের বিবেচ্য। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'লে দেখা যায় যে বিবেকানন্দ নিজ আধ্যাত্মিক অনুভূতির দরুন ও অদ্বৈত বেদান্ত-তত্ত্বের উপর দাঁড়ানোর জন্য মানুষের ধর্ম-চেতনার স্বরূপ ও তার ধর্ম-জিজ্ঞাসার উৎপত্তি সম্বন্ধে মৌলিক অথচ সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ এবং সেজন্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছেন।[১]

ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রকৃতি-উপাসনা ও মৃতের উপাসনা—এই দুই তত্ত্বের বিশ্লেষণ ক'রে তিনি দেখিয়েছেন যে মানুষের ধর্ম-চেতনার উৎপত্তি ভয় হ'তে নয়, তার উৎপত্তি বরঞ্চ মানুষের এক স্বাভাবিক বৃত্তি—দুর্নিবার প্রকৃতি-জয়ের বাসনা হ'তে। মানুষ প্রকৃতির সীমাবদ্ধতা মেনে নেয়নি, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক বিপর্যয় মেনে নিয়ে হার স্বীকার করেনি। প্রকৃতির সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতেই সে একদিন সত্যের সম্মুখীন হয়েছে, ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম ক'রে অপরোক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছে। তারই প্রথম বিকাশ আমরা দেখি বৈদিক প্রকৃতি-উপাসকদের মধ্যে, দেখি প্রাচীন মিশরীয় মমী-রক্ষকদের মধ্যে। প্রকৃতির বিচিত্র শোভা, দিবারাত্রির অনিবার্য সন্নিধান, জন্ম-মৃত্যুর অমোঘ বিধান—এ সকল দেখে বিস্ময়াহত আদিম মানুষ প্রশ্ন তুলেছিল: এ সকল কেমন ক'রে আছে, কেমন ক'রে এ সৃষ্টি সম্ভব হ'ল? প্রথম বিস্ময়ের দ্যোতনা দেবতায় মূর্ত হ'য়ে উঠল—তার মুগ্ধতা রূপ নিল ঋক্-ছন্দে—বরুণ-ইন্দ্র-চন্দ্র-অগ্নি-বায়ু-যম-সাবিত্রী-রুদ্র-বিষ্ণুরূপে। ক্রমে তার বুদ্ধি-প্রগতি চেতনার সুপ্তি থেকে তার আত্মার জাগরণ ঘটাল—সে দেখল প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যের অন্তরালে আছেন তার পরমদেবতা, জীবন ও বল যথায় বিচ্ছুরিত, অমরত্ব ও মৃত্যু যাঁর ছায়া, সৃষ্টির পথ যাঁর নয়নসম্পাতে বিকশিত।

বস্তুতঃ এর থেকে এই সিদ্ধান্তই গঠন করা যায় যে মানুষের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রবণতাই ধর্ম, ধর্মের রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, দেব-দেবীর উপাসনা—এ গুলিই ধর্ম নয়, যদিও এগুলি ধর্মাচরণের অঙ্গ। ধর্মের অবনতি যখন ঘটে, তখন এই আঙ্গিকগুলি প্রধান হয়, ধর্মচেতনা বিলুপ্ত হয়। কতগুলি রীতিনীতি ও অর্থহীন বিধিনিষেধের কঠোর নিগড়ে আবদ্ধ সমাজ-জীবনে তীব্র ভেদ-বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। ভারতের ইতি-হাসে এর প্রমাণ আছে। জাতিভেদের প্রাচীর অনড় হ'য়ে উঠেছে তখনই, যখন ধর্মের গ্লানি বেড়েছে এবং এ তো দেখা গিয়েছে যে যখনই ধর্মের গ্লানি-অবসানের জন্য ধর্মনেতা আবির্ভূত হয়েছেন, তখনই জাতিভেদের নিগড় শিথিল হয়েছে। শ্রীবুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে জাতিভেদের প্রাকার আকাশচুম্বী হয়েছিল, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেও তাই, এবং দেখা যায় যে শ্রীবুদ্ধ জাতিভেদের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছেন, আঘাত করেছেন শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্যান্য ধর্মনেতাগণ। ইতিহাসের এই সাক্ষ্য থেকেও আমরা দেখি যে ধর্মের প্রাদুর্ভাবেই বিশেষ সুবিধার অবসান, শোষণের অবসান, প্রকৃত ধর্মের অভাবের উপরেই বিশেষ সুবিধার প্রতিষ্ঠা, সেইজন্যই দেখি যে ভারতে ধর্মান্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে সমাজ-বিপ্লব—ভেদ-বৈষম্যের নিগড় ভেঙে ফেলবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। শ্রীবুদ্ধকে স্ত্রী-শূদ্রের মুক্তিদাতা-রূপে এইজন্যে স্তুতি করা হয়েছে নানাস্থানে। ধর্মের এই ভূমিকা মার্ক্স-পন্থীদের দৃষ্টিপথে পড়েনি, এবং সেজন্য ইতিহাস-ব্যাখ্যায় তাঁদের অনেক সময়ই তথ্যকে বিকৃত ক'রে নিতে হয়, না হ'লে সমাজ-বিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে মার্ক্স-এর

১ 'Necessity of Religion'—Jnana Yoga, Swami Vivekananda.

নির্ধারিত তত্ত্বের সঙ্গে প্রকৃত তথ্য মেলে না। সেইজন্য আধুনিক মার্ক্সপন্থী ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় পাই: যাজ্ঞবল্ক্য জনক-রাজসভায় গার্গীকে হত্যা করবার ভয় দেখিয়ে তাকে জড়-বাদ প্রতিষ্ঠা করতে বিরত করেছিলেন, হর্ষবর্ধন পরম অত্যাচারী, অতিশয় ভোগবিলাসী ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ও শোষক সম্রাট্ ছিলেন, উপনিষদের যুগের রাজন্যবর্গ বহু ফন্দী এঁটে জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়ে শোষণ করবার উদ্দেশ্যে অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদ ও অতীন্দ্রিয় সত্য-তত্ত্ব রচনা করে-ছিলেন।[২] ধর্ম-চেতনার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে যে অভিমত আমরা বিবেকানন্দের বিশ্লেষণে পাই তাতে ইতিহাসকে বিকৃত ক'রে দেখবার প্রয়োজন হয় না। ইতিহাসকে অবিকৃত রেখেই সমাজ-বিকাশের ধারা ব্যাখ্যা করা চলে।

বাস্তবিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই আমরা সমাজ-জীবনে ধর্মের যথার্থ ভূমিকার পরিচয় পাই। ধর্ম সভ্যতার প্রসারের সহায়। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ তাঁর 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে বলছেন: 'অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগতের বার্তা ও সহায়তার জন্য সর্বমানব-প্রাণ সদাই ব্যাকুল। সাধারণের সেথায় প্রবেশ অসম্ভব, জড়ব্যূহ ভেদ করিয়া ইন্দ্রিয়-সংযমী, সত্ত্বগুণপ্রধান পুরুষেরাই সে রাজ্যে গতিবিধি রাখেন, সংবাদ আনেন ও প্রদর্শন করেন। ইঁহারাই পুরোহিত, মানব-সমাজের প্রথম গুরু, নেতা ও পরিচালক।··· পুরোহিত-প্রাধান্যে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশুত্বের উপর দেবত্বের প্রথম বিজয়, জড়ের উপর চেতনের প্রথম অধিকার-বিস্তার, প্রকৃতির ক্রীতদাস জড়পিণ্ডবৎ মনুষ্যদেহের মধ্যে অস্ফুটভাবে যে অধীশ্বরত্ব লুক্কায়িত তাহার প্রথম বিকাশ।'

বস্তুতঃ আদিম কৌম সমাজের ক্রম-পরিণতির অন্তরালে বুদ্ধি ও চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-চিন্তার বিকাশ এবং তারই সঙ্গে উন্নত সমাজের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। অতি গুরুত্ব-পূর্ণ সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশের এই লক্ষণীয় দিকটি আধুনিক বস্তুবাদী সমাজ-শাস্ত্রবিদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। তাঁরা উৎপাদনের যন্ত্রের ক্রম-বিকাশের সঙ্গে জীবিকা-নির্বাহের উপায়ের অনিবার্য কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখেছি যে অতি আধুনিক সমাজ-শাস্ত্রবিদ্‌দের মধ্যে অনেকে এই বিশ্লেষণের ত্রুটি দেখিয়েছেন।[৩] তাঁদের মতে সমাজজীবনের বিকাশের অনেকগুলি মৌল উপা-দান আছে যথা—উৎপাদনের ও জীবিকা-নির্বাহের উপায়, ধর্মকর্ম, ধ্যান-ধারণা, শিল্পকলা ইত্যাদি। মার্ক্সবাদীদের এই ভ্রান্তির দরুন তাঁরা সমাজ-জীবনে ধর্মের ভূমিকা সম্বন্ধে নানারকম ভুল ধারণা পেয়েছেন। যেমন ব্যাবহারিক জীবনে তাঁরা বললেন যে অর্থের (money) একাধিপত্য হ'তে দার্শনিকদের চিন্তার ক্ষেত্রে অদ্বৈত-তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে তা নয়, অদ্বৈত-তত্ত্বের আবির্ভাব বুদ্ধি-প্রগতির দরুন ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ফলেই ঘটেছে।

এইজন্য আমরা দেখছি যে 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে আর্থিক শক্তিকে যথাযথ স্বীকৃতি দিয়েও বিবেকানন্দ সভ্যতার বিকাশে সক্রিয় শক্তিরূপে ধর্মকেই প্রধান স্থান দিয়েছেন। ধর্মের বিকাশ ঘটলেই বহু মানবের মধ্যে সকল সুপ্ত শক্তির জাগরণ ঘটবে এবং সেজন্যই ব্যাবহারিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও ঘটবে জাগরণ। সোরো-কিনও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন:

২ From Volga to Ganga—Rahul Sankrityana.

৩ Sorokin, Ogburn, Mannheim, Max Weber প্রভৃতি সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌দের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

Despite its negative position regarding economic well-being and wealth, Ideationalism (আধ্যাত্মিক প্রভাবসম্পন্ন ভাবধারা) generates forces which often work toward an improvement of the economic situation. For example, such in fact was the history of accumulation of wealth and growth of economic functions in many a centre of Ideational Christian, Buddhist, Taoist, Hindu religion.[৪]

ভারতে বৌদ্ধযুগেই আমরা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই। বৌদ্ধযুগ ব্যাবহারিক জগতে—আর্থিক, রাজনৈতিক, শিল্পকলা, সাহিত্য, স্থাপত্য, বিজ্ঞান-চর্চা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতির যুগ। সমাজে অধঃপতিত ও পদদলিত মানব-সাধারণের মধ্যে সে সৃজনী-শক্তি সুপ্ত ছিল তাই জাগরিত হয়েছিল শ্রীবুদ্ধের প্রভাবে, দেব-ভাবের বিকাশে সামান্য মানুষও তার সকল সম্ভাবনা উন্মোচিত ক'রে পূর্ণ বিকশিত হ'তে পেরেছিল। এ সকলই সম্ভব হয়েছিল ধর্মের শক্তির দ্বারা। এইজন্যই বিবেকানন্দ বলেছেন, 'Civilisation means manifestation of spirituality in man'—বলেছেন, 'প্রত্যেক জাতির প্রাণশক্তি আধ্যাত্মিকতার মধ্যে নিহিত থাকে, আধ্যাত্মিকতা বিলীন হইয়া বস্তুবাদের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে এই প্রাণশক্তি শুকাইতে থাকে'[৫], এবং তখনই ধর্ম পরিণত হয় শোষণের যন্ত্ররূপে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ দেখাচ্ছেন যে 'উন্নতির সময় পুরোহিতের যে তপস্যা, যে সংযম, যে ত্যাগ সত্যের অনুসন্ধানে সম্যক্ প্রযুক্ত ছিল, অবনতির পূর্বকালে তাহাই আবার ভোগ্য-সংগ্রহে বা আধিপত্য-বিস্তারে সম্পূর্ণ ব্যয়িত।'[৬] অর্থাৎ জড়বাদের প্রাদুর্ভাব যখন ঘটে—তখন ভোগের উপকরণ-সংগ্রহার্থে নামসর্বস্ব, আকার-সর্বস্ব ধর্মকেও ব্যবহার করা হয় এবং তখনই ধর্ম শোষণের যন্ত্র। অতএব দেখা যাচ্ছে যে মার্ক্সবাদীর তথ্যসংগ্রহ অসম্পূর্ণ, বিশ্লেষণও সম্পূর্ণ নয়, তত্ত্বও সঙ্কীর্ণতা-দোষযুক্ত। ফলে ধর্মসাধনার দেশ ভারতের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্ক্সবাদী অত্যন্ত বিভ্রান্তির পরিচয় দেন। যেমন তাঁরা বলেন যে 'যজ্ঞ এককালে দেবতাদের কাছে অন্ন-লাভের উপায় মাত্র ছিল বলেই বৈদিক মানুষদের জীবনে যজ্ঞের স্থান অমন অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরকালে, এই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হ'য়ে যজ্ঞ পরিণত হ'ল নিছক ধর্মানুষ্ঠানে'।[৭] এ সিদ্ধান্ত কি সত্য? যদি সত্য হয়, তাহলে বিশ্বাস করতে হয় যে যজ্ঞানুষ্ঠানই ছিল (খাদ্য) উৎপাদনের উপায়, তারই দ্বারা বাস্তবে উৎপাদন সম্ভব হ'ত, যখন উৎ-পাদনের উপায়ের পরিবর্তন ঘটল তখনই তা নিছক ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত হ'ল। এ অসম্ভব কথা বিশ্বাস করা যায় কি ক'রে? যজ্ঞানুষ্ঠান ক'রে দেবতা'দের সন্তোষ উৎপাদন ক'রে অলৌকিক ভাবে অন্ন-সংগ্রহ কি কোন সময়েই সম্ভব ছিল? তাছাড়া যজ্ঞ যাঁরা অনুষ্ঠান করেছেন, তাঁদের মনোভাব বিশ্লেষণ করেই কি আমরা এ যুক্তির সমর্থন পাই? যথা যজ্ঞকর্তাগণ বলছেন—'যিনি চিত্তের নির্মলতা সম্পাদন করেন, যিনি বলের বিধান করেন, সকল প্রাণী—এমনকি দেবগণও যাঁর শাসন অনুসরণ করেন, অমৃতত্ব ও মৃত্যু যাঁর ছায়াস্বরূপ, সেই প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশ্যে আমরা হবিঃ প্রদান করি' (ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ১২১ সূক্ত)। এর মধ্যে নিষ্কাম মনোভাবের পরিচয়ই তো আমরা পাই, অন্ততঃপক্ষে মনে হয় না উৎপাদনের উপায় ব'লে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও মার্ক্সবাদীর যুক্তি :

৪ Sorokin—Social and Cultural Dynamics—p. 520

৫ জ্ঞানযোগ

৬ বর্তমান ভারত

৭ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—লোকায়ত দর্শন।

'ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠান হ'ল সেই সব আচার-বিচারেরই আধার, যেগুলি এক-কালে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করবার জোরেই জীবনোপায়ের সহায়ক ছিল বলেই মানুষের চেতনায় এবং মানব-সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে পেরেছিল।'[৮] শুধু তাই নয়, মার্ক্সবাদীর আরও অভিমত যে 'সমাজের নীতিবোধও নিরালম্ব নয়, অর্থনৈতিক জীবনের উপর, ধনোৎপাদন-পদ্ধতির উপর তা নির্ভরশীল।'[৯] এই সিদ্ধান্তের পিছনে তথ্য-প্রমাণের জোর দৃঢ় নয়, যথা পূর্বোক্ত ঋক্-মন্ত্রটি এর দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না, অনুরূপ আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মার্ক্সবাদীর ঐতিহাসিক তত্ত্ব সত্য থেকে এক্ষেত্রে বিচ্যুত।

তবে জড়বাদের প্রাধান্যের কালে কখনও কখনও ধর্মানুষ্ঠান নীতিবোধ অর্থনৈতিক কারণ দ্বারা নির্ধারিত হ'তে পারে। বৈদিক যুগেও তার দৃষ্টান্ত মেলে নানারূপ যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়ানুষ্ঠান সহকারে যেখানে সম্পদলাভ, ভোগোপকরণ-সংগ্রহের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। পুরোহিত-তন্ত্রের শেষ পরিণাম এইরূপ ব'লে বিবেকানন্দ অভিমত প্রকাশ করেছেন 'বর্তমান-ভারতে' (পৃঃ ১৯-২১)। এ সম্পর্কে সমাজশাস্ত্রবিৎ সোরোকিনের গবেষণা প্রভূত আলোক সম্পাত করছে। অতএব এখানে সোরোকিনের তত্ত্বের বিশদ আলোচনা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না ব'লে মনে হয়।[১০]

সোরোকিনের মতে সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশ তিনটি স্তরের মাধ্যমে ছন্দাকারে (Rhythm) প্রবাহিত: এই স্তরগুলি—Ideational, Idealistic ও Sensate। প্রথমটি হ'ল আধ্যাত্মিকতা-প্রাধান্যের যুগ, তৃতীয়টি জড়বাদের প্রাধান্যের যুগ, দ্বিতীয়টি এ উভয়ের সংমিশ্রণ। প্রথমোক্ত যুগে ধর্মে-কর্মে, ধ্যান-ধারণায়, আচার-আচরণে, শিল্পকলায়, সাহিত্য-ইতিহাস-রচনায়—সর্বত্র অধ্যাত্ম-প্রবণতার ছাপ পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়টিতে কিছু তার মালিন্য ঘটবে ও ইন্দ্রিয়ানুগতার ছাপ পরিস্ফুট হবে, আর তৃতীয়টিতে পুরোপুরি ইন্দ্রিয়ানুগ মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যাবে। যেমন উপরোক্ত গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে সোরোকিন দেখিয়েছেন যে প্রথমোক্ত যুগের চিত্রকলার ক্ষেত্রে অঙ্কনের বিষয়বস্তু দেখা যায়—

'God, The virgin, The Soul, The Spirit, The Holy Ghost and other religious and mystical topics'.

তৃতীয় বা Sensate যুগের চিত্রকলায়—

'The topic is empirical and visual......In content they represent character-painting'.

আর মধ্যবর্তী যুগের চিত্রকলা সম্বন্ধে সোরোকিন দেখাচ্ছেন—

Though the subject matter is super-empirical, the form in which it is rendered attempts to embody some visual resemblance to what is considered to be its empirical aspect e.g. pictures of Paradise, Inferno, The Last Judgment.

সোরোকিন এমনি ক'রে সাহিত্য, দর্শন, নীতিবোধ প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তব দৃষ্টান্ত সহায়ে এই যুগ-বিভাগ প্রমাণিত করেছেন এবং তারপর দেখিয়েছেন যে চক্রাকারে Ideational, Idealistic এবং Sensate—এই তিন যুগ আবর্তিত হয়, এবং সমাজ-সংস্কৃতির গতিপথ এই চক্রপথ। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদের প্রাদুর্ভাব ক্রমান্বয়ে ঘটে থাকে। মার্ক্সীয় ইতিহাস-ব্যাখ্যা বর্তমান Sensate যুগেরই অভিব্যক্তি মাত্র। এ সম্পর্কে সোরোকিনের নিম্নলিখিত উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য:

৮, ৯ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—লোকায়ত দর্শন।

১০ Sorokin—Social and Cultural Dynamics.

Just as the mentality of the truth of faith spiritualises everything, even the inorganic material phenomena and their motions or happenings, so the mentality of the truth of senses, which by definition perceives and can perceive only the material phenomena materialises everything, even the spiritual phenomena like the human soul. Empiricism, materialism, mechanisticism and determinism are positively associated and go together, while the truth of faith, idealism, indeterminism, and non-mechanism go together.

অর্থাৎ কোন একযুগের ধ্যান-ধারণা, জীবন-যাত্রা, দর্শন-চিন্তা সবই সে যুগ-বৈশিষ্ট্য দ্বারা নিরূপিত, বর্তমান Sensate যুগে জড়বাদের প্রাধান্য-হেতু এ সকল অর্থনৈতিক ব্যাপারের দ্বারা নিরূপিত।

বিবেকানন্দও বলেছিলেন (এবং সোরোকিনের বহু পূর্বেই বলেছিলেন) যে 'Materialism and spiritualism prevail in turn in society' (অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদ পর্যায়ক্রমে সমাজে আধিপত্য করে) কারণ মানুষের মধ্যে সুরাসুরের সংগ্রাম চলছে। 'বর্তমান ভারতে' বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন যে ধর্ম সূক্ষ্ম মানসিক শক্তির ব্যাপার যার থেকে অলৌকিক ও গূঢ় প্রক্রিয়া ও কার্যের উদ্ভব। এবং এই সকল অলৌকিক শক্তির প্রয়োগ দ্বারা ক্রমে মানুষ প্রলোভনের কবলে পড়ে এবং তখনই তার প্রচেষ্টা হয় এর দ্বারা ভোগ্যবস্তুর উপর অধিকার-অর্জন। ক্রমে বিদ্যা-চর্চার বিলোপ হয় এবং তখনই ধর্মের সম্পূর্ণ অবনতি ঘটে। এবং তারপর বিদ্যাহীন, পুরুষ-কারহীন, পূর্বপুরুষদের নামমাত্রধারী পুরোহিত-কুল পৈতৃক অধিকার, পৈতৃক সম্মান, পৈতৃক আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য 'যেন তেন প্রকারেণ' চেষ্টা করেন, অন্যান্য জাতির সহিত কাজেই বিষম সঙ্ঘর্ষ। এ সম্পর্কে আরও বিশদ আলোচনা ক'রে সোরোকিন বলছেন :

The sensate society is turned toward this world and in this world particularly toward the improvement of its economic condition as the main determinant of sensate happiness. To this purpose it devotes its chief thought, attention, energy and efforts....In an over-developed sensate mentality, everybody begins to fight for a maximum share of happiness and prosperity This leads often to conflicts between sects, classes states, provinces, unions, etc., and often results in revolts, wars, class-struggles, over taxation, which ruin security and in the long run make economic prosperity impossible.

অর্থাৎ এই Sensate যুগে বিষম শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য। শুধু তাই নয় এই প্রকার সঙ্ঘর্ষের ফলে অতি দ্রুত আর্থিক উন্নতির প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত আর্থিক উন্নতিও সুদূরপরাহত হয়, এবং পরিশেষে মানুষের দুর্গতির সীমা থাকে না। সেইজন্য সোরোকিনের অভিমতে Sensate যুগের অবসান এই পথে আসে। পরবর্তী কালের উপযোগী পরিবর্তনে ধীরে ধীরে দেখা দেয়—এবং ইন্দ্রিয়-সুখভোগে বিরক্তি উৎপন্ন হয়, মানুষের মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়, আসে Ideational যুগ। সোরোকিনের এইরূপ গবেষণার ফলে বিবেকানন্দের সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়েছে যে আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদ ক্রমান্বয়ে চক্রপথে আবির্ভূত হয়, দ্বিতীয়তঃ আধ্যাত্মিকতার বিকাশেই প্রকৃত সভ্যতার উন্নতি।

মোটের উপর আমরা দেখছি যে শোষণের যন্ত্ররূপে ধর্মের যে অবনতি তার জন্য দায়ী জড়বাদ বা বস্তুবাদ, অন্য কিছুই নয়। ধর্ম নিছক শোষণের যন্ত্র হ'লে ধর্মশাস্ত্রের নিদান হ'ত না সমাজ ও অর্থনীতিগত ব্যবস্থাতে সমানাধিকার স্থাপন। অথচ ভাগবত গ্রন্থে আমরা তাই-ই দেখতে পাচ্ছি। ভাগবতকার বলেছেন, 'সকলেই ক্ষুধার অন্ন পেতে পারে, প্রয়োজনের বেশী ছলে বলে

যে অধিকার করে সে চোর, সামাজিক ভাবে সে দণ্ডনীয়।[১১] ধর্মশাস্ত্রের এই নীতি তো কোনও ক্রমেই শোষণের উদ্দেশ্যানুগ নয়। এ সকল কথা স্মরণ না রাখলে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত ইতিহাসও হ'য়ে দাঁড়ায় মনগড়া অবাস্তব অসত্য কাহিনী। সেদিক থেকে এবম্বিধ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার হাত থেকে ইতিহাসের মুক্তি আজ একান্ত বাঞ্ছনীয়। কারণ, ইতিহাসের একটি মহান্ উদ্দেশ্য আছে তা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত, সে উদ্দেশ্য—"অতীতের আলোতে বর্তমানের পথ দেখানো, সমাজ ও গোষ্ঠীর চলাচলের পথ ও বিপথ দেখিয়ে মানুষকে সাবধান করা। সমাজ ও সভ্যতার অভ্যুদয় ও পতনের বন্ধুর পথে মানুষের যাত্রা ও যাত্রাশেষের দিগ্‌দর্শন হচ্ছে ইতিহাস।"[১২] সেই-জন্যই তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়ে বা অসম্পূর্ণ সন্নিধান ক'রে কোন তত্ত্ব-প্রদর্শনের স্থান ইতিহাসে নেই, কারণ তার দ্বারা (তা যতই বৈজ্ঞানিক রীতি-সম্পন্ন হোক না কেন) ইতিহাসের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

মার্ক্সবাদীদের বিভ্রান্তির প্রধানতম কারণ যে মার্ক্স অতিমাত্রায় অষ্টাদশ শতকের শিল্প-বিপ্লব দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি উক্ত ঘটনার অল্পকাল পরে জন্মেছিলেন[১৩]। তিনি সমাজ-জীবনে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সম্পূর্ণ প্রভাব লক্ষ্য করবার পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তার দ্বারা তাঁর দৃষ্টি ছিল আচ্ছন্ন হ'য়ে। ফলে ইতিহাস-ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক রীতি তিনি গঠন করতে প্রভূত সহায়তা করলেও ইতিহাসের মুক্তি ঘটেনি তাঁর হাতে। তাঁর মস্ত বড় ভ্রান্তি ঘটেছে সেইখানে, যেখানে তিনি মনে করেছেন অর্থ-ব্যবস্থাই সমাজ-জীবনের ভিত্তি। আর ধর্ম-কর্ম, শিল্প-কলা, সাহিত্য এ সকল তার সৌধচূড়া, এবং এই সৌধচূড়ার আকৃতি ও গঠন তার ভিত্তিমূল দ্বারাই নিরূপিত। মার্ক্স-এর কিছুকাল পরে জন্মেছিলেন বিবেকানন্দ, শিল্প-বিপ্লব দ্বারা তিনিও ছিলেন যথেষ্টই প্রভাবান্বিত। বিবেকানন্দের এ সম্বন্ধে অতিশয় সচেতনতার প্রমাণ পাই তাঁর এই অভিমতের মধ্যে যে অনুরূপ শিল্প-বিপ্লব ব্যতীত ভারতের মুক্তি নেই। কিন্তু ধর্ম-সাধনার লীলাভূমি ভারতবর্ষে জন্মে, ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার প্রতিভূ হ'য়ে দাঁড়িয়ে সমাজ-জীবনে ধর্মের ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি কোনও ভ্রান্তমতের বশীভূত হননি, এ সম্বন্ধে তাঁর বিচারশীল মন কোন ভুল করেনি। কাজেই মার্ক্স-এর অল্পকাল পরে জন্মালেও এ সম্বন্ধে তাঁর ছিল যথার্থ জ্ঞান।

১১ ভাগবত—৭।১৪।৮

১২ অতুলচন্দ্র গুপ্ত—ইতিহাসের মুক্তি

১৩ Mannheim—Systematic Society · Chapter on 'Social Change.'

চির-পথচারী

শ্রীমতী বসুধারা গুপ্ত

অজ্ঞাতের আমন্ত্রণে আমি
বারংবার করি পরিক্রমা
এই পৃথিবীরে।
পুনর্বার শ্লথ গতি,
মিশে যাই নিস্তরঙ্গ নৈঃশব্দের নিগূঢ় তিমিরে।

আবার জাগিয়া উঠি সৃজন-মায়ায়
ঘন ঘোর কুজ্ঝটিকা ভেদি
সুপ্তি-লোক হ'তে,
হাসিকান্না-বিধ্বনিত বৈচিত্র্যের নব মায়ালোকে।

পার হ'য়ে যাই কত নদী গিরি বন,
সাহারার রিক্ত বক্ষ করি অতিক্রম
উদ্বেলিত প্রতীক্ষার ভারে
কার লাগি? চিনি না তাঁহারে।
কখনো বা শ্বাপদসঙ্কুল
গভীর অরণ্য-বুকে করেছি ভ্রমণ
অবহেলে নিঃশঙ্ক হৃদয়ে
কুশাঙ্কুরে বিক্ষত শরীর,
তবু নহি স্থির—
চঞ্চল অস্থির মন কার অন্বেষণে?

যুগে যুগে বৈচিত্র্যের ঘাটে ঘাটে করি উত্তরণ
ঈপ্সিত বস্তুর লাগি
বিনিদ্র রজনী জাগি,
মেলে না সন্ধান,
অফুরান হ'য়ে চলে এ পথ-চারণ।
চিত্তে মোর নিদারুণ বিস্ময় যে জাগে
কোন লীলা-বিলাসীর কৌতুক-লীলায়
ঘূর্ণি সম ঘোরে পৃথ্বি, ঘুরি আমি,
ঘোরে গ্রহতারা দুরন্ত আবেগে।

কে সেই অদৃশ্য চক্রী?
যাঁর চক্র ঘোরে অবিরাম
কক্ষে কক্ষে তালে তালে
কালের মন্দির পানে
আবর্তিছে এ বিশ্বেরে অনিবার্য টানে॥

কেবা সেই মহাশিল্পী, কি তাঁর স্বরূপ?
অন্তহীন রূপধারী, তাই কি অরূপ?
নাই নাই নাই সেই অমিতের সীমা,
তাঁরই লাগি রাত্রিদিন মানব-যাত্রীর
এই পরিক্রমা?

মৃত্যুর তিমির-দ্বার করি অতিক্রম
জ্যোতির্ময় লোকে আত্মা চাহে জাগরণ,
পরিত্যজি বর্ণময়ী ধরিত্রীর ক্ষণিক নির্মোক
সর্বহারা হ'য়ে করে পথ পর্যটন॥

হে অবেদ্য, তোমারি যে মহা আকর্ষণে
বিভ্রান্ত এ বিশ্ববাসী চলিয়াছে ছুটি
খণ্ড হ'তে অখণ্ডের সাগর-সঙ্গমে।
তাই আজো মৃত্যুময়ী ধরিত্রীর বুকে
অমৃতের অদম্য অভীপ্সা
জেগে রয় অন্তরের অন্তরালে
সীমাহীন তৃষা।

ওগো স্রষ্টা, কোথা তুমি?
অন্বেষিয়া তোমারে যে জন্ম জন্ম ধরি
বিবাগী এ আত্মা মোর চির-পথচারী॥

মহাশক্তিরূপে ঈশ্বরের উপাসনা

স্বামী সুন্দরানন্দ

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের সর্বত্র বিশেষতঃ শরৎকালে পরমেশ্বর মহাশক্তিরূপে বিভিন্ন প্রকারে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। শাক্তদর্শন-মতে সর্বব্যাপিনী শক্তিই পরমেশ্বরী—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী মহাশক্তি। জননী হইতে সকল জীব সাক্ষাৎভাবে জাত হয়, সুতরাং পিতা অপেক্ষা মাতাই সৃষ্টির অধিকতর নিকটবর্তিনী। এজন্য শাক্ত দার্শনিকগণ—যাঁহা হইতে সর্ব জীব উদ্ভূত হইয়াছে, সেই মূলকারণ-সনাতনী আদ্যাশক্তিকে জগন্মাতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মহানির্বাণ তন্ত্র 'বহুত্বে একত্বে'র উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলিয়াছেন: একই চন্দ্র যেমন ভিন্ন ভিন্ন জলরাশিতে প্রতিবিম্বিত হয়, সেরূপ জগজ্জননীই সমস্ত দেব-দেবীতে প্রতিবিম্বিত, তিনিই তাহাদের শক্তির উৎস। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, স্থিতিকর্তা বিষ্ণু এবং প্রলয়কর্তা মহাকাল রুদ্র ও তাঁহাদের শক্তি তাঁহার মধ্যেই বিদ্যমান। কালী, তারা প্রমুখ দশমহাবিদ্যা, দুর্গা, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা ও অন্যান্য দেবী তাঁহারই বিভিন্ন শক্তি ও রূপ এবং তাঁহারা সকলেই এক ও অভিন্ন।

দার্শনিক বিচারে জগজ্জননী বা মহামায়া ব্রহ্মের ক্রিয়াশীলা শক্তি। নিষ্ক্রিয়া তুরীয়া জগজ্জননী, আগমশাস্ত্রে বর্ণিত নিষ্কল শিবের শক্তি এবং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য নির্গুণ ব্রহ্মের শক্তি অভিন্ন। নির্গুণ ব্রহ্ম ও নিষ্কল শিব এক—নির্বিকার চৈতন্যশক্তি, কিন্তু কর্তৃত্ব বা ক্রিয়া-শক্তি-রহিত। সেইরূপ সগুণ ব্রহ্ম ও স-কল শিব অভিন্ন; উভয়ই সর্বভূতে অনুস্যূত ও ক্রিয়াশক্তিমান্। নির্গুণ ব্রহ্ম ও নিষ্কল শিবে শক্তি অব্যক্ত, আর সগুণ ব্রহ্ম ও স-কল শিবে শক্তি ব্যক্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা একই সত্তার দুইটি দিক। এইরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন। জড় দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন এই মহাশক্তিরই অভিব্যক্তি।

পুরাণ-মতে শিব পুরুষ এবং শক্তি স্ত্রী। কিন্তু দার্শনিক বিচারে তাঁহারা একই ভগবৎ-সত্তার দুইটি দিক মাত্র—পুরুষ বা স্ত্রী কোনটিই নন। ব্রহ্মের ন্যায় সর্বভূতে অনুস্যূত সত্তাই শক্তি। কুলচূড়ামণি-নিগমশাস্ত্রে ভৈরবী (শক্তি) ভৈরবকে (শিব) বলিতেছেন, "তুমি সকলের গুরু। আমি শক্তিরূপে তোমার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছি, তজ্জন্যই তুমি প্রভু হইয়াছ। আমি ছাড়া আর কেহই সৃজনকারিণী জননী বা 'কার্যবিভাবিনী' নাই। অতএব, সৃষ্টি-ব্যাপারে মাতৃত্ব আমারই, তুমি 'কার্যবিভাবক' পিতা, অর্থাৎ, নিত্যানন্দ হইতে যে অমৃত নিস্যন্দিত হয়, তাহা ধারণ করিবার পাত্র—শক্তি। শিব-শক্তির মিলনেই সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। যেহেতু পৃথিবীর সকলই শিবশক্ত্যাত্মক, অতএব হে মহেশ্বর, তুমি সকলের মধ্যে আছ, আমিও সকলের মধ্যে আছি।" এইরূপে জীব-জগৎ সেই মহাশক্তি হইতেই প্রসূত হইয়াছে।

মহাসমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বীয় জীবনে তন্ত্রশাস্ত্রের জটিল দার্শনিক তত্ত্বগুলি উপলব্ধি করিয়া অতি সরল ও সুস্পষ্ট ভাষায় যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার ভাবার্থ: অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তির ন্যায় ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তির মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই।…একই শক্তির বিকাশ বিভিন্ন বস্তুতে বিভিন্ন, কারণ বহুত্বই

সৃষ্টির নিয়ম, একত্ব নহে। ঈশ্বর সর্বভূতে অনুস্যূত—পিপীলিকাতেও তিনি আছেন। পার্থক্য কেবল বিকাশের তারতম্যে। তন্ত্রের জগদম্বা বেদান্তের ব্রহ্ম ব্যতীত আর কেহ নহেন। তিনি নির্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্মেরই সবিশেষ সাকার রূপ। জগজ্জননী এক ও বহু, আবার তিনি এক এবং বহুর অতীত। যে সত্যদ্রষ্টা ভগবানের একটি রূপ বা একটি দিক দেখিতে পাইয়াছে, সে তাঁহার অন্যান্য রূপ বা দিকও অনায়াসে দেখিতে পারে। যিনি সগুণ সাকার, তিনিই নির্গুণ নিরাকার। যিনি শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম। পূর্ণজ্ঞান-লাভের পর সকল ভেদ তিরোহিত হয়।

এই আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্রসমূহ জগতের বিভিন্ন শক্তি-প্রকাশের মূলে একই মহাশক্তির অধিষ্ঠান বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করিয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞানীরাও বলেন—সমস্ত বস্তুর মূলে রহিয়াছে একই মহাশক্তি, জড়েরও মূলে চৈতন্য অনুভূত হইতেছে। মানুষ ও জড় বস্তুর এবং জন্তু ও বৃক্ষলতা প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য—এই শক্তি-প্রকাশের তারতম্যে পর্যবসিত হইয়াছে। একই পরমা শক্তি আত্মারূপে সকলের মধ্যে বিদ্যমান। দেখা যাইতেছে—প্রাচীন দর্শন ও আধুনিক বিজ্ঞান এই চরম সিদ্ধান্তের অভিমুখে চলিয়াছে।

ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অতীত

ডাঃ শ্রীপীযূষকান্তি লালা

ভূমিকা

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস মানবজাতির ইতিহাসে অতি পুরানো, ভারতীয় সভ্যতার গোড়ার দিকে গেলে যে আর্যসভ্যতার মহিমা আমাদের মুগ্ধ করে, তারও আগে যে ভারতীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রায় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সুপরিণত ছিল—দাক্ষিণাত্য আজও তার সুপ্রচুর সাক্ষ্য বহন করছে। সেটা ছেড়ে দিয়েও আর্যসভ্যতা থেকেই যদি শুরু করি, তাহলেও সে যুগকে অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতির সমসাময়িক পরিণতির সঙ্গে তুলনা করলে অবাক্ হ'তে হয়। পাশ্চাত্য মানবগোষ্ঠী যখন জাতিহিসেবে প্রতিষ্ঠিতই হয়নি, পূর্বের দিগ্বলয় তখন ভারতীয় মনীষীদের জ্ঞানসাধনার জ্যোতিতে হ'য়ে উঠেছে ভাস্বর। এ আর্য সভ্যতার সঠিক কালনির্ণয় এখনও সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য সব ক্ষেত্রেই ভারতীয় সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছিল এবং সুপ্রাচীন কাল হতেই বিজ্ঞানের যে সব শাখা আবিষ্কৃত ও অবদান-পরিপুষ্ট হয়েছিল, চিকিৎসা-বিজ্ঞান তাদের মধ্যে শুধু অন্যতম নয়, একটি প্রধান শাখা।

বর্তমানে প্রধানতঃ যে কয়টি চিকিৎসা-পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত তারা হ'ল: আয়ুর্বেদনির্দিষ্ট পদ্ধতি (কবিরাজী চিকিৎসা নামে যা প্রসিদ্ধ), য়ুনানী চিকিৎসা, হোমিওপ্যাথি (স্বনামধন্য হ্যানিমান যার আবিষ্কর্তা) এবং আধুনিকতম বিজ্ঞানপরিপুষ্ট পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালী (লোকমুখে যা এলোপ্যাথি নামে সু-পরিচিত)। ভারতীয় নিজস্ব চিকিৎসা-বিজ্ঞান বলতে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাই বুঝায়, যদিও পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও আজ ভারতের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

এ আয়ুর্বেদসম্মত চিকিৎসা যদিও মূলতঃ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালীর সঙ্গে তার বিজ্ঞানগত বিরোধ নেই, তবুও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার বর্তমান রূপ নৈরাশ্যব্যঞ্জক এবং কল্পনা করতেও কষ্ট হয় যে : আয়ুর্বেদই এককালে উৎকর্ষের চরমতা লাভ করেছিল। এর মূল কোথায়? এবং বর্তমান ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধনের উপায়ই বা কি?—এ সব প্রশ্নের উত্তর জানতে হ'লে আগে ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের স্বরূপ এবং ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস মোটামুটি জানা প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক পটভূমি ও ক্রমবিবর্তন

হিন্দু বা আর্যসভ্যতায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিকাশ এক আশ্চর্য ব্যাপার। বিজ্ঞানের এক স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখা হিসেবে চিকিৎসা-বিজ্ঞান কবে রূপ নিয়েছিল, তা এখনও সঠিক নির্ণীত হয়নি। মোটামুটিভাবে পাঁচটি অধ্যায়ে এর ক্রমবিবর্তনকে ভাগ করা যায়—

প্রথম অধ্যায় : বৈদিক যুগ,
দ্বিতীয় অধ্যায় : ক্রমোন্নতির বা সংহিতার যুগ,
তৃতীয় অধ্যায় : সংস্করণের যুগ,
চতুর্থ অধ্যায় : সঙ্কলনের যুগ,
পঞ্চম অধ্যায় : ক্রমাবনতির যুগ।

(১) বৈদিক যুগ

চরকসংহিতায় বৈদিক যুগকে আয়ুর্বেদের উষাকাল ব'লে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুশ্রুত-সংহিতার সূত্রস্থানে আয়ুর্বেদকে অথর্ববেদের 'উপাঙ্গ' ব'লে বিশেষিত করা হয়েছে। আবার কোথাও একে 'পঞ্চম বেদ' ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে (ব্রহ্মবৈর্তপুরাণ)। বৈদিক যুগের কাল-নির্ণয় প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোন মনীষীই সঠিক-ভাবে করতে পারেননি। তবে বেদকে পৃথিবীর সর্বপুরাতন গ্রন্থ ব'লে স্বীকার করতে কারও আপত্তি নেই। এ যুগেও আয়ুর্বেদে আটটি প্রধান বিষয় আলোচিত হয়েছে, যথা—

(১) শল্যতন্ত্র : এতে মুখ্য শল্যবিদ্যা বা Major Surgery আলোচিত। 'যে কোন বস্তু শরীরে পীড়াকর হয় তাকেই শল্য বলা যায়। সেই শল্যের উদ্ধরণ, যন্ত্রাদি প্রয়োগ এবং ব্রণ-বিনিশ্চয়করণই শল্যতন্ত্রের উদ্দেশ্য।' —সুশ্রুত

(২) শালাক্যতন্ত্র : এতে গৌণশল্যবিদ্যা (Minor Surgery) আলোচ্য বিষয়। 'শালাক্য অর্থাৎ শলাকাপ্রয়োগরূপ কর্ম যে তন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাকেই শালাক্যতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হয়েছে।'—সুশ্রুত

(৩) কায়চিকিৎসা (Internal Medicine)—'সর্বাঙ্গপ্রসৃত ব্যাধির চিকিৎসাজ্ঞানই কায়চিকিৎসা।'—সুশ্রুত

(৪) ভূতবিদ্যা—গ্রহপ্রকোপের অপনোদনের জন্যে এ বিদ্যার আশ্রয় নিতে হয়।

(৫) কৌমার-ভৃত্য—কুমার (newly born baby)-এর ভরণপোষণ, ধাত্রীর স্তন্য-পুষ্টির সংশোধন, দুষ্টস্তন্যপানজাত ও দুষ্টগ্রহজাত শিশুরোগের চিকিৎসা এতে বর্ণিত।

(৬) অগদতন্ত্র—বিভিন্ন বিষোদ্গীরণশীল জীবের দংশন ও অন্যান্য কারণে বিষক্রিয়া; তাদের লক্ষণ এবং উপশমের উপায় এতে লিপিবদ্ধ।

(৭) রসায়নতন্ত্র (Alchemy)—আয়ু, মেধা ও বলবৃদ্ধি এবং রোগপ্রতিরোধের সামর্থ্য অর্জনের উপায় এ তন্ত্রে আলোচিত।

(৮) বাজীকরণতন্ত্র—এতে পুরুষের যৌন-স্বাস্থ্য বর্ধনের উপায় বর্ণিত।

(২) সংহিতার যুগ

এ যুগ আয়ুর্বেদের নূতন রচনায় ও বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। এ যুগের দুই সুবৃহৎ ও প্রখ্যাত রচনা

হ'ল—অগ্নিবেশকৃত 'অগ্নিবেশ-সংহিতা' (যার বর্তমান রূপ হ'ল চরক-সংহিতা) এবং সুশ্রুত রচিত 'সুশ্রুত-সংহিতা'।

অগ্নিবেশ-সংহিতা : এর ইতিহাস আলোচনায় অনেক মনীষীর নাম এসে পড়ে। বৃহস্পতিতনয় ভরদ্বাজ ও অগ্নিতনয় আত্রেয়—এঁরা দুজন প্রখ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। দুজনের মধ্যে আত্রেয়ই তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞান শিষ্যদের মধ্যে বিতরণ ক'রে গেছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা গুরুপ্রদত্ত জ্ঞান কিছু না কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন—তাঁরা হলেন অগ্নিবেশ, ভেল, পরাশর, হারীত ও ক্ষরপাণি। তাঁদের মধ্যে অগ্নিবেশকৃত 'অগ্নিবেশ-সংহিতা'ই ভেষজ-চিকিৎসার প্রধান পথিকৃৎ। তার পরেই হ'ল 'ভেল-সংহিতা' (তাঞ্জোর সরকার লাইব্রেরীতে এর খানিকটা বর্তমান এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি সংস্কৃত হরফে এটা প্রকাশ করেছেন)। আজও যদিও মূল অগ্নিবেশ-সংহিতার পূর্ণরূপ অজানা রয়ে গেছে, চরক-কৃত সংস্করণে 'চরক-সংহিতা'-রূপে তার অনেকটাই জানতে পারি আমরা। অগ্নিবেশের আবির্ভাব—সঠিক জানা না গেলেও খৃষ্টজন্মের হাজার বছর আগে ব'লে অনুমিত হয়। আর চরকের আবির্ভাব খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের মধ্যে। এ বিরাট ব্যবধানকালে অগ্নিবেশসংহিতার অনেক বিকৃতি ও অবলুপ্তি ঘটে। তাই চরক নূতন ক'রে একে উজ্জীবিত করেন তাঁর সংস্করণে ('অগ্নিবেশকৃত তন্ত্রে চরক-প্রতিসংস্কৃতে'—চরক)। চরক তাঁর জীবদ্দশায় অগ্নিবেশ-সংহিতার দুই-তৃতীয়াংশ সংস্করণে সমর্থ হয়েছিলেন। অগ্নিবেশ-সংহিতার পরবর্তী কতকগুলি (ভাগবত, বৃন্দ, চক্রপাণি, দলন, বিজয়রক্ষিত, শ্রীকান্ত প্রভৃতি কৃত) সংকলনে এমন সব উদ্ধৃতি বর্তমান যা চরক-সংহিতায় নেই। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, চরক-সংহিতা অগ্নিবেশ-সংহিতার অপূর্ণ সংস্করণ। দৃঢ়বল (খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী) অগ্নিবেশ-সংহিতার শেষাংশ ও চরক-সংহিতার পূর্ণ সংস্করণ করেছিলেন।

কোন কোন পাশ্চাত্য লিপিকার অগ্নিবেশ-সংহিতার যুগকে অনেক পরবর্তী কালের ব'লে অনুমান করেছেন। ক্যাষ্টেলেনী ও গ্যারিসন্ (Castelleni and Garrison)-এর মতে আত্রেয় খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে তক্ষশিলায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান-প্রচারে রত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ভ্রান্ত, কারণ বৌদ্ধসাহিত্য থেকে উদ্ধৃত তাঁদের এ আত্রেয় ছিলেন ভিক্ষু—তিনি ছিলেন বুদ্ধ ও বৌদ্ধ নৃপতি বিম্বিসারের চিকিৎসক জীবকের গুরু এবং অগ্নিবেশের শিক্ষক আত্রেয় থেকে ভিন্ন লোক। যদিও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে তক্ষশিলার প্রসিদ্ধি ছিল সুদূর-বিস্তৃত ও আত্রেয় ছিলেন তদানীন্তন প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী, তথাপি চরক-সংহিতায় তক্ষশিলার উল্লেখ নেই একটিবারও, অথচ অগ্নিবেশ ও আত্রেয়ের উল্লেখ রয়েছে প্রতিটি পরিচ্ছেদের শুরুতে—'ঋষি আত্রেয় এরূপ শিক্ষাদান করেছেন এবং শিষ্য অগ্নিবেশ আপন ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন '।

সুশ্রুত-সংহিতা—এর রচনাকাল এখনও সঠিক জানা যায়নি, তবে শ্রদ্ধেয় হেস্‌লার সাহেব (Hessler) সুশ্রুত-সংহিতার ল্যাটিন অনুবাদে অনুমান করেন যে খৃষ্টের আবির্ভাবের হাজার বছরেরও আগে এ গ্রন্থ সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। বিশ্বামিত্র-তনয় সুশ্রুত হলেন এ প্রখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা। সুশ্রুত, ভোজ, ভালুক, করবীর্য, বৈতরণ, ঔপধেনব, পৌষ্কলাবত ও গোপুর রক্ষিত এঁরা ধন্বন্তরির কাছে শল্যতন্ত্র শিক্ষা করেন ব'লে কথিত। সুশ্রুতই শিক্ষালব্ধ জ্ঞান লিপিবদ্ধ করেন তাঁর সংহিতায়, বর্তমান সুশ্রুত-সংহিতায় মূল গ্রন্থের অনেকাংশই নেই। কালে অনেক বিকৃতি ও অবলুপ্তি ঘটে সুশ্রুত-সংহিতারও,

এবং নূতন ক'রে এর সংস্করণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগার্জুন (খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতক) এ কাজ নিপুণ হাতে সমাধা করেন নাগার্জুন-সংহিতায়, মূল গ্রন্থ থেকে চক্রপাণি-কৃত অনেক সংকলন বর্তমান সুশ্রুত-সংহিতায় (নাগার্জুন-কৃত সংস্করণ) নেই। তবুও বর্তমান সুশ্রুত-সংহিতা অধ্যয়ন করলে আমরা জানতে পারি—কত সুসংহত জ্ঞানের ভিত্তিতে এ পুস্তক লিপিবদ্ধ হয়েছিল। চিকিৎসা-শাস্ত্রে সুশ্রুতের অবদান অবিস্মরণীয়। খুব সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গেলে দেখি, এ সংহিতাকে পূর্বতন্ত্র এবং উত্তরতন্ত্র এ দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। পূর্বতন্ত্র পাঁচটি স্থান বা বৃহৎ অংশে বিভক্ত, যথা :

সূত্রস্থান : ছেচল্লিশটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এবং এতে অসংখ্য জিনিস আলোচিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে প্রধান এবং বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে বিভিন্ন চিকিৎসাবিধি, তাদের প্রয়োগ ও গুণ-বর্ণনা, শল্য-চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ শস্ত্রসমূহের আকার বর্ণনা ও তাদের প্রয়োগবিধি, বিভিন্ন দ্রব্য বা ওষধির গুণাগুণ বর্ণনা এবং পথ্যবিজ্ঞান (Dietetics)।

নিদানস্থান : ষোলটি অধ্যায়ে এ স্থান বিভক্ত। এতে রোগসমূহের কারণ ও লক্ষণ-সকল (Etiology, Signs and Symptoms) আলোচিত হয়েছে।

শারীরস্থান : দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এ স্থানে শরীরের উৎপত্তি ও ভ্রূণবিদ্যা (Embryology), শরীরের পুঙ্খানুপুঙ্খ গঠনসংস্থা (Anatomy), শারীরবৃত্ত (Physiology) ও তার অস্বাভাবিক অবস্থায় রোগের উৎপত্তি (Pathology) আলোচিত হয়েছে এবং প্রসূতি-বিজ্ঞান (Obstetrics)-ও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

চিকিৎসিতস্থান : বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা-বিধি ও ক্ষেত্রবিশেষে শস্ত্র প্রয়োগবিধি এখানে বর্ণিত। চল্লিশটি অধ্যায়ে এ 'স্থান' সম্পূর্ণ।

কল্পস্থান : বিষ ও বিষঘ্ন ঔষধসমূহের ব্যবহার (Toxicology) এ স্থানের আলোচ্য বিষয়। আটটি অধ্যায়ে এ 'স্থান' বিভক্ত।

পাঁচটি 'স্থান' মোট একশ' কুড়িটি অধ্যায়ে সমাপ্ত। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উত্তরতন্ত্র, এতে ছেষট্টিটি অধ্যায় আছে, শালাক্যতন্ত্র, কৌমার-ভৃত্য, কায়চিকিৎসা ও ভূতবিদ্যা এবং তন্ত্র-ভূষণাধ্যায়—এ কয়টি বিষয়ে উত্তরতন্ত্র সমাপ্ত, পূর্বতন্ত্রে বর্ণিত সকল বিষয়ই উত্তরতন্ত্রে আরও বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। সে যুগের শস্ত্র-সমূহের নিখুঁত বর্ণনা ও বৈজ্ঞানিক ব্যবহার-বিধির কথা ভাবলে আজও অবাক্ হ'তে হয়।

এ দুই সংহিতায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান মোটা-মুটিভাবে দুই বিশিষ্ট প্রণালীতে নির্দিষ্ট হ'ল—চরকের নির্দিষ্ট পথে ভেষজ-চিকিৎসা এবং সুশ্রুত-নির্দিষ্ট পথে শল্য-চিকিৎসা, যদিও সুশ্রুত-সংহিতায় ভেষজ-চিকিৎসাও স্থানলাভ করেছে। দুটো পথই হ'ল একে অন্যের পরিপূরক—কাজেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথ হয়েছিল আরও প্রশস্ত। দুটো পথেই চিকিৎসাবিদ্‌গণ বিশেষত্ব অর্জন করতে লাগলেন। সুষ্ঠুভাবে কোন্ প্রণালীর উদ্ভব আগে হয়—এ নিয়ে মত-দ্বৈধ আছে। সুশ্রুত-সংহিতায় যদিও প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে যে শল্য-চিকিৎসাই আদি এবং শ্রেয়তর, তবুও স্বাভাবিক অনুমান হ'ল ভেষজ-চিকিৎসার প্রচলনই আগে হয়, যুদ্ধ সংঘটনের বৃদ্ধির সঙ্গে শল্য-চিকিৎসার প্রয়োজনও বৃদ্ধিলাভ করে।

এ যুগে এ দুই বৃহৎ সংহিতা ছাড়া আরও অনেক অবদানে সমৃদ্ধ হয় চিকিৎসাশাস্ত্র। যে সব মনীষীর অবদান উল্লেখযোগ্য—তাঁরা হলেন

বিশ্বামিত্র, খরনদ, গর্গ, চাক্ষুষ্য, সাত্যকি, শৌনক, কৃষ্ণাত্রেয়, করাল প্রভৃতি। খৃষ্টীয় দশম শতকে রচিত গ্রন্থসমূহে এঁদের লিপির উল্লেখ আছে।

এ যুগকে আয়ুর্বেদের 'স্বর্ণ যুগ' বলা যায়। বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বর্ণিত অসংখ্য রোগের লক্ষণসমূহ ও চিকিৎসা সে যুগেও জ্ঞাত ছিল। শারীরস্থান (Anatomy) সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের জন্য শব-ব্যবচ্ছেদের প্রচলন ছিল। শুধু তাই নয়, শব-সংগ্রহ ও তার ব্যবচ্ছেদ-প্রণালীও সুশ্রুত-সংহিতায় বর্ণিত হয়েছে (সুশ্রুত-সংহিতা—শারীরস্থান : ৫ম অধ্যায় —৫০)। শব-ব্যবচ্ছেদ ব্যতীত যে আয়ুর্বেদে ব্যুৎপত্তি-লাভ সম্ভব নয়, তা স্পষ্টই বলা হয়েছে : যিনি শব-ব্যবচ্ছেদ দ্বারা শরীরের বাহ্যাভ্যন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং শাস্ত্রে তৎসমস্ত অবগত হইয়াছেন, তিনিই আয়ুর্বেদবিশারদ, প্রত্যক্ষদৃষ্ট ও শাস্ত্রশ্রুত বিষয় দ্বারা সন্দেহ-নিরাকরণপূর্বক তিনি চিকিৎসা করিয়া থাকেন (সুশ্রুত-সংহিতা, শারীরস্থান, পঞ্চম অধ্যায়—৫১)। বর্তমান যুগের যে মস্তিষ্ক-শল্য-চিকিৎসা (Brain-Surgery) দুরূহ ব'লে উক্ত—কথিত আছে, সুশ্রুত নিজেই ছিলেন তাতে দক্ষহস্ত।

(৩) সংস্করণের যুগ

এ যুগের দু'জন মহামনীষী হলেন চরক এবং নাগার্জুন, দু'জনে যথাক্রমে অগ্নিবেশ-সংহিতা এবং সুশ্রুত-সংহিতার সংস্কার সাধন ক'রে চরক-সংহিতা ও নাগার্জুন-সংহিতা প্রণয়ন করেন—এ কথা আগেই বলা হয়েছে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের এ দু'খানা অমূল্য গ্রন্থ এ ভাবে ধ্বংস ও অবলুপ্তি থেকে রেহাই পেয়ে চিকিৎসা-জগতে নূতনভাবে উপস্থাপিত হয়।

চরকের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকলেও মোটামুটিভাবে প্রমাণিত হয় যে তিনি খৃষ্টীয় ১ম-২য় শতকের মধ্যে তাঁর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ক্যাটেলেনী ও গ্যারিসন তাঁকে খৃষ্টীয় ২য় শতকের লোক ব'লে বর্ণনা করেছেন। চৈনিক মতে তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতকে জীবিত ছিলেন এবং কেউ কেউ বলেন তিনি শকাব্দ-প্রচলয়িতা সম্রাট্ কণিষ্কের রাজবৈদ্য ছিলেন।

বৌদ্ধ মনীষী নাগার্জুন সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। চরক-সংহিতা এবং নাগার্জুন-সংহিতা ছাড়া আরও সংস্করণ হয় এ যুগে। তাদের মধ্যে দৃঢ়বল-কৃত (খৃষ্টীয় ৪র্থ শতক) অগ্নিবেশ-সংহিতার সংস্করণ উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া কয়েকটি মৌলিক অবদানও আয়ুর্বেদশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করে। খৃষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতকে রচিত হয় বৌদ্ধ মনীষী ভাগবতের 'অষ্টাঙ্গসংগ্রহ'। আর একজন ভাগবত (খৃষ্টীয় ৮ম-৯ম শতক) প্রণয়ন করেন 'অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা'। এ দু'খানা গ্রন্থই হিন্দু চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অমূল্য অবদান ব'লে স্বীকৃত।

ধীরে ধীরে চরক-সংহিতা ও সুশ্রুত-সংহিতা-প্রবর্তিত চিকিৎসাপ্রণালী ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে এবং খৃষ্টীয় ৯ম-১০ম শতকে পূর্বে কাম্বোডিয়া এবং পশ্চিমে আরব দেশে এ দু'খানা গ্রন্থের প্রচলন হয়। এরও বহু পূর্বে হিপোক্রেতিস্ (Hippocrates) জটামাংসী, তিল, আদা ইত্যাদি ভারতীয় ভেষজের নামোল্লেখ করেন, এবং অনেক ভারতীয় ভেষজের নাম ডিয়োস্-কর্ডিস্ (Dioscordis)-কৃত গ্রন্থে (খৃষ্টীয় ১ম শতক) আছে। ইতিয়াস্ (Aetius) চন্দন, নারিকেল ইত্যাদির উল্লেখ করেন (খৃষ্টীয় ৫ম শতক)।

(৪) সংকলনের যুগ

এ যুগের প্রথম ভাগে চিকিৎসাশাস্ত্রে নূতন ও মৌলিক অবদান খুব বেশী না থাকলেও

এ বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন চলতে থাকে। এ যুগকে বিশেষ ক'রে সংকলনের যুগ বলা যায়। এ যুগের পথিকৃৎ ছিলেন মাধব কর। তিনি বাঙালী ছিলেন। ভেষজসমূহের গুণাগুণ বর্ণনা ক'রে 'রত্নমালা' নামে অমূল্য গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। এ রচনা থেকে পরবর্তী চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা অনেক উপকৃত হন। হারুন-অল্-রসীদ (খৃষ্টীয় ৮ম-৯ম শতক) মাধব করের 'নিদান' এবং চরক- ও সুশ্রুত-সংহিতার অনুবাদ করেন আরবীতে। সুতরাং মাধব করের আবির্ভাব খৃষ্টীয় ৮ম শতকের আগেই। মনীষী উইল্সন্ (Wilson)-এর মতে এ অনুবাদ মূল গ্রন্থের পারসী অনুবাদ থেকে কৃত। এতে মাধব করের আবির্ভাবকাল আরও আগে ব'লে মনে হয়। বৃন্দ (৯ম শতক) মাধবনিদানের অসংখ্য উল্লেখ করেছেন। সুশ্রুতের ভাষ্যকার মাধব এবং বেদের ভাষ্যকার মাধবাচার্য দুজনে পৃথক লোক ছিলেন। এ ছাড়া অন্যান্য যে সব সংকলয়িতার অবদান চিকিৎসাশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: বৃন্দ (খৃঃ ৯ম শতক), বাণভট্ট (গুপ্তযুগ), চক্রপাণি (১০৬০ খৃঃ—গৌড়রাজ নয়াপালের রাজসভা অলংকৃত করেন), ভগ্নসেনা (খৃঃ ১১শ-১২শ শতক), গয়াদাস (খৃঃ ১১শ শতক), দলন (খৃঃ ১২শ শতক), অরুণ দত্ত (১২২০ খৃঃ), হিমাদ্রি ও বাচস্পতি (১২৬০ খৃঃ), শার্ঙ্গধর ও বিজয় রক্ষিত (১২৪০ খৃঃ), বোপদেব (১৩০০ খৃঃ), শ্রীকান্ত (?), শিবদাস (?), ভাবমিশ্র (১৬শ শতক) প্রভৃতি।

এ অধ্যায়ের শেষাংশেই ক্রমাবনতির সূত্রপাত হয় এবং পরবর্তী যুগে সেটা সম্পূর্ণ হয়; তবে এ যুগেই বিশেষ ক'রে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সাথে সাথে হিন্দু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বহুল প্রচার হয় বাইরে। আরব ও মিশর হ'ল এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় ৯ম শতকের প্রথম ভাগে আরবীয়গণ যষ্টিমধু, লাক্ষা, গুগ্গুল, দারুচিনি, ত্রিফলা, মরিচ, আদা, চন্দন ইত্যাদির ব্যবহার শেখে ও এগুলি আরবীয় ভেষজশাস্ত্রে স্থানলাভ করে। আবার আরব্য ভেষজ গন্ধবোল, সৌবলথর (সৌবর্চল ?), আকরকরা ইত্যাদি হিন্দু ভেষজের অন্তর্ভূত হয়।

হিন্দু শাসনের সময় ভেষজশাস্ত্রের সুপরিণত অবস্থা সম্বন্ধে ক্যাষ্টেলেনীর মত উদ্ধৃত করা যায়:

"ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্গণ শুধুমাত্র যে ভেষজচিকিৎসা বা শল্যবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তা নয়, রোগ-প্রতিরোধে এবং ধাত্রীবিদ্যায় অস্ত্রোপচারেও তাঁরা নিপুণ ছিলেন। বহুমূত্র, আমাশয়, ক্ষয়রোগ, উপদংশ, কৃমিজাত এবং আরও বহু রোগের চিকিৎসায় তাঁরা দক্ষ ছিলেন। রোগনির্ণয়ে নাড়ীপরীক্ষা, শরীরের তাপমাত্রা, চামড়ার রং, কণ্ঠস্বর, শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ, চক্ষু-পরীক্ষা, মল-পরীক্ষা—এসবকে তাঁরা মূল্যবান্ তথ্য হিসেবে গণ্য করতেন। রোগের উপসর্গ সম্বন্ধে ছিল তাঁদের প্রভূত জ্ঞান। রোগকে তাঁরা সাধ্য (নিরাময়যোগ্য) ও অসাধ্য (অনারোগ্য) এ দুভাগে ভাগ করতেন। রোগ-প্রতিরোধে বসন্তের টীকাদান-প্রথা প্রচলিত ছিল। পথ্যবিজ্ঞান ও বিষশাস্ত্রে তাঁদের অশেষ জ্ঞান ছিল।

"ভারত ও সিংহলে বৌদ্ধ রাজকুমারগণ অনেক আরোগ্যশালা বা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকেই সিংহলের রাজধানী অনুরাধাপুরে এ রকম একটি আরোগ্য-নিকেতনের বর্ণনা পাওয়া যায়, পরে এ রকম আরও অনেকগুলি স্থাপিত হয়। রাজ্যশাসনে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের জন্যে ভিন্ন একটি বিভাগ থাকত, প্রতি দশখানা গ্রামে একজন ক'রে চিকিৎসাব্রতী এই স্বাস্থ্যবিভাগে কাজ

করতেন। এ ছাড়া পঙ্গু, অনাথ, ও গরীবদের জন্যেও আশ্রম ছিল অনেক।"

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও বিচারের প্রয়োজনে 'অস্থমৃতক পরীক্ষা' বা মৃতদেহ-পরীক্ষার (Post-mortem Examination) কথা আছে। মৌর্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের আমলে উচ্চ বিচারালয়সমূহে (কণ্টকশোধন-বিচারালয়) এ পরীক্ষার প্রয়োজন হ'ত, অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে এ পরীক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল এবং মৃতদেহ রক্ষার জন্যে আলাদা ঘর থাকত, এ সব মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্যে তৈলীয় উপাদান ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(৫) ক্রমাবনতির যুগ

হিন্দুশাসনের শেষভাগে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গৌরব অনেক স্তিমিত হ'য়ে আসে, তৎকালে রাজনৈতিক ভিত্তির শৈথিল্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সব দিকগুলির উপরেই প্রভাব বিস্তার করে। তারপর থেকে শুরু হয় একের পর এক বহিঃশত্রুর আক্রমণ। ভারতীয় জনসাধারণের জীবন যে এতে শুধু বিপর্যস্ত হয় তা নয়, শিক্ষা ও সম্পদ সবই এতে পর্যুদস্ত হয়। হিন্দুরাজত্বে অর্থ ও খাদ্যের সচ্ছলতা ও রাজনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য গণজীবনে দিয়েছিল নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের ও সেই সঙ্গে নির্বিঘ্ন জ্ঞানসাধনার সুযোগ। তাছাড়া রাজন্যবর্গের সমাদর ও আগ্রহে পুষ্ট হতেন বিজ্ঞানীরা। মুসলমান আক্রমণের সাথে সাথে দেখা দিল বিজ্ঞানের অবনতি, একে একে সুলতান মামুদ (খৃঃ ১১শ শতকের প্রথমভাগ), মহম্মদ ঘোরী (১১৯১ খৃঃ) চেংগিস্ খান্ (খৃঃ ১৩শ শতক), আলাদিন খল্জী (১২৯৬—১৩১৬ খৃঃ), তৈমুর লঙ্গ (খৃঃ ১৪শ শতক), নাদির শাহ্ (১৭৩৯ খৃঃ) আক্রমণ ও লুণ্ঠনের তাণ্ডব সংঘটন ক'রে ভারতীয় হিন্দুদের জাতীয় জীবনকে প্রায় বিধ্বস্ত করেন। মোগল এবং পাঠান রাজত্বে যদিও শিল্পকলা ও বিদেশী সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটে, হিন্দুবিজ্ঞানের গৌরব হিন্দুশাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই স্তিমিত হ'য়ে পড়ে এবং এর পুনরুজ্জীবন আর হয়নি।

তারপর আসে বৃটিশ-শাসন। এ শাসনের প্রথমাংশে হিন্দুবিজ্ঞানের গৌরব আরও ক্ষীণ হয়ে আসে। বৃটিশ-শাসনের মধ্যমে ও শেষভাগেই কয়েকজন গুণগ্রাহী পাশ্চাত্য মনীষীর প্রচেষ্টায় এবং দেশীয় শিক্ষাবিদের প্রেরণায় সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও অনুবাদকার্য আরম্ভ হয়, এতে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের অনেক কিছুই পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে হিন্দু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অনেক সম্পদই বিদেশে চলে গেছে—যা এখনও ফিরে আসেনি।

কেবল একটি মাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই শাস্ত্রনির্ণীত অর্থ সঠিক জানা যায় না,
অতএব চিকিৎসককে অনেক দেখিয়া শুনিয়া সত্য নির্ণয় করিতে হইবে।

(সূত্রস্থান—৪.৬)—সুশ্রুতসংহিতা

সকল প্রাণীর সুখের জন্য চেষ্টা করিবে। প্রতিদিন দাঁড়াইয়া হউক, বসিয়া হউক—
সমগ্র হৃদয় দিয়া সেবা করিয়া রোগাতুরকে রোগমুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে।

(বিমান—৮ম অধ্যায়)—চরকসংহিতা

গীতা-জ্ঞানেশ্বরী

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥১৮

এই সমগ্র চরাচর বিশ্ব যে প্রকৃতির অভ্যন্তরে অবস্থিত, সেই প্রকৃতি ক্লান্ত হইয়া যেখানে বিশ্রাম লাভ করে, সেই পরম গতিও আমি, প্রকৃতি যাহা দ্বারা জীবন ধারণ করে এবং যাহার অধিষ্ঠানে বিশ্ব প্রসব করে, প্রকৃতির সহবাসে যে গুণ ভোগ করে, হে পাণ্ডুসুত, সেই বিশ্ব-লক্ষ্মীর ভর্তাও আমি,—আমিই সমস্ত ত্রৈলোক্যের স্বামী। (২৮০)

আকাশ সর্বব্যাপী, বায়ু ক্ষণকালও নিশ্চল থাকে না, অগ্নি দহন করে, মেঘ বর্ষণ করে, পর্বত স্থানচ্যুত হয় না, সমুদ্র নিজের সীমা উল্লঙ্ঘন করে না, পৃথিবী ভূতভার বহন করে—এ সমস্তই আমার আজ্ঞায় হইয়া থাকে; আমি বলাইলেই বেদ বলে, আমি চালাইলেই সূর্য চলে; যে প্রাণ জগৎকে চালনা করে, আমি স্পন্দন করিলেই সেই প্রাণ স্পন্দিত হয়, আমারই আজ্ঞায় কাল ভূতগণকে গ্রাস করে। হে পাণ্ডুসুত, সারা বিশ্বই যাঁহার আজ্ঞাধীন, জগতের এইরূপ সমর্থ প্রভু আমি, আর গগনের ন্যায় সাক্ষীভূত আমিই। হে পাণ্ডব, যে এই নামরূপাত্মক বিবিধ পদার্থে ভরিয়া আছে, আর যে নিজেই এই সমস্ত নামরূপের আধার—যেমন জলেই তরঙ্গ আর তরঙ্গের মধ্যেই জল থাকে, তেমনি সারা সৃষ্টির নিবাস বা আশ্রয়স্থল আমিই। যে অনন্যভাবে আমার শরণ লয়, আমি তাহার জন্মমরণ নিবারণ করি; এইজন্য শরণাগতের একমাত্র শরণ্য আমি। আমি এক হইয়াও বহু, প্রকৃতির বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট জীব-জগতের প্রাণ হইয়া অবস্থান করি; সূর্য যেমন সমুদ্র বা ডোবা বিচার না করিয়া সকল জলাশয়েই প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি আমি ব্রহ্মাদি সর্বভূতেরই হৃদয়বাসী সুহৃদ্। (২৯০)

হে পাণ্ডব, আমিই এই ত্রিভুবনের জীবন—উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের মূল, বীজ (বৃক্ষের) শাখাদি উৎপন্ন করে, পরে বৃক্ষ বীজের মধ্যেই সমাহিত হয়, তেমনি (আদি) সঙ্কল্প হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি, পরে জগৎ ঐ সঙ্কল্পেই বিলীন হয়; এই ভাবে জগতের বীজ যে অব্যক্ত বাসনারূপ সঙ্কল্প—তাহা কল্পান্তে যেখানে নিক্ষিপ্ত হয়, সে স্থান আমিই; যখন নামরূপ লয়প্রাপ্ত হয়, বর্ণব্যক্তি নষ্ট হয়, জাতির ভেদ থাকে না এবং আকারেরও লোপ হয়, তখন সঙ্কল্প-বাসনার সংস্কার পুনরায় চরাচর রচনা করিবার জন্য যেখানে অমর হইয়া অবস্থান করে, সেই নিধানও আমি।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥১৯

আমি সূর্যরূপে তাপ প্রদান করি, তাহাতে জগৎ শোষিত হয়, পরে ইন্দ্র বা মেঘরূপে বর্ষণ করি, তাহাতে পৃথিবী পুনরায় (জলে) ভরিয়া যায়; অগ্নি কাষ্ঠকে গ্রাস করিলে কাষ্ঠই অগ্নি হইয়া যায়;

যাহা মরণশীল এবং এবং যাহা মৃত্যু ঘটায়—উভয়ই আমার স্বরূপ; এইজন্য যাহারা মৃত্যুর কবলে পড়ে, তাহারা আমারই রূপ; আর যাহারা অমর তাহারা স্বভাবতই আমার স্বরূপ; এখন আর অধিক কি-বলিব? এক কথায় সদসৎ [ব্যক্ত ও অব্যক্ত] সমস্তই জানিবে আমি; সুতরাং হে অর্জুন, এরূপ কোন্ স্থান আছে যেখানে আমি নাই? পরন্তু প্রাণিগণের কেমন দুর্ভাগ্য, তাহারা আমাকে দেখিতে পায় না! (৩০০)

তরঙ্গ কি জল বিনা শুকাইয়া যায়? দীপ বিনা কি সূর্যের রশ্মি দেখা যায় না? তেমনি ইহারা মদ্রূপ হইয়াও আমাকে জানে না,—কি বিস্ময়কর ব্যাপার দেখ! এই বিশ্বের অন্তর-বাহির আমিই ভরিয়া আছি, এই নিখিল জীবজগৎ আমারই ঢালাই-করা মূর্তি, অথচ উহাদের কর্ম এমন প্রতিবন্ধক যে উহারা বলে আমি নাই, যে অমৃতের কূপে পড়িয়া সেখান হইতে আপনাকে বাহিরে আনিতে চায়, সেই দুর্ভাগার জন্য কি করা যায়? হে কিরীটী, একগ্রাস অন্নের জন্য অন্ধ ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং চিন্তামণি পায়ের কাছে পড়িলে অন্ধত্বের জন্য সে তাহা ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, জ্ঞানের অভাবে এই দশাই হয়, সুতরাং জ্ঞান বিনা কোন কর্ম করিলে তাহা সফল হয় না, অন্ধ গরুড়ের পাখা কি তাহার কাজে লাগে? তেমনি জ্ঞান বিনা সৎকর্মের পরিশ্রম বিফলে যায়।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকম্
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥২০

হে কিরীটী, দেখ—যাহারা বর্ণাশ্রম-ধর্মের পথে থাকিয়া আপনারাই বিধিমার্গের কষ্টিপাথর হইয়া যায়, যাহাদের যজ্ঞানুষ্ঠান দেখিয়া বেদত্রয় মাথা নাড়াইয়া সমর্থন করে এবং যাহাদের সম্মুখে যজ্ঞক্রিয়া ফলের সহিত দণ্ডায়মান, এই ভাবে দীক্ষিত হইয়া যাহারা যজ্ঞশেষ সোমরস পান করে, তথাকথিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া তাহারা পুণ্যের নামে পাপই সংগ্রহ করে, তাহারা বেদত্রয় জানিয়া, শতযজ্ঞ করিয়াও যজ্ঞের ফলদাতা আমাকে ভুলিয়া স্বর্গ কামনা করে, (৩১০)

হে কিরীটী, দুর্ভাগা লোক কল্পতরুর তলায় বসিয়া (ভিক্ষার) ঝুলিতে গাঁট দেয়, এবং ভিক্ষা করিতে বাহির হয়, তেমনি শত যজ্ঞ দ্বারা আমাকে যজন করিয়া যদি কেহ স্বর্গসুখ কামনা করে, তাহার সেই যজ্ঞলব্ধ পুণ্য কি যথার্থই পাপ নহে? আমাকে ছাড়িয়া স্বর্গপ্রাপ্তি অ-জ্ঞানীর কাছেই পুণ্যমার্গ, জ্ঞানী তাহাকে 'উপসর্গ' বা কল্যাণের হানি মনে করে, বস্তুতঃ নারকীয় দুঃখের তুলনায় স্বর্গকে সুখ বলা হয়, নতুবা নির্দোষ নিত্যানন্দ শুধু আমারই স্বরূপ। হে অর্জুন, আমার দিকে আসিবার পথে দুটি কুটিল (বক্র) মার্গ আছে—স্বর্গ ও নরকে যাইবার এই দুইটি চোরা পথ; জীব পুণ্যাত্মক কর্মফলে স্বর্গে যায়, পাপাত্মক কর্মফলে নরকে যায় [উভয় কর্মফলই দুঃখের কারণ বলিয়া পাপ], পরন্তু আমাকে যাহাতে পাওয়া যায় তাহাই শুদ্ধ পুণ্য; হে পাণ্ডুসুত, যাহার জন্য মানুষ আমা হইতে দূরে চলিয়া যায় তাহাকে পুণ্য বলিলে কি জিহ্বা খসিয়া পড়িবে না? এখন প্রস্তুতের বিষয় শুন: এইভাবে সকাম কর্মীরা দীক্ষিত হইয়া, আমাকেই যজন

করিয়া স্বর্গভোগ প্রার্থনা করে ; এবং যাহা দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই 'পাপরূপ' পুণ্য অর্জন করিয়া তাহারই সামর্থ্যে স্বর্গে যায়—যেখানে অমরত্বই সিংহাসন, ঐরাবত বাহন, ও অমরাবতী রাজধানী ; (৩২০)

সেখানে মহাসিদ্ধির ভাণ্ডার অমৃতের কুঠরি, সেখানে কামধেনুর পাল আছে ; সেখানে দেবগণ ভৃত্যরূপে সেবা করে, সর্বত্র চিন্তামণি বিছানো, ক্রীড়ার জন্য (চতুর্দিকে) কল্পতরুর উপবন ; সেখানে গন্ধর্বগণ গান করে, রম্ভার ন্যায় অপ্সরাগণ নৃত্য করে, উর্বশী প্রমুখ বিলাসিনীগণ (বিরাজ করে) ; শয়নাগারে মদন সেবা করে, চন্দ্র বদনে চাঁদনি সিঞ্চন করে, বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী ভৃত্যগণ দৌড়াদৌড়ি করে; সেখানে বৃহস্পতি প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ স্বস্তিবাচন করে, বহুসংখ্যক দেবগণ ভাটরূপে স্তুতিগান করে, সেখানে লোকপালগণ পদাতিক সৈন্যের ন্যায় চলে এবং প্রধান নৃপতিগণ (সহিসের ন্যায়) উচ্চৈঃশ্রবাকে হস্তে ধরিয়া অগ্রে গমন করে , অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, যে পর্যন্ত পুণ্যের লেশ মাত্র থাকে, সে পর্যন্ত তাহারা ইন্দ্রের সুখের ন্যায় বহু সুখ ভোগ করে।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥২১

পুণ্যের পুঁজি ফুরাইলে ইন্দ্রত্বের তেজ চলিয়া যায়, এবং জীবকে মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয় ; তাহারই জন্য কপর্দকহীন ব্যক্তিকে বেশ্যা যেমন আর তাহার দ্বারও স্পর্শ করিতে (ঠেলিতে) দেয় না, তেমনি এই কাম্য যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তির লজ্জাকর অবস্থার কথা আর কি বলিব ? এই ভাবে আমার শাশ্বত স্বরূপ ভুলিয়া যাহারা পুণ্য দ্বারা স্বর্গ কামনা করে, তাহাদের অমরত্ব বৃথা হয়, অন্তে তাহারা মৃত্যুলোকই প্রাপ্ত হয়। (৩৩০)

মাতার উদরগহ্বরে বিষ্ঠার বেষ্টনীর মধ্যে পচিয়া, নয় মাস পর্যন্ত সিদ্ধ হইয়া বার বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় ও মরিতে হয় ; জাগ্রত হইলেই স্বপ্নে প্রাপ্ত ধনভাণ্ডার যেমন মিলাইয়া যায়, বেদজ্ঞের (যজ্ঞকর্তার) স্বর্গসুখও তেমনি জানিবে ; হে অর্জুন, বেদবিদ্ হইলেও—আমাকে না জানিলে সবই ব্যর্থ হয়, শস্য ঝাড়ার পর যে ভূষি পড়িয়া থাকে সেইরূপ, এইজন্য যদি আমার স্বরূপের জ্ঞান না হয়, তবে বেদোক্ত ত্রয়ী ধর্মই নিষ্ফল হয়,—এখন আমাকে জানিলে আর কিছু না জানিলেও তুমি সুখী হইবে।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥২২

যাহারা সর্বভাবের সহিত আমাতে চিত্ত সমর্পণ করে,—যেমন গর্ভস্থ শিশু কোন (উদ্যমের) ব্যাপারের কিছুই জানে না, তেমনি যাহাদের আমা ভিন্ন অন্য কিছুই ভাল লাগে না, আমার নামেই যাহারা জীবিত থাকে—এই ভাবে যাহারা অনন্যগতি হইয়া আমাকে স্মরণ করিয়া উপাসনা করে, আমিও তাহাদের সেবা করি ; একাগ্রচিত্ত হইয়া যখন তাহারা আমার ভজনের মার্গ অবলম্বন করে, তখন তাহাদের সম্বন্ধে সমস্ত চিন্তা আমার উপরই আসিয়া পড়ে ; তাহাদের সমস্ত কর্ম

আমাকেই করিতে হয়—যেমন অজাতপক্ষ শাবকের জন্য পক্ষিণী মাতাকেই খাদ্য সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয় ; আপনার ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া মাতাকেই শাবকের কল্যাণের জন্য সব কিছু করিতে হয়, তেমনি যাহারা প্রাণ দিয়া আমাকেই অনুসরণ (ভজনা) করে, তাহাদের সব কিছু আমিই করি ; (৩৪০)

তাহারা যদি আমার সহিত সাযুজ্য-লাভের ইচ্ছা করে, আমি তাহাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করি—কিংবা যদি তাহারা সেবা করিতে চায়, তবে তাহাদের হৃদয়ে প্রেম দান করি ; এইভাবে তাহারা মনে যে যে ভাব (ইচ্ছা) পোষণ করে, আমাকে বারংবার তাহাই পূর্ণ করিতে হয় ; আর তাহাদের যাহা কিছু দেওয়া হয়, আমিই তাহা রক্ষা করি , হে পাণ্ডব, যাহারা সর্বভাবে আমারই আশ্রয় লয়, তাহাদের সমস্ত যোগ-ক্ষেম আমাকেই বহন করিতে হয়।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥২৩

আরও অনেক সাধক সম্প্রদায় আছে, যাহারা আমার সর্বব্যাপক স্বরূপ না জানিয়া অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য, চন্দ্রকে যজন করে , বাস্তবিক তাহাদের ঐ যজ্ঞ আমার উদ্দেশ্যেই কৃত হয়, কারণ এই সমস্ত জগৎ আমিই। পরন্তু তাহাদের ঐ উপাসনা-প্রণালী বিধিসিদ্ধ নহে, উহা বিষম (ভুল) পথ , দেখ, বৃক্ষের শাখাপল্লব কি একই বীজ হইতে উৎপন্ন হয় না ? পরন্তু (বৃক্ষের) মূলই জল গ্রহণ করে—আর মূলেই জল ঢালিতে হয় , একই দেহে দশটি ইন্দ্রিয় আছে, আর ইহারা যে বিষয় ভোগ করে তাহা একই স্থানে যায় , তথাপি উত্তম আহার্য রন্ধন করিয়া কি কানে ঢালিতে হয় ? ফুল আনিয়া কি চক্ষুকে ঘ্রাণ লইতে বলা যায় ? রসাস্বাদন মুখ দিয়াই করিতে হয়, সুগন্ধ নাসিকা দ্বারাই আঘ্রাণ করিতে হয় , তেমনি আমার স্বরূপ জানিয়া আমাকেই যজন করিতে হইবে , নতুবা আমাকে না জানিয়া অন্য যে কোন ভাবে আমার উপাসনা করা ব্যর্থ হয়,—এইজন্য কর্মের জন্য যে জ্ঞানদৃষ্টির আবশ্যক, তাহা নির্দোষ হওয়া প্রয়োজন। (৩৫০)

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥২৪

হে পাণ্ডুসুত, দেখ—এই সমস্ত যজ্ঞোপচারের ভোক্তা আমি ভিন্ন আর কে আছে ? আমিই সকল যজ্ঞের আদি ও অন্ত, পরন্তু আমাকে ভুলিয়া দুর্বুদ্ধি মনুষ্য দেবতাগণকে ভজনা করে ; গঙ্গার জল যেমন (দেব ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে) গঙ্গাতেই অর্পণ করিতে হয়, তেমনি ইহারা আমারই সত্ত্ব আমাকেই দেয়—পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে , এইজন্য হে পার্থ, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয় না। যাহার প্রতি তাহাদের মনের আস্থা (শ্রদ্ধা বিশ্বাস), তাহারা সেখানেই যায়।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫

মন বাক্য ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে দেবতার উদ্দেশ্যে ভজনা করে, শরীরত্যাগের সময় সে সেই দেবরূপই প্রাপ্ত হয় ; অথবা যাহার মন পিতৃব্রতে নিযুক্ত (যে পিতৃলোকের উপাসনা করে), দেহত্যাগের পর সে পিতৃত্ব বরণ করে (পিতৃলোকে যায়) ; কিংবা ক্ষুদ্র দেবতাদি অথবা ভূতগণ

যাহাদের পরম দেবতা, যাহারা অভিচার-মার্গে তাহাদের উপাসনা করে, দেহের যবনিকাপাত হইলে তাহারা ভূতত্বই প্রাপ্ত হয়। এইভাবে সঙ্কল্পবশে ইহারা স্বকর্মের ফল ভোগ করে। পরন্তু যাহারা নয়নে আমাকে দেখে, কর্ণে আমারই নাম শ্রবণ করে, মনে আমাকেই ধ্যান করে এবং বাক্য দ্বারা আমারই স্তুতিগান করে, সর্বাঙ্গে সর্বস্থানে আমাকেই নমস্কার করে, আমারই উদ্দেশ্যে দান-পুণ্যাদি কর্ম করে, (৩৬০)

যাহারা আমার বিষয়ই অধ্যয়ন করে, অন্তরে বাহিরে মদ্রূপ হইয়াই তৃপ্ত হয়, আমারই জন্য জীবন ধারণ করে, শ্রীহরির গুণকীর্তনের জন্যই যাহারা অহংভাব পোষণ করে, আমাকে লাভ করাই যাহাদের জগতে একমাত্র লোভ, যাহারা আমাকে পাইবার ইচ্ছায়ই সকাম, আমার প্রেমেই প্রেমিক, আমারই ভুলে স-ভ্রম হইয়া (আমারই চিন্তায় বিভোর হইয়া) জগৎ ভুলিয়া যায়, আমাকে জানাই যাহাদের শাস্ত্র, আমাকে লাভ করাই যাহাদের মন্ত্র,—এইভাবে যাহারা সর্ব ব্যাপারে আমাকেই ভজনা করে, তাহারা মরণের এপারেই যথার্থভাবে আমার সহিত মিলিয়া যায়, মরণের পরে আমাকে ছাড়িয়া অন্যদিকে কেমন করিয়া যাইবে? এইজন্য যাহারা আমার যজন করে, সেবা-পূজার অছিলায় আপনাকে আমাতেই অর্পণ করে, তাহারা আমার সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে; হে অর্জুন, আমাতে আত্মসমর্পণ বিনা কেহই আমার প্রিয় হইতে পারে না, কোন উপচারে আমাকে বশীভূত করা যায় না। যে আপনাকে জ্ঞানী মনে করে; সে কিছুই জানে না; যে আপন শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করে, সে সত্যই হীন, যে বলে 'আমার আত্মজ্ঞান হইয়াছে' তাহার কিছুই হয় নাই, অথবা হে কিরীটি, যজ্ঞ-দান-তপাদি ক্রিয়ার বাহাড়ম্বর ইহার কাছে একটি তৃণের সমানও নহে; দেখ জ্ঞানের সামর্থ্য দেখিতে গেলে বেদ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি? শেষনাগ হইতে বড় বক্তা আর কেহ আছে? (৩৭০)

সেও আমার শয্যার নীচে চাপা পড়িয়াছে, বেদও 'নেতি নেতি' বলিয়া পিছু হটে, সনকাদি ঋষিগণও এ বিষয়ে (কিছু নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া) পাগল হইয়া যান; তাপসদের কথা বিচার করিলে শূলপাণি মহাদেবের সমকক্ষ কে? তিনিও অভিমান ত্যাগ করিয়া (আমার) চরণ-তীর্থ (গঙ্গাকে) মস্তকে বহন করেন। অথবা সমৃদ্ধির বিচারে লক্ষ্মীর ন্যায় কে আছে? তিনিও আমার ঘরে দাসীর ন্যায়। তিনি যে অমরপুরী নামে খেলার ঘর নির্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণ কি তাঁহার খেলার পুতুল নন? তাঁহার সখ মিটিলে যখন এই খেলাঘর ভাঙা হয়, তখন মহেন্দ্রকেও ভিখারী হইতে হয়। তিনি যে বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই বৃক্ষই কল্পতরু হয়। যাঁহার গৃহে এই প্রকার সামর্থ্যসম্পন্না পরিচারিকা, সেই মুখ্য নায়িকা লক্ষ্মী দেবীরও এখানে আমা ভিন্ন কোন প্রতিষ্ঠা নাই। হে পাণ্ডব, সর্বভাবে সেবা করিয়া, অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তিনি আমার চরণ ধৌত করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইজন্য আপন মহত্ব বা প্রতিষ্ঠা দূরে রাখিয়া বিদ্যার গৌরব ভুলিতে হইবে, এবং যখন জগতে সকলের কাছে ছোট হইবে, তখনই আমার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিবে। হে কিরীটী, সহস্রকিরণ সূর্যের দৃষ্টির সম্মুখে চন্দ্রই লোপ পায়, সেখানে খদ্যোত আপনার তেজের কি বড়াই করিবে? তেমনি যেখানে লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য শোভা পায় না, শম্ভুর তপস্যা বিফল হয়, সেখানে প্রাকৃত অ-জ্ঞানী লোক আমাকে কি করিয়া জানিবে? (৩৮০)

এইজন্য দেহাভিমান পরিত্যাগ করিয়া সকল গুণের প্রতিষ্ঠা 'নিমলোণ'* করিয়া ছাড়িতে হইবে এবং সম্পত্তিমদ (অভিমান) দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬

অসীম প্রেমের উল্লাসে আমাকে অর্পণ করিবার নিমিত্ত যে কোন একটি ফল—যদি আমার ভক্ত আমার কাছে লইয়া আসে, আমি দু' হাত বাড়াইয়া তাহা গ্রহণ করি, এবং তাহার বোঁটা না ফেলিয়াই অত্যন্ত আদরে তাহা ভক্ষণ করি, আর ভক্তিসহকারে আমাকে যদি কেহ একটি ফুল দেয়, তাহা আমার আঘ্রাণ করাই উচিত, পরন্তু তাহাও আমি মুখে ফেলিয়া দিই; ফুলের কথা থাকুক, যে কোন একটি পত্রও যদি প্রেমের সহিত কেহ অর্পণ করে—তাহা তাজাই হউক কি শুষ্কই হউক—যদি দেখি তাহা (সর্বভাবে) ভক্তির রসে ভরা, তাহা হইলে ক্ষুধিত ব্যক্তি যেমন অমৃত সেবন করিয়া তুষ্ট হয়, তেমনি ঐ পত্রটি সুখে ভোজন করিতে আরম্ভ করি। অথবা এমন যদি হয়, যে একটি পত্রও জোটে না, তবে জলের তো কোন অভাব হয় না? জল যেখানে সেখানে—বিনা মূল্যে বিনা পরিশ্রমে পাওয়া যায়, ঐ জলই যদি সর্বস্ব মনে করিয়া (প্রেমসহকারে) কেহ আমাকে অর্পণ করে, তবে আমি মনে করি সেই ভক্ত আমার জন্য বৈকুণ্ঠ হইতেও বিশাল মন্দির নির্মাণ করিয়া দিল, কৌস্তুভ হইতেও উজ্জ্বল অলঙ্কারে আমাকে সজ্জিত করিল; আমি মনে করি যেন আমার জন্য ক্ষীরাব্ধির ন্যায় মনোহর দুগ্ধের শয্যা রচনা করিল; (৩৯০)

কর্পূর, চন্দন, অগুরু ইত্যাদি সুগন্ধের মহামেরু রচনা করিয়া সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল বর্তিকায় দ্বারা যেন দীপমালা সাজাইয়া দিল, যেন গরুড়ের ন্যায় বাহন, কল্পতরুর উদ্যান, কামধেনুরূপ গোধন আমাকে দান করিল; যেন অমৃত হইতেও সুরস (রসাল) বহুপ্রকারের পক্কান্ন আমাকে পরিবেশন করিল—ভক্তের এক বিন্দু জলের অর্ঘ্যে আমার এমনি পরিতোষ হয়! হে কিরীটী, আরও কি বলিতে হইবে? তুমি জানো এক কণা চিপিটকের জন্য আমি সুদামার বস্ত্রের গ্রন্থি খুলিয়াছি। আমি শুধু ভক্তিই জানি, যেখানে ভক্তি আছে সেখানে আমি ছোট বড় বিচার করি না। যে কেহ হউক না কেন, আমি তাহার ভাবই গ্রহণ করি। পত্র, পুষ্প, ফল—এ সব উপাসনার উপকরণ মাত্র, 'নিষ্কল' (নিরুপাধি) ভক্তিতত্ত্বই আমাকে প্রাপ্ত করায়; অতএব হে অর্জুন, শুন, তোমাকে একটি সহজ উপায় বলিতেছি, তুমি কখনও আপন মনোমন্দিরে আমাকে বিস্মৃত হইও না।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ২৭

যে কোন ব্যাপার (কর্ম) করিবে, যে কোন ভোগ্য (বিষয়) উপভোগ করিবে, নানা প্রকার যজ্ঞে যাহা যজন করিবে, অথবা পাত্রবিশেষে যাহা দান করিবে, সেবকজনের জীবিকা-নির্বাহের জন্য যাহা প্রদান করিবে, তপাদি সাধন বা ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে, এ সমস্ত ক্রিয়া—যাহা স্বাভাবিক ভাবে আসিয়া পড়িবে, সে সমস্তই ভক্তিভাবে আমারই উদ্দেশ্যে করিবে। (৪০০)

*ভূতাপসারণের জন্য নিমপাতা ও নুন একত্র করিয়া সন্তানের মুখের চারিদিকে ঘুরাইয়া ফেলিয়া দেওয়া।

পরন্তু এই সব কর্ম করিবার সময় আপনার অন্তরে নিজের স্মৃতিও যেন না থাকে (কর্তৃত্বের অহংকার থাকিবে না), এই ভাবে সেই সমস্ত কর্ম নিঃশেষে আমার হস্তে অর্পণ করিবে।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮

অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয় না, তেমনি আমাকে অর্পণ করিলে এই শুভাশুভ কর্ম ফলপ্রদ হইবে না। যেটুকু কর্ম অবশিষ্ট থাকে, তাহা সুখদুঃখরূপ ফল প্রসব করে এবং তাহা ভোগ করিবার জন্য একটি দেহধারণ করিতে হয়; ঐ সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করিলে তখনই জন্মমরণ শেষ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জন্মের সহিত যে কষ্ট ভোগ করিতে হয় তাহারও অন্ত হইবে, সেইজন্য হে অর্জুন, তোমাকে এই সহজ সন্ন্যাস-যুক্তি প্রদান করিলাম—যাহাতে আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির বিলম্ব না হয়, ইহাতে দেহবন্ধনে পড়িবে না, সুখদুঃখের সাগরে ডুবিবে না, আমারই সুখ-স্বরূপে অনায়াসে মিলিত হইবে।

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯

যদি প্রশ্ন কর, আমি কেমন? তবে (তাহার উত্তর এই যে) আমি সর্বদা সমভাবাপন্ন, আমার আপন বা পর এরূপ ভেদভাব নাই; যাহারা এইভাবে আমাকে জানিয়া অহঙ্কারের আধার ভাঙিয়া কর্ম করিয়া অন্তরের সহিত আমাকে ভজনা করে, তাহারা দেহ ধারণ করিয়া দেহের ব্যাপার করিতেছে দেখা যায়, পরন্তু তাহারা দেহে থাকে না, আমাতেই অবস্থান করে এবং আমিও সমগ্র-ভাবে তাহাদের হৃদয় ভরিয়া থাকি। সবিস্তার বটবৃক্ষ যেমন বীজ-কণিকার মধ্যে থাকে, আর বীজ-কণাও যেমন বটবৃক্ষের মধ্যে থাকে, (৪১০)

তেমনি আমার ও তাহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ, শুধু বাহিরের নামেই পার্থক্য, নতুবা অন্তরের বস্তুবিচারে আমার ও তাহাদের মধ্যে কোনও ভেদ নাই (তাহারা ও আমি একই), ধার-করা অলঙ্কার যেমন শরীরের উপরেই শোভা পায় (উহাতে কোন মমত্ববুদ্ধি থাকে না), তেমনি তাহারাও উদাসীন হইয়া দেহধারণ করে; ফুলের সৌরভ বায়ুর সঙ্গে চলিয়া গেলে যেমন গন্ধহীন ফুলটি বোঁটার উপর থাকে, তেমনি তাহাদের দেহ আয়ু শেষ হইবার অপেক্ষায় থাকে; হে পাণ্ডব, তাহার সমস্ত অভিমান মদ্ভাবে আরূঢ় হইয়া (মদ্ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া) আমাতেই লীন হয়।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০

এমনিভাবে—প্রেমসহকারে যে আমার ভজনা করে, সে যে কোনও জাতির হউক না কেন—তাহাকে আর শরীর ধারণ করিতে হয় না; হে মহাবীর অর্জুন, আচরণ দেখিতে গেলে, সে নিকৃষ্টতম দুরাচারী হইলেও যদি ভক্তির পথে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকে; অন্তকালের বুদ্ধিই পরজন্মের গতি নির্ধারণ করিয়া থাকে—সেই জন্য যে শেষকালে আপন

জীবন ভক্তিকেই সমর্পণ করিয়া দেয়; সে পূর্বে দুরাচারী হইলেও তাহাকে সর্বোত্তম বলিয়া জানিবে,—যেমন কেহ যদি বন্যার জলে ডুবিয়াও মৃত্যুমুখে না পড়িয়া জীবিত অবস্থায় তীরে উঠিয়া আসে, তাহার যেমন ডুবিয়া যাওয়া নিরর্থক বা নিষ্ফল হয়, তেমনি অন্তে যদি ভক্তিকে আশ্রয় করা যায় তবে পূর্বকৃত পাপ ধৌত হইয়া যায়; এই জন্য পূর্বে দুষ্কৃতিকারী (দুরাচারী) হইলেও অনুতাপতীর্থে স্নান করিয়া ভক্ত (শুদ্ধ হৃদয়ে) সর্বভাবে আমার স্বরূপে প্রবেশ করে; (৪২০)*

তখন তাহার কুল পবিত্র হয়, আভিজাত্য নির্মল হয়, এবং তাহার জন্ম সফল হয়, সে তখন (কিছু না করিয়াও) সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে, তপশ্চরণ শেষ করিয়াছে, অষ্টাঙ্গ যোগ অভ্যাস করিয়াছে; আর অধিক কি বলিব? হে পার্থ, আমার উপর যাহার অখণ্ড আস্থা (প্রেম, বিশ্বাস) সে সর্বথা কর্মের ঝঞ্ঝাট উত্তীর্ণ হইয়াছে, হে কিরীটী, সে সমস্ত মনোবুদ্ধির ব্যাপার একনিষ্ঠারূপ পেটিকায় ভরিয়া আমারই মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে (রাখিয়া দিয়াছে)।

* বন্ধনীর সংখ্যাগুলি মূল 'জ্ঞানেশ্বরী'র অধ্যায়ান্তর্গত শ্লোকসংখ্যা।

'ভূমৈব সুখম্'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তোমাতে আমার চিত্ত যুক্ত হ'য়ে থাক
অহোরাত্র আর সব দিগন্তে মিলাক্।
তুমি যে অনন্ত! আর আমরা ভূমার
কাঙাল; বুভুক্ষু প্রাণ করে হাহাকার
তাইতো সীমার মাঝে; অল্পে কোথা সুখ?
বিত্ত দিয়ে, খ্যাতি দিয়ে ভরে না তো বুক!
স্নেহে-প্রেমে শূন্য হিয়া পূর্ণ কভু হয়?
মৃত্যুর ছায়ায় কাঁদে মানব-হৃদয়
অমৃতের পিপাসায়। মাটির পিঞ্জরে
স্বর্গের সে কোন্ পাখী গুমরিয়া মরে।
নিজেরে চিনি না ব'লে এত দুঃখ পাই।
নিজেরে জানি না ব'লে ভুল ক'রে চাই
যাহা ছায়া, যার মাঝে মৃত্যুর যাতনা;
জানাও, ভূমাতে শুধু আত্মার সান্ত্বনা।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রাচীন ভারত

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

(১)

রবীন্দ্রনাথের কাব্যচেতনার মূলে সুদূরপ্রসারী ও বিচিত্র কল্পনা; কিন্তু নিছক কল্পনার জাল বুনেই কবি-প্রতিভা নিঃশেষিত হয়নি। কালিদাস ও কীটসের মতো তীব্র সৌন্দর্যানুভূতি তাঁর কবি-কল্পনাকে করেছে সমৃদ্ধ, শেলীর মতো সর্ব-বন্ধনমুক্ত জীবনের উপলব্ধি তাঁর কাব্যে সঞ্চার করেছে প্রচণ্ড আবেগ. দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবনের রহস্য অনুসন্ধানে তাঁর কাব্য হয়েছে তাৎপর্যময়, চিরন্তনী প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভবে তিনি আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন কালিদাস ও ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের সঙ্গে, প্রেমের সূক্ষ্ম রহস্য বিশ্লেষণে তিনি ব্রাউনিঙের সমধর্মী, আবার শিশুমনের রহস্য-জগতেও তিনি বিচরণ করেছেন পাশ্চাত্য নাট্যকার মেতারলিঙ্ক ও বেরির মতো। রবীন্দ্র-মনের এ বিপুল প্রসার তাঁর সৃষ্টিতে এনে দিয়েছে বৈচিত্র্য, কিন্তু বৈচিত্র্যই রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়., রবীন্দ্র সাহিত্যকে বিশিষ্টতা দান করেছে অন্তঃস্তব্ধ ভাব-গভীরতা, আর জগৎ ও জীবনের প্রতি ঋষি-জনোচিত প্রজ্ঞাদৃষ্টি। সে অনন্তবিস্তারী দৃষ্টি দিয়ে কবি অবিচ্ছিন্ন সেতু রচনা করেছেন জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে, স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে, বর্তমান ও অতীতের মধ্যে। প্রাচীন ভারতের বিচিত্র জীবনধারা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কখনও ফিরে আসেন বর্তমান ভারতে, আবার বর্তমান ভারতের কর্মচঞ্চল জীবন-প্রবাহের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি কল্পনায় ফিরে যান প্রাচীন ভারতের সুগভীর শান্তি ও মৌনমহিমায় স্তব্ধ ভাব-জীবনে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে বর্ণিত সে ভারত কর্মে উত্তেজনাহীন, ধর্ম-উপলব্ধিতে প্রশান্ত, শ্রী ও সমৃদ্ধিতে জ্যোৎস্না-স্নাত শারদ প্রকৃতির মতোই মাধুর্যময়। সে স্বপ্নের ভারত রবীন্দ্র-সাহিত্যে কী গৌরবদীপ্তি নিয়ে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল তাই এখানে আমাদের আলোচ্য।

(২)

রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে জীবন যেমন দেশকালের সীমোত্তীর্ণ একটি সক্রিয় সত্তা, তেমনি দেশকেও দেখেছেন কবি একটি বিস্তৃত কালের পটভূমি-কায়। অতীত হ'তে বর্তমানের মধ্য দিয়ে দেশ অগ্রসর হ'য়ে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। প্রাচীন কালে ভারত যখন স্বাধীন ছিল, তখন ভারতবাসীও ছিল অখণ্ড জীবন-দৃষ্টির অধিকারী। কবির সমকালে পরাধীন ভারত হারিয়ে ফেলেছে সে অখণ্ড জীবনবোধ, তার ফলে ভারতের বর্তমান জীবন শত সহস্র তুচ্ছতার আঘাতে ধূল্যব-লুণ্ঠিত। একটা মহান্ জীবনাদর্শ হ'তে বর্তমান ভারতবাসীর এ মর্মান্তিক স্খলন রবীন্দ্রনাথের ভারতপ্রেমিক কবিচিত্তে জাগিয়েছে দুঃসহ বেদনা-বোধ। তাই তিনি বার বার পরমশক্তিমান্ বিশ্বপিতার নিকট প্রার্থনা করেছেন—বর্তমান অধঃপতিত ভারতকে প্রাচীন ভারতের অখণ্ড জীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। কবির সমগ্র 'নৈবেদ্য'-কাব্যে আধুনিক মোহাচ্ছন্ন ভারতকে প্রাচীন ভারতের সে সম্পূর্ণ জীবন-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত।

নানা লৌকিক সংস্কারে অন্ধ মানুষের জন্যে কবির এ মুক্তিস্বপ্ন বর্তমান যুগে নতুন নয়। রবীন্দ্রনাথের সমধর্মী ইংরেজ কবি শেলীও

সংকীর্ণ জীবন-পল্বলে আবদ্ধ মানুষের মধ্যে একটা বন্ধনমুক্ত ভাব-জগতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিপ্লবী কবির সে জগৎ-চেতনা গগনস্পর্শী কল্পনায় সমৃদ্ধ হলেও সাধারণ মানুষের কাছে তা একটা নির্বিশেষ ভাবসত্য বলেই মনে হয়। আবার টেনিসনের কাব্যে স্বদেশের রূপ এত বাস্তব ও এত সংকীর্ণ যে তাতে কাব্যের উন্মুক্ত প্রসার ও বেদনা নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে স্বদেশ-চিত্র কবির অখণ্ড জীবনচেতনা ও বেদনায় স্পন্দমান। সে সামগ্রিক জীবনবোধকে কাব্যোচিত উৎকর্ষ দান করেছে বাস্তব জীবনের বর্ণবৈচিত্র্য, আবার মাহাত্ম্য দান করেছে অপরূপ জীবনের সৌন্দর্য।

সে মহাজীবনের অধিকারী হয়েছিল প্রাচীন ভারত ত্যাগ ও বীর্যের সাধনার দ্বারা, সমস্ত তুচ্ছতা ও গ্লানির উর্ধ্বে অবস্থান ক'রে, সে শাশ্বত জীবনবোধ যুগে যুগে উদ্বোধিত করেছে ভারতবাসীকে একটা আদর্শ জীবনের পিপাসায়। সে মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনের পরিচয় ভোগাকাঙ্ক্ষাহীন ইতিহাস-বিশ্রুত রাজার জীবনে আর ঋষির তপোবনে। বর্তমান ভারতের খণ্ডিত জীবন-চেতনা তাই অনন্ত জীবনের অভিলাষী কবি-চিত্তকে ব্যাকুল ক'রে তুলেছে সে মুক্ত জীবনের জন্যে, তারই ব্যঞ্জনা :

দাও আমাদের অভয়মন্ত্র
অশোকমন্ত্র তব,
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র
দাও গো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব,
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব।

(৩)

পরিপূর্ণতার সাধনাই ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনার চরমাদর্শ। সেজন্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে কবি জীবনের একমাত্র মুক্তিপথ ব'লে ভাবতে পারেননি। বর্তমান যুগে শ্রীঅরবিন্দের জীবনে কবি দেখেছিলেন বাস্তবতা ও আদর্শের এক অপূর্ব সম্মেলন।—স্বদেশের পরাধীনতার অসহ্য বেদনা যেমন করেছিল তাঁর বন্ধন-অসহিষ্ণু মনকে বিপ্লবী, তেমনি মানবাত্মার পূর্ণ স্ফূর্তির পথ আবিষ্কারের জন্যে তিনি বরণ করেছিলেন নিঃসঙ্গ-কঠোর তপোব্রত জীবন। ভাব ও কর্মের এ দুর্লভ সমন্বয়ই রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ অন্তরকে সবলে আকর্ষণ করেছিল শ্রীঅরবিন্দের অখণ্ড জীবন-সাধনার দিকে। এ মুক্তি-সাধককে নমস্কার জানাতে গিয়ে কবি বলেছেন :

আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন।
সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছ দেশের হ'য়ে অকুণ্ঠ আশায়
সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে।

এ পরিপূর্ণতার আদর্শে প্রত্যয়ী কবি তাই প্রাচীন ভারতে যে স্থির জীবন-মূল্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, তা প্রধানতঃ ভোগস্পৃহাহীন ধর্মবোধ ও ত্যাগের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আজ এই সভ্যতা-গর্বিত বিংশ শতাব্দীতে শুধুমাত্র সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষমতালোভী জাতির জীবনে নেমে এসেছে বিদ্বেষের কালো ছায়া। আর পরিপূর্ণ মানবতার উপাসক প্রাচীন ভারত বিশ্বের আর্য অনার্য সমস্ত জাতিকে সস্নেহে আহ্বান করেছিল একটা মহাজাতি-গঠনের স্বপ্নে। অতীত ভারতের এ বিশ্বমৈত্রী-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এ

যুগের কবি রবীন্দ্রনাথও সমস্ত বিশ্ববাসীকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এ পুণ্যভূমি ভারততীর্থে। কবি-কল্পনায় ভারতলক্ষ্মীর রূপ-পরিকল্পনাও সংকীর্ণ দেশকালের সীমারেখার বহু উর্ধ্বে— ভারত-জননী শুধু ভারতবাসীর বন্দিতা মাতা নন, তিনি বিশ্বেরও জননী।

ভারতবর্ষের এ গৌরবদীপ্ত মূর্তি-কল্পনায় কবি যদি শুধুমাত্র ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হতেন, তাহলে ইতিহাসের সত্যানুসন্ধিৎসুর কাছে তার বিশেষ কোন মূল্য থাকত না। কিন্তু ইতিহাস-পাঠকমাত্রই জানেন, সুদূর অতীতে প্রাচীন ভারতবর্ষই সমস্ত পৃথিবীকে সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রথম আলো দেখিয়েছিল। কবির অনুভূতিতে বিশ্বদেবতা তাই দেখা দিয়েছেন তাঁর স্বদেশের প্রিয়মূর্তিতে :

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে ?
দেখিনু তোমারে পূর্ব গগনে
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।

বিশ্বসভ্যতার পথপ্রদর্শক এ প্রাচীন ভারত সাময়িকভাবে আজ অধঃপতিত হলেও কবি ঐতিহ্যগৌরবমণ্ডিত এ দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী হারাননি। যে মঙ্গল-সাধনা ও সত্যোপাসনা প্রাচীন ভারতকে করেছিল বিশ্ববাসীর কাছে বরেণ্য, ভাবীকালে সে ভারত বিরোধ-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর মধ্যে আবার এনে দেবে শান্তির অভয়বাণী :

নয়ন মুদিয়া ভাবীকাল পানে
চাহিনু শুনিনু নিমেষে—
তব মঙ্গল বিজয় শঙ্খ
বাজিছে আমার স্বদেশে।

(৪)

শুধু ইতিহাসের বস্তু-জগতে নয়, সাহিত্যের ভাবঘন রস-জগতেও কবি অনুসন্ধান করেছেন প্রাচীন ভারতবর্ষের বিচিত্র রূপ। বেদ-উপনিষদের মধ্য দিয়ে যে প্রাচীন ভারতকে দেখা যায়, সে ভারত জ্ঞান ও কর্মে বৃহৎ; আর ক্লাসিক সাহিত্যে যে ভারতের পরিচয় পাওয়া যায়, সে ভারত সৌন্দর্য ও মাধুর্যে আনন্দঘন। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' ও 'মেঘদূত' কাব্যে সে সৌন্দর্যের জগৎ চিত্রিত হয়েছে বিচিত্র বর্ণানুলিম্পনে। সে হিংসা-দ্বেষহীন, লাভালাভ ও জয়-পরাজয়ের সংগ্রামহীন, শান্তি প্রীতি ও শ্রী পরিপূর্ণ জীবন-পরিকল্পনায় ক্লাসিক কবির কল্পনাতিশয্য যে ছিল না, তা জোর ক'রে বলা চলে না। কিন্তু সে শান্ত ছন্দে প্রবহমাণ জীবন প্রবাহের প্রতি শান্ত রসের কবি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ সহজাত ও দুর্নিবার। রবীন্দ্রনাথের এ কাল্পনিক অতীত-প্রীতির ভেতর আধুনিক সমাজতান্ত্রিক সমালোচক একটা পলায়নী মনোবৃত্তির ভাব আবিষ্কার করবেন, সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ অতীত জীবন-প্রীতির মধ্যেই নিহিত আছে— রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের একটা অভ্রান্ত সংকেত। কোন সময়ে হালকা হাসির বুদ্বুদের মধ্য দিয়ে, আবার কোন সময় মেঘমন্দ্র-শব্দিত ছন্দ ও গম্ভীর শব্দ-বিন্যাসের মধ্যে কবি তাঁর সে ধ্যানের ভারতকে মূর্ত ক'রে তুলেছেন বহু কাব্য ও কবিতায়।

সুগভীর ঐতিহ্যপ্রীতি নিয়ে এ ধরনের রস-সমৃদ্ধ কবিতা বিশ্ব-সাহিত্যে বিরল। একজন রবীন্দ্র-সমালোচক সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন : Longfellowর Divina Commedia বা Keats-এর Ode to the Grecian Urn-এর মত বিখ্যাত রোমান্টিক কবিতায়ও রবীন্দ্রনাথের এ শ্রেণীর কাব্যের রসের দীপ্তি বা কল্পনার সমগ্রতা নেই। (দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথ ; ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)

'মানসী'র অন্তর্গত 'মেঘদূত' কবিতায় ভেতর কবি জীবন্ত ক'রে তুলেছেন মন্দাক্রান্তা ছন্দে

প্রবাহিত কালিদাসের প্রাচীন ভারতকে, আর 'কল্পনা'র 'স্বপ্ন' কবিতায় প্রাচীন উজ্জয়িনীতে কবির মানস অভিসার অপরূপ কাব্য-সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু উভয় কবিতাতেই দেখি বর্তমানের বাস্তব আঘাতে কবির স্বপ্ন-কল্পনা হয়েছে খণ্ডিত, আর এ স্বপ্নভঙ্গের বেদনা একটা মর্মান্তিক আর্তনাদের মধ্য দিয়ে লাভ করেছে করুণ পরিসমাপ্তি। কবি-অন্তরের এ বেদনার হাহাকার পাঠকের সংবেদনশীল অন্তরেও ফেলে বেদনার একটা দীর্ঘ ছায়া।

রবীন্দ্র-কাব্যে প্রেমানুভূতিকেও বিস্তৃতি দিয়েছে প্রাচীন ভারতীয় কাব্যপুরাণ-বর্ণিত চিরন্তন প্রেমকাহিনী। প্রথম যুগের কাব্য-কবিতায় কবি সে সুপ্রাচীন প্রেম-কাহিনীকে সবিস্তার রূপ দিয়ে যেন আত্মতৃপ্তি অনুভব করেছেন, আর প্রেমকাব্য-রচনার শেষ পর্যায়ে সে বিস্মৃত অতীতের প্রেমানুভূতিকে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে রূপান্তরিত করেছেন শুধুমাত্র সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার সাহায্যে। 'মহুয়া' কাব্যের 'সাগরিকা' কবিতা হ'তে শুধু একটি মাত্র উদাহরণ দেব। সংশয়ের স্তরোত্তীর্ণ বালিসুন্দরী নবাগত ভারত-পুরুষের দিকে যখন অনুরাগের দৃষ্টিতে চাইল, সে দৃষ্টিকে তুলনা করেছেন কবি ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসির সঙ্গে। এ অবস্থায় এর চাইতে চমৎকার ইঙ্গিতময় অনুরাগের বর্ণনা বোধ হয় আর হ'তে পারত না। শুধু এ কবিতায় কেন, কবির শেষ পর্যায়ের আরও বহু প্রেম-কবিতায় কবি প্রেমানুভূতিকে মাধুর্য ও গভীরতা দান করেছেন প্রাচীন ভারতের আরও বহু প্রেম-চিত্রের প্রেক্ষাপটে।

(৫)

প্রাচীন ভারতের সঙ্গে জাগরণোন্মুখ নবীন ভারতের পরিচয়-সাধনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ' নামক গ্রন্থে। দেশে তখন জাতীয়তাবোধের উন্মত্ত বন্যা প্রবাহিত হয়েছে। নেতারা 'পোলিটিক্যাল এজিটেশন' ক'রে অত্যাচারী বিদেশী শাসকের কাছ থেকে স্বাধীনতা আদায় করতে ব্যস্ত। কিন্তু দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ অনুভব করলেন শুধুমাত্র উদ্দীপনা, উত্তেজনা ও আন্দোলনের সাহায্যে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা যাবে না, প্রকৃত জাতীয় মুক্তির জন্যে চাই—প্রথমে উত্তেজনাহীন গভীর স্বদেশ-চিন্তা ও গঠনমূলক কাজ। ঐতিহ্যভ্রষ্ট জাতির পক্ষে একটা নতুন জাতীয় জীবনের সৌধ নির্মাণ করবার চেষ্টা শূন্যে ফুলের ফসল ফলাবার ইচ্ছার মতোই অর্থহীন। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েও শেষ পর্যন্ত সে আন্দোলন হ'তে সরে দাঁড়ালেন। জীবনের এ পথ-পরিবর্তন কোন ভীরুতার ফলে নয়, বরং নতুন ভাবান্দোলনের সাহায্যে জাতীয় চিত্তে নবজাগ্রত স্বাদেশিকতার প্রেরণাকে একটা বলিষ্ঠ ভিত্তির ওপর স্থাপন করবার উদ্দেশ্যে। জাতীয় জীবনের শক্তি ও বলের উৎস খুঁজে পেলেন তিনি প্রাচীন ভারতের স্থির জীবনাদর্শের মধ্যে। সে ভারত জ্ঞানে কর্মে ও চিন্তায় মহান্, বীর্যে ক্ষমায় প্রেমে তেজোদীপ্ত, ভোগে সংযমে ও বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ জীবন-চেতনার আশ্রয়স্থল। সে ভারতের পরিচয় তুলে ধরলেন তিনি 'স্বদেশ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'নূতন ও পুরাতন', 'নববর্ষ', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা', 'ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি সুচিন্তিত প্রবন্ধে। স্বদেশ-চেতনার একটা নতুন রূপ দেখা গেল এ সমস্ত প্রবন্ধে। শক্তিমান্ প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্য দিয়ে তিনি দেখালেন, কী ধর্মপ্রেরণায়, কী সমাজচিন্তায়, কী রাষ্ট্রচিন্তায়—প্রাচীন ভারত আধুনিক য়ুরোপ হ'তে কোন অংশেই হীন ছিলনা, বরং সে সুদূর অতীতে ভারতীয় সংস্কৃতি আলো বিকীর্ণ করেছে সমস্ত পৃথিবীতে।

বর্তমান য়ুরোপ কর্মসফলতাকেই জীবনের চরম লক্ষ্য ব'লে অনুভব করেছে, তাই অবিচ্ছিন্ন কর্মপ্রয়াসেই তার আনন্দ, স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে য়ুরোপের কৌতূহল সীমাবদ্ধ। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে প্রাচীন ভারতবর্ষ তদানীন্তন পৃথিবীর চাঞ্চল্য থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, তাই বহিঃসংঘাতহীন অচঞ্চল চিত্তে অন্তর্জগতের গভীর রহস্য অনুসন্ধানে তৎপর হয়েছিল। ভারতের এ আন্তর সাধনার পরিচয়-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

'জগৎ যেমন অসীম, মানবের আত্মাও তেমনি অসীম, যাঁরা সেই অনাবিষ্কৃত অন্তর্দেশের পথ অনুসন্ধান করেছিলেন তাঁরা যে নতুন কোন সত্য, নতুন আনন্দ লাভ করেননি, তাহা নিতান্ত অবিশ্বাসীর কথা।'

'ভারতবর্ষ সুখ চায়নি, সন্তোষ চেয়েছিল; তাহা পেয়েওছে, এবং সর্বতোভাবে সর্বত্র তার প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেছে।'

এ সূক্ষ্ম অন্তর্জগতের অনুসন্ধানী প্রাচীন ভারতীয় মন যে জীবনবিমুখ ছিল—পাশ্চাত্য সভ্যতাবিলাসীর এ আধুনিক বিশ্বাস যে শুধু অশ্রদ্ধেয় নয়, অসত্যও—মহাভারতের জীবন-পরিচয় বিশ্লেষণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ তা প্রমাণ করেছেন :

'এক মহাভারত পড়লেই দেখতে পাওয়া যায়, আমাদের তখনকার সভ্যতার মধ্যে জীবনের আবেগ কত বলবান্ ছিল। তার মধ্যে কত পরিবর্তন, কত সমাজ-বিপ্লব, কত বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ দেখতে পাওয়া যায়। সে সমাজে একদিকে লোভ, হিংসা, ভয়, দ্বেষ, অসংযত অহংকার—অন্যদিকে বিনয়, বীরত্ব, আত্মবিসর্জন, উদার মহত্ত্ব এবং অপূর্ব সাধুভাব মনুষ্য-চরিত্রকে সর্বদা জাগ্রত ক'রে, মথিত ক'রে রেখেছিল।... সেই বিপ্লব-সংক্ষুব্ধ বিচিত্র মনোবৃত্তির সংঘাত দ্বারা সর্বদা-জাগ্রত শক্তিপূর্ণ সমাজের মধ্যে আমাদের প্রাচীন ব্যূঢ়োরস্ক, শালপ্রাংশু সভ্যতা উন্নত মস্তকে বিহার ক'রত।'

একটা উদার শান্তি ও অচঞ্চল স্তব্ধতাই ছিল প্রাচীন ভারতীয় জীবনের সকল শক্তির মূলে। 'নববর্ষে' কবি নবীন ভারতকে সেই অন্তঃস্তব্ধ প্রাচীন ভারতের বলিষ্ঠ জীবন-চেতনার বাণী উপলব্ধি করবার জন্যে অনুপ্রাণিত করেছেন সরল ভাষায় :

'যাহা আমাদের সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, তাহা বলিষ্ঠ-ভীষণ, তাহা দারুণ সহিষ্ণু, উপবাস-ব্রতধারী, তাহার কৃশ পঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত, অশোক, অভয় হোমাগ্নি এখনও জ্বলিতেছে। ...এই সঙ্গী-হীন নিভৃতবাসী ভারতবর্ষকে আমরা জানিব, যাহা স্তব্ধ তাহা উপেক্ষা করিব না, যাহা মৌন তাহাকে অবিশ্বাস করিব না, যাহা বিদেশের বিপুল বিলাস-সামগ্রীকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারা অবজ্ঞা করে—তাহাকে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিব না, করজোড়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিব, এবং নিঃসন্দেহে তাহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া স্তব্ধভাবে গৃহে আসিয়া চিন্তা করিব।'

ভারতীয় মুক্তি ও য়ুরোপের freedom-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'এই যে কর্মের বাসনা, জনসংঘের সংঘাত ও জিগীষার উত্তেজনা হইতে মুক্তি—ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে ব্রহ্মের পথে ভয়হীন, শোকহীন, মৃত্যুহীন, পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে। য়ুরোপ যাকে 'ফ্রীডম্' বলে সে মুক্তি ইহার কাছে নিতান্তই ক্ষীণ; সে মুক্তি চঞ্চল, দুর্বল, ভীরু; তাহা স্পর্ধিত, তাহা নিষ্ঠুর—তাহা পরের প্রতি অন্ধ, তাহা ধর্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করে না এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিকৃত করিতে চাহে।...এই দানবীয় 'ফ্রীডম্' কোন কালে

ভারতবর্ষের তপস্যার চরম বিষয় ছিল না।... এই 'ফ্রীডমের' চেয়ে উন্নততর—বিশালতর যে মহত্ব—যে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্যার ধন, তাহা যদি পুনরায় আমরা সমাজের মধ্যে আবাহন করিয়া আনি—অন্তরের মধ্যে আমরা লাভ করি, তবে ভারতবর্ষের নগ্ন চরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড় বড় রাজমুকুট পবিত্র হইবে।'

এ গৌরবদীপ্ত প্রাচীন ভারতের মাহাত্ম্য উপলব্ধি ক'রে কবি প্রত্যয়ান্বিত হলেন নবীন ভারতের ভবিষ্যৎ-সম্পর্কে। এত প্রাচীন ও মৃত্যুঞ্জয় জীবনাদর্শের অধিকারী যে দেশ, সে দেশের সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয় সুনিশ্চিত। ১৩০৯ সালের নববর্ষে শান্তিনিকেতনে ভারতের ভবিষ্যৎ বিষয়ে তিনি যে অভয়বাণী প্রচার করলেন, উত্তরকালে রাজনৈতিক মুক্তির দিক দিয়ে অন্ততঃ তা সত্য ব'লে প্রমাণিত হয়েছে :

'জয় হইবে, ভারতবর্ষের জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্বাক্, তাহারই জয় হইবে।'

প্রাচীন ভারত-চিন্তা রবীন্দ্রনাথের সুদূর-প্রসারী ও রোমান্টিক ভাব-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত ক'রে শুধুমাত্র তাঁর কাব্যকেই সমৃদ্ধ করেনি, দেশের মননশীল চিন্তাকেও জাগরিত করেছে একটা বিরাট সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের অভিমুখে।

সূর্য-প্রণাম

শ্রীশুভ গুপ্ত

প্রভাতের স্পর্শ লাগে ঘুম-ভাঙা চোখে,
হে তপন, জীবনের হে স্বর্ণ-দিশারী!
ভাঙো ভাঙো মূঢ় স্বপ্ন অবচেতনার,
এ অসহ ক্লান্তি হ'তে ত্রাণ করো মিতা,
প্রাণের আকাশে দাও গানের আলোক।
কিছু তো বুঝি না বন্ধু, কোথায় বেদনা,
কোথায় মৃত্যুর মন্ত্র জপে অন্ধকার,
বারংবার পরাজিত অবসন্ন দেহে
দুঃখদাহে প্রদীপের জ্বেলেছি যে শিখা,
তাহারে নিভাতে চায় সে কোন্ নির্মম,
অন্তরের অন্তঃশায়ী কোন্ মৃত্যুদূত।
দেহ হ'তে মন হ'তে ঊর্ধ্বে তুলে নাও,
তোমারি বিমল জ্যোতি আত্মার আত্মীয়,
মেঘ-ম্লান আবরণ দূর করো তার,
বুকে টেনে করো তারে তোমারি স্বকীয়।

শ্যামপুকুর-বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ৫৫এ, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট-স্থিত ভবনে এসে চিকিৎসার্থ দুই মাস নয় দিন অবস্থান করেন। এই বাটীতে তাঁর দিব্য লীলার বহু বিবরণী 'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ', 'পুঁথি' প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে সবিস্তার লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমরা ঐ সকল বিবরণীর মাত্র কয়েকটি এখানে অনুধ্যান ক'রে পরিতৃপ্ত হব।

শুভাগমন

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জুন মাসের প্রথমার্ধে পরমহংসদেবের গলরোগের সূত্রপাত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে রোগ কঠিন আকার ধারণ করে।

ভক্তগণ তখন সুবিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় আনয়নের সংকল্প করেন। ঠাকুরের নির্দেশমত বাগবাজার অঞ্চলে গঙ্গার সন্নিকটে দুর্গাচরণ মুখার্জী ষ্ট্রীটে নবনির্মিত একটি বাড়ি ভাড়া করা হয়। ২৬শে সেপ্টেম্বর (১১ই আশ্বিন, ১২৯২ সন), শনিবার সকালে তিনি এই বাড়িতে আগমন করেন। গঙ্গাতীরে কালীবাড়ির সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ও মনোরম উদ্যান-সংলগ্ন গৃহে বসবাসে অভ্যস্ত ঠাকুর স্বল্পপরিসর এই বাড়িতে প্রবেশ ক'রে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, এবং তৎক্ষণাৎ ঐ বাড়ি থেকে পদব্রজেই ভক্তগণসঙ্গে শ্রীযুক্ত বলরাম বসুর ভবনে উপস্থিত হন। তখন সকাল প্রায় নয়টা। কলকাতায় মনোমত বাড়ি না পাওয়া পর্যন্ত বলরামবাবুর অনুরোধে ঠাকুর তাঁর ভবনেই থাকতে সম্মত হলেন।

ভক্তগণ উপযুক্ত বাড়ি অনুসন্ধান করতে লাগলেন এবং বলরাম-মন্দিরে প্রসিদ্ধ কবিরাজগণকে আহ্বান করলেন। গঙ্গাপ্রসাদ সেন, গোপীমোহন, দ্বারিকানাথ, নবগোপাল প্রমুখ বিশিষ্ট বৈদ্যগণ ঠাকুরকে পরীক্ষা করলেন। তাঁদের কাছে বিশেষ আশা না পেয়ে ভক্তগণ হোমিওপ্যাথি-মতে ঠাকুরের চিকিৎসা করানো যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন।

'শ্যামপুকুরের মধ্যে বাড়ী হইল স্থির।
যাহার পশ্চিমে এক শিবের মন্দির॥
দ্বিতল মহল বাড়ী মাস ভাড়া ধার্য।
গৃহস্বামী নামজাদা শিবু ভট্টাচার্য॥'—পুঁথি

এক সপ্তাহের মধ্যেই শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষের চেষ্টায় ৫৫ (বর্তমান ৫৫এ), শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে একটি দ্বিতল বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ২রা অক্টোবর, ১৭ই আশ্বিন শুক্রবার সন্ধ্যার পর ভক্ত-সেবকগণসহ এই বাড়িতে শুভাগমন করেন।

শ্যামপুকুর-বাটী

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবস্থানকালে শ্যামপুকুর-বাটী যেরূপ ছিল তার বিশদ বর্ণনা 'লীলাপ্রসঙ্গে' (দিব্যভাব-খণ্ডে) পাওয়া যায়।

বর্তমানে এই বাড়ির অনেক পরিবর্তন চোখে পড়ে। বাড়িটি ৫৫এ এবং ৫৫বি—দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমোক্ত ভাগে ঠাকুর থাকতেন। উঠানে দুই ভাগের মাঝখানে এখন টিনের একটি উচ্চ প্রাচীর দেখা যায়। ৫৫এ অংশের দ্বিতলে যাবার জন্য পৃথক্ সিঁড়ি নির্মিত হয়েছে। বাড়িতে প্রবেশ করলে বাম দিকে ঐ সিঁড়ি পড়ে। ঐ সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলে উঠে বৈঠকখানা-ঘরে (ঠাকুর এই ঘরে থাকতেন) যাওয়া যায়। এই ঘরটি পূর্ববৎ প্রশস্ত নেই, একাধিক কক্ষে পরিণত হয়েছে।

জ্যোতিঃপথে গমন

শ্যামপুকুর-বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগমনের অল্পকাল মধ্যেই শারদীয়া মহাপূজা সমাগত হ'ল। সকলেই আনন্দে মত্ত, কিন্তু ঠাকুরের সেবক-ভক্তগণ গভীর বিষাদগ্রস্ত, কারণ

'জবাব দিয়াছে চিকিৎসকের নিচয়।
প্রভুর অসাধ্য ব্যাধি আরোগ্যের নয়॥'—পুঁথি

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদ ও আজ্ঞা নিয়ে ভক্তপ্রবর সুরেন্দ্র মিত্র সিমলায় নিজ গৃহে প্রতিমায় দেবীর মহাপূজার সংকল্প করেছেন। মহানবমী-বিহিত পূজাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হ'ল। মহাসমারোহে তিন দিন আনন্দময়ীর পূজা করেও সুরেন্দ্রের চিত্তে আনন্দ নেই। নবমীপূজার দিন সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটার সময় তিনি যুক্তকরে প্রতিমার সম্মুখে বিষণ্ণভাবে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন করছেন। 'মা, মা' ব'লে ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদছেন। নয়নজলে তাঁর গণ্ডদেশ ভেসে যাচ্ছে। তিনি কেবলই ভাবছেন—ঠাকুর সুস্থ থাকলে তাঁর গৃহে শুভাগমন করতেন। তাঁকে নিয়ে মহাপূজায় কতই না আনন্দোৎসব হ'ত। কিন্তু হায়! তিনি আজ শয্যাশায়ী, কাছেই আছেন, অথচ আসতে পারছেন না।

'সুরেন্দ্র সমানভাবে আছে দাঁড়াইয়া।
প্রভুর মোহন মূর্তি মনে ধিয়াইয়া॥
এমন সময় তেঁহ দেখিবারে পান।
প্রতিমার মধ্যে প্রভু নিজে অধিষ্ঠান॥'—পুঁথি

এদিকে শ্যামপুকুর-বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তগণসঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গাদি করতে করতে ঠিক ঐ সময়ে হঠাৎ সমাধিমগ্ন হলেন। কিছুকাল পরে সমাধিভঙ্গ হ'লে তিনি উপস্থিত ভক্তগণকে আপনার অদ্ভুত দর্শন ও অনুভূতির কথা বললেন: এখান হ'তে সুরেন্দ্রের বাড়ী পর্যন্ত একটা জ্যোতির রাস্তা খুলে গেল। দেখলাম, তার ভক্তিতে প্রতিমায় মার আবেশ হয়েছে। দালানের ভিতরে দেবীর সম্মুখে দীপমালা জ্বেলে দেওয়া হয়েছে, আর সুরেন্দ্র ব্যাকুল হৃদয়ে 'মা, মা' ব'লে কাঁদছে।

ঐদিন সুরেন্দ্রের গৃহে ভক্তবর্গের নিমন্ত্রণ ছিল। তাই ঠাকুর তাঁদের বললেন, 'তোমরা সকলে এখনই তার বাড়ী যাও। তোমাদের দেখলে তার প্রাণ শীতল হবে।'

পরদিবস বিজয়া দশমী, ১৮ই অক্টোবর। সকাল আটটার সময় ঠাকুর বিছানায় উপবিষ্ট। শ্রীযুক্ত মাষ্টার, নবগোপাল প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত উপস্থিত। বাড়ি থেকে সুরেন্দ্র ঠাকুরের নিকট পালিয়ে এলেন। আজ মা দুর্গাকে বিসর্জন দিতে হবে, তাই তাঁর মন খুবই খারাপ। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ঠাকুর বলছেন: 'মা হৃদয়ে থাকুন।' তাঁর তীব্র আর্তি ও ব্যাকুলতা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ অশ্রু বিসর্জন করছেন। পূর্বদিনের দর্শনের কথা তিনি সুরেন্দ্রকে বললেন: 'কাল ৭টা ৭॥টার সময় ভাবে দেখলাম, তোমাদের দালান। ঠাকুর-প্রতিমা রয়েছেন, এখানে ওখানে এক হ'য়ে আছে। যেন একটা আলোর স্রোত দু'জায়গার মাঝখানে বইছে!'

সুরেন্দ্র বললেন: আমি তখন ঠাকুরদালানে 'মা, মা' ব'লে ডাকছি। মনে উঠল—মা বলছেন, 'আমি আবার আসবো।'

বিজয়ের দর্শন-কথা

'ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক বিজয় এখন।
নানা দেশ নানা তীর্থ করিয়া ভ্রমণ॥
উপনীত এবে তেঁহ সহর ভিতরে।
আজি হেথা শ্রীপ্রভুর দরশন তরে॥'—পুঁথি

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শ্যামপুকুর-বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করতে এসেছেন। সঙ্গে কয়েকজন ব্রাহ্মভক্ত। গোস্বামীজী ঢাকায়

অনেক দিন ছিলেন। সম্প্রতি পশ্চিমে বহু তীর্থ ভ্রমণ ক'রে কলকাতায় এসেছেন। সেদিন রবিবার, ১০ই কার্তিক, ২৫শে অক্টোবর। বেলা প্রায় ৩টা ৪টা। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, মহিমা চক্রবর্তী, নবগোপাল, লাটু, ছোট নরেন্দ্র, মাষ্টার ভূপতি প্রভৃতি ভক্তগণ উপস্থিত। অনেক দিন পরে গোস্বামীজীর সাক্ষাৎলাভে সকলেই আনন্দিত।

শ্রীযুক্ত মহিমা চক্রবর্তী বিজয়কৃষ্ণকে তাঁর তীর্থভ্রমণের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলেন: মহাশয়, তীর্থ ক'রে এলেন, অনেক দেশ দেখে এলেন, এখন কি দেখলেন, বলুন।

উত্তরে বিজয় বললেন: কি বলবো! দেখছি, যেখানে এখন বসে আছি, এইখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা! কোন কোন জায়গায় এরই এক আনা কি দু' আনা, কোথাও চার আনা, এই পর্যন্ত। এইখানেই পূর্ণ ষোল আনা দেখছি।

প্রসঙ্গতঃ তিনি আরও বললেন: ঢাকায় এঁকে (পরমহংসদেবকে) দেখেছি! গা ছুঁয়ে।*

ঢাকায় অবস্থানকালে শ্রীযুক্ত বিজয় একদিন ঘরে খিল দিয়ে ধ্যান করছিলেন, সেই সময়ে তিনি অভাবনীয়রূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন। তাঁর ঐরূপ দর্শন মাথার খেয়াল না সত্য, তা পরীক্ষা করার জন্য তিনি ঠাকুরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টিপে ভালভাবে দেখেন এবং ঐ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন।

সেই কথাই তিনি আজ মুক্তকণ্ঠে ভক্তগণ-সমক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বললেন: আমি আপনাকে ঢাকাতে এই আকারে দর্শন করেছি, এই শরীরে!—

একদিন নিরজনে ঢাকায় যখন।
আপনারে সশরীরে কৈনু দরশন॥—পুঁথি

* 'কথামৃত'—১ম ভাগ, ১৩শ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

ঠাকুর ঐ কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন—'সে তবে আর একজন!'

বিজয় করযোড়ে বললেন: ধরা না দিলে ধরা শক্ত। এইখানেই ষোল আনা, বুঝেছি আপনি কে? আর বলতে হবে না!

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ হ'য়ে গদ্‌গদকণ্ঠে বললেন—'যদি তা হ'য়ে থাকে, তো তাই'।

বিজয়কৃষ্ণ—'বুঝেছি'।

এত বলি চক্ষে বারি প্রেমে গদ হ'য়ে।
অভয়-চরণমূলে পড়িলা লুটিয়ে॥
নিরখিয়া তাহা প্রভু হইয়া কেমন।
বিজয়ের বক্ষে দিলা দক্ষিণ চরণ॥
এখন ঈশ্বরাবেশে বাহ্য আর নাই।
পুত্তলিকাবৎ জড় জগৎ-গোঁসাই॥—পুঁথি

ঠাকুরের দিব্য প্রেমাবেশ ও ভাবাবস্থা দর্শন ক'রে উপস্থিত ভক্তগণেরও অনেকের ভাব হ'ল। ভাবে কেউ কাঁদছেন, কেউ বা স্তব করছেন। সকলেই একদৃষ্টে ঠাকুরের দিকে চেয়ে আছেন।

মিশ্রের দর্শন-কথা

আসিয়া জুটিল এক ত্যাগী যোগিবর।
শ্যামল বরণ চক্ষু ডাগর ডাগর॥
কোট-পেণ্টুলন-পরা টুপি আছে শিরে।
চাপ দাড়ি হাতে ছড়ি সুহাসি অধরে॥
ভিতরে কৌপীন তাঁর বাসে আচ্ছাদন।
বাহ্যিক দেখিতে এক বাবুর মতন॥
স্বভাবে চরিত্রে কিন্তু যোগীর আচার।
উপাধিতে মিশ্র তিনি প্রভু নাম তাঁর॥—পুঁথি

৩১শে অক্টোবর, ১৬ই কার্তিক, শনিবার। বেলা প্রায় ১১টা। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, মাষ্টার, ছোট নরেন প্রভৃতি ভক্তগণ উপস্থিত। লোকমুখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিমা শ্রবণ ক'রে শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল মিশ্র তাঁকে শ্যামপুকুর-বাটীতে দর্শন করতে এসেছেন। ইনি একজন খ্রীষ্টান ভক্ত,

—'কোয়েকার' (Quaker) সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁর জন্মস্থান পশ্চিমাঞ্চলে। কয়েক পুরুষ পূর্বে এঁরা কান্তকুব্জ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

প্রভুদয়াল খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী হলেও নিত্য যোগ অভ্যাস করতেন। ঐরূপ যোগ-সাধনের ফলে তাঁর জ্যোতি-দর্শন হ'য়েছিল। পুরুষ-পরম্পরাগত চালচলন তিনি সযত্নে ধরে রেখেছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ ছিলেন এবং স্বপাকে নিত্য হবিষ্যান্ন গ্রহণ করতেন।

যাহোক, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন ক'রে মিশ্র পরম আহ্লাদিত হলেন। একবার গিরিগুহায় নিভৃতে ধ্যানকালে তিনি এক অপূর্ব সৌম্যমূর্তি মহাপুরুষের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন। সেই মূর্তি তাঁর হৃদয়ে সুস্পষ্ট অঙ্কিত ছিল। ঠাকুরকে দর্শনমাত্রই তিনি চিনতে পারলেন ইনিই সেই সৌম্য পুরুষ।

হৃদয়ে অঙ্কিত ছবি সদা জাগে মনে।
আর না দেখিতে পায় বসিলে ধিয়ানে॥
অনিমিষ আঁখি মিশ্র দেখিবারে পায়।
ধ্যানে দেখা সেই মূর্তি এই প্রভু রায়॥—পুঁথি

মিশ্র প্রসঙ্গক্রমে গদ্‌গদকণ্ঠে সমাগত ভক্তগণকে বললেন: আপনারা এঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) চিনতে পারছেন না। আমি আগে থেকে এঁকে দেখেছি—এখন সাক্ষাৎ দেখছি। দেখেছিলাম—একটি বাগান, উনি উপরে আসনে বসে আছেন; মেঝের উপর আর একজন ব'সে আছেন; তিনি তত advanced (উন্নত) নন।'*

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কিছু দেখতে পাও?'

মিশ্র বললেন—'আজ্ঞা, বাড়িতে যখন ছিলাম তখন থেকে জ্যোতি দর্শন হ'ত। তারপর যিশুকে দর্শন করেছি।'

যোগিবরে প্রভু রায় করি নিরীক্ষণ।
দাঁড়াইয়া সমাধিতে হইল মগন॥—পুঁথি

ঠাকুর মিশ্রের কথা শুনে যিশুর ভাবাবেশে আবিষ্ট হ'য়ে গভীর সমাধিতে মগ্ন হলেন। অল্পক্ষণ পরে তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হলেন এবং মিশ্রকে দেখে আনন্দে হাস্য করতে লাগলেন। ঠাকুর ঐরূপ অর্ধবাহ্যদশায় মিশ্রের সঙ্গে করমর্দন (shake hand) করছেন এবং সহাস্যে তাঁকে বলছেন—'তুমি যা চাইছ তা হ'য়ে যাবে।'

মিশ্র তখন যুক্তকরে পরম আবেগ ও ভক্তি-ভরে ঠাকুরকে বললেন—'আমি সেদিন থেকে মন, শরীর—সব আপনাকে দিয়েছি।'

সরল অন্তরে যেবা চায় ভগবানে।
সেই সে আসিয়া জুটে প্রভুর সদনে॥—পুঁথি,

ডাঃ সরকারকে কৃপা

শ্রীরামকৃষ্ণদেব চিকিৎসার্থ শ্যামপুকুরে আগমন করলে ভক্তগণ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের উপর তাঁর চিকিৎসার ভার অর্পণ করেন। মথুরবাবুর জীবদ্দশায় তাঁর পরিবারবর্গের চিকিৎসার জন্য ডাঃ সরকার কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে যান। সেই সূত্রে তিনি সেখানে পরমহংসদেবের দর্শন পান এবং তাঁর সঙ্গে আলাপাদি করেন। ঠাকুরের গলরোগ পরীক্ষা করার জন্যও ডাঃ সরকার দক্ষিণেশ্বরে যান। দক্ষিণেশ্বরে (২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) ঠাকুর ঐ প্রসঙ্গে স্বয়ং বলেন—'মহেন্দ্র সরকার দেখেছিল, কিন্তু জিভ্ এমন জোরে চেপেছিল যে ভারি যন্ত্রণা হয়েছিল…'

শ্যামপুকুরে ঠাকুরকে পরীক্ষা করতে ডাঃ সরকার প্রায় নিত্যই আসতেন, এক একদিন তিনি ঠাকুরের সান্নিধ্যে বহুক্ষণ অতিবাহিত ক'রে যেতেন ও তাঁর কথামৃত পানে তিনি পরম আনন্দ লাভ করতেন। ক্রমশঃ তাঁদের উভয়ের মধ্যে নিবিড় হৃদ্যতা জন্মায়।

*কথামৃত'—৪র্থ ভাগ, ৩০শ খণ্ড।

'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ', 'পুঁথি' প্রভৃতি গ্রন্থে ডাঃ সরকারের সঙ্গে ঠাকুরের কথোপকথন ও পুণ্য লীলার মনোহর চিত্র অনেকগুলিই দেখা যায়। আমরা এখানে 'কথামৃতে'র মাত্র একটি চিত্র অনুধ্যান করছি :

১৬ই কার্তিক, ৩১শে অক্টোবর—১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখতে এসেছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, মাষ্টার মশায় প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত। ঠাকুর ডাক্তারকে দেখতে দেখতে সমাধিস্থ হ'য়ে পড়লেন। তিনি কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হ'য়ে বলছেন, 'কারণানন্দের পর সচ্চিদানন্দ—কারণের কারণ।' ঠাকুর দিব্য-ভাবে মাতোয়ারা হ'য়ে হাসিমুখে গাইছেন :

সুরাপান করি না আমি,
সুধা খাই জয় কালী ব'লে,
মন-মাতালে মাতাল করে,
মদ-মাতালে মাতাল বলে।

ঠাকুরের শ্রীমুখে সুমধুর সঙ্গীত শুনে ডাঃ সরকার ভাবাবিষ্ট। গান শেষ হ'তে না হ'তেই আবার ঠাকুর ভাবাবেশে তাঁর চরণযুগল ডাক্তারের কোলে প্রসারিত করলেন। ডাক্তার সযত্নে আপনার কোলে ঠাকুরের অভয় পাদপদ্ম ধরে রাখেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের ঐ ভাব প্রশমিত হ'লে আপনার চরণ গুটিয়ে নিলেন। তারপর তিনি নরেন্দ্রের গান শোনার জন্য ব্যাকুল হলেন। ঠাকুরের আজ্ঞামত নরেন্দ্র গাইলেন—

(১) 'হরিরস-মদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে।'
(২) 'চিদানন্দ-সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।'
(৩) 'চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন।'

নরেন্দ্রের সুমধুর গানগুলি শুনে ডাক্তার পরম আনন্দিত হলেন। ডাক্তারকে লক্ষ্য ক'রে ঠাকুর ভক্তগণকে বললেন, 'সেদিন মা দেখালে দুটি লোককে। ইনি তার ভিতর একজন। খুব জ্ঞান হবে দেখলাম,—কিন্তু শুষ্ক। (ডাক্তারকে সহাস্যে) কিন্তু তুমি র'সবে।'

পূজনীয় পুঁথিকার ডাক্তার সরকারের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছেন :

যে কার্য করিলা তেঁহ প্রভুর লীলায়।
বহি যদি শিরে জুতা শোধ নাহি যায়॥
রামকৃষ্ণ-পন্থীমাত্র তাঁর কাছে ঋণী।
বারে বারে বন্দি তাঁর চরণ দু'খানি॥—পুঁথি

বরাভয় মূর্তি ধারণ

শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে দুর্গাপূজার মতো কালীপূজায় সময়ও এক অপূর্ব ভাবের প্রকাশ লক্ষিত হয়। ভক্ত-বৃন্দ ঠাকুরের আজ্ঞায় ঐ বাটীতে সংক্ষেপে শ্যামাপূজার আয়োজন করেছেন। পূজা-দিবসে (৬ই নভেম্বর) পরমহংসদেব সকাল থেকেই জগন্মাতার ভাবে বিভোর হ'য়ে আছেন। ক্রমে সূর্য অস্তমিত হ'য়ে সন্ধ্যা নেমে এল। সমস্ত বাটী উজ্জ্বল দীপমালায় আলোকিত হ'ল। রাত্রি প্রায় সাতটা। ঠাকুর স্থিরভাবে তাঁর শয্যায় ব'সে আছেন। তিনি জগন্মাতার চিন্তায় নিমগ্ন। পূজার বিবিধ সামগ্রী এনে তাঁর শয্যার পূর্বদিকে রাখা হ'ল। ভক্তগণ দেবীর প্রতিমা, পট অথবা ঘট আনয়ন করেননি। সংক্ষেপে মায়ের পূজার আয়োজন হয়েছে।

ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান রয়েছে অথচ বহুক্ষণ স্থির ভাবে আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। প্রায় ত্রিশ জনেরও অধিক ভক্ত ঐ গৃহে উপস্থিত ; কিন্তু গৃহমধ্য একেবারে নীরব, নিস্তব্ধ। এক অপূর্ব ভাবগম্ভীর পরিবেশ। ভক্তবর রামচন্দ্র দত্ত তখন গিরিশবাবুকে বললেন, 'ঠাকুর আজ কৃপা ক'রে আমাদের পূজা গ্রহণ করবেন।' তাই বোধ হয় অপেক্ষায় উপবিষ্ট রয়েছেন। অমনি ভৈরব ভক্ত গিরিশচন্দ্র পুষ্পপাত্র থেকে

ফুলের মালা নিয়ে 'জয় মা, জয় মা' ব'লে ঠাকুরের শ্রীচরণে অর্পণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দিব্য আবেশে ঠাকুরের সর্বাঙ্গ পুলকিত হ'য়ে উঠল। তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হ'য়ে গভীর সমাধিতে মগ্ন হলেন। তাঁর করদ্বয়ে বরাভয়-মুদ্রা দেখা দিল। তাঁর প্রসন্ন প্রশান্ত মুখশ্রী দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হ'ল।

ভক্তগণ ঠাকুরের মধ্যে বরভয়করা জগন্মাতা কালিকার পরম আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করলেন। তখন সকলে মহোল্লাসে 'জয় মা, জয় মা' ব'লে তাঁর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। কেউ কেউ ভক্তিতে গদ্‌গদ হ'য়ে জগদম্বার মধুর স্তবস্তুতি পাঠ করলেন। এই ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহে জীবন্ত কালীর পূজার্চনা ক'রে তাঁরা তাঁর শুভাশীর্বাদ লাভে কৃতকৃতার্থ হলেন।

কেবা কালী, কেবা প্রভু, না পারি বুঝিতে।
কালীতে কেবল তিনি, মা কালী তাঁহাতে ॥ পুঁথি

বিনোদিনীর কাণ্ড

গিরিশের রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী যত।
সকলেই প্রভুদেবে ভকতি করিত ॥
তাহাদের মধ্যে যেবা বিনোদিনী নামে।
বিশেষ তাহার ভক্তি প্রভুর চরণে ॥—পুঁথি

শ্যামপুকুর-বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন দেখেন,—তাঁর দেহ থেকে সূক্ষ্ম শরীর বের হ'য়ে গৃহমধ্যে বিচরণ করছে। তিনি ঐ সূক্ষ্মদেহের গলায় ও পিঠে অনেকগুলি ক্ষত লক্ষ্য করেন। জগন্মাতা তাঁকে জানিয়ে দেন—লোকেরা নানা কুকর্ম ক'রে তাঁর চরণকমল স্পর্শ ক'রে পাপমুক্ত হ'য়ে যাচ্ছে, তাদেরই অসহ্য পাপভারে তাঁর শরীরে ঐরূপ ক্ষত হয়েছে।

ঠাকুরের ঐ আশ্চর্য দর্শনের কথা শুনে সেবক-ভক্তগণ অতিশয় চিন্তিত ও বিচলিত হন। তাঁরা তখন স্থির করেন যে, তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত কাউকে তাঁর চরণ স্পর্শ করতে দেবেন না এবং নিজেরাও তা করবেন না। সেই হ'তে তাঁরা নতুন লোকদের আগমন নিবারণের চেষ্টা করতে লাগলেন। গিরিশবাবু তাঁদের বললেন, 'চেষ্টা করছ কর, কিন্তু তা সম্ভবপর নয়, কারণ উনি (ঠাকুর) যে ঐ জন্যই দেহ ধারণ করেছেন।'

অবশেষে দেখা গেল যে, ওরূপ করায় অপরিচিতদের আগমন বন্ধ হলেও ভক্তগণের পরিচিত নতুন লোকদের গতায়াত নিবারণ করা সম্ভবপর হ'ল না। শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ একদিন সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে হ্যাট-প্যাণ্ট-কোট-পরা জনৈক বন্ধুসহ শ্যামপুকুর বাটীতে এলেন। কালীপদর ঐ নতুন বন্ধুকে কেউ বাধা দিলেন না। বন্ধুটি তখন সটান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকটে গিয়ে আবেগভরে তাঁর চরণমূলে পতিত হ'য়ে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগল।

অনেকের সঙ্গে দেখা পথের মাঝারে।
কেহই চিনিতে নাহি পারিল তাহারে ॥
কিন্তু শ্রীগোচরে যেই মুহূর্তেক আসা।
চিনিয়া শ্রীপ্রভু তারে করিল জিজ্ঞাসা ॥
কি রে তুই হেথা হেন বেশে কি কারণ।
উত্তরে কহিল-- প্রভু মাত্র দরশন ॥—পুঁথি

কালীপদ ঘোষের এই বন্ধুটি আসলে পুরুষ নয়, মেয়ে। পুরুষের বেশে ভক্তদের ফাঁকি দিয়ে ঠাকুরকে দর্শন করতে এসেছে। তার নাম বিনোদিনী। গিরিশবাবুর থিয়েটারের নাম-করা অভিনেত্রী। রঙ্গমঞ্চে ঠাকুর একবার তার সুনিপুণ অভিনয়-দর্শনে পরম প্রীত হন এবং তার অভিনয়-দক্ষতার প্রশংসা করেন। এ দিনের অভিনয়ও তার কম দক্ষতার পরিচায়ক নয়!

আজি তার ভক্তিভাবে ভরিল অন্তর।
নিরখিয়া দীনবন্ধু লীলার ঈশ্বর ॥—পুঁথি

ভক্তমেলা

পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ (লীলা-প্রসঙ্গ—দিব্যভাবে) লিখেছেন: 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘরূপ মহীরুহ দক্ষিণেশ্বরে অঙ্কুরিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দিষ্ট হইলেও শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে উহা নিজ আকার ধারণপূর্বক এত বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল যে ভক্তগণের অনেকে তখন স্থির করিয়াছিলেন, ঐ বিষয়ে সাফল্য আনয়নই ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধির অন্যতম কারণ।'

শ্যামপুকুর-বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবস্থান-কালে শ্রীমা সারদাদেবী তাঁর সেবা-শুশ্রূষার জন্য সেখানে এসেছিলেন। নরেন্দ্রাদি চিহ্নিত পার্ষদগণ, স্ত্রীপুরুষ ভক্তগণ ও অনুরাগিগণ ছাড়া, আরও কত শত নরনারী যে ঠাকুরের পুণ্য দর্শন লাভের জন্য এই বাটীতে এসেছিলেন তা নির্ণয় করা অসম্ভব। দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়া যাদের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না, তাদের ধর্মালোক প্রদানের জন্যই যেন ঠাকুর অপার করুণাবশে স্বয়ং তাদের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

কাশীপুর যাত্রা

'সশঙ্কিত চিত্ত এবে ডাক্তার প্রধান।
স্থান-পরিবর্তনের দিলেন বিধান॥'—পুঁথি

শ্যামপুকুর-বাটীতে বহু চিকিৎসায় এবং যত্নে যখন আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল না, তখন ডাক্তার বললেন: কলকাতার রুদ্ধ দূষিত বায়ুর জন্যই এইরূপ হচ্ছে। শহরের বাইরে উন্মুক্ত স্থানে কোন বাগানবাড়িতে এখন ঠাকুরকে রাখা আবশ্যক।

ভক্তগণ তখন চেষ্টা ক'রে কাশীপুরে গোপাল চন্দ্র ঘোষের উদ্যান-বাটীটি ঐ উদ্দেশ্যে মাসিক ৮০ টাকায় ভাড়া নেন। ঠাকুর ১১ই ডিসেম্বর, ১৮৮৫ (২৭শে অগ্রহায়ণ) শুক্রবার, শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শ্যামপুকুর-বাটী হ'তে কাশীপুর-উদ্যানে যাত্রা করেন।*

* এই প্রবন্ধের তিথি ও তারিখগুলি 'কথামৃত' অবলম্বনে লিখিত।

ধ্রুব-কৃত ভগবৎ-স্তুতি

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্ নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥

* * *

যে পুরুষ সকল জ্ঞান শক্তি ধারণ করেন, যিনি আমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া প্রসুপ্ত বাক্‌শক্তিকে, কর-চরণ-কর্ণ-ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে এবং প্রাণকেও সঞ্জীবিত করিতেছেন, আপনি সেই পরমপুরুষ ভগবান, আপনাকে নমস্কার। (শ্রীমদ্ভাগবত—৪।৯।৬)

প্রেমানন্দ-পুণ্যস্মৃতি

শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়

১৯১৪ খৃঃ মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরাট উৎসবে যোগদান করিয়া বিমলানন্দ লাভ করিলাম। আমরা শনিবার দিনই মঠে রাত্রিতে পৌছিয়াছিলাম এবং সমস্ত রাত্রি উৎসবের কাজ করিয়াছিলাম। মঠে এই আমার প্রথম যাওয়া, সাধুদের সঙ্গে কোন পরিচয় নাই। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিতেছি, এমন সময় পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ আসিয়া পাচক ব্রাহ্মণদের বলিতেছেন, 'এ কি! কাঠগুলি পোড়াচ্ছ—কোন কড়া চাপাও নাই, এ কি ক্ষতির মাল পেয়েছ?' আমি তো শুনিয়াই অবাক্। সাধুদের এত কড়া নজর যে সামান্য কাঠ পুড়িয়া যাইতেছে—ইহাও তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে না। সমস্ত দিন উৎসব ও সাধুদের কর্মকুশলতা দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। লক্ষ লক্ষ লোক উৎসবে যোগদান করিয়াছেন, সমস্তই অতি নিপুণতার সহিত হইয়া যাইতেছে।

১৯১৬ খৃঃ জানুআরি মাসে দ্বিতীয়বার পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে দর্শন করি ময়মনসিংহে শ্রীযুক্ত জিতেন দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে; তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাজের পূত সঙ্গ লাভ করিয়া বুঝিয়াছিলাম, তিনি ভক্তদের মঙ্গলের জন্য সর্বদাই আগ্রহান্বিত। তাঁহার মত সরল ও অহেতুক ভালবাসা জীবনে আর দেখি নাই।

১৯১৭ খৃঃ পুনরায় মঠে আসিয়া তাঁহার পুণ্য দর্শন লাভ করিয়া বড়ই সুখী হইলাম। তাঁহার নিরভিমানতা দেখিবার মতো ছিল। একদিন তিনি মঠের পশ্চিম দিকের বারান্দায় লম্বা বেঞ্চে বসিয়া আছেন, এমন সময় নোয়াখালি জেলার দুইটি ছেলে মঠে আসিয়া পশ্চিম দিকের বারান্দায় দাঁড়াইল। তাঁহাদের সঙ্গে দুইটি পুঁটলি (বোঁচকা) ও দুইটি বদনা। উপস্থিত কেহ কেহ বদনা দুইটি দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বাবুরাম মহারাজ কিন্তু একটুও হাসিলেন না। মনে হইল ঐ ছেলে দুইটি এই প্রথম মঠে আসিয়াছে। বাবুরাম মহারাজ আমাকে বলিলেন, 'যা, এদের মঠের সব দেখিয়ে নিয়ে আয়।' আমি তাঁহার আদেশানুসারে মঠের সব দেখাইয়া নিয়া আসিলাম। বাবুরাম মহারাজ এইবার উহাদের দুপুরে প্রসাদ পাইবার কথা বলিলেন। তাহারাও প্রসাদ পাইবে জানিয়া আনন্দিত হইল।

তাহাদের লক্ষ্য করিয়া পূজনীয় মহারাজ বলিলেন, 'তোমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের বই পড়েছ?' তাহারা বলিল, 'হাঁ, শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর বই কিছু কিছু পড়িয়াছি।' মহারাজ আবার বলিলেন, 'দেখ্, একেবারে শ্রীশ্রীঠাকুরকে তোরা ধরতে পারবি না। ঠাকুরকে বুঝতে হ'লে স্বামীজীকে ধরতে হবে। স্বামীজীর মধ্য দিয়ে ঠাকুরকে বুঝতে হবে। স্বামীজীর বইগুলি খুব ভাল ক'রে পড়্। তাতে মনে খুব জোর আসবে। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি সব কথাই তাঁর বইএ আছে। এ যুগে স্বামীজীই তোদের আদর্শ। এমন আদর্শ তোরা আর কোথাও খুঁজে পাবি না। তিনি জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন—যাতে মানুষ প্রকৃত 'মানুষ' হ'য়ে জীবন কাটাতে পারে। তোদের এখন অনেক কাজ করতে হবে। প্রথমে চাই ব্রহ্মচর্য, তার পরেই সেবাধর্মের কাজ করতে হবে। তবেই ঠিক ঠিক মানুষ হ'তে পারবি।'

কথাগুলি এমনভাবে বলিয়া গেলেন যে সকলেরই প্রাণে কর্মশক্তি আসিল। সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্নান করিতে গেলাম। মহারাজ আমাকে বলিলেন, 'যা, এই নূতন ছেলে দুটির খোঁজখবর কর্, ওরা সবে মঠে নতুন এসেছে, কিছু জানে না।'

* * *

১৯১৭ খৃঃ মার্চ মাসে আমরা শ্রীশ্রীমায়ের দেশে জয়রামবাটী গিয়াছিলাম। ওখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় বাবুরাম মহারাজকে দর্শন করি এবং শ্রীশ্রীমা অসুখ অবস্থাতেও আমাদের কৃপা করিয়াছেন, বিস্তৃত সব বলিলাম। এখন যেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির তাহারই নিকট দাঁড়াইয়া মহারাজ মঠের গরুগুলির দেখাশোনা করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের অহেতুক কৃপার কথা শুনিয়া বলিলেন: কি আর বলব—কৃপা, কৃপা, কৃপা! (এই বলিয়া হাতে জপ করিতে লাগিলেন) দেখ্ মায়ের এই কৃপার কথা যেন তোর মনে থাকে, বেইমান হোস্‌নি। মা যে কি—পরে বুঝবি। এখন আমাদের কারো বুঝবার সাধ্য নেই, তিনি পরে তোদের কৃপা ক'রে বোঝাবেন। এখন কেবল তাঁহার কথা স্মরণ করে যা। আহা! লোক-কল্যাণের জন্য তিনি কিই না করেছেন! নিজের সর্বসুখ বিসর্জন দিয়েছেন।' শ্রীশ্রীমায়ের কথা বলিতে বলিতে একেবারে মাতিয়া গেলেন। আমার মনে হইল, মায়ের মাহাত্ম্য যেন বলিয়া শেষ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার মুখে শ্রীশ্রীমায়ের কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, শ্রীশ্রীমাই যেন তাঁহার মাহাত্ম্য শুনাইবার জন্য পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের নিকট আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

বিশ্বময়ী

শ্রীশান্তশীল দাশ

কোথায় মা তোর আগমন, আর কোথায় বিসর্জন!
তুই যে মাগো বিশ্বমাঝে আছিস্ অনুক্ষণ।
আসা-যাওয়া সবার আছে;
মাগো, সেতো তোরই কাছে—
আসনটি তোর নিত্য পাতা, সে যে চিরন্তন;
কোথায় মা তোর আগমন, আর কোথায় বিসর্জন!

আনন্দে গান গেয়ে উঠি, 'এলি মা তুই' ব'লে;
'চলে গেলি' ব'লে আবার ভাসি নয়নজলে।
অলক্ষ্যে তোর আসন থেকে,
হাসিস্ বুঝি এ সব দেখে—
কান্না-হাসি দেখে শিশুর মা হাসে যেমন;
কোথায় মা তোর আগমন, আর কোথায় বিসর্জন!

সমালোচনা

Philosophy and Religion (Revised Edition) by Swami Abhedananda, Published by Ramakrishna Vedanta Math, Calcutta—6. Pp. 209+12, Demy size. Price Rs. 6 50 np.

দর্শন বা ধর্মপুস্তক কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যের দ্বারাই রচিত হইলে কোথায় যেন একটা ফাঁক থাকিয়া যায়। কিন্তু ঐ সব পুস্তক রচনায় যদি পাণ্ডিত্যের সঙ্গে নিজস্ব উপলব্ধির গঙ্গাযমুনা সঙ্গম হয়, তাহা হইলে উহা এক তীর্থক্ষেত্রের পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হইয়া পাঠককে সেই তীর্থস্নানে পূত ও পরিচ্ছন্ন করিয়া উপলব্ধির কেমন এক অননুভূতপূর্ব আস্বাদনের রস যোগায়। আলোচ্য পুস্তকটিতে আমরা সেই সঙ্গমস্নানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ (কালী-তপস্বী) একদিকে যেমন তাঁর দিব্য গুরুর সান্নিধ্যে উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি আবার নিয়ত পাঠে ব্যাপৃত থাকিয়া শাস্ত্রজ্ঞানের আহরণেও যত্নবান্ হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ পাশ্চাত্যে অবস্থানকালে সর্ববিধ জ্ঞানের অনুশীলন করিয়া বেদান্তকে বর্তমানের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংকলন-গ্রন্থটির ১৪টি অনুচ্ছেদে ও দুইটি পরিশিষ্টে ধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন দিক—যথা: দর্শনের অর্থ, দর্শনের সহিত ধর্মের যথার্থ যোগ, বেদান্তদর্শন, হিন্দুধর্ম কি? দর্শনবিচারে পাপ ও পুণ্য, আমাদের পরিত্রাতা, ঈশ্বরের মাতৃভাব প্রভৃতি বিষয়-ব্যাখ্যায় নৈপুণ্য ও পাণ্ডিত্য পাঠকচিত্তকে সহজেই মুগ্ধ করে। পুস্তকটির সংকলন-কার্যও সুষ্ঠু এবং সুন্দর হইয়াছে। বিভিন্ন বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে গ্রথিত হইলেও ইহাতে একটি পরিচ্ছন্ন মিলনসূত্র অব্যাহত আছে। সুন্দর ছাপা ও বাঁধাইকরা এই পুস্তকটির আমরা বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

—মহানন্দ

নির্গ্রন্থ-প্রবচন (বঙ্গানুবাদ-সহ): প্রণেতা—ভগবান মহাবীর: অনুবাদক—ধর্মরাজ শর্মা, সাহিত্যরত্ন। প্রকাশক: দিবাকর দিব্যজ্যোতি কার্যালয়, ব্যাবর (আজমীর)। পৃষ্ঠা ১৭৭+৭, মূল্যের উল্লেখ নাই।

ধর্মভূমি ভারতে বিভিন্ন ধর্মের আবির্ভাব হইয়াছে, যুগ যুগ ধরিয়া বিভিন্ন ধর্মমত পাশাপাশি রহিয়াছে, ধর্ম লইয়া বিচার-বিতর্কও হইয়াছে, কিন্তু অন্য ধর্মকে লুপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে রক্তারক্তি হয় নাই, কারণ প্রেম ও মৈত্রীই ভারতীয় ধর্মের প্রাণ। ধর্মান্ধতা এদেশের ধর্মে খুবই কম।

বাংলাদেশ এক সময় বৌদ্ধধর্মে প্লাবিত হইয়াছিল, কাহারও কাহারও মতে তৎপূর্বে এখানে জৈনধর্ম প্রসারলাভ করিয়াছিল। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি-স্থল মগধ হইলেও বাংলায় এই দুই ধর্মের বিলক্ষণ প্রসার হইয়াছিল। এই হিসাবে বাংলা ও মগধ একই সূত্রে গাঁথা, সেইজন্য বাঙালী মাত্রেরই এই উদার ধর্ম দুইটির সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

ভগবান মহাবীর-প্রবর্তিত ধর্ম জৈনধর্ম নামে খ্যাত। মহাবীরের দিব্য বাণীর অনুপম সংগ্রহ-গ্রন্থ নির্গ্রন্থ-প্রবচন। হিন্দুগণের নিকট যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আদরণীয়, বৌদ্ধগণের নিকট যেরূপ 'ধম্মপদ' আদরের বস্তু, জৈনধর্মাবলম্বীদিগের 'নির্গ্রন্থ-প্রবচন' তেমনি প্রাণের জিনিস। এই গ্রন্থপাঠে জৈনধর্মের স্বরূপ ও আদর্শ সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা হইবে। ১৮টি অধ্যায়ে দ্রব্য, কর্ম, ধর্ম, আত্মশুদ্ধি, জ্ঞান, ব্রহ্মচর্য, প্রমাদ, ভাষা, কষায়, বৈরাগ্য, মোক্ষ প্রভৃতি দুরূহ বিষয় আলোচিত। মূল গ্রন্থ পালি ভাষায় রচিত। অনুবাদ সর্বত্র সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে বলা যায় না, তবে বাংলায় এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ এই প্রথম, সেইজন্য অনুবাদকের এই সাধু প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য, তিনি বঙ্গভাষাভাষীদিগকে মহাবীরের দিব্য বাণীর সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন।

—জীবানন্দ

নব জ্ঞান-ভারতী : শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত, প্রকাশক—জেনারেল প্রিণ্টার্স, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। পৃষ্ঠা ৬১২+৮; মূল্য—রেক্সিন-বাঁধাই ২০৲, বোর্ড-বাঁধাই ১৫৲।

বহুদিন হইতেই বাংলা সাহিত্যে এইরূপ একখানি গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সে অভাব দূর করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। এই বৃহৎ গ্রন্থখানি তাঁহার পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

'নব জ্ঞান-ভারতী' বাংলা ভাষায় ভৌগোলিক কোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া। এই গ্রন্থমধ্যে পৃথিবীর নানা দেশ, নদী, হ্রদ, পর্বত, নগর, ঐতিহাসিক স্থান বর্ণানুক্রমিক ভাবে সন্নিবেশিত। ইতিহাসে যে সকল নামের উল্লেখ আছে, অথচ নূতন নূতন রাজনৈতিক বিপ্লবের কারণে সেই সব নাম পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের নাম আধুনিক মানচিত্রে পাওয়া যায় না—এই শ্রেণীর কতকগুলি নামও পুস্তকে স্থানলাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশের জেলা, মহকুমা, থানা, শহর, নদী, তীর্থ, শিল্পস্থান প্রভৃতির পরিচিতি বিশেষ ভাবে উল্লিখিত। বাংলা ভাষার ভৌগোলিক অভিধানে বাংলা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য ভৌগোলিক বিষয়গুলির স্থান হওয়ায় পুস্তকের মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে একটি ত্রুটি লক্ষণীয়, ভৌগোলিক কোষগ্রন্থে উপযুক্ত স্থানে—অন্ততঃ শেষে কয়েকখানি মানচিত্র *থাকিলে খুবই ভাল হইত, অবশ্য সেক্ষেত্রে* মূল্যও বৃদ্ধি পাইত, যাহা হউক পরবর্তী সংস্করণে এবিষয়ে গ্রন্থকার ও প্রকাশকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক

স্বামী নির্বেদানন্দ—জীবনী ও রচনাদি-সংগ্রহ : প্রকাশক স্বামী সন্তোষানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেণ্ট্‌স্ হোম, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ১৮৪+৭৯, মূল্য পাঁচ টাকা।

পুস্তকের প্রারম্ভে স্বামী নির্বেদানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী (৫৮ পৃঃ) সন্নিবেশিত, তাহাতে তাঁহার সাধনাময় কর্মজীবনের ও মহৎ চরিত্রের একটি রূপরেখা পাওয়া যায়। দ্বিতীয় খণ্ড রচনা-সংগ্রহ, তাহাতে স্বামী নির্বেদানন্দের বাংলায় ১২টি এবং ইংরেজীতে ১২টি রচনার মধ্যে, উল্লেখযোগ্য কয়েকটি : পথের আলোক, 'আমি'র সন্ধানে, বহিঃপ্রকৃতি ও মন, রসস্বপ্নে রবীন্দ্রনাথ (রম্য রচনা ,) ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, জগতের ভাবী সভ্যতা, Peace or pleasure? Bearing of Hinduism on International Peace, Sri Ramakrishna (radio script), School Discipline. এতদ্ব্যতীত বাংলায় ও ইংরেজীতে লিখিত কয়েকটি পত্র এবং একটি গান সন্নিবেশিত হইয়াছে।

Thus spake Sri Krishna—compiled by Swami Suddhasatwananda, Published by the President of Ramakrishna Math, Mylapore, Madras 4, Pp. 102; Price : 40 np. ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাণী গীতা ও ভাগবত হইতে সংগ্রহ করিয়া ইংরেজী এই পকেট সংস্করণ গ্রন্থখানি প্রকাশিত।

Contents : Sri Krishna ; Swami Vivekananda on Sri Krishna ; Jnana-Yoga ; Self ; Signs of Sthitaprajna ; Bhakti-Yoga ; Self surrender ; Dhyana-Yoga , Karma-Yoga ; The three Gunas ; The triple Division ; etc.

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বাংলা, বোম্বাই ও আসাম রাজ্যে বন্যার জন্য গত মাসে যে সকল কেন্দ্র হইতে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক সেবাকার্য আরম্ভ হইয়াছে, অর্থ ও সামর্থ্য অনুযায়ী নিম্নলিখিত ভাবে তাহা এখনও চলিতেছে।

বাংলায় :

সেবাপরিচালন-কেন্দ্র	জেলা	গ্রাম-সংখ্যা
নরেন্দ্রপুর	২৪ পরগনা	১৩
	মেদিনীপুর	৩
সারদাপীঠ, বেলুড়	হাওড়া	১৮
আসানসোল	বর্ধমান	১৮

এ পর্যন্ত প্রদত্ত জিনিসপত্র ও	তাহার পরিমাণ
চাল ও আটা	৩৬৭ মণ
ডাল	৯৭ মণ
গুঁড়া দুধ	৫,৬৮৭ পাউণ্ড
দেশলাই	১,৩০৩ বাক্স
নূতন ধুতি শাড়ী	৪১৬ খানি

ইহা ছাড়া বহু পুরাতন কাপড়, কম্বল এবং কেরোসিন ও সরিষার তৈল, আলু, লবণ, গুড়, চিঁড়া, রুটি—প্রয়োজনের ক্ষেত্রে গৃহনির্মাণের জন্য বাঁশ, দড়ি, খড় প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে।

সারদাপীঠ-কেন্দ্র ১১৯৪ ব্যক্তিকে T.A B C. ইঞ্জেকশন দিয়াছেন এবং ১০৬ জন রোগীর সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বোম্বাই : বোম্বাই আশ্রম-পরিচালিত এখানকার সেবাকার্যে প্রধানতঃ গৃহনির্মাণ ও পুনর্বাসনের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, সমগ্র সেবাকার্যে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

		পরিবার-সংখ্যা	গ্রাম-সংখ্যা
ভুজ (শহরে)	পুনর্বাসন	১০০	×
কচ্ছ	গৃহনির্মাণ	৩,৪৫০	২৭৩
সুরাট	"	৫,০০০	৮০

আসাম : কাছাড়জেলায় শোনবিলে টেষ্ট রিলিফ কার্য চলিতেছে করিমগঞ্জ-কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে।

* * *

মাদ্রাজ : মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন রিলিফের সচিত্র বিবরণী পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

(১) ঘূর্ণিবাত্যা-সেবাকার্য ও পুনর্বাসন

৩০শে নভেম্বর, ১৯৫৫ রাত্রে ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যায় মাদ্রাজের তাঞ্জোর ও রমানাথপুরম্ জেলার অধিবাসিবৃন্দ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন রিলিফ-কার্য আরম্ভ করেন। তিনটি তালুকে রিলিফের পর সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে কলোনি নির্মাণ করা হয়। সেতুপতি বিবেকানন্দ-পুরম্ এবং শিবানন্দপুরম্ নামে দুইটি কলোনির নির্মাণকার্যে ২৫,০০০ টাকা ব্যয় হয়। অধিকন্তু রামানাদ জেলায় ১৬২১টি কুটির-নির্মাণে ৩৮,০০০ টাকা লাগে।

বেদারণ্যম্ ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে যে সেবাকার্য করা হয় তাহাতে ২৪০ জন স্বেচ্ছাসেবক সহ মিশনের কর্মীরা জামাকাপড়, বাসন, গুঁড়া দুধ, বাড়ী তৈয়ারীর জন্য জিনিসপত্র বিতরণ করেন। দুইজন অভিজ্ঞ নার্স ও কয়েকজন কর্মী গ্রামে গ্রামে যাইয়া ঔষধপত্রাদি দ্বারা রোগী-দিগের পরিচর্যা করেন। রিলিফ-ক্যাম্পে একটি অস্থায়ী চিকিৎসালয় খোলা হয়, উহাতে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ৫৮৯ রোগীর চিকিৎসা করেন। ঘূর্ণিবাত্যায় বিশেষভাবে আহত ব্যক্তি-দিগকে তাঞ্জোর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

২,১০০ মণ চাল রান্না করিয়া ৩,৬০,০০০ লোককে খাওয়ানো হয়। ৭৫,৭০০ খানি নূতন এবং ৩৫,৫৪০ খানি পুরাতন কাপড় বিতরণ করা হয়। ৯৮৭টি বিদ্যার্থীকে পোষাক-পরিচ্ছদ, শ্লেট, পেন্সিল প্রভৃতি দেওয়া হয়।

প্রাথমিক রিলিফ শেষ হইলে পুনর্বাসন-কার্য আরম্ভ হয়। এই গ্রামের ২০০টি পরিবারের পুনর্বাসন-ব্যবস্থা মিশনকে করিতে হয়। প্রত্যেকটি পরিবারের জন্য টালির ছাদবিশিষ্ট ১০´×৮´ ফুটের শয়নগৃহ, ধোঁয়াশূন্য উনানবিশিষ্ট স্বতন্ত্র রান্নাঘর নির্মাণ করা হয়। পানীয় জলের জন্য ১০টি নলকূপ তৈয়ার করা হয়। এই সাইক্লোন রিলিফ-কার্য ও কলোনি-নির্মাণে মোট ৫,২৫,৭৩৬ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

(২) দাঙ্গা

১৯৫৭, সেপ্টেম্বরে রামনাথপুরম্ জেলায় ভীষণ দাঙ্গার ফলে ৪টি তালুক ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে মিশন ৪.১০.৫৭ হইতে ২৮.১২.৫৭ পর্যন্ত ১২৪টি গ্রামে ৩,২৫২ পরিবারের মধ্যে সেবাকার্য করেন এবং ৪৫টি গ্রামে ১,২২৩ গৃহ পুনর্নির্মাণ করিয়াছেন।

(৩) বন্যা

নেলোর জেলায় বন্যায় মিশন-পরিচালিত রিলিফ-কার্যে (১৯৫৭-৫৮) ৫৫টি গ্রামে ২,৭০৭ পরিবারকে ৩,৭২৫ ধুতি, ৩,৯২১ শাড়ী, ২,৪১০ ছোটদের জামা-প্যাণ্ট, ১,২৯১ তোয়ালে, ১৭৭ জ্যাকেট, ১,৮০০ কম্বল, ২,৫৯৬ মাদুর, ৭,৪৪১ পুরাতন কাপড়, ৯,১১৫ এলুমিনিয়াম পাত্র, ৩,৬৬৫ মন চাল এবং ১,৫০০ দেওয়াল-ল্যাম্প বিতরণ করা হয়। জিনিসপত্র ছাড়া এই সেবাকার্যে ৪৫,৭৫৭ টাকা নগদ ব্যয় হয়।

কার্যবিবরণী

এলাহাবাদ: ৫০ বৎসর পূর্বে ১৯১০ খৃঃ পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ কর্তৃক এলাহাবাদের মুঠিগঞ্জ এলাকায় এই সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭-৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত সেবাশ্রমের বর্তমান কর্মধারা: (১) বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়, (২) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, (৩) ক্লাস ও বক্তৃতার মাধ্যমে সর্বজনীন ধর্মপ্রচার।

চিকিৎসালয়ে '৫৭ ও '৫৮ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে ৩৭,০৭৯ ও ৪১,১১৯ রোগী চিকিৎসিত হয়। পৌর-প্রতিষ্ঠান কিছু কিছু বার্ষিক সাহায্য করিয়া থাকেন।

লাইব্রেরিতে বর্তমানে ৫৪৬৫ খানি মূল্যবান্ পুস্তক আছে। ১৯৫৮ খৃঃ ৯৫০টি পুস্তক পঠনার্থে প্রদত্ত হইয়াছিল। পাঠাগারে ২২টি পত্র-পত্রিকা নিয়মিত রাখা হয়। সম্প্রতি শিশুবিভাগ খোলা হইয়াছে। ১৯৫৭ খৃঃ ৭৫,৪৮৮ টাকা ব্যয়ে লাইব্রেরির নূতন ভবনের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয় এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর কর্তৃক ১৯.১০.৫৮ তারিখে ইহার উদ্বোধন হয়।

রামনবমী, জন্মাষ্টমী, বুদ্ধজয়ন্তী, খৃষ্ট জন্মদিন যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব বিশেষ পূজা-হোম, ভজন ও কীর্তন সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়।

চিকিৎসালয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য দুইটি গৃহের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে, ইহার জন্য ১৭,০০০ টাকা আবশ্যক।

রাঁচি: রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা-আরোগ্য ভবনের ১৯৫৮ খৃঃ বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই স্যানাটোরিয়ামটি রাঁচি শহর হইতে দশ মাইল দূরে রাঁচি-চাইবাসা রোডের পার্শ্বে অবস্থিত। স্বাস্থ্যকর সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে—২,১০০ ফুট উচ্চতায় প্রায় ২৭৯ একর পরিমিত অরণ্যময় ভূখণ্ডের উপর এই আরোগ্য-ভবন গড়িয়া উঠিতেছে। এখান হইতে কলিকাতা ও পাটনার দূরত্ব যথাক্রমে ২৬০ ও ২২৫

মাইল। বৈদ্যুতিক আলো, টেলিফোন (রাঁচি ২৪৮) ও জলাধারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯৩৯ খৃঃ পরিকল্পিত হইলেও ১৯৫১ খৃঃ ৫২টি শয্যা (bed) লইয়া প্রতিষ্ঠানটির সূচনা হয়। ৮ বৎসরের মধ্যে ইহা আধুনিক একটি পূর্ণাঙ্গ আরোগ্য-ভবনে পরিণত হইয়াছে। ইহা ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট যক্ষ্মা-চিকিৎসাকেন্দ্র।

১৮টি কেবিন ও ১৪টি কটেজ সহ বর্তমানে মোট শয্যা-সংখ্যা ১৮০ (৩২টি দরিদ্র রোগীদের জন্য সংরক্ষিত)।

এখানে দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগের আধুনিকতম ফুসফুস-অস্ত্রোপচারসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা-ব্যবস্থাদি আছে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসাকার্যে নিযুক্ত আছেন। কর্মী, চিকিৎসক ও রোগীসহ এখানে মোট চারশত জন লোক থাকে।

১৯৫৮ খৃঃ ৩৩২টি (পূর্ব বৎসরের ১৫৬) রোগী চিকিৎসিত হয়, ইহার মধ্যে ৬৮টি বিনা ব্যয়ে এবং ৩১টি আংশিক ব্যয়ে।

আলোচ্য বর্ষে নূতন পাকশালা, সংগ্রহ-ভবন কর্মী-ভবন এবং আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের শিল্প-ভবনের নির্মাণকার্য শেষ হইয়াছে। জল-সরবরাহ ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১০টি শয্যা-সংযোগের কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসায় কঠিন যক্ষ্মা-রোগের কবল হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত আগ্রহশীল কতিপয় ব্যক্তিকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া আরোগ্য ভবনেই বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত করা হইয়াছে। রোগমুক্ত ব্যক্তিদিগকে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নির্মীয়মাণ কলোনির সার্থক রূপায়ণে সরকার ও বদান্য ব্যক্তিগণের সহৃদয় সহযোগিতা প্রয়োজন।

সারদাপীঠ (বেলুড়): মিশন পরি-চালিত শিক্ষা-কেন্দ্রগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যে ও ব্যাপকতায় সারদাপীঠ এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। সারদাপীঠের প্রধান ৫টি বিভাগ: বিদ্যামন্দির, শিল্পমন্দির, তত্ত্বমন্দির, জনশিক্ষা-মন্দির, এবং সমাজশিক্ষণকেন্দ্র (S.E.O.T.C.)। সারদাপীঠের ১৯৫৮ খৃঃ সুমুদ্রিত কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত।

(১) বিদ্যামন্দির

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শে স্থাপিত আবাসিক কলেজ বিদ্যামন্দির ইহার প্রতিষ্ঠা-বর্ষ (১৯৪১ খৃঃ) হইতেই উৎকৃষ্ট পরীক্ষাফলের জন্য জনসাধারণের ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী-গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বিদ্যামন্দিরে ২১৩জন ছাত্র ছিল, ২৬জন অভিজ্ঞ অধ্যাপক (৬ জন সাধু) তাঁহাদের শিক্ষাদান ও তত্ত্বাবধান করেন। ১৯৬০খৃঃ হইতে বিদ্যামন্দির তিন বৎসরের ডিগ্রি কলেজে উন্নীত হইবে। সাধারণ শিক্ষানুষ্ঠানের সহিত ছাত্র-পরিষদের উদ্যোগে প্রার্থনা, পূজা, জাতীয় উৎসব, বিতর্ক ও সাহিত্যসভা, পত্রিকা-প্রকাশ, ছুটিতে বিভিন্ন স্থানে দলবদ্ধ অভিযান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

(২) শিল্পমন্দির

শিল্পমন্দিরের ৩টি বিভাগ: ইঞ্জিনিয়রিং, টেকনিক্যাল ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল। ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগে ১৯৫২-৫৫খৃঃ পর্যন্ত জুনিয়র ডিপ্লোমা কোর্স শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ বা তদূর্ধ্ব শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদিগকে উচ্চতর শিল্পশিক্ষা দিবার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সহায়তায় তিন বৎসরের সিনিয়র ডিপ্লোমা কোর্স বা লাইসেন্‌সিয়েট ইঞ্জিনিয়রিং চালু করা হইয়াছে। এখানে সুযোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ সিভিল (L.C.E.), মেকানিক্যাল (L.M.E.) ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল (L.E.E.)

ইঞ্জিনিয়রিং শিক্ষা দেন। শিল্পমন্দিরের ছাত্রাবাসে এ বৎসর ১৩৫ জন ছাত্র ছিল।

শ্রমশিল্প-বিভাগে বয়ন ও রঞ্জন-শিল্প, খেলনা-তৈয়ার এবং কাঠের ও দর্জির কাজ শেখানো হয়। শিল্প-বিভাগের বিক্রয়কেন্দ্রে শ্রমশিল্প ও যন্ত্র-শিল্প-জাত দ্রব্যাদি সর্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

শিল্প-বিভাগে একটি গবেষণাগার আছে, সেখান হইতে উদ্ভাবিত গোময়-গ্যাস প্ল্যাণ্ট, পেট্রল-গ্যাস প্ল্যাণ্ট, ইলেক্‌ট্রিক ক্লক ও অটোমেটিক তাঁত উল্লেখযোগ্য, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে প্রশংসিত।

(৩) তত্ত্বমন্দির

ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচার উদ্দেশ্যে তত্ত্বমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার চতুষ্পাঠীতে সারদাপীঠের কর্মিগণ বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

ভারতের জাতীয় আদর্শ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বাহক সংস্কৃত ভাষাকে মর্যাদা দিবার উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দের মহতী ইচ্ছা রূপায়িত করিবার জন্য বেলুড় মঠের সন্নিকটে গঙ্গাতীরে একটি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করা হইতেছে। তত্ত্বমন্দিরে মাঝে মাঝে সর্বসাধারণের জন্য ধর্মসভার ব্যবস্থা করা হয়।

(৪) জনশিক্ষা-মন্দির

জনশিক্ষা-মন্দিরের প্রধান কাজ দেশের বিভিন্ন অংশে 'ত্যাগ ও সেবা'র আদর্শে উপযুক্ত কর্মী ও দেশসেবক গড়িয়া তোলা। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, চলচ্চিত্র ও শিক্ষা-শিবিরের মাধ্যমে ইহার কাজ ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে।

স্নাতকোত্তর সমাজ-শিক্ষা-শিক্ষণকেন্দ্র (S.E.O.T.C) খোলা হইয়াছে (১৯৫৮ খৃঃ), এখানে গ্রাজুয়েট ছাত্রগণ সমাজ, গ্রামোন্নয়ন, স্বাস্থ্য, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি, মনস্তত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকগণের নিকট শিক্ষালাভ করেন; প্রায়োগিক শিক্ষার উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে দুইবারে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৭৭ জন সমাজসেবী শিক্ষা পাইয়াছে।

(৫) শিক্ষামন্দির

শিক্ষামন্দির বা আবাসিক B. T. College-এ আলোচ্যবর্ষে ৪৭ জন শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

* * *

সারদাপীঠের আরও কয়েকটি বিভাগ: ফটোগ্রাফিক, গোপালন, কৃষি ও পুস্তক-প্রকাশন। সারদাপীঠ হইতে প্রকাশিত বার্ষিক ও সাময়িক পত্রিকা: বিদ্যামন্দির (কলেজের), ত্রয়ী (শিল্পমন্দিরের), চরৈবেতি (জনশিক্ষা-মন্দিরের), অনির্বাণ ও মাসিক বুলেটিন (S.E.O.T.C.)।

বলরাম-মন্দির (কলিকাতা):

প্রতি শনিবার পাঠ ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল—

	বিষয়	বক্তা
আগষ্ট:	গীতা	স্বামী সাধনানন্দ
	যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ	„ জীবানন্দ
	ভারতীয় সংস্কৃতি	„ মহানন্দ
	বিবেকানন্দ	অধ্যাপক প্রমথনাথ দে
	শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত	স্বামী দেবানন্দ
সেপ্টেম্বর:	ভাগবত	„ জীবানন্দ
	শ্রীশ্রীমা	ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী
	মহাভারত	অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী
	শ্রীশ্রীচণ্ডী-কথকতা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসব

রহড়া: গত ১৬ই অক্টোবর শুক্রবার সকাল ৭-৫৫ মিঃ-এ রহড়া বালকাশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু সাধু ও ভক্তের উপস্থিতিতে

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে ১৫ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার হইতে ২১শে অক্টোবর বুধবার পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। ১৬ই, ১৭ই এবং ১৮ই অক্টোবর তিন দিনই ঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ইত্যাদি এবং কাশী হইতে আগত যাজ্ঞিকপ্রবর শ্রীঅগ্নিযাত্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের নেতৃত্বে কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের পণ্ডিত মহাশয়গণের সহায়তায় যথাক্রমে বাস্তুযাগ, রুদ্র-যাগ এবং সপ্তশতী হোম অনুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞের জন্য মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে পৃথক্ ভাবে বিচিত্র সুসজ্জিত যজ্ঞমণ্ডপ নির্মাণ করা হয়। বৈদিক পদ্ধতি অনুসারে কৃত এই যজ্ঞ দেখিবার জন্য স্থানীয় এবং কলিকাতা হইতে আগত বহু লোকের সমাগম হয়।

এতদুপলক্ষে নিম্নলিখিত বিচিত্র কার্যসূচী অনুসৃত হইয়াছিল :

১৫ই অক্টোবর সন্ধ্যায় অধিবাস পরে কীর্তন।

১৬ই প্রাতঃ—বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা, পূজা হোম ও বাস্তুযাগ।
সন্ধ্যা—শ্যামাসঙ্গীত ও বাউল গান।

১৭ই প্রাতঃ—পূজা হোম ও রুদ্রযাগ।
অপরাহ্ণ—মহাভারতীয় ভাষণ : শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী।
সন্ধ্যা—যন্ত্রসঙ্গীত ; আলী আকবর খাঁ।

১৮ই প্রাতঃ—পূজা ও সপ্তশতী হোম
শ্রীরামকৃষ্ণ-আত্তলীলা কীর্তন।
দ্বিপ্রহরে—নারায়ণসেবা।
অপরাহ্ণ—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক জনসভা।
বক্তা শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

১৯শে সন্ধ্যা—শ্রীচৈতন্যলীলা যাত্রাভিনয়।
প্রাতঃ—ভাগবত-পাঠ : শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী।
অপরাহ্ণ—ভজন : শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী।
সন্ধ্যা—উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত।

২০শে প্রাতঃ—শ্রীরামকৃষ্ণ-কিশোরলীলা কীর্তন।
অপরাহ্ণ—তরজা।
সন্ধ্যা—যাত্রাভিনয় : চন্দ্রগুপ্ত।

২১শে প্রাতঃ—নগরকীর্তন।
অপরাহ্ণ—শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা ভজন।
সন্ধ্যা—চলচ্চিত্র : শ্রীরামকৃষ্ণ।

সাতদিনব্যাপী উৎসবে সমস্ত আশ্রম-প্রাঙ্গণ সর্বদাই আনন্দে মুখরিত থাকে এবং হাজার হাজার ভক্ত নরনারী ইহাতে যোগদান করেন। এই মন্দির নির্মাণ করিতে প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে, কলিকাতার মার্টিন বার্ণ কোম্পানী ইহা নির্মাণ করিয়াছেন। মন্দির-সংলগ্ন নাটমন্দিরে প্রায় ছয়শত লোক একসঙ্গে বসিতে পারে। বিভিন্নমুখী কর্মধারার সঙ্গে এই মন্দিরটি নির্মিত হইবার ফলে আশ্রমের বহুদিনের একটি অভাব পূর্ণ হইল।

বেদান্ত-সমিতির নূতন মন্দির

সানফ্রান্সিস্কো : গত ৭ই হইতে ১১ই অক্টোবর পর্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী উৎসবের মাধ্যমে স্যানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত-সমিতির নবনির্মিত বৃহৎ মন্দির ও বক্তৃতাগৃহের শুভ উদ্বোধন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সন্ন্যাসিগণ এবং বহু ভক্ত এই উপলক্ষে স্যানফ্রান্সিস্কোতে আসিয়াছিলেন। প্রথম চারদিন নানাবিধ পূজার্চনা, বেদ উপনিষদ্ গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্রাবৃত্তি এবং ধর্মসঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরের কাষ্ঠনির্মিত বেদিটির পরিকল্পনা ও কারুকার্যে প্রধানতঃ ভারতীয় শিল্প-কলা অনুসৃত হইয়াছে। বেদির উপর শ্রীরাম-কৃষ্ণ (মাঝখানে), শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, বুদ্ধ ও যীশুখ্রীষ্ট এই পাঁচজনের পূর্ণাবয়ব ব্রঞ্জ মূর্তি স্থাপিত। প্রথম তিনটি মূর্তির নির্মাতা রবার্ট শিন নামক জনৈক স্থানীয় ভাস্কর। বুদ্ধ ও যীশুখ্রীষ্টের মূর্তি গড়িয়াছেন মহিলা ভাস্কর মেরী টিলডেন স্ট্রীভী। বেদির শীর্ষে সকল মত ও পথের প্রতীকস্বরূপ স্বর্ণ-মণ্ডিত কাঠের ওঁকার শোভা পাইতেছে। উৎসবের কয়দিন সনাতন হিন্দুধর্মের দেবা-রাধনার বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবগম্ভীর পরিবেশ সমবেত পাশ্চাত্য ভক্তগণকে গভীরভাবে মুগ্ধ

ও অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। উৎসবের পঞ্চম দিন রবিবারে একটি মহতী সভায় সর্বসাধারণের জন্ম মন্দিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন হয়। সমিতির পরিচালক স্বামী অশোকানন্দ সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাধ্যমে সকল মত ও পথের সত্যানুসন্ধিৎসুগণের জন্ম এই মন্দিরের লক্ষ্য ও কর্মপ্রণালী উল্লেখ করিয়া মন্দিরের শুভারম্ভ ঘোষণা করিবার পর পর্যায়ক্রমে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ, স্বামী অখিলানন্দ, স্বামী বিবিদিষানন্দ, স্বামী অশেষানন্দ, স্বামী সর্বগতানন্দ ও স্বামী পবিত্রানন্দ বেদান্তের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন। স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ প্রারম্ভিক প্রার্থনা এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সমাপ্তিসূচক শান্তিপাঠ করিয়াছিলেন। স্যানফ্রান্সিসকোর এই নূতন মন্দিরটি বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম বেদান্ত-মন্দির। অতঃপর এখানে নিত্য পূর্বাহ্নে পূজা, সান্ধ্য উপাসনা ও ধ্যানধারণা এবং রবিবার সকালে ও বুধবার সন্ধ্যায় বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হইবে। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেরই জন্ম মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত। বাড়িটির একতলায় পুস্তকাগার ও পুষ্পোদ্যান এবং ত্রিতলে সমিতির অফিস। মন্দিরের পাশে একটি পৃথক্ বাড়িতে সমিতির নারীমঠ। পুরাতন বাড়িতে শুক্রবারের উপনিষদ্-ক্লাস, ছাত্রছাত্রীগণের ধর্মশিক্ষার স্কুল এবং সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের মঠ পরিচালিত হইতেছে।

* * *

এতদুপলক্ষে ১২ই অক্টোবর প্রত্যূষে চজন আমেরিকান যুবক ব্রহ্মচর্য-ব্রত গ্রহণ করেন। বেলুড় মঠের অনুমতিক্রমে স্যানফ্রান্সিসকো আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দই তাঁহাদের ঐ ব্রতে দীক্ষিত করেন।

বিবিধ সংবাদ

সংস্কৃত নাটকাভিনয়

এবার পূজাবকাশে সংস্কৃত নাটক প্রচারের নিমিত্ত প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের অভিনেতৃবৃন্দ দক্ষিণ ভারতে গমন করেন। ছয়রাত্রে তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত 'শক্তি-সারদম্', 'মহাপ্রভু-হরিদাসম্' এবং 'ভারতহৃদয় অরবিন্দম্' অভিনয় করেন। ১৪ই অক্টোবর মাদ্রাজের বিশিষ্ট রঙ্গস্থান 'রসিকরঞ্জনী হলে' 'মহাপ্রভু-হরিদাসম্' অভিনয় করেন। মাদ্রাজের রাজ্যপাল বিষ্ণুরাম মেধী, ভারতের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীপতঞ্জলি শাস্ত্রী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন, অভিনয়ান্তে তাঁহারা এই প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। পন্দিচেরীতে ও মাদ্রাজে 'শক্তি-সারদম্' নাটকের অভিনয় সকলকে বিশেষ আনন্দ দান করে। পন্দিচেরী আশ্রমে ডক্টর চৌধুরীর সর্বশেষ সংস্কৃত নাটক 'ভারতহৃদয় অরবিন্দম্' নাটক প্রায় আড়াই হাজার আশ্রমবাসী এবং অন্যান্য সুধীসজ্জন সমক্ষে অভিনীত হয়।

ভারতে শিক্ষায় ব্যয়

শিক্ষাব্যাপারে (কোটি টাকার অঙ্ক)

পঞ্চবার্ষিক	মোট ব্যয়	কেন্দ্রীয় ব্যয়	মোটব্যয়ের
১ম	১৬৯	৪৪	৭%
২য়	২৭৫	৬৮	৬%

বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষাখাতে শতকরা ব্যয়

৩টি	,,	শতকরা	২৫ এর বেশি
৯টি	,,	,,	২০ হইতে ২৫
৬টি	,,	,,	১০ ,, ২০
২টি	,,	,,	১০ এর কম

বোম্বাই সর্বাপেক্ষা বেশি, তারপর ক্রমানুসারে উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, পশ্চিম বঙ্গ।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান :—	বোম্বাই	৬৬,২৭৯ গুলি
	উত্তরপ্রদেশ	৪০,৭১৮ ,,

জনসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান :

মণিপুর, ত্রিপুরা	৫০০ জনের জন্য ১টি		
আসাম, আন্দামান	৭০০	,,	,,
বোম্বাই, মহীশূর উড়িষ্যা, পঃ বঙ্গ	৮০০	,,	,,
অন্যান্য ১০টি রাজ্যে	৯০০	,,	,,

১৯৫৮।৫৯খৃঃ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত টাকা শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগে নিম্নলিখিত শতকরা হারে ব্যয়িত হইয়াছিল।

যন্ত্রবিজ্ঞান	২৬%
প্রাথমিক	২১ ,,
মাধ্যমিক	১৮ ,,
বিশ্ববিত্যালয়	১২ ,,
বিবিধ	৯
ছাত্রদের বৃত্তি	৭
সমাজ-কল্যাণ	৭

বিভিন্নপ্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মোটসংখ্যার শতকরা পল্লী অঞ্চলে

বৃত্তিমূলক	৭৭%
প্রাথমিক	৮৮ ,,
মাধ্যমিক	৬৮ ,,
কলেজ	৮ ,,

—নিবেদন—

আগামী মাঘ মাসে 'উদ্বোধনে'র নূতন (৬২তম) বর্ষ আরম্ভ হইবে। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্বক নাম ঠিকানা সহ বার্ষিক ৫৲ (পাঁচ টাকা) ১৫ই পৌষেব মধ্যে উদ্বোধন-কার্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। টাকা যথাসময়ে হস্তগত হইলে ভি পি.-তে পত্রিকা পাঠাইবার অতিরিক্ত ডাক-ব্যয় বাঁচিয়া যায় ও অযথা বিলম্ব হয় না। **মনিঅর্ডার কুপনে গ্রাহক-সংখ্যা** অতি অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। ইতি—

কার্যাধ্যক্ষ
১, উদ্বোধন লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা ৩

উদ্বোধন

শ্রীশ্রীসারদাদেবীস্তোত্রম্

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

যা দেবী মর্ত্যদেহেঽমরগণ-বিরল-জ্যোতিষা দীপ্যমানা
যস্যাঃ পুণ্যপ্রভাবৈরগণিত-মনুজা দর্শিতা মুক্তিমার্গম্।
যস্যাঃ পীযূষবাণী নিখিল-তনুভৃতাং সর্বসন্তাপ-হন্ত্রী
শ্রীমা-রূপেণ নৃণাং নিয়ত-হিতকরীং **সারদাং** তাং নমামি ॥১॥

পত্যুঃ স্থানং ব্রজন্তী স্বজন-পরিহৃতা প্রান্তরে ভীমদস্যুং
'কন্যাহং সারদা তে ত্বমসি মম পিতা রক্ষণীয়া ত্বয়াহম্।'
ইত্যুক্ত্বা দস্যুচিত্তং কুলিশ-সুকঠিনং কোমলং যা চকার
শ্রীমা-রূপেণ মহ্যাং ধৃততনুমভয়াং **সারদাং** তাং নমামি ॥২॥

ত্যক্ত্বা ভোগস্য মার্গং পতিগত-হৃদয়া তদ্‌ব্রতে চৈকনিষ্ঠা
পূর্ণং কর্তুং ব্রতং তদ্ বিগলিত-চিকুরা মাতৃভাবাশ্রিতা যা।
পত্যুঃ পূজামগৃহ্ণাজ্জগতি নিরুপমাং ষোড়শী সিদ্ধিদাত্রী
শ্রীমা-খ্যাং বিশ্ববন্দ্যাং গিরিবর-তনয়াং **সারদাং** তাং নমামি ॥৩॥

ভক্তানাং মাতৃরূপাং সততমভয়দাং সর্বকল্যাণকামাং
পত্যুরুগ্নস্য সেবামনলস-মনসা কুর্বতীং ক্লান্তিহীনাম্।
আতিথ্যে মুক্তহস্তাং সুনিপুণ-গৃহিণীমব্ধিজাতা-স্বরূপাং
শ্রীমা-খ্যাং বিশ্বরূপামভিমত-বরদাং **সারদামর্চয়ামি** ॥৪॥

লব্ধ্বা মাতৃত্ব-সম্পদ্-বহুসুকৃতিফলং যোষিতঃ পূর্ণকামা-
স্তস্মাৎ সন্তানচিন্তা মনসি সমুদিতা সা তু তত্রৈব লীনা।
সংখ্যাতীতান্ সুপুত্রান্ নিজ-তনুজ-নিভান্ প্রাপ্য যাসীৎ কৃতার্থা
কল্যাণীং শুদ্ধসত্ত্বাং জনগণজননীং **সারদাং** তাং নমামি ॥৫॥

প্রণত-হৃদয়পদ্ম-ন্যস্তপাদাব্জযুগ্মা মধুরবচনগর্ভাং বিভ্রতী কণ্ঠবীণাম্।
রুচিরবিমলকান্তির্জ্ঞানভক্তিপ্রদাত্রী নিখিলভুবনপূজ্যা **সারদা**সারদৈব ॥৬॥

জয়তু জয়তু দেবী ধ্যানগম্ভীরমূর্তির্জয়তু জয়তু দেবী সাধকাভীষ্টদাত্রী।
জয়তু জয়তু দেবী রামকৃষ্ণস্য শক্তির্জয়তু জয়তু দেবী সারদা বিশ্বধাত্রী॥৭॥
বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুপার্শ্বে বিহরতি কমলা বিশ্বকল্যাণদাত্রী
কৈলাসে শম্ভুবাসে বিহরতি গিরিজা লোকরক্ষা-বিধাত্রী।
জাহ্নব্যাং পুণ্যতীর্থে মণিময়-ভবনে কালিকা-পাদপদ্মে
রাজেতে ধ্যানমগ্নৌ মম হৃদয়-নিধী সারদা-রামকৃষ্ণৌ ॥৮॥

(বঙ্গানুবাদ)

যিনি মর্ত্যদেহ ধারণ করিয়াও দেবদুর্লভ জ্যোতিতে দীপ্তিময়ী, যাঁহার পুণ্যপ্রভাব অসংখ্য মানবকে মুক্তির পথ দেখাইয়াছে, এবং যাঁহার অমৃতবাণী সমুদয় জীবের সর্বসন্তাপহারিণী, শ্রীমা-রূপে মানুষের নিয়ত হিতকারিণী সেই সারদাকে প্রণাম করি।১।

পতির আলয়ে গমনকালে প্রান্তরে স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া ভীষণ দস্যুকে 'আমি তোমার কন্যা সারদা, তুমি আমার পিতা, আমাকে রক্ষা কর' এই কথা বলিয়া যিনি বজ্রের ন্যায় সুকঠিন দস্যু-হৃদয়কে কোমল করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে শ্রীমা-রূপে দেহধারণকারিণী সেই ভয়শূন্যা সারদাকে (অথবা সারদা-রূপিণী অভয়াকে—অর্থাৎ দুর্গাকে) প্রণাম করি।২।

যিনি ভোগের পথ ত্যাগ করিয়া পতিগতপ্রাণা ও পতির ব্রতে একনিষ্ঠা হইয়া সেই ব্রত পূর্ণ করিবার জন্য আলুলায়িতকেশবিশিষ্ট হইয়া মাতৃভাব আশ্রয় করিয়া সিদ্ধিদাত্রী ষোড়শী-রূপে পতির পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন—জগতে যাঁহার তুলনা মিলে না—'শ্রীমা'-নাম-ধারিণী বিশ্ববন্দ্যা গিরিরাজতনয়া (দুর্গা)-রূপিণী সেই সারদাকে প্রণাম করি।৩।

ভক্তগণের মাতৃস্বরূপা, সতত অভয়দায়িনী, সর্বকল্যাণকামা, অনলসমনে এবং ক্লান্তিহীন-ভাবে মুক্তহস্তা, লক্ষ্মীস্বরূপা সুনিপুণ গৃহিণী, এবং ঈশ্বরী-রূপে অভিমত-বরদায়িনী 'শ্রীমা'-নাম-ধারিণী সারদার অর্চনা করি।৪।

বহু সুকৃতির ফল-স্বরূপ মাতৃত্ব-সম্পদ্ লাভ করিলে নারীগণের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। অতএব (হয়ত 'শ্রীমা'রও) মনে সন্তানচিন্তা উদিত হইয়াছিল, কিন্তু উহা মনের মধ্যেই বিলীন হইয়া গিয়াছিল। তনুজ (তনুজাত পুত্র)-তুল্য বহু সুপুত্র (প্রকৃত ভক্ত সন্তান) লাভ করিয়া যিনি যথার্থই 'মা' হইয়াছিলেন—সেই কল্যাণী, শুদ্ধস্বভাবা, জনগণজননী সারদাকে প্রণাম করি।৫।

যিনি ভক্তগণের হৃদয়পদ্মে পাদপদ্মযুগল স্থাপন করিয়াছেন, এবং মধুর বচনপূর্ণ কণ্ঠরূপ বীণা ধারণ করিয়া আছেন, সুন্দর এবং বিমলকান্তি-বিশিষ্টা, জ্ঞানভক্তিপ্রদায়িনী এবং সমস্ত জগতের পূজনীয়া সেই সারদা সারদা (অর্থাৎ সরস্বতী) ব্যতীত আর কেহই নহেন।৬।

ধ্যানগম্ভীর-মূর্তিধারিণী দেবীর জয় হউক, জয় হউক। সাধকের অভীষ্টপূরণকারিণী দেবীর জয় হউক, জয় হউক। রামকৃষ্ণের শক্তিস্বরূপা দেবীর জয় হউক, জয় হউক। বিশ্বজননী দেবী সারদার জয় হউক, জয় হউক।৭।

বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পার্শ্বে বিশ্বকল্যাণদায়িনী লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন, কৈলাসে মহাদেবের বামে লোকরক্ষাকারিণী পার্বতী বিরাজ করিতেছেন, জাহ্নবীতটে পুণ্যতীর্থে মণিময় মন্দিরে কালিকা দেবীর পাদপদ্মে ধ্যানমগ্ন হইয়া আমার হৃদয়নিধি সারদা ও রামকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন।৮।

কথাপ্রসঙ্গে

শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা

স্বাধীনতা অর্জন করিবার সাধনা কঠিন, কিন্তু কিন্তু সেই অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করিবার সাধনা কঠিনতর। মুষ্টিমেয় অসাধারণ ব্যক্তির ত্যাগ তপস্যা, বিদ্যাবুদ্ধি, কল্পনা ও শক্তি বিদেশীর শাসনপাশ হইতে একটি দেশকে মুক্ত করিতে পারে, কিন্তু সেই দুর্লভ মুক্তি বা স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে অগণিত জনসাধারণের সংহত শক্তি। সেজন্য তাহাদের যে ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, যে কঠোর অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে—তাহার জন্য প্রয়োজন এক নূতন ধরনেব শিক্ষা। তাত্ত্বিক তথ্যানুসন্ধিৎসা ও নিছক জীবিকার্জনের শিক্ষা দ্বারা একটি জাতির স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। স্বাধীন জাতি মাত্রেই এ বিষয়ে সচেতন, ভারতও এ বিষয়ে অবহিত হইতেছে।

স্বাধীনতার পর এক যুগ (১২ বৎসর) কাটিয়া গেল। শিশু রাষ্ট্র এখন আর নেহাত শিশু নাই, ধীরে ধীরে কৈশোরের পরে যৌবনের পথে পা বাড়াইতেছে। এখন আর শৈশবের চঞ্চলতা, চপলতা বা অভিযোগমূলক ক্রন্দন তাহার শোভা পায় না, তাহাকে এখন শান্ত সংযত হইতে হইবে, শক্তি অর্জন করিতে হইবে। 'স্বাধীনতা' বলিতে এখন আর 'যা খুশি করিবার, যা খুশি বলিবার স্বাধীনতা' ভাবিলে চলিবে না। স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার নয়, স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাও স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা এক চরম ও পরম দায়িত্ব। যে জাতি উপযুক্ত শিক্ষা সহায়ে এই দায়িত্ব পালন করে, সেই জাতিই বড় হয়, বরণীয় হয়, আর যে জাতি সেই শিক্ষার অভাবে বহু কষ্টার্জিত স্বাধীনতার অপব্যবহার করে, সে জাতিকে আবার পরাধীনতার পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে আমাদের একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল,—একটি মাত্র সমস্যা ছিল, কিভাবে স্বাধীনতা লাভ করা যায়, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর দেখা দিয়াছে অগণিত সমস্যা, তন্মধ্যে অবশ্যই প্রধান—কিভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করা যাইবে। তাহার একটি মাত্র উত্তর—শিক্ষা, উপযুক্ত শিক্ষা। স্বাধীনতা রক্ষা করা কোন একজন নেতার বা সেনাধ্যক্ষের কাজ নয়। স্বাধীনতা রক্ষা করা শুধু সৈন্যবিভাগের কর্তব্য নয়। ব্যাপক যুগোপযোগী শিক্ষা পাইলে জনগণই স্বাধীনতা রক্ষা করিবে।

আজ যখন স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে, ট্রেনে-সিনেমায় দেখা যায় ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—দেশের যাহারা ভবিষ্যৎ নিয়ন্তা, তাহাদের এই বিসদৃশ ব্যবহাব কেন? সদ্যোলব্ধ স্বাধীনতা ইহারা কিভাবে রক্ষা করিবে? কে ইহাদের এরূপ বিশৃঙ্খল ব্যবহার শিখাইল? এই প্রশ্ন আজ দেশের নেতাদের বিচলিত করিয়াছে, চিন্তিত করিয়াছে, তাঁহারা ইহার প্রতীকারের চিন্তাও করিতেছেন। শুভ লক্ষণ।

ছাত্রদের এই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ একটি সাময়িক অসংযত উচ্ছ্বাস নয়, একটি স্থানীয় বিস্ফোরণ নয়, দূষিত ক্ষতের মতো ইহা বাড়িতেছে; পুরাতন ব্যাধির মতো ইহা সহ্য হইয়া আসিতেছে, কিন্তু জাতির শরীরকে ইহা পঙ্গু করিতেছে। দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে ছাত্রদের অদ্ভুত অদ্ভুত আচরণের সংবাদ আসিতেছে। কখনও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আস্ফালন—অকৃতকার্য ছাত্রকে পাস করাইয়া দিতে হইবে, কখনও

কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন—অনুপযুক্ত ছাত্রকে ভরতি করিতে হইবে। শুধু উত্তর ভারতে নয়, সেদিন দক্ষিণ ভারত হইতেও সংবাদ আসিয়াছে—একটি সাংস্কৃতিক সঙ্গীতানুষ্ঠানে অবাধ প্রবেশাধিকারের জন্য ছাত্রেরা গণ্ডগোল করিয়াছে। সিনেমায় ও ট্রেনে অনুরূপ ঘটনা সংবাদপত্রে প্রায়ই প্রকাশিত হয়। এ সকল ক্ষেত্রে ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার কখনই সমর্থন করা যায় না, কিন্তু আশ্চর্য, অবস্থা এমন আয়ত্তের বাহিরে কি করিয়া চলিয়া যায় যে শেষ পর্যন্ত স্থানীয় সরকারকে চরম পন্থা অবলম্বন করিতে হয়।

ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ রোগ বিশেষ, এবং ইহা সংক্রামক রোগ। ইহার কারণ নির্ণয় করিয়া ব্যাপক প্রতিষেধক ব্যবস্থা এখনই অবলম্বন করিতে হইবে। নতুবা জাতীয় জীবন বিপন্ন।

বিভিন্ন মনীষী ও চিন্তাশীল নেতা এই শৃঙ্খলা হীনতার বিভিন্ন কারণ নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিষেধক ঔষধ নির্ণয়ে প্রায় সকলেই একমত।

প্রথমে রোগের সম্ভাবিত কারণগুলি উল্লেখ করিয়া আমরা ঔষধের প্রসঙ্গ আলোচনা করিব।

অনেকের ধারণা সংগ্রামশীল বিপরীত আদর্শের সংঘাত—আবার নূতন করিয়া আমাদের দেশে শুরু হইয়াছে। পুরাতন কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা নাই, নূতন কোন আদর্শও ধরিতে পারিতেছে না, শুধু বিজাতীয় ভাবের প্রতি একটা মোহময় আকর্ষণ—এরূপ অবস্থায় ছাত্রগণ বিভ্রান্ত, বিচলিত! যান্ত্রিকতার যুগে, জড়বাদের স্রোতে নিজস্ব চিন্তা করিবার সময় নাই, শক্তিও নাই, যূথচারী মনোবৃত্তির (herd instinct) দ্বারা আজ আমাদের ছাত্রসমাজ চালিত।

আর একদল মনীষী বলেন, এ যুগের আর্থনীতিক অনিশ্চয়তাই ছাত্রদের মনে একটা বিফলতা ও ব্যর্থতার মনোভাব আনিয়াছে, তাহাতেই তাহারা ঐরূপ ব্যবহার করে, দেশের আর্থনীতিক কাঠামো সুদৃঢ় হইলে, বেকারভীতি দূরীভূত হইলে জীবনের একটা নিশ্চয় ভিত্তি ও নিশ্চিন্ত পন্থা পাইলে ছাত্রদের ব্যবহারে একটা সামঞ্জস্য—একটা শান্ত ছন্দ আসিবে।

তৃতীয় আর একটি মতও উপেক্ষণীয় নয়। এ মতের ব্যক্তিরা বলেন, ছাত্রেরা যেমন দেখিতেছে তেমন শিখিতেছে। শিক্ষকদের ব্যবহারই ছাত্রেরা অনুকরণ করে, নেতাদের আচরণই তাহারা অনুসরণ করে। বিধানসভার ও লোকসভার সভ্যদের কথাবার্তা চালচলন হইতেও ছাত্রেরা অনেক কিছু শিক্ষা করিতেছে।

সিনেমার পর্দায় ও পোষ্টারে যে চিত্র ও বিষয়বস্তু পরিবেশিত হয়, স্কুল-কলেজ হইতে যাতায়াতের পথে তাহাও ছাত্রদের জীবন প্রভাবিত করে। বিশেষতঃ ঐগুলির যৌন ও অপরাধমূলক আবেদন হইতে ছাত্রেরা নিজেদিগকে রক্ষা করিতে পারে না।

ছাত্রদের গৃহজীবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যায়—সেখানেও তাহারা দেখে এবং শোনে, আত্মীয়স্বজনদের অনেকে অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করিয়া বড়াই করিতেছেন। এরূপ পরিবেশে তরুণদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হইতে পারে?

আশাবাদী কোন কোন নেতা বলিয়া থাকেন, অত্যধিক শিক্ষাবিস্তারের জন্যই ছাত্রসমাজে এই বিশৃঙ্খলা। অর্থাৎ যে সকল পরিবারে এতদিন কোন উচ্চ শিক্ষা ছিল না, তাহাদের ছেলেরা স্কুলে কলেজে আসিতেছে, উচ্চশিক্ষার সহিত তাল মিলাইয়া তাহারা চলিতে পারিতেছে না, তাই এই বিশৃঙ্খলা।

এই কারণগুলি বিভিন্ন চিন্তাশীল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির উক্তি হইতে মোটামুটি উদ্ধৃতি, এইগুলি লইয়া আলোচনা না করিয়া আমরা প্রতীকার-প্রসঙ্গে মনোনিবেশ করিতেছি।

অযোগ্য ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষাই যদি এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া থাকে, তবে তো একেবারে প্রাথমিক স্তরে শৃঙ্খলা-শিক্ষাকেই অগ্রাধিকার

দেওয়া উচিত। শিক্ষাবিদ্‌গণ সকলেই এ বিষয়ে একমত : ছেলেকে যাহা শিখাইতে চাও—তাহা মাতৃ-দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া দাও।

যে কোন কারণেই হউক, একদিন দেশে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার বীজ উপ্ত হইয়াছিল, আজ আমরা তাহার বিষময় ফসল কাটিতেছি। আজ যদি শৃঙ্খলা ও সুনীতির বীজ বপন করিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই যথাসময়ে দেশে ঐ দুটি গুণ ব্যাপক ভাবে দেখা দিবে। এ বীজ বপন করিবার ক্ষেত্র অবশ্যই ছাত্রদের হৃদয়ে, প্রাথমিক স্তর হইতে শুরু করিয়া সর্বস্তরে এই শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা আজ সঞ্চারিত করিতে হইবে।

আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে অফুরন্ত শক্তি রহিয়াছে, উপযুক্ত সংগঠনকারীর অভাবে ঐ মহা শক্তি নানাদিকে বিক্ষিপ্ত। দুএকটি 'দুষ্টু ছেলে' বা দুর্বৃত্ত মানব গোলমালের সৃষ্টি করে, দুর্বৃত্ততা কাহারও স্বাভাবিক ধর্ম নহে। সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হইলেই বিভিন্নমুখী শক্তি সংহত হইয়া মহাশক্তিতে পরিণত হইবে, শুধু বক্তৃতা দ্বারা ইহা হইবার নহে।

দেশের সর্বস্তরে—শহরে গ্রামে পল্লীতে আজ চাই যোগ্য নেতা, সহানুভূতিসম্পন্ন নেতা—দেশের মাটিতে যাহার শিকড় আছে, দেশের মানুষের সহিত যাহার নাড়ীর সম্বন্ধ। জনসাধারণের অভাব অভিযোগ বুঝিয়া, সুখ-দুঃখ বুঝিয়া যিনি ত্যাগ-সেবামূলক স্থায়ী কাজ করিবেন, তিনিই বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো তাহাদের হৃদয় জয় করিতে পারিবেন, তিনিই তাহাদিগকে যথার্থ শিক্ষা দিয়া তাহাদের জীবন গঠন করিতে পারিবেন। পল্লীর ভিত্তিতে এরূপ কাজের সূত্রপাত হইলে সুনীতি ও শৃঙ্খলা ক্রমশঃ উচ্চ স্তরে সঞ্চারিত হইবে।

দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে সৈন্য সহায়ে সীমান্ত রক্ষা করার মতোই প্রয়োজনীয় কাজ দেশের আভ্যন্তরীণ শক্তি সংহত করা। শারীরিক বলের সহিত চাই মানসিক শক্তি। দুর্বল শরীরে কোন কাজ হয় না, আবার শৃঙ্খলা-শূন্য শারীরিক বলও পশু-শক্তি। তাহার দ্বারা মহৎ কিছু করা সম্ভব নয়। আত্মবিশ্বাস ও আদর্শনিষ্ঠাই মানুষকে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করে।

সম্প্রতি চীনের সহিত সীমান্ত-বিরোধ আমাদিগকে নূতন একভাবে নাড়া দিয়াছে। কোন আত্মসম্মানসম্পন্ন জাতি বৈদেশিক আক্রমণ সহ্য করিতে পারে না। এই বিপদের সম্মুখে সর্বপ্রকার স্বার্থ বিসর্জন দিয়া, ছোটখাট বাদবিসম্বাদ অতিক্রম করিয়া ঐক্যবদ্ধ জাতিরূপে আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

বিপদ ছোট হউক, বড় হউক—তাহার সম্মুখীন হইবার জন্য সর্বদা এই প্রস্তুতির ভাব শৃঙ্খলা-শিক্ষা হইতেই আসিয়া থাকে। এ শৃঙ্খলা সামরিক শিক্ষা হইতে সহজেই জাতীয় জীবনে সঞ্চারিত হয়। নৈতিক শিক্ষার সহিত সামরিক শিক্ষা ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবনে বহু সদ্‌গুণের সৃষ্টি করিবে : প্রথমতঃ শৃঙ্খলাবদ্ধ আচরণ, দ্বিতীয়তঃ সংঘবদ্ধ কর্মক্ষমতা, তৃতীয়তঃ সর্বত্র সহযোগিতার ভাব, তদুপরি গঠিত হইবে ছাত্রদের বজ্রদৃঢ় শরীরে এক সাহসী, সমবেদনশীল, সক্রিয় মন।

সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন : আজকাল স্কুল-কলেজের ছেলেরা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, ধনুকের মতো বাঁকা দেখায়! কি পরিতাপের বিষয়!

সামরিক শিক্ষা পাইলেই যে এখনই যুদ্ধে যাইতে হইবে, তাহা নয়। আজকালকার যুদ্ধে সৈন্যবিভাগের দায়িত্ব যতখানি, জনসাধারণের দায়িত্ব তদপেক্ষা কম নহে। এইজন্য সামরিক শিক্ষা আজ জাতীয় শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিলে সমগ্র জাতি শরীরের দিক দিয়া যেমন শক্ত ও সমর্থ হইবে, তেমনই মনের দিক দিয়া ঐক্যবদ্ধ ও সদাপ্রস্তুত হইতে শিখিবে। দেশের যে কোন বিপদের মুহূর্তে কোটি কোটি মানুষ একমন এক-প্রাণ হইয়া আগাইয়া আসিবে—বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়া।

চলার পথে

'যাত্রী'

কালস্রোতের উজান বয়ে একটি দিনের কথা স্মরণে আসছে। স্বমহিমায় দিনটি সত্যই অপূর্ব। মহাকালের ধ্বংসের মাঝে আজও যা শাশ্বত শতদল হ'য়ে ফুটে আছে।

ঐ কে যায়? ঐ সুবিস্তৃত মরুপ্রান্তরের রৌদ্রতাপে ঝলসান, পাথর ঘেরা, উঁচুনীচু পথ ধ'রে ঐ কে যায়?—কি অপরূপ তনু! কি উদ্ভাসিত দেহদীপ্তি! কি অদ্ভুত যৌনমধুরিমা! কি সকরুণ সুস্মিত আনন! ও যে একাই চলতে পারছে না। তার ওপর আবার ওকে ঐ গুরুভার বইতে দেওয়া কেন? ওকে দিয়ে কি বওয়াতে আছে ঐ ভারী ক্রুশ-কাষ্ঠ? ও যে তা বইতে পারছে না—তার ওপর পেছনের ঐ সৈনিকরা ওর ঐ বরতনুকে অমন নৃশংসভাবে চাবুক মারছে কেন? কি নির্মম নিষ্পেষণ! এত অত্যাচারেও সে কিন্তু এক গভীর ভাবে নিবিষ্ট! ও কি মানুষ? মানুষ হ'লে কি কখনো নীরবে এত যাতনা সহ্য করতে পারে।

আজ যার জন্য পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক ছুটে আসতে চায়, যার এতটুকু কষ্ট মুছে দেবার জন্য তারা সহস্র জীবন ডালি দেবার জন্য সদাই উন্মুখ—তাকে এই পদযাত্রায় সাহায্য করবার কি কেউ নেই?—একথা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু এই জগতে একদিন এমনি অবিশ্বাস্য ঘটনাই তো ঘটে গেছে।

যেমন ক'রে হোক, ও এগিয়ে চলেছে। সঙ্গে আরও দুজন দস্যু চলেছে ওরই সাথে, নিজ নিজ ক্রুশ ঘাড়ে ক'রে। ওদের সঙ্গে তুমি কেন চলেছ, ঈশা? তুমি তো নিষ্পাপ, মানব-দরদী তুমি, তুমি ঈশ্বর-পুত্র—তবু তোমার এ লীলা কেন? সবার মনের রাজা হয়েও তোমার মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়ে দিল যারা, তাদেরও শেষ পর্যন্ত তুমি ক্ষমা করতে পারলে? ধন্য তুমি!—এ সবের কিছুই বুঝতে পারি না। তন্দ্রাহারা মনেও এই বিচার কূল পায় না। মনে ব্যথা বাজে। ভাবনার ছন্দপতন হয়।

দিনটা বেশ বিষাদমাখা! মরু-প্রান্তরের চারিদিক ঘিরেই এক রহস্যময় আলোক স্তব্ধ হ'য়ে আছে। বৃক্ষহীন উষর প্রান্তরে অতীন্দ্রিয় ইঙ্গিতের আভাস। আকাশের অবয়বও কেমন এক প্রলয়ের কালো মেঘে কবলিত। শীঘ্রই ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে, তারই সঙ্কেত ছড়িয়ে রয়েছে।

ঐ, ঐ যে, ঐ শ্রান্ত ক্লান্ত যীশু চলতে চলতে পথের মধ্যে পড়ে গেল। ও কি শেষ পর্যন্ত বধ্যভূমি—'ক্যালভ্যারি'তে বা 'গলগোথা'-য় পৌছতে পারবে না? না পারলে, ওর পেছনে মজা-দেখার এত লোক হতাশ হবে যে। তারা যে ওকে ক্রুশে-বিদ্ধ অবস্থায় মরতে দেখতে চলেছে। তাই বুঝে প্রহাররত সৈনিকরাও যীশুকে একটু রেহাই দিলে। এমন কি, সেই জনতার মধ্য থেকে 'সাইমন' এসে যীশুর ক্রুশ বইবার কাজেও লেগে গেল। ধন্য সাইমন, তুমিই ধন্য! দেব-মানবের জন্য তোমার এই শ্রমদান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থেকে গেল।

ওগো ঈশা, ওগো দেব-মানব, তোমার ঐশ্বরিক ক্ষমতা আর কিছু অবশিষ্ট নেই কি? যদি থাকে, তাহলে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিচ্ছ না কেন?—অধম আমরা মহামানবের শক্তি বিচার করতে গিয়ে এইরূপ কথাই তো ভাবি। কিন্তু এ কি? 'ভেরোনিকা'র বাড়ির কাছে যীশু আসতেই, সেখানকার এক বালিকা বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে যীশুকে ঐ অবস্থায় দেখে কাঁদতে লাগল।

অসীম করুণায় সে তার রেশমী উত্তরীয় দিয়ে যীশুর মুখের ঘাম দিল মুছে। কি আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে ঐ বালিকার রেশমী উত্তরীয়ে যীশুর মুখচ্ছবি চিরতরে মুদ্রিত হ'য়ে গেল। তাহলে তো সকল ক্ষমতা থাকতেই স্বেচ্ছায় যীশুর এই মৃত্যুবরণ! মানবের পাপহরণের জন্য কি অদ্ভুত ত্যাগ স্বীকার! যিনি যুগ যুগ ধরে মানবকে অনুশোচনার অশ্রুজলে স্নান করিয়ে মুক্তির আলো বিতরণ করবেন, —সহস্র সহস্র লোক 'প্রভু' বলে যাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়বে, তাঁ'রই তো সাজে এই বিস্ময়কর মৃত্যুবরণ। কত মনে কত দোলাই তো দিয়ে যায়!

মরুভূমির মধ্যাহ্ন সূর্য তখন মাথার ওপর। বধ্যভূমিতে তখন ওরা পৌঁছে গেছে। একে একে তিনজনকেই ক্রুশে বিদ্ধ করা হ'ল। যীশুর হাতের তালুতে মোটা পেরেক ঠুকে দেহটিকে দেওয়া হ'ল ঝুলিয়ে। পা দুটিও এক ক'রে পায়ের পাতার ওপর পেরেক ঠুকে ক্রুশ-সংলগ্ন করা হ'ল। পরার্থে জীবন দানের এই মর্মন্তুদ কাহিনীর কি আর তুলনা মেলে।

ওধারে দিক্‌চক্রবালে ঘনমেঘের আবির্ভাব হয়েছে। ক্রমে ক্রমে আরো অন্ধকার ঘনিয়ে এল। বিদ্যুৎও চমকাতে লাগল। কুয়াশার আবরণে ছোট ছোট পাহাড়ের মাথাগুলো হ'য়ে এল অস্পষ্ট। কেমন এক অজ্ঞাত ভয়ে সকলের দেহ শির্‌ শির্‌ করতে লাগল। এমন সময় শোনা গেল প্রভুর শেষ বাণী—'হে স্বর্গীয় পিতা, তোমার হাতে আমার আত্মাকে ফিরিয়ে দিলাম।' পরক্ষণেই যীশুর শরীর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। তখন বেলা ৪টা, শুক্রবার (৭ই এপ্রিল), ৩০ খৃষ্টাব্দ।

এর পরেই আকাশ ভেঙে ভীষণ দুর্যোগ ঘনিয়ে এল। জেরুজালেমের প্রধান মন্দিরের চন্দ্রাতপ হ'য়ে গেল দ্বিখণ্ডিত। ভূমিকম্পে মেদিনী উঠল কেঁপে। পাহাড় থেকে প্রস্তর-খণ্ডসকল ভেঙে পড়তে লাগল। কবরসকল হ'ল উন্মুক্ত। কয়েকটি মন্দিরও খান্‌ খান্‌ হ'য়ে ভেঙে পড়ল। এই দুর্যোগের পরেই যীশুর স্বশরীরে পুনরাবির্ভাব অনেকেই দেখলেন। সে আবির্ভাব সত্যই রহস্যময়।

এমনি ভাবে, মানুষের হাতেই ঐ দেবমানবের নির্যাতন শেষ হ'ল। এই মহান মৃত্যুর কথা স্মরণ ক'রে আজও শিল্পীর তুলি থেমে যায়, কবির কল্পনা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে, আর ভাবুক অতন্দ্র ধ্যানে তন্ময় হ'য়ে যায়। পৃথিবীতে এই বিরাট তিরোভাব অসীম বুভুক্ষা নিয়ে আজও প্রহেলিকাময়।

এস পথিক, আগত বড়দিনের সময়, এই কালজয়ী অবতারের পূত চরিত্র ও বাণী স্মরণ ক'রে আমরা আমাদের চলার পথের পাথেয় সংগ্রহ করি। তাঁর আশীর্বাদের আগ্নেয় মশাল জেলে শুদ্ধকর্মের পথে এগিয়ে চলি, চল। সবার জন্য তিনি তাঁর প্রাণ দিয়ে গেছেন—সেই প্রাণের আরাধনায় নিজেদের জীবন ধন্য ক'রে নাও। সার্থক হোক সবাকার অগ্রগমন। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

শ্রীশ্রীশিবানন্দস্তবঃ

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

নমস্তে গুরবে তুভ্যং শিবানন্দস্বরূপিণে।
সচ্চিদানন্দরূপায় শম্ভবে দুঃখহারিণে ॥১॥
অহৈতুককৃপাসিন্ধো মায়াধ্বান্তবিনাশক।
ত্রাহি মাং ঘোরসংসারাজ্‌ জন্মমৃত্যুসমাকুলাৎ ॥২॥
দর্শনাদ্বৈ ভবন্মূর্তের্জনিমুৎপদ্যতে স্বয়ম্‌।
সাক্ষাত্ত্বৎপ্রসাদোঽহং কথং ন ভবপারগঃ ॥৩॥
সাক্ষাচ্ছিবস্বরূপস্ত্বং কাশীবিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ং।
তারকব্রহ্মমন্ত্রেণ মুমূর্ষুংস্ত্বং বিমুঞ্চসি ॥৪॥
শরণাগত-দীনার্ত-ভক্তানাং শরণং প্রভো।
দীনার্তোঽহং প্রপন্নোঽস্মি ত্রাহি মাং ভববন্ধনাৎ ॥৫॥
মহাজ্ঞানী মহাধ্যানী দেহাত্মবুদ্ধিবর্জিতঃ।
রামকৃষ্ণৈকতাদাত্ম্যস্তন্নামগ্রহণপ্রিয়ঃ ॥৬॥
ত্যাগবৈরাগ্যসংযুক্তঃ সন্ন্যাসিপ্রবরো মহান্‌।
জীবমুক্তঃ সদানন্দশ্চাভিমানবিবর্জিতঃ ॥৭॥
জ্ঞানেন দর্শয়ন্‌ লোকাংস্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্‌।
সেবকং ত্রাহি মাং নিত্যমেকান্তং শরণাগতম্‌ ॥৮॥

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

ভক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন লাহিড়ী

কোয়ালপাড়া মঠে কিছুদিন থাকার পর বাড়ী আসিবার পথে মায়ের সহিত দেখা করিয়া যাইব, মনে করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের জন্য কিছু মিছরি লইয়া যাত্রা করিলাম। তখন সন্ধ্যা। যাওয়ার পথে রাস্তা ভুল হওয়ায় খেয়া ঘাট হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে মা লোকজন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা দূরে লণ্ঠন দেখাইতেছিলেন এবং আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছিলেন; কিন্তু আমি ভয় পাইয়া আরও দূরে চলিয়া যাই।

তখন খুব মেঘ করিয়াছিল। খেয়া না পাইয়া মিছরি ও জুতা একসঙ্গে মাথায় লইয়া মায়ের কৃপায় বহুকষ্টে সাঁতরাইয়া নদী পার হইলাম। ভীষণ ঝড় ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। বিদ্যুতের আলোকে দুইধারে কণ্টকময় বাবলা গাছের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে আছাড় খাইতে খাইতে চলিলাম এবং একবার বেতের কাঁটার উপর পড়িয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু মায়ের কৃপায় শরীর অক্ষত রহিল।

ঝড়বৃষ্টি কমিয়া গেলে নিকটস্থ গ্রামে একটা বাড়ীতে উঠিলাম। কাপড়ের পুঁটুলি ভিজিয়া গিয়াছে। সেই বাড়ীতে আমাকে খাইবার জন্য খুব সাধিল, কিন্তু মাকে দেখিবার জন্য প্রাণে অত্যন্ত ব্যাকুলতা থাকায় বেশী দামে মুটে ভাড়া করিয়া সেই রাত্রেই মায়ের কাছে পৌঁছিলাম।

যাইবামাত্র মা আমাকে 'পাগল ছেলে' বলিয়া বলিলেন, 'তোমার জন্য লোক পাঠিয়েছিলাম, তাদের তুমি দেখতে পাওনি?' তখন আমি বলিলাম, 'দেখেছিলাম কিন্তু ভয় পেয়ে কাছে যাইনি।' আমার ভিজা কাপড় দেখিয়া পরিবার জন্য আমাকে মা একখানা কাপড় দিলেন এবং আমার পরিত্যক্ত কাপড় নিজে-হাতে কাচিয়া শুকাইতে দিলেন এবং আমার গা-হাত মুছাইয়া দিলেন।

রাত্রি তখন ১০টা; বলিলাম: 'মা, আমি তোমার জন্য মিছরি এনেছিলাম, কিন্তু জুতা আর মিছরি এক হ'য়ে গেছে, এই মিছরি তোমাকে দেব না, ফেলে দেব।' তখন মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবা, এ মিছরি তো আমার জন্য এনেছ?' আমি বলিলাম, 'তোমার জন্যই তো এনেছিলাম, মা।' মা আমার আর কোন কথা না শুনিয়া সযত্নে ঐ মিছরি লইয়া গেলেন।

রাত্রে মা আমাকে পরিতোষপূর্বক খাওয়াইলেন। পরে বলিলেন, 'দেখ বাবা, পরবসতশায়ী ও পরান্নভোজী কখনই হয়ো না। এ বড়ই কষ্ট, না বাবা?' আমি বলিলাম, 'মা, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি কখনই তা হবো না।'

মা বলিলেন, 'শ্রীশ্রীঠাকুরের সংসার মনে ক'রে সংসারে থাকবে এবং নিজে উপার্জন ক'রে খাবে।' আরও অনেক বিষয়ে উপদেশ দিয়া শেষে বলিলেন, 'ধর্মাড়ম্বর কখনও করবে না।'

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

সাধন করতে করতে দেখবে—আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগ্‌দি ডোমের মাঝেও তিনি…।

জীবন ও মৃত্যু

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

মৃত্যু যতক্ষণ সুদূরে, ততক্ষণ মৃত্যুর সম্বন্ধে অনেক তত্ত্বকথা অনায়াসেই আমাদের মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসে—যেন মৃত্যু একান্তই একটা সাধারণ ঘটনা, উহা আসা বা না আসা দুইই আমাদের নিকট সমান, যেন আমরা কনিষ্ঠ অঙ্গুলি নাড়িয়া মৃত্যুকে এক মুহূর্তে শাসন করিতে পারি! কিন্তু সেই মৃত্যুই যখন একটা ধ্রুব ঘটনা হইবার উপক্রম করিয়া একেবারেই সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন আমাদের মুখ শুকাইয়া যায়, আমাদের সকল আস্ফালন, বীরত্ব উদরের ভিতর ঢুকিয়া পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ-উদাহৃত টিয়া-পাখীর গল্পটি অতিশয় সত্য। মার্জারের ছায়া যেখানে নাই, সেখানেই পাখীর মুখে 'রাম'-নাম মধুর, মার্জার দেখা দিলে উহার কণ্ঠ হইতে আর 'রাম' নাম নির্গত হয় না, বাহির হয় কেবল 'ট্যাঁ ট্যাঁ' শব্দ। এ সংসারে আমরা সকলেই প্রায় টিয়াপাখী। আমাদের ধর্মচর্চা, শাস্ত্রবৈদগ্ধ্য, জপতপ, পূজাপাঠ অনেক সময়েই শুধু শিখানো বুলি। জীবনের চরম পরীক্ষা যখন আসে, তাহার সম্মুখে তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইবার সামর্থ্য আমরা খুঁজিয়া পাই না, সেই পরীক্ষার সম্মুখে অতি বড় ধার্মিকও কাপুরুষের মতো ব্যবহার করেন। সহস্রবার যিনি 'অচ্ছেদ্যোঽয়ম্ অদাহ্যোঽয়ং' গীতার এই উক্তি পাঠ করিয়াছেন, উহা লইয়া কত বক্তৃতা দিয়াছেন, তাঁহারও আত্মা অন্ধকারে ডুব মারে; জীবন-প্রদীপের সলিতা ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনিও মৃত্যুসময়ে আতঙ্কে চেঁচাইয়া উঠেন, 'আমায় বাঁচাও, আমায় বাঁচাও।'

হায় রে, বাঁচাইবে কে? মৃত্যু হইতে আখেরে কেহ বাঁচাইতে পারে কি? মোকদ্দমার মতো এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটিকে সাময়িকভাবে মুলতুবী রাখা চলে, কিন্তু একদিন তো খেলা-শেষের ঘণ্টা বাজিবেই। বুদ্ধদেব মৃত পুত্রের অবোধ জননীকে এই সহজ সত্যটি কেমন সুন্দর করিয়া বুঝাইয়াছিলেন!

'হাঁ মা, তোমার সন্তানকে আমি পুনর্জীবিত করিব, তবে কিনা একটা দ্রব্যবিশেষের প্রয়োজন। আনিতে পারিবে কি?'

'নিশ্চয়ই! ছেলের জীবনের জন্য যেমন করিয়া পারি নিশ্চয়ই সংগ্রহ করিয়া আনিব। বলুন প্রভু, কি জিনিস?'

তথাগত একটু হাসিলেন—বড় করুণ হাসি। মানুষের মনের মোহ দেখিয়া ব্যথা পাইয়াছেন। বলিলেন, 'জিনিসটি এমন কিছু দুষ্প্রাপ্য নয়। এক মুঠা সরিষা। তবে সরিষা এমন বাড়ী হইতে আনিবে মা, যে বাড়ীতে কেহ কখনো মরে নাই।'

রমণী ছুটিল। দ্বারে দ্বারে যাচাই করিল, 'ওগো তোমাদের বাড়ীতে কখনো কাহারো মৃত্যু হইয়াছে কি? বল, বল, শীঘ্র বল। এই প্রশ্নের উত্তরের উপর আমার হারানো বুকের মানিককে ফিরিয়া পাওয়া নির্ভর করিতেছে।'

প্রশ্নটির উত্তর তো সকলেই জানে। রমণীও জানিত। তবে উত্তরটি নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কঠিন, তাই ভুলিয়া গিয়াছিল। এবার একশত দরজায় ঘুরিয়া নিরাশ হইবার পর প্রশ্নের উত্তর পাকাপাকি হৃদয়ে বসিয়া গেল।—না, এমন সরিষা পাওয়া যাইবে না। সব বাড়িতেই মৃত্যু হানা দিয়াছে এবং দিবে। মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। মৃত পুত্রে

বাঁচিতে পারে না। শোক সহিয়া যাওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

জন্মিলে মরিতে হয়, সকলেই ইহা জানে, তবে নিজের ক্ষেত্রে মানিতে চায় না। বিপদ এইখানেই। নিজেকেও একদিন মরিতে হইবে, ইহা আগে হইতে যদি চিন্তা করা থাকে, তাহা হইলে মৃত্যু আসিলে ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিতে হয় না। কবির ন্যায় বলিতে পারা যায় —'মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।'

কই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো 'আমায় বাঁচাও, আমায় বাঁচাও' বলিয়া সন্ত্রাসে চিৎকার করিয়া ওঠেন নাই। জীবন ও মৃত্যু দুয়ের পারে শাশ্বত সত্যে দাঁড়াইয়া দেহত্যাগের পূর্বে 'ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে' আবিষ্কার করিয়া গেলেন। তিনি সারা জীবন উপনিষদের মন্ত্র গভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছেন, তোতাপাখীর মতো আওড়ান নাই, সেইজন্য অমন ধীর প্রশান্তভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারিয়াছিলেন। জীবনের পরপারে কি আছে—তাহার পুঁথিগত পাণ্ডিত্য-পূর্ণ উত্তর রবীন্দ্রনাথ হয়তো বলিতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁহার নিজের প্রজ্ঞাজনিত বিশ্বাস তিনি নিঃসংশয়ে ঘোষণা করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। না, ওপারে যাহা আছে তাহা শূন্য নয়, অন্ধকার নয়, তাহা শান্তি-সমুদ্র—'সম্মুখে শান্তি-পারাবার'। তাহা একটা নৈর্ব্যক্তিক অসাড় দার্শনিক তত্ত্ব মাত্র নয়—তাহা চৈতন্যময়, প্রেমময় ভাগবত ব্যক্তিত্ব। জীবনের এপারে পদে পদে যাঁহার সন্ধান পাইয়াছি, তিনিই ওপারে তাঁহার পুঞ্জীভূত মমতা লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন—জীবনের পরম দেবতা, কর্ণধার। এ পারের খেলাঘর ভাঙিল, এই দেহরূপ খেলনাটি পড়িয়া থাকিবে, পুড়িয়া ছাই হইবে, তাহাতে ভয় কি, বেদনা কি? স্থূল দেহ ব্যতিরিক্ত আমার একটি আলাদা সত্তা আছে—আমার আত্মসত্তা। উহা অনন্ত সত্যের পথে যাত্রী। উহা তরণীর মতো হেলিয়া দুলিয়া ভাসিয়া চলিবে। কর্ণধার রহিয়াছেন। তিনিই উহাকে যথাপ্রয়োজন ভাসাইয়া লইয়া চলিবেন। তাই প্রার্থনা—'ভাসাও তরণী হে কর্ণধার!' এ পারের কল্পনা, বিদ্যাবুদ্ধি দিয়া ওপারের সেই 'চিরসাথী'কে বুঝিয়া ওঠা যায় না। কিন্তু প্রাণ জানে তিনি আছেন। এ পারের মাপকাঠিতে তিনি অজানা হইলেও তাঁহার ঘনীভূত দয়া, ক্ষমা, আলোক লইয়া ধ্রুবতারার মতো তিনি বিরাজ করিতেছেন।

'মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।
হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা অজানার॥'

ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সংস্কৃতি মৃত্যুকে বাদ দিয়া জীবনকে কখনও বালির বাঁধের উপর গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে নাই। মৃত্যুকে গোঁজামিল দিয়া চাপিয়া রাখিতে গেলে জীবনের সত্যও চাপা পড়িয়া যায়। 'হাঁ, শুনিয়াছি বটে মানুষের একটা আত্মা আছে, মরণের পরে ঈশ্বরের কাছে তাহার বিচার হয়, তাহার পর সে বেহেস্ত বা জাহান্নমে যায়, অনন্ত সুখ বা অনন্ত দুঃখ ভোগ করে।...'—এইটুকু ধারণা যথেষ্ট নয়। আত্মা যদি থাকে তো তাহার সম্বন্ধে গভীরতর জিজ্ঞাসা প্রয়োজন। আত্মার প্রকৃতি কি? কেন আত্মা দেহের মধ্যে ধরা পড়ে, আবার দেহ ছাড়িয়া চলিয়াই বা যায় কেন? দেহের মধ্যে বাঁধা পড়া কি একবারই ঘটিয়াছে, না অতীতকালে আরও অনেকবার? এইবারকার জন্ম শেষ হইলে আর কি জন্ম হইবে না? ভগবানের এ কি বিচার? এই জীবনে কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা,

কত ভালবাসা, কত আনন্দ! পঞ্চাশ বা ষাট বা আশী বৎসরে কতটুকুই বা পাওয়া গেল? আরও যে কত পাইবার ছিল। এত তাড়াতাড়ি সব ফুরাইয়া যাইবে? আর সুযোগ আসিবে না? —স্বর্গে যাইয়া মিলিবে? আর স্বর্গ যদি ফসকাইয়া যায় তাহা হইলে? অনন্ত নরক? সর্বনাশ! —এই সকল প্রশ্নের নিঃসন্দিগ্ধ জবাব চাই। তবেই জীবনকে যথার্থ বুঝা যাইবে, বুঝিয়া উহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করা চলিবে। জীবনের অতীত ও ভবিষ্যৎ যাহারা মানিতে চায় না—সত্য, ন্যায়, বিবেক, স্বার্থত্যাগ, সংযম, সহানুভূতি প্রভৃতি মানব-ধর্ম তাহাদের নিকট একপ্রকার অর্থহীন। তাহারা 'বর্তমানের' উপাসক। যে কোন উপায়ে বর্তমানের সুখ ও সুবিধা নিজের ও পরিবারবর্গের জন্য লুটিয়া লওয়াই তাহাদের লক্ষ্য। আশেপাশের লোক-গুলির চোখে ধুলা দিয়া কাজ হাসিল করিতে পারিলেই হইল। অলক্ষ্যে অপর কোনও বিচারকের কথা ভাবিবার প্রয়োজন নাই। জীবন বলিতে তাহাদের নিকট ইন্দ্রিয়ভোগৈক-লক্ষ্য এই পৃথিবীর জীবনটুকু বুঝায়। ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্যের অন্যতম শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণ এই ধরনের লোককে 'অসুর' বলিয়াছেন। তাহারা 'অল্পবুদ্ধি', 'উগ্রকর্মা', দুষ্পূরণীয় কাম, দম্ভ, মান ও মোহ আশ্রয় করিয়া তাহারা শুধু জগতের অমঙ্গলই করিয়া চলে। (গীতা—১৬শ অধ্যায়)

মৃত্যুর কথা ভাবিলে মানুষের চিন্তায় ও কর্মে রূপান্তর আসিতে বাধ্য। বার বার জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়া, নানা শরীর পরিগ্রহ করিয়া মানবাত্মা প্রগতির পথে চলিয়াছে। এই সংসার তাহার চিরদিনকার ঘর নয়, যাত্রাপথে একটি পান্থশালা মাত্র, অতএব সংসারের সহিত বেশী জড়াইয়া পড়িলে তো তাহার চলিবে না, অনাসক্তিপুরঃসর তাহাকে কর্তব্য কর্ম করিয়া যাইতে হইবে, জীবনের চরম লক্ষ্য বিস্মৃত না হইয়া ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, সংযম, সেবার অনুশীলন দ্বারা সংসারাতীত সত্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাই সনাতন ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টিতে জীবন ও মৃত্যু কোনটাই মানবাত্মার চরম উপেয় নয়, পরম শ্রেয়োলাভ-রূপ উদ্দেশ্যের উপায় মাত্র। জীবন লইয়া অনাবশ্যক অশোভন মাতামাতি নয়, মৃত্যু আসিলে ভয়ে চিৎকারও নয়। জীবন হইতে পলায়ন নয়, উহার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার; কেননা জীবন পূর্ণতার যাত্রাপথের একটি শুভ সুযোগ। আবার জীবন হইতে বিদায় লইবার সময় উপস্থিত হইলে কান্নাকাটি করিয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া উহাকে আঁকড়াইয়া ধরিবার হাস্যকর চেষ্টাও নয়, মৃত্যুকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা; কেননা মৃত্যু যাত্রাপথের আর একটি কল্যাণ-চিহ্ন।

কঠোপনিষদে দেখিতে পাই—বালক নচিকেতাকে ধর্মরাজ যম তিনটি বর দিতে চাহিলে নচিকেতা শেষ বরে মৃত্যু-রহস্য জানিতে চাহিতেছেন। যম নচিকেতাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন; বলিলেন, 'তুমি ছেলেমানুষ, এত বড় জটিল তত্ত্বজিজ্ঞাসা তোমার জন্য নয়। তুমি বরং অন্য কিছু চাও, পৃথিবীতে যাহা কাজে লাগে—টাকাকড়ি, পরমায়ু, গাড়ীঘোড়া, বন্ধু-বান্ধবী, রাজত্ব—এই সব।' নচিকেতা ভুলিবার ছেলে নয়, কহিল, 'না ঠাকুর, ও সব খেলনায় আমার কাজ নাই। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া খেলিয়া হয়রান হইয়াছি। আর খেলা নয়। কেন খেলি, কোন্ স্বার্থে খেলি, কে খেলায়? এবার এই সেরা প্রশ্নটির উত্তর চাই।' বালকের জিদ দেখিয়া যমরাজ মনে মনে খুশী। পৃথিবীতে তো সকলেই 'কলাই-এর ডালের খরিদ্দার'। সেরা জিনিস চায় কে? ঠিক ঠিক যদি কেহ চায়, তাহাকে দিয়াও সুখ। নচিকেতার মতো জিজ্ঞাসুকে

আত্মবিদ্যা বলিলে আত্মবিদ্যা সার্থক। অতএব যমরাজ নচিকেতাকে জন্মমৃত্যুর রহস্য উপদেশ করিলেন। উপনিষদ্ উপাখ্যানের উপসংহার করিয়া ঘোষণা করিতেছেন: মৃত্যুরাজ যমের মুখে আত্মবিদ্যা শুনিয়া নচিকেতা ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিলেন, বিরজ এবং বিমৃত্যু হইলেন। অপরেও নচিকেতার মতো আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন। (কঠোপনিষৎ ২।৩।১৮)

আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ—একই বস্তুর এ-পিঠ ও-পিঠ। মানুষ যতক্ষণ অজ্ঞানের মধ্যে রহিয়াছে ততক্ষণ সে নিজেকে দেহের সহিত, মনের সহিত এক করিয়া দেখে। অজ্ঞানের ঘোর কাটিয়া গেলে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা সে বুঝিতে পারে, বুঝিতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বানানো গল্প বলেন নাই, সত্য কথাই বলিয়াছিলেন—আত্মা জন্মান না, মরেন না, চিরকাল রহিয়াছেন, অনন্ত মহাকাশের মতো ব্যাপিয়া রহিয়াছেন সব কিছু, অথচ কোন কিছুর সহিত লিপ্ত নন। —পারাপারহীন মহাসমুদ্রের মতো উদার, গম্ভীর, প্রশান্ত। সমুদ্রবক্ষে ঢেউএর মতো সংসারের বহু বিচিত্র অভিব্যক্তি চৈতন্য-সিন্ধুতে উঠিতেছে, লয় পাইতেছে। আত্মার এই সত্যস্বরূপের নাম ব্রহ্ম। 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ বৃহত্তম। যে আত্মা অজ্ঞানবশে দেহের মধ্যে বাঁধা পড়িয়া হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, নাচিতেছে, কুঁদিতেছে, সেই আত্মাই চোখের ভ্রম কাটিয়া গেলে দেখিতে পায় সে মহাকাশ, সে মহাসমুদ্র, সে ব্রহ্ম। নচিকেতা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাই উপনিষদ্ বলিলেন, তিনি 'ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যুঃ'।

উপনিষদ্ বলিতেছেন, রামশ্যাম যদুমধু মালতীমাধবীরও আশা আছে। তাহারাও নচিকেতার মতো নিজের মধ্যে ডুবিয়া নিজেকে খুঁজিয়া পাইতে পারে নিজের মায়ানির্মুক্ত জন্মহীন মৃত্যুহীন সত্তাকে—নিজের বৃহত্তম সত্য ব্রহ্মভাবকে। নিজেকে এইরূপ খুঁজিয়া পাওয়াই মানুষের চরম লক্ষ্য। যতদিন না নিজেকে আবিষ্কার করা যাইতেছে ততদিন মানুষের যাত্রার বিরতি নাই, শরীরের পর শরীর পরিগ্রহ করিয়া, অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া কখনও বেহেস্ত, কখনও জাহান্নম, কখনও এই দুনিয়ায় তাহাকে ক্রমাগত চলিতে হইবে। সে চলা আশার মধ্য দিয়া আবার নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া, উল্লাসের মধ্য দিয়া আবার বেদনার মধ্য দিয়া, সার্থকতার মধ্য দিয়া আবার ব্যর্থতার মধ্য দিয়া। একটানা আলোক নাই, একটানা তৃপ্তি বা সার্থকতা নাই। চলার রীতিই এই প্রকার। তাই অনবরত চলা কখনো মানুষের অভীপ্সিত নয়। শান্তি চাই। শান্তি আসে আত্ম-আবিষ্কারে—ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে। রামশ্যাম যদুমধু মালতীমাধবীদের প্রত্যেককে একদিন চলায় শান্তি দিতে হইবে—দুদিন আগে বা পরে। কিন্তু যে চতুর সে আগে হইতে সাবধান হয়, জন্মমৃত্যুর প্রবাহে গা ভাসাইয়া না দিয়া জন্মমৃত্যুর রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করে, নিজেকে ঐ প্রবাহ হইতে মুক্ত করিতে মনোযোগী হয়।

সহজ কথা অবশ্যই নয়। অনেক পড়িলে, অনেক শুনিলে, অনেক মঠে-মন্দিরে ঘোরাঘুরি করিলেই যে আত্মদৃষ্টি খুলিয়া যাইবে, তাহা বলা চলে না। অতবড় মেধাবী পণ্ডিত রাজর্ষি জনক—তাঁহারই কি সম্যক্ বোধ সহজে আসিয়াছিল? বহুদিন ধরিয়া তিনি বেদান্ত শুনিয়াছেন, ধ্যানধারণা করিয়াছেন, জ্ঞানী পুরুষ বলিয়া সর্বত্র তাঁহার খ্যাতি, নিজের মনে একটা গর্বও বোধ করি ছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন আচার্য যাজ্ঞবল্ক্য মুনি প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, 'আচ্ছা মহারাজ, এত তো পড়াশুনা জপ তপ করিয়া-

ছেন, বলিতে পারেন মৃত্যুর পর কোথায় যাইবেন?'

সোজাসুজি এইরূপ প্রশ্নের জন্য রাজর্ষি প্রস্তুত ছিলেন না। ঘাবড়াইয়া গিয়া আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, 'না, তাহা ঠিক জানি না।' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'মহারাজ, এত বেদ-বেদান্ত পড়িয়াছেন, এত জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন, কিন্তু আসল কাজের কথাটিতেই হুঁশ রাখেন নাই? শুনুন তবে শেষবারের মতো। জিজ্ঞাসা করি আপনার কি মৃত্যু আছে? আপনার কি জন্ম হইয়াছিল? জন্মমৃত্যুর প্রসঙ্গ তো দেহের, মনের এবং প্রাণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আপনি তো চৈতন্যস্বরূপ আত্মা। পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঊর্ধ্ব অধঃ—যে দিকে তাকান সেই দিকেই আপনি বিদ্যমান। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ—যে কালের কথাই ভাবুন সেই কালেই আপনি রহিয়াছেন। অতএব মৃত্যুর পর কোথায় যাইবেন—এই প্রশ্নটিই আপনার পক্ষে অবান্তর। আপনার শাশ্বত স্বরূপের দিকে তাকান। এই মুহূর্তে সকল প্রশ্ন, সকল সংশয় মিটিয়া যাইবে।' (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ—৪।২)

জনকরাজার সংশয় মিটিয়া গিয়াছিল বই কি। তবে সময় লাগে, শুভ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, বিশেষতঃ যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় তত্ত্বদ্রষ্টা শিক্ষকেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু সংশয় যখন মিটে, তখন ভাগ্যবান্ ভাবে—এত সহজ সরল আলোকময় জিনিসটিকে কি করিয়া এত গভীর অন্ধকারে কবর দিয়া রাখিয়াছিলাম? যে চিরন্তন আত্মার অস্তিত্বে সব কিছুরই অস্তিত্ব, সেই আত্মাকেই খুঁজিয়া পাই নাই! যে জ্ঞানময় আত্মার চৈতন্যালোকে সব কিছু দেদীপ্যমান, তাঁহারই উপর সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভার চাপাইয়া বাহবা লইতেছিলাম! যে রসময় আত্মার আনন্দকণা বিষয়ের শত সহস্র আকর্ষণকে অহুক্ষণ মূল্য দিতেছে, তাঁহাকে বাদ দিয়া হাটে বাটে স্ফূর্তি খুঁজিয়া ফিরিয়াছি! কী মূর্খই ছিলাম! * * * আমি শুধু জীবনই পাই নাই, মৃত্যুও পাইয়াছি, আমার জন্য উহা বাগ্‌বন্দী হইয়া আছে, সময়মতো আমাকে বরণ করিবে। অতএব মৃত্যুকে ভুলিয়া জীবনের সহিত যেন কায়েমী সম্পর্ক পাতাইতে না যাই। যদি যাই তো কাঁদিতে হইবে, ভয়ে চিৎকার করিতে হইবে, ঠকিতে হইবে।

জীবন ও মৃত্যু—দুয়েরই পারে ঐ দুয়ের বিধাতা রহিয়াছেন,—আমার একান্ত লক্ষ্য, আরাধনার ধন, আমার প্রেমের ভগবান। জীবনে যদি তাঁহাকে ধরিতে পারিয়া থাকি তো মৃত্যুর পরেও তাঁহা হইতে বিযুক্ত হইব না। অতএব মৃত্যু হইতে ভয় পাইবার আমার কিছুই নাই। মৃত্যুর সময় অবশ্য কিছু এখানে ছাড়িয়া যাইতে হইবে—এই দেহ, এই দেহের পরিবেষ্টনী, এই বন্ধুবান্ধব, এই পৃথিবীর বহু আনন্দস্মৃতি। কিন্তু আমার জীবন-সত্য, আমার জীবন-মরণের নিয়ামক, আমার ভগবানের অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত মাধুর্যের কাছে সেই ছাড়িয়া-যাওয়া বস্তুগুলি খুব বেশী বড় কি? যখন শিশু ছিলাম তখন খেলনাগুলিকে কতই না ভালবাসিতাম, ভাবিতাম উহাদের বিচ্ছেদ কিছুতেই সহিতে পারিব না। মা যখন কোলে নিবার জন্য ডাকিতেন, তখন কাঁদিতাম, বলিতাম, মা, এখন না, আর একটু খেলিয়া লই। মা হাসিতেন। এই জীবনের খেলনাগুলির প্রতি যদি শিশুর মতো অন্যায্য আসক্তি দেখাই, তাহা হইলে আমার চিরন্তনী বিশ্বজননীও হাসিবেন।

জীবন ও মৃত্যুর বিধাতা ভগবানকে মানিয়া, ভালবাসিয়া মনুষ্যত্বকে সার্থক করা যায়। সেই ভালবাসার ভগবানকে যখন জ্ঞানের দিক দিয়া

বিচার করি, তখন তিনি আমার আত্মার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি—পরমাত্মা—ব্রহ্ম। বিচারের দিক দিয়াও আমি জীবন ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া।

ভগবৎপ্রেম ও আত্মজ্ঞান যাহাই আমি বাছিয়া লই না কেন, উহা আমাকে জীবনের পরম সত্যে উপনীত করিবে—যাহা নিঃসন্দিগ্ধ, ভয়-মোহ-ক্ষুদ্রতা-বিমুক্ত, শাশ্বত জ্ঞান ও আনন্দ। উহা আমাকে মৃত্যুর মর্মও বুঝিতে দিবে। মৃত্যু আমার শত্রু নয়, বন্ধু। মৃত্যু আমাকে ধাপে ধাপে সত্যের পথে লইয়া যায়। সত্যে পৌঁছিলে বলে, 'বন্ধু বিদায়, আর আমি আসিব না, তবে বেশ বদলাইয়া অবিনাশী সত্যের সহিত মিশিয়া চিরদিন তোমার পাশে পাশে থাকিব।'

মরণ-কল্পনায়

'বৈভব'

জীবনের অবেলায়
বিদায় দাও গো ধরণী জননি,
বিদায়, মা গো বিদায়।
কেহ নাহি জানে কোথা কোন দিন
শুধিবার লাগি কার কিবা ঋণ
বেজে উঠেছিল এ জীবন-বীণ,
কেহ জানিবে না হায়,
কেন সে সহসা বাজিয়া থামিল
মরণ-কল্পনায়!

*

আমার আঁখিতে আঁধিয়ার লাগে
আর, কিছু নাহি দেখা যায়;
জীবনের যত প্রিয়তম ছায়া
ম্লান হ'য়ে আসে হায়!
সত্য সে ধরে সত্যের রূপ,
মিথ্যা মিলায়ে যায় চুপিচুপ,
মর্ত্যের মায়া অতি অপরূপ
মৃত্যুর মহিমায়—
আমার চোখেতে ধরা দিতে চায়
সুনিবিড় নীলিমায়!

ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বর্তমান রূপ

ডাঃ শ্রীপীযূষকান্তি লালা

[গত মাসে প্রকাশিত লেখকের প্রবন্ধ 'ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অতীত' এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য। উঃ সঃ]

ভারতের জাতীয় জীবনে ক্রমাগত যে সব রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছে—তাতে জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি যে মুছে যায়নি, এটাই আশ্চর্য। কিন্তু ছয়শ' বছরের মুসলমান শাসন ও দুশ' বছরের ইংরেজ শাসনের পরও সনাতন হিন্দুধর্ম যেমন টিকে আছে—তেমনি বেঁচে আছে ভারতের চিরন্তন সংস্কৃতি। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতোই ভারতের সুপ্রাচীন এবং নিজস্ব চিকিৎসা-পদ্ধতিও বাঁচিয়ে রেখেছে নিজেকে, একেবারে লুপ্ত হ'য়ে যায়নি, বেঁচে আছে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নয়, বা উন্নত বিজ্ঞানের আলোকে দীপ্তিমান্ হ'য়ে নয়—বেঁচে আছে নেহাত এক যান্ত্রিক চিকিৎসা-পদ্ধতি হিসেবে অধুনালুপ্ত গৌরবদীপ্ত এক বিজ্ঞানের স্মারক চিহ্ন হ'য়ে।

তার এ দুর্দশার কারণ অনুসন্ধান করলে রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক ছাড়া যে বড় কারণটা চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানের প্রচণ্ড অগ্রগতি আজ আমাদের পারমাণবিক যুগের যে ধাপে পৌঁছে দিয়েছে, তার প্রধান অবদানসমূহই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের, চিকিৎসা-বিজ্ঞানও এগিয়েছে সমান তালে, প্রথম মহাযুদ্ধে মারণাস্ত্রসমূহের যেমন উন্নতি হ'ল—তেমনি যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর যুগের মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি লড়াইয়ে শক্তি-পরীক্ষায় এগিয়ে এলেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা, পচনহীন অস্ত্রোপচার (Aseptic Surgery) হ'ল এযুগের মুখ্য আবিষ্কার—যদিও পচন-প্রতিরোধের উপায় এর আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। তারপর এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হ'ল অ্যান্টিবায়োটিকস্ (Antibiotics); পেনিসিলিন্ (Penicillin)-এর আবিষ্কার যদিও ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে, তার ব্যবহার শুরু হয় যুদ্ধকালে। তারপর একের পর এক নূতন অ্যান্টিবায়োটিক্ যে শুধু ভেষজ-চিকিৎসাক্ষেত্রে যুগান্তর আনল তা নয়, শল্য-চিকিৎসাকেও ক'রল আরও সহজ এবং নির্বিঘ্ন। এর সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাক্ষেত্রে প্রাধান্য পেল জৈব রসায়ন (Biochemistry), যা আগে খুব আদৃত হয়নি। ভেষজক্ষেত্রে শীঘ্রই তার আবিষ্কারসমূহ হ'য়ে উঠল অতি প্রয়োজনীয়। তবুও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ হ'তে এখনও অনেক দেরি, এবং তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণাকার্য এখনও সমানেই চলছে।

* * *

ইতিমধ্যে দেখতে পাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাধনা শুরু হ'য়ে গেছে আমাদের দেশেও। চিকিৎসাক্ষেত্রেও আধুনিক বিজ্ঞানের অবদানগুলি সমান ভাবেই আদৃত হ'ল, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সুযোগ-সুবিধাগুলিকে ভিত্তি ক'রে নূতনভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাধনায় অগ্রণী হলেন বাঙালী মনীষী প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁর প্রেরণাতেই রসায়নের গবেষণা দিয়ে এ কাজ শুরু হয়। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন অনেকেই। আবিষ্কার-ক্ষেত্রেও তাঁদের অবদান সারা বিশ্বে আদৃত। স্যার ইউ. এন্. ব্রহ্মচারী, আর. এন্. চোপরা—এঁদের নাম কে না জানে? তবুও একমাত্র গবেষণাকার্যে সুযোগ-সুবিধার অভাবের জন্যেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এখনও ভারত পরমুখা-

পেক্ষী হ'য়ে আছে। এ গেল পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সাধনার মোটামুটি রূপ। সে অবস্থায় বিধ্বস্ত প্রায়াবলুপ্ত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান যে পেছিয়ে থাকবে ও অনাদৃত হ'য়ে থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। বর্তমানের দুএকটি নামকরা আয়ুর্বেদ-প্রতিষ্ঠানই তার রূপ ফিরিয়ে দেয়নি।

এবারে এ অবস্থার বৈজ্ঞানিক দিকটা বিশ্লেষণ করা যাক। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আসে তার সবদিকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, এবং বিজ্ঞান-সাধনায় স্বভাবতই বিজ্ঞানীদের আশ্রয় নিতে হয় তার এক একটা দিকের। তার থেকেই শুরু হয় বিশেষ জ্ঞানার্জন বা Specialisation। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতি ও সম্প্রসারণেও হ'ল তাই। রোগ-প্রতিরোধ এবং নিরাময়ে তার জনপ্রিয়তাও কাজেই হ'য়ে উঠল অনন্য। বর্তমানে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গড়ে উঠেছে অসংখ্য দিক। শুধু ভেষজ-চিকিৎসার কথাই যদি ভাবি, তাহলে অনেকগুলি দিক আপনা-আপনিই চোখে পড়ে। প্রথমতঃ ভেষজ-সমূহের অন্যতম প্রধান উৎস উদ্ভিদ্‌বিদ্যার সাহায্য আসে উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানী-র (Botanist) কাছ হ'তে, এ সব উদ্ভিদ্ ও অন্যান্য ভেষজের উৎস বস্তুসমূহের গুণাগুণে অভিজ্ঞ তিনি হলেন ভেষজবিদ্ (Pharmacologist), এসব জৈবিক ও অজৈবিক পদার্থের সংশ্লেষণ ও সংমিলনে ওষুধ হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী পদার্থ হাতের কাছে এগিয়ে দেন রসায়নবিদ্ (Chemist), রোগীর রোগ নির্ণয় ক'রে উপযোগী ওষুধ যিনি ব্যবহার করবেন নিরাময়ের জন্যে—তিনি হলেন চিকিৎসাবিদ্ (Therapeutist)। কাজেই আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞানে শ্রেণীবিভাগ ও শ্রমবিভাগ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের পরিশ্রমের অনেক লাঘব করেছে। সাধারণ চিকিৎসাবিদের যদিও উপরোক্ত বিজ্ঞানের বিভাগগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার, সব বিষয়গুলিতে তাঁর বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

এবার সাধারণ আয়ুর্বেদবিদ্‌গণের বর্তমান অবস্থা আলোচনা করলে দেখা যাবে, এ শ্রম-বিভাগের অভাবেই তাঁরা কতটা পেছিয়ে আছেন। বর্তমান আয়ুর্বেদে তো শল্যবিদ্যার ব্যবহার উঠে গেছে বললেই চলে। ভেষজ-চিকিৎসাতেই তাঁরা অসুবিধার সম্মুখীন হন পদে পদে। বর্তমান কবিরাজদের অধিকাংশই এ বিষয়ে ভুক্তভোগী। চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হ'লে তাঁদের হ'তে হবে (Botanist, Chemist ও Therapeutist) সব একসঙ্গে, একই লোককে পরিচয় রাখতে হচ্ছে গাছ-গাছড়ার শ্রেণীগোষ্ঠী সম্বন্ধে, সেগুলির গুণাগুণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে, আবার তা থেকে ও অন্যান্য পদার্থ থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ওষুধ নিষ্কাশনের কাজটাও তাঁর। এর জন্যে দরকারী সাজসরঞ্জাম মজুত চাই তাঁর কাছে, অল্প খরচায় তা থেকে ওষুধ তৈরীর পদ্ধতিও তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তিতেই নির্ণীত হবে এবং সে ওষুধ তিনি ব্যবহার করবেন রোগনির্ণয়ের পর। এত গুণের অধিকারী হ'তে পারলে তবেই তিনি চিকিৎসক হ'তে পারবেন। কাজেই আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাথে আয়ুর্বেদ পাল্লা দিতে পারবে কেন ?

আজকাল অবশ্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের আহৃত জ্ঞানের ভিত্তিতে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে আয়ুর্বেদ শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যেমন বারাণসী ও ত্রিবান্দ্রম্ প্রমুখ স্থানে, কিন্তু সুসংহত গবেষণা ও শ্রম-বণ্টনের অভাবে তার কতটাই বা কাজে লাগছে ?

ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নয়নের উপায়

বর্তমান ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এ অবস্থায় কি ক'রে অল্প সময়ে দেশকে অগ্রণী করা যায়? এ প্রশ্নের জবাব কঠিন নয়। আয়ুর্বেদ-সম্মত ভেষজ-চিকিৎসা এবং পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-অনুসৃত পথে ভেষজ-চিকিৎসা—এ দুয়ের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখতে পাই, মূলতঃ দুয়ে কোন তফাৎ নেই। বর্তমানে যে তফাৎটা গড়ে উঠেছে, তা হ'ল বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বনিয়াদ পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও সিদ্ধান্তের (experiment, observation and inference) ভিত্তিতে আরও সুদৃঢ় হয়েছে, আর আয়ুর্বেদ-শিক্ষাপ্রণালী এতদিন তারই অভাবে আয়ুর্বেদ-চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে পেছিয়ে রেখেছে। পুরাকালের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আয়ুর্বেদ শিক্ষাদান ও আয়ুর্বেদ-চিকিৎসার গৌরব নিয়ে হা-হুতাশ করলেই সে দিন ফিরে আসবে না। আধুনিক *চিকিৎসা-বিজ্ঞানে উদ্ভিদবিদ্যা, শারীরবিদ্যা,* রসায়ন ইত্যাদির ভিত্তিতে জ্ঞান আহরণ ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রোগনির্ণয়ের সুযোগগুলিকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। সুপ্রাচীন আয়ুর্বেদের রত্নভাণ্ডারকে ওগুলির মধ্য দিয়েই কাজে লাগাতে হবে। বর্তমান চিকিৎসা-জগতে আয়ুর্বেদমতে চিকিৎসা ও পাশ্চাত্যমতে চিকিৎসা—এ দুয়ের যে ব্যবধান রচিত হয়েছে, তা হ'ল বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির অভাবে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ের মধ্য দিয়ে এগুলি একে অন্যকে সমৃদ্ধ করতে পারে। দুটি মোটেই পরস্পরবিরোধী নয়; একে অন্যের পরিপূরক। সংস্কারমুক্ত মনে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, এখনকার বিজ্ঞানপ্রদত্ত সুযোগ কাজে লাগিয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে আমরা আরও সমৃদ্ধ করতে পারি আয়ুর্বেদিক রসায়ন ও ভেষজসমূহের উপযোগী ব্যবহার পুনরুদ্ধার ক'রে।

বর্তমান ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান বলতে আজ শুধু প্রাচীন আয়ুর্বেদকেই বোঝায় না। বিজ্ঞানের আশীর্বাদ-সম্ভার হ'তে আমাদের দেশ বঞ্চিত হয়নি এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় চিকিৎসা অনেকখানি এগিয়ে গেছে আমাদের দেশে। সেখানে 'ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নয়ন' মানে এ নয় যে আয়ুর্বেদের অগ্রগতি যেখানে এসে রুদ্ধ হয়েছে বা নিশ্চিহ্ন হয়েছে, সেখান থেকেই কেঁচে গণ্ডূষ শুরু করা। বরং আধুনিক বিজ্ঞানের শক্ত বনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে আয়ুর্বেদের সদ্ব্যবহার করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। আয়ুর্বেদের পুরানো ভেষজশাস্ত্রসমূহ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের আগ্রহ কেন এত বেশী? কেন আজ আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ বিদেশে চলে গেছে? তার কারণ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের জ্ঞানস্পৃহা ও গ্রহণশীল *মনোবৃত্তি। বৃটিশ আমলেই হিমালয়-অঞ্চলের* নানা ভেষজগুণসম্পন্ন উদ্ভিদ্ চালান হয়েছে বিদেশে—আর তা থেকে নিষ্কাশিত ওষুধ আমাদের দেশে এসেছে অতি দামী পণ্য হিসেবে। প্রচুর দাম দিয়ে সে ওষুধ আমদানি করতে হয়েছে বৃটেন জার্মানি ও আমেরিকা থেকে, আর ভারতের গরীব *রোগগ্রস্ত* জনসাধারণ তাদের সঞ্চিত অর্থ তুলে দিয়েছে ও দিচ্ছে এসব বিদেশী ওষুধের প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে।

বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সুপ্রচলিত অনেক ওষুধের ব্যবহার আয়ুর্বেদশাস্ত্রেই ছিল এবং তা আয়ুর্বেদশাস্ত্রের সমৃদ্ধিই প্রমাণ করে, যে পারদ (Mercury) ও তার লবণসমূহ (Salts) প্রস্রাব-বৃদ্ধির কাজে সুপ্রচুর ব্যবহৃত হয়—তার ব্যবহার আয়ুর্বেদে রয়েছে বহু প্রাচীনকাল হতেই,

যে সর্পগন্ধা (*Rauwolfia Serpentina*) ও তজ্জাত ভেষজসমূহ রক্তচাপবৃদ্ধি থেকে শুরু ক'রে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় সারা বিশ্বে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার ব্যবহার স্মরণাতীত কাল হ'তে আয়ুর্বেদে চলে আসছে। এর ব্যবহার প্রথমত উদ্ভূত হয় আয়ুর্বেদ থেকেই। আশার কথা দু-একটা দেশীয় ভেষজের ব্যবহার পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে সাফল্যের সঙ্গে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে—সজনের মূল থেকে তৈরী আলকালয়েড্ (Alkaloid) স্পাইরোচিন্ (Spirochin)-এর ব্যবহার পুরানো ক্ষতসমূহ নিরাময়ে কার্যকর হচ্ছে।

তবুও ভারতীয় ভেষজসম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য কি প্রচেষ্টা আছে—সরকারী বা বেসরকারী? সরকারী প্রচেষ্টা নগণ্য। সারা ভারতে এর জন্যে বিশেষভাবে তৈরী একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান হ'ল Central Institute for Research in Indigenous Systems of Medicine (জামনগর)। বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাবার জন্যে সরকার আজ ভেষজ-দ্রব্যের আমদানি নিয়ন্ত্রিত করেছেন, ও দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহদানের কথা বলছেন। এ প্রচেষ্টা সাধু সন্দেহ নেই, কিন্তু এতে কি আসল সমস্যার সমাধান হয়েছে? অতি প্রয়োজনীয় বিদেশী ওষুধ কেনার জন্যে আজও গরীব জনসাধারণকে মূল দামের তিনচারগুণও দিতে হয়, কারণ সব প্রয়োজনীয় ওষুধ-তৈরীতে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং তাদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হ'তে পারে যে রকম ওষুধও বেরোয় নি। ওষুধ-তৈরীর ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার প্রচেষ্টা এবং ভারতের ভেষজসম্পদকে কাজে লাগানোর প্রয়াস দেশীয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে আছে—এটা আশার কথা, কিন্তু এ সব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশেরই নিজস্ব কোন গবেষণাগার নেই, বা গবেষণাকার্যে উৎসাহদানের মতো সঙ্গতিও অনেকেরই নেই। সরকারী প্রচেষ্টা অতি সামান্য। দেশীয় ভেষজসম্পদ্ নিয়ে গবেষণা চালাবার মতো গবেষণাগারের অভাব অতি মাত্রায় প্রকট। দেশীয় ভেষজসম্পদ্ নিয়ে গবেষণায় উৎসাহদানের জন্যে কয়টি গবেষণা-বৃত্তির ব্যবস্থা সরকার করেছেন? দেশীয় চিকিৎসকদের মধ্যে বিশেষতঃ নবীনদের মধ্যে গবেষণাকার্যে উৎসুক আছেন অনেকেই। কিন্তু তার উৎসাহদাতা নেই কেউই। এর চাইতে হতাশার কথা আর কি হ'তে পারে? এ কাজ মুখ্যতঃ সরকারী প্রচেষ্টাতেই সম্ভব। দেশজ সম্পদ্ কাজে লাগিয়ে শুধু যে ভেষজ-ক্ষেত্রেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া যাবে তা নয়, নিত্য নতুন আবিষ্কারে পাশ্চাত্য দেশকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতি। এ বিষয়ে সকলের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হ'ক।*

* এ নিবন্ধ-রচনায় সহায়তা গ্রহণে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের কাছে আমি ঋণী :

সুশ্রুতসংহিতা—কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অনূদিত,

A Text Book of Pathology—By Dr. D. N. Banerjee,

History of Indian Medicine—Mookhopadhyay

ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অতীত আলোচনায় সময়গুলি আমি শেষোক্ত দুই গ্রন্থ থেকেই প্রামাণ্য ব'লে ধ'রে নিয়েছি।

মাতৃজাতি ও বেদাধ্যয়ন

[আশ্বিন সংখ্যার পর]

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

যাহা হউক, পূর্বোক্ত যুক্তিগুলি মাতৃজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকারকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে ব্যবস্থাপিত করতে পারে না। এক্ষণে আমরা এমন কতকগুলি প্রমাণ শ্রুতি, গৃহ্যসূত্র এবং স্মৃতি প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত করিব, যাহাদের বলে ত্রৈবর্ণিক মাতৃজাতির বৈধ বেদাধ্যয়নে অধিকার নিঃসন্দিগ্ধভাবে সিদ্ধ হইবে। 'জাতেরস্ত্রী-বিষয়াদযোপধাৎ'—(পাঃ সূঃ ৪।১।৬৩) ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্রের বৃত্তিতে 'কঠী', 'বহ্বৃচী' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। 'কঠী' শব্দের অর্থ—কৃষ্ণযজুর্বেদের কঠ-নামক শাখা-ধ্যয়নকারিণী। বহ্বৃচী শব্দের অর্থ—বহু ঋক্ অধ্যয়নকারিণী, অথবা ঋগ্বেদাধ্যয়নকারিণী। যদি স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার না থাকিত, তাহা হইলে বেদের কঠ-নামক শাখা এবং ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করা স্ত্রীজাতির পক্ষে সম্ভব হইত না। ফলে উক্ত স্থলে 'কঠী' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগও পরিদৃষ্ট হইত না। অতএব উক্ত শব্দসকলের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে প্রয়োগ থাকায় অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে মাতৃজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার সিদ্ধ হয়।

আবার শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে—'গার্গী, বাচক্নবী পপ্রচ্ছ' (বৃঃ ৩।৬।১)—'বচক্নুর কন্যা গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন' ইত্যাদি। এইস্থলে অবেদবিদ্ গার্গী যে বেদবিদ্ আচার্য যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বিচার করিয়াছিলেন, ইহা কল্পনা করা চলে না। সুতরাং গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের বিচারাত্মক এই শ্রৌতলিঙ্গপ্রমাণ-বলে মাতৃজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার সিদ্ধ হয়। প্রসিদ্ধ দেবীসূক্তের দ্রষ্টা অম্ভৃণ ঋষির কন্যা 'বাক্' প্রভৃতি বহু নারী ঋষির নাম[১] পাওয়া যায় এবং মৈত্রেয়ী (ঋক্ সং ৯।১০।২), মৈত্রেয়ী (বৃঃ ৪।৫।১) ইত্যাদি বহু ব্রহ্মবাদিনীর (বেদে পারদর্শিনীর) নাম বেদেই আছে। এই সকল প্রমাণকে উপেক্ষা করা চলে না এবং অন্য প্রকারে ব্যাখ্যাও করা চলে না। মৈত্রেয়ী প্রভৃতির নাম অর্থবাদ মধ্যে পঠিত হইলেও বক্ষ্যমাণ অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা পুষ্ট হওয়ায় অর্থবাদগত লিঙ্গপ্রমাণরূপে তাহারা স্ত্রীজাতির বেদে অধিকারেরই সমর্থক হইয়া থাকে।

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের ৩।৭।১৩ সূত্রে বেদা-ধ্যয়নান্তে সমাবর্তনকালে কুমারীর কৃত্যরূপে চন্দন দ্বারা অঙ্গ-লেপনের ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। স্ত্রী-জাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার না থাকিলে তাঁহা-দের জন্য সমাবর্তন নিশ্চয়ই ব্যবস্থাপিত হইত না। গোভিল-গৃহ্যসূত্রে 'প্রাবৃতাং যজ্ঞোপ-বীতিনীম্' (২।১।১৯) এবং 'পশ্চাদগ্নেঃ পদা প্রবর্তয়ন্তীং বাচয়েৎ' (২।১।২০) ইত্যাদি সূত্রে যজ্ঞোপবীতধারিণী কন্যার বিবাহ এবং তৎকর্তৃক বেদমন্ত্রপাঠ বিহিত হওয়ায় স্ত্রীজাতির উপনয়ন-সংস্কার ও বেদাধ্যয়ন অঙ্গীকৃত হইয়াছে। পারস্কর-গৃহ্যসূত্রের বিবাহপ্রকরণে হরিহরভাষ্যে 'কুমারী ভগায় স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ চতুর্থং জুহোতি'

১ ঋগ্বেদ-সংহিতাতে নিম্নোক্ত নারী ঋষিগণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—রোমশা (১।১২৬), লোপামুদ্রা (১।১৭৯), বিশ্ববারা (৫।২৮।১), শশ্বতী (৮।১।৩৪), অদিতি (৮।৭১), অপালা (৮।৯১), ঘোষা (১০।৩৯-৪০), সূর্যা (১০।৮৫), যমী (১০।১০,১৫৪), ইন্দ্রাণী (১০।১৪৫), শচী (১০।১৫৯), সর্প-রাজ্ঞী (১০।১৮৯), সরমা (১০।১০৮), গোধা (১০।১৩৪), নিবৃহা (১০।১৩৩), জুহূ (১০।১০৯), বাক্ (১০।১২৫) ইত্যাদি। যাঁহারা বেদমন্ত্রের ঋষি হইতে পারেন, বেদাধ্যয়নে তাঁহাদের অধিকার নাই, ইহা কল্পনারও অযোগ্য।

(১।৭।৫) এবং 'তচ্চক্ষুরিতি মন্ত্রেণ স্বয়ংপঠিতেন সূর্যমিরীক্ষতে' (১।৮।৭) ইত্যাদি* প্রকারে বেদ-মন্ত্রপাঠে মাতৃজাতির অধিকার পরিদৃষ্ট হইতেছে।

সুপ্রাচীনকালে পুরুষগণের ন্যায় স্ত্রীগণেরও উপনয়ন-সংস্কার হইত, ইহা গোভিল-গৃহ্যসূত্র ২।১।১৯ সূত্রভাষ্যে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত যমবচনবলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। যথা 'পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে। অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা'।—'পুরাকালে কুমারীগণের মৌঞ্জীবন্ধন, বেদসকলের অধ্যয়ন এবং সাবিত্রীবচন (গায়ত্রী-দীক্ষা) হইত। উপনয়ন-সংস্কারকালে যে কুশনির্মিত উপবীত পরিধান করা হয়, তাহাকে বলে 'মৌঞ্জীবন্ধন'। অত্রস্থ 'পুরাকল্প' শব্দের অর্থ 'পুরাকাল' গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ উপনয়নাদি সংস্কার বেদ-বিহিত বিধিবলে সম্পাদিত হইয়া থাকে। সেই বেদ যদি এক এক কল্পে এক একপ্রকার হয়, তাহা হইলে বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব ব্যাহত হইবে এবং বেদের বেদত্বই থাকিবে না।

যাহা হউক, এইরূপে দেখা যাইতেছে—সুপ্রাচীনকালে কুমারগণের ন্যায় কুমারীগণেরও উপনয়ন-সংস্কার হইত এবং বেদাধ্যয়নেও তাঁহারা ছিলেন কুমারগণের সম-অধিকারিণী। কালক্রমে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে কুমারীগণের উক্ত অধিকার ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকে। গোভিল-গৃহ্যসূত্রের ভাষ্যে তৎস্থলেই উদ্ধৃত যম-বচন হইতেই ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা—'পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বা, নৈনামধ্যাপয়েৎ পরঃ।

স্বগৃহে চৈব কন্যায়া ভৈক্ষচর্যা বিধীয়তে।

বর্জয়েদজিনং চীরং জটাধারণমেবচ'॥

—পিতা পিতৃব্য এবং ভ্রাতা ইহাকে বেদাধ্যয়ন করাইবে, অপরে অধ্যয়ন করাইবে না। কন্যা স্বগৃহেই ভিক্ষা গ্রহণ করিবে (গুরুকুলে বাস করিবে না); মৃগচর্ম, চীরবসন এবং জটাধারণ করিবে না। এখন দেখা যাইতেছে পারি-পার্শ্বিক অবস্থার চাপে গুরুগৃহে বাস এবং পিতা প্রভৃতি অতি নিকট আত্মীয় ব্যক্তিরেকে অপরের নিকট বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার হেতু—ইদানীন্তনকালেও গৃহশিক্ষক-সংক্রান্ত ব্যাপার হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি। মনুষ্যের স্বভাব কম-বেশী প্রায় সর্বকালেই সমান। ইহার পরবর্তী অবস্থাও গোভিল-গৃহ্যসূত্রভাষ্যে উক্ত স্থলে উদ্ধৃত হারীত-বচন-বলে অবগত হওয়া যায়। স্মৃতিকার পূজ্যপাদ হারীত বলিয়াছেন, 'দ্বিবিধাঃ স্ত্রিয়ঃ ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ'—স্ত্রী দুই প্রকার, ব্রহ্মবাদিনী এবং সদ্যোবধূ। যাঁহারা উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া স্বগৃহে ভিক্ষাচর্যা করতঃ বেদাধ্যয়নাদি করেন, তাঁহারাই 'ব্রহ্মবাদিনী', আর বিবাহকাল উপস্থিত হইলে কথঞ্চিৎ উপনয়ন-সংস্কারান্তে যাঁহাদের বিবাহ হয়, তাঁহা-রাই 'সদ্যোবধূ'—ইহা উক্ত স্থলেই উদ্ধৃত পূজ্যপাদ মাধবাচার্যের ব্যাখ্যা। এইপ্রকারে দেখা যাইতেছে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে স্ত্রীজাতির উপনয়ন-সংস্কার ও বেদাধ্যয়ন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। এইভাবে সঙ্কুচিত হইতে হইতে কালক্রমে উক্ত ব্যবস্থা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং স্ত্রীজাতির যে উপনয়ন-সংস্কার ও বেদাধ্যয়নে অধিকারই নাই, ইহার প্রতিপাদকরূপে শাস্ত্রবাক্যসকল ব্যাখ্যাত হইতেছে। ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা পূর্বেই প্রদান করিয়াছি। পূজ্যপাদ মাধবাচার্য-কৃত 'জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তরে' ৬।১।৩ অধি-করণের পাদটীকাতে মাতৃজাতির উপনয়ন-সংস্কার ও বেদাধ্যয়নে অধিকার স্পষ্টভাবেই বর্ণিত

* এইগুলি মাতৃজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকারের সূচক লিঙ্গপ্রমাণ, কারণ এই সকলের দ্বারা বেদমন্ত্রোচ্চারণে তাঁহাদের অধিকার সূচিত হইতেছে।

হইয়াছে। উক্তস্থলেই 'সীতা ও মহাশ্বেতা প্রভৃতি মহিলাগণ সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছেন, ইহা প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতিতে পরিদৃষ্ট হয়'—এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্বমীমাংসা ৬।১।৪ অধিকরণে শ্রৌতকর্মে দম্পতীর সহাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। আবার এমন কতকগুলি স্থলও শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়, যেখানে পতি-নিরপেক্ষভাবেই পত্নীর কর্মে অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। বাশিষ্ঠ স্মৃতিতে 'মনসা ভর্তু-রতিচারে সাবিত্র্যষ্টশতেন শিরোভির্বা জুহুয়াৎ' (২১ অঃ)—মনে মনে ভর্তাকে লঙ্ঘন করিলে অষ্টোত্তরশতসংখ্যক গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা, অথবা সশিরস্ক গায়ত্রীর দ্বারা (গায়ত্রীর পূর্বে প্রণব সহ ব্যাহৃতি যোগকরতঃ) হোম করিবে। প্রস্তাবিতস্থলে পতির সহিত সহাধিকারের প্রশ্নই উঠে না, কারণ এই কর্মে অতিচারকারিণী পত্নীই অধিকারিণী, পতি নহে। কেহ কেহ এইস্থলে 'ব্রাহ্মণ দ্বারা হোম করাইবে'—এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করেন। তাহা সঙ্গত মনে হয় না, কারণ 'এতি প্রাচী বিশ্ববারা ঈড়ানা হবিষা ঘৃতাচী'—বিশ্ববারা স্তব করিতে করিতে ঘৃতাদি হবনীয় দ্রব্যযুক্ত স্রুক্ হস্তে পূর্বাভিমুখে অগ্নির প্রতি গমন করিতেছেন (ঋক্ সং ৫।২৮।১) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়, পুরাকালে মাতৃজাতি যে মাত্র বেদাধ্যয়নেই অধিকারিণী ছিলেন তাহা নহে, তৎকালে নিজস্ব হোমকর্মেও তাঁহারা ছিলেন অধিকারিণী।[২] সুতরাং উক্ত শ্রৌতলিঙ্গপ্রমাণ-বলে স্থলবিশেষে মাতৃজাতির পতি-নিরপেক্ষভাবে স্বীয় যজ্ঞকর্মে অধিকার অস্বীকৃত হইলে কোন প্রকার অসঙ্গতি হয় না। এইরূপে গায়ত্রী-মন্ত্রে ও তৎসাধ্য হোমে স্ত্রীজাতির অধিকার থাকায় বেদাধ্যয়নে তাঁহাদের অধিকারও সিদ্ধ হইয়া পড়িতেছে।

শবর-ভাষ্যের সহিত উপস্থাপিত সিদ্ধান্তের অবিরোধ প্রদর্শন

এইস্থলে সংশয় হয়—আশ্বলায়ন, পারস্কর ও গোভিল প্রভৃতি সূত্রকার মহর্ষিগণের স্থায় পূর্ব-মীমাংসা-ভাষ্যকার শাস্ত্রতাৎপর্যবিৎ পূজ্যপাদ শবর স্বামীও বেদবিৎ। তিনি কিন্তু পূঃ মীঃ ৬।১।২৪ সূত্রভাষ্যে 'প্রতিসিদ্ধস্য পত্ন্যাঃ অধ্যয়নস্য পুনঃ-প্রসবে ন কিঞ্চিদ্ অস্তি প্রমাণম্'—প্রতিষিদ্ধ যে পত্নীর বেদাধ্যয়ন (বেদমন্ত্রোচ্চারণ), তাহা পুনরায় বিধানের প্রতি কোন প্রমাণ নাই—ইত্যাদি ভাষ্যগ্রন্থে স্ত্রীজাতির বেদে অধিকার নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তদুত্তরে বলা যায়—ভগবান্ ভাষ্যকার উক্তস্থলে মাতৃজাতির বেদা-ধ্যয়নে অধিকার নিরাকরণ করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিতভাবে নিরূপণ করা যায় না, কারণ পত্নী শব্দের অর্থ স্ত্রীজাতি নহে, ইহা পূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি। উক্তস্থলে পঠিত 'পুমান্ বিদ্বাংশ্চ, পত্নী স্ত্রী চ, অবিদ্যা চ'—পুরুষ বিদ্বান্ (বেদবিদ্) এবং [তাঁহার] পত্নী হইতেছেন স্ত্রী-জাতি ও অবিদ্যা (বেদবিদ্যাহীনা)—ইত্যাদি ভাষ্যালোচনা করিলে প্রতিভাত হয়, পূজ্যপাদ ভাষ্যকারের সময়ে স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়ন অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইয়াই তাঁহাকে ধর্মব্যবস্থা প্রদর্শন করিতে হইয়াছে। নতুবা স্ত্রীকে বেদাধ্যয়ন করাইয়া কর্মানুষ্ঠান করিতে হইলে কর্মই বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। আর যজ্ঞকালে পত্নীর মন্ত্রোচ্চারণের আবশ্যকতাও নাই, কারণ যজ্ঞকালে পতি ও পত্নী—ইঁহাদের মধ্যে কে কোন্ যজ্ঞাঙ্গ সম্পাদন করিবেন, তাহা ব্রাহ্মণগ্রন্থে ও তদনুসরণকারী শ্রৌতসূত্রসমূহে নির্দিষ্ট আছে। পতি ও পত্নী উভয়েই যদি সকল কর্মাঙ্গেরই অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তত্তৎ ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও শ্রৌত-

২ পূর্বমীমাংসা ১২।৪।১৩ অধিকরণে মাত্র ব্রাহ্মণেরই অপরের ঋত্বিক্‌কর্মে অধিকার ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। 'হোতারং বৃণীত' এই বিধিবাক্যে পুংলিঙ্গ হোতৃশব্দের প্রয়োগ হওয়ায় অপরের ঋত্বিক্‌কর্ম পুরুষই করিতে পারেন।

সূত্রসকল বাধিত হইয়া পড়িবে এবং যজ্ঞাঙ্গের একাধিক প্রয়োগবশতঃ অবৈধ আবৃত্তির প্রসক্তি হইয়া পড়িবে; ফলে অঙ্গবিকলতা-দোষবশতঃ কর্মটিই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আর 'হয় পতি মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তত্তৎ কর্মাঙ্গের অনুষ্ঠান করিবেন, অথবা পত্নী তাহা করিবেন'—এই প্রকার পরিস্থিতি স্বীকৃত হইলে অষ্টদোষগ্রস্ত বিকল্পের প্রসক্তি হইয়া পড়িবে। আবার 'পত্ন্যবেক্ষিতম্ আজ্যম্ ভবতি'—পত্নী হবনীয় ঘৃতে দৃষ্টিপাত করিবেন, পত্নীর জন্য বিহিত এই যজ্ঞাঙ্গ পতিতে প্রসক্ত হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি নানা দোষ হইয়া পড়িবে। সেইহেতু যজ্ঞকালে পত্নীর মন্ত্রপাঠ নিষিদ্ধ হইয়াছে, 'অস্তি হি তস্য পুমান্ নিবর্তকঃ' —তাহার (স্ত্রীর মন্ত্রপাঠের) নিবর্তক পুরুষ বর্তমান আছে—ইত্যাদি ভাষ্যগ্রন্থের ইহাই তাৎপর্য। শাস্ত্রদীপিকাকারও উক্ত গ্রন্থের ৬।১।৬ অধিকরণে বলিয়াছেন—'সম্পন্নবিদ্যেন পুংসা তেষাম্ অনুষ্ঠানসিদ্ধেঃ, অতঃ পুমান্ এব কর্তা' —বেদবিদ্যাসম্পন্ন পুরুষকর্তৃক সেই যজ্ঞাঙ্গসকলের অনুষ্ঠান সিদ্ধ হয় বলিয়া পুরুষই কর্তা। এতদ্দ্বারা স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার নিবারিত হয় না, পরন্তু পুরুষই যজ্ঞাঙ্গসকলের নির্বাহকর্তা, এই যে পূর্বমীমাংসার ৬।১।৬ অধিকরণের সিদ্ধান্ত, ইহাই সমর্থিত হয়। এইরূপে 'প্রতিষিদ্ধস্য পত্ন্যাঃ অধ্যয়নস্য', ইত্যাদি পূর্বোদ্ধৃত ভাষ্যবাক্যের অর্থ হইবে—যজ্ঞকালে প্রতিষিদ্ধ যে পত্নীর বেদাধ্যয়ন (বেদমন্ত্রোচ্চারণ) তাহা পুনরায় বিধানের প্রতি কোন প্রমাণ নাই, ইত্যাদি। অতএব মাতৃজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার অঙ্গীকৃত হইলে পূর্বমীমাংসা-ভাষ্যের সহিত বিরোধ হয় না, ইহাই আমরা মনে করি।

স্ত্রীজাতির বেদে অনধিকারবোধক ভাষ্যসকলের প্রবল প্রমাণ-বলে বাধ

এইরূপে আমরা দেখিলাম—পূঃ মীঃ ৬।১।৬ অধিকরণের যাহা প্রধান প্রতিপাদ্য, অর্থাৎ 'মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তত্তৎ যজ্ঞাঙ্গের সম্পাদনে পুরুষেরই অধিকার'—এই বিষয়ে কোন বিরোধ নাই। কিন্তু তত্রস্থ কোন কোন ভাষ্যবাক্য হইতে যদি উক্ত অধিকরণের অবান্তর প্রতিপাদ্যরূপে ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীজাতির বৈধ বেদাধ্যয়নে অধিকারকে নিরাকরণ করিতে ইচ্ছা করা হয়, তাহা হইলে প্রবলপ্রমাণসকলের বলে সেই অবান্তর প্রতিপাদ্য বাধিত হইয়া পড়িবে। ব্যাস-সংহিতায় (১।৪) পাই:

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণং স্যাত্তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥

—শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ যেস্থলে পরিদৃষ্ট হয়, সেইস্থলে শ্রুতিই হয় প্রমাণ। আর পুরাণ ও স্মৃতিবচনের মধ্যে বিরোধ হইলে স্মৃতিবচন হয় শ্রেষ্ঠ॥ শাস্ত্রতাৎপর্যবিদ্‌গণ যখন পুরাণবচন হইতেও স্মৃতিবচনের প্রাবল্য অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন পূর্বোদ্ধৃত শ্রৌতলিঙ্গ (দ্রঃ ৩.৬।১, ঋক্ সং ৫।২৮।১ ইত্যাদি)-সকলের এবং যমস্মৃতি ও হারীতস্মৃতি প্রভৃতিতে পঠিত পূর্বোদ্ধৃত বচনসকলের বলে মাতৃজাতির বৈধ বেদাধ্যয়ন নিরাকরণপর সেই অবান্তর তাৎপর্যের উপস্থাপক পূর্বমীমাংসা-ভাষ্যকার প্রভৃতির তাদৃশ বচনসকল যে বাধিত হইয়া পড়িবে (স্বপ্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণ করিতে পারিবে না), এই বিষয়ে আর বলিবার কি আছে?

ভাট্টদীপিকাকারের মত নিরাকরণ

পূজ্যপাদ ভাট্টদীপিকাকার উক্ত গ্রন্থের ৬।১।৬ অধিকরণে 'অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত, তম্ অধ্যাপয়ীত' ইত্যাদি বেদবাক্যে পুংলিঙ্গ 'তদ্' শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় পুরুষেরই বেদাধ্যয়নে অধিকার অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং 'স্ত্রীজাতিকে বেদ অধ্যয়ন করাইবে না'—এই প্রকার অর্থ কল্পনা করিয়া মাতৃজাতির বৈধ বেদাধ্যয়নে অধিকার নিরাকরণ করিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। পৌরুষেয় বচন হওয়ায় উপ-

যোক্ত শ্রৌতলিঙ্গাদি প্রমাণসকলের বলে তাহাও বাধিত হইয়া পড়িবে, ইহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে।

শাস্ত্রদীপিকাকারের মতে উক্ত বেদবচন হইতে বেদাধ্যয়নে স্ত্রীজাতির অধিকার সিদ্ধ হয়

পূজ্যপাদ শাস্ত্রদীপিকাকার কিন্তু 'তম্ অধ্যাপয়ীত' অত্রস্থ 'তম্' পদে পুংলিঙ্গের বিবক্ষা অঙ্গীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, 'অধ্যয়নম্ অপি অনির্দিষ্টকর্তৃকত্বাৎ প্রকৃতম্ উপনীতং কর্তারম্ আশ্রয়ং স্ত্রিয়াঃ অপি স্যাৎ ইতি অধিকারবুদ্ধিঃ ভবতি' (৬।১।৬ অধিঃ)। ইহার তাৎপর্য এই: 'ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত' এই স্থলে যদি লিঙ্গের বিবক্ষা না থাকে,[৩] তাহা হইলে 'তম্ অধ্যাপয়ীত', এই অধ্যয়ন-বিধিতেও তাহা থাকিবে না, কারণ উপনয়ন-বিধিতে যিনি বিধির বিষয়রূপে বিবক্ষিত, অধ্যয়ন-বিধিতে প্রযুক্ত 'তম্' এই সর্বনাম পদ তাঁহাকেই সমর্পণ করিতেছে। সুতরাং উপনয়নে কর্তার লিঙ্গ নির্দিষ্ট না থাকায় অধ্যয়নেও কর্তার লিঙ্গ নির্দিষ্ট হইবে না বলিয়া প্রস্তাবিত উপনয়ন-সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত যে কর্তা, তাহাকে আশ্রয়করতঃ স্ত্রীজাতির উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার আছে, এইপ্রকার বুদ্ধি হয়। অতএব ইহার মতে—'অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত, একাদশবর্ষং রাজন্যম্, দ্বাদশ-বর্ষং বৈশ্যম্' এই বাক্যত্রয়ের বলেই উক্ত বর্ণ-ত্রয়ান্তর্গত স্ত্রীজাতিরও উপনয়নে, সুতরাং বৈধ বেদাধ্যয়নে অধিকার সিদ্ধ হইয়া পড়ে।

শাস্ত্রদীপিকাকার কিন্তু কণ্ঠতঃ স্ত্রীজাতির উপনয়নে অধিকার অঙ্গীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, 'তথাপি আহত্য স্ত্রীণাম্ অধ্যয়ন-প্রতিষেধাৎ' ইত্যাদি। টীকাকার সোমনাথ 'প্রতিষেধাৎ' এই গ্রন্থের বাক্য পূরণ করিয়াছেন —'ধর্মশাস্ত্রে ইতি শেষঃ'। সুতরাং ইহাই প্রতিভাত হয় যে, বেদে স্ত্রীজাতির উপনয়ন সংস্কার ও বেদাধ্যয়ন প্রতিষিদ্ধ না হইলেও ধর্মশাস্ত্রে অর্থাৎ স্মৃতি ও পুরাণে তাহা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহাই শাস্ত্রদীপিকাকারের অভিপ্রায়; কোন স্মৃতিবচন ইনি উদ্ধৃত করেন নাই। ভাট্টদীপিকাকার 'স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাম্' ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা কিন্তু পুরাণবচন হওয়ায় 'তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা' (ব্যাস সং ১।৪) এই ন্যায়বলে পূর্বোদ্ধৃত যম- ও হারীত-স্মৃতিবচনসকলের ও পূর্বপ্রদর্শিত শ্রৌতলিঙ্গসকলের বলে বাধিত হইয়া পড়িবে। আর এক কথা, 'ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত' ইত্যাদি বেদবচনবলে ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীজাতির উপনয়ন-সংস্কারে ও বৈধ বেদাধ্যয়নে যে অধিকার সিদ্ধ হয়, ধর্মশাস্ত্রের বচন-বলে তাহা বাধিত হইবে—ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ স্মৃতিপ্রমাণাপেক্ষা শ্রুতিপ্রমাণ বলবান্। অতএব ত্রৈবর্ণিক স্ত্রী-জাতির উপনয়নাদিতে অধিকার নিরাকরণ শাস্ত্রদীপিকাকারের হৃদ্‌গত অভিপ্রায় নহে, ইহাই নির্ণীত হয়।

জৈমিনীয় ন্যায়ানুসারে ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীজাতির উপনয়নে অধিকার-সিদ্ধি

আর 'তুষ্যতু দুর্জন ন্যায়ে' যদি স্বীকার করি-য়াও লওয়া যায় যে 'ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত' ইত্যাদি বচনত্রয়ে ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীজাতির উপনয়ন-সংস্কার বিহিত হয় নাই, তাহা হইলে বাক্যভেদভয়ে উক্ত বাক্যত্রয়ে তাহা নিষিদ্ধও হয় নাই, ইহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে। ফলে **'বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্'** (জৈঃ সূঃ ১।৩।৩) এই জৈমিনীয় ন্যায়বলে ত্রৈবর্ণিক মাতৃজাতির উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার সিদ্ধ হইয়া পড়ে। উক্ত সূত্রে আচার্যপাদ

৩ ভাট্টদীপিকাকারও এই বিষয়ে একমত। উক্ত গ্রন্থের ৬।১।৩ অধিকরণ দ্রষ্টব্য। পূঃ মীঃ ৩।৭।১ গ্রহৈকত্বাধি-করণে যেমন গ্রহের (সোমরসাধারের একত্ব বিবক্ষিত নহে, প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ ব্রাহ্মণের পুংস্ত্ব বিবক্ষিত নহে।

জৈমিনি বলিয়াছেন, 'শ্রুতির সহিত বিরোধ হইলে স্মৃতি হইবে অনাদরণীয়া। কিন্তু বিরোধ না থাকিলে শ্রুতিকল্পক অনুমানের প্রবৃত্তি অবশ্যই হইবে'। প্রস্তাবিত স্থলে 'ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত' ইত্যাদি শ্রুতির সহিত পূর্বোদ্ধৃত যম ও হারীত প্রভৃতি স্মৃতিবচনসকলের বিরোধ হইতেছে না, কারণ শ্রুতিবাক্যসকলে ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীজাতির উপনয়নে অধিকার নিরাকৃত হয় নাই। সুতরাং উক্ত স্মৃতিবাক্যসকলের অনুকূলভাবে ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীজাতির উপনয়ন-সংস্কারের বোধক শ্রুতিবাক্য উক্ত জৈমিনীয় ন্যায়বলে অনুমান করিলে কোন প্রকার অসঙ্গতি হইবে না।

'স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাম্' ইত্যাদি অবশিষ্ট বাক্যদ্বয়ের যথার্থ অর্থ

এই প্রকারে দেখা গেল—মাতৃজাতির উপনয়ন ও বেদাধ্যয়নের বিরোধিগণ কর্তৃক উদ্ধৃত শাস্ত্রবাক্যসকলের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা সম্ভব হওয়ায় এবং উহার সমর্থকগণ কর্তৃক গোভিল, পারস্কর ও আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ও তাহাদের ভাষ্যাদি হইতে উদ্ধৃত শাস্ত্রবাক্যসকলের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা সম্ভব না হওয়ায় এবং মাতৃজাতির বেদাধ্যয়ন শ্রৌতলিঙ্গপ্রমাণসকলের দ্বারা পুষ্ট হওয়ায় **মাতৃজাতির উপনয়ন ও বেদাধ্যয়নে অধিকার অবশ্যই সিদ্ধ হয়।** সেইহেতু উক্ত প্রমাণ ও প্রদর্শিত যুক্তিসকলের বলে 'স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরাঃ' (শ্রীমদ্ভাঃ ১।৪।২৫) ইত্যাদি বাক্যের ব্যাখ্যা হইবে এই প্রকার: পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে কালক্রমে অপ্রচলিত হইয়া পড়ায় স্ত্রীজাতির, বেদত্যাগ বশতঃ শাস্ত্রকর্তৃক পর্যুদস্ত হওয়ায় শূদ্রজাতির এবং আচারহীন হওয়ায় দ্বিজবন্ধুগণের (ত্রৈবর্ণিকের মধ্যে অধম ব্যক্তিগণের) বেদ কর্ণগোচর হয় না, সেইহেতু তাহাদের মঙ্গলের জন্য ব্যাসদেব মহাভারত ও পুরাণ রচনা করিয়াছেন—ইত্যাদি। এইরূপে ইহা ইনির্ণীত হইল যে—উক্ত বাক্য স্ত্রীজাতির বৈধ বেদাধ্যয়নে অধিকারের নিবর্তক নহে, কারণ তাদৃশ কিছুই উক্ত বাক্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আর আমাদের মনে হয়, 'ন স্ত্রীশূদ্রৌ বেদম্ অধীয়াতাম্' এই বাক্যটি বেদবাক্য নহে, কারণ তাহা হইলে গোভিল, আশ্বলায়ন ও পারস্কর প্রভৃতি সূত্রকার ঋষিগণ অবেদবিদ্ হইয়া পড়িবেন। এই প্রকার মূলনাশিকা কল্পনা সর্বথা অসঙ্গত। তথাপি উক্ত বাক্যকে যদি শ্রুতিবাক্যরূপেই গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ করা হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রমাণসকলের বলে তাহাকে তৎশাখাতে সঙ্কুচিত করিতে হইবে, অর্থাৎ যে শাখাতে উক্ত বাক্যটি পঠিত হইয়াছে, সেই শাখাধ্যয়নে স্ত্রীজাতির অধিকার নাই, এই প্রকার অর্থকল্পনা করিতে হইবে, অথবা উপনয়ন-সংস্কারবিহীন স্ত্রীগণ ও শূদ্রগণ বেদাঙ্গবিহিত ক্রম ও স্বরাদিসহ বেদ-পাঠ করিবেন না, উক্ত বাক্যটির এই প্রকার অর্থই হইবে। পূর্বোদ্ধৃত প্রমাণসকলের বলে উক্ত বাক্যবিহিত ব্যবস্থা কিছুতেই অসঙ্কুচিত হইতে পারে না। উহা যদি স্মৃতিবাক্য হয়, তাহা হইলে পূর্বোদ্ধৃত শ্রৌতলিঙ্গপ্রমাণ ও অন্যান্য স্মৃতিপ্রমাণসকলের বলে তাহা বাধিত হইয়া পড়িবে।

এইরূপে ইহাই সিদ্ধ হইল যে, ত্রৈবর্ণিক মাতৃজাতির উপনয়ন সংস্কার বেদবিধিসিদ্ধ, সুতরাং বৈধ বেদাধ্যয়নে তাঁহাদের অধিকার আছে, তবে কালক্রমে প্রতিকূল অবস্থার চাপে তাহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের আরও মনে হয়—যজ্ঞকালে বেদমন্ত্রোচ্চারণে যে বিধিবিহিত প্রতিষেধ, তাহাও মাতৃজাতির মধ্যে বেদাধ্যয়ন-বিলুপ্তির অন্যতম হেতু, কারণ 'যাহা না হইলেও চলে' এরূপ বিষয়ে মানুষের আগ্রহ প্রায়ই দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

ভারতে সেণ্ট টমাস

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

ভ্রান্ত জীবকুলকে অমৃতের সন্ধান দিবার জন্য শ্রীভগবান বা তাঁহার শক্তি যুগে যুগে মনুষ্যশরীরে অবতীর্ণ হন, সঙ্গে লইয়া আসেন একদল অসাধারণ মানুষ যাঁহারা তাঁহার দিব্যবাণীকে দিকে দিকে প্রচার করেন। ইহারা অবতারের লীলাসহচর—অবতার-পুরুষের নিগূঢ় আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ জীবনের ভাষ্যস্বরূপ।

ভগবান যীশুখৃষ্টও প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন জন্, পিটার, ম্যাথু, টমাস প্রভৃতি দ্বাদশজন লীলাসহচর। যীশুখৃষ্টের দিব্যবাণী তাঁহারা জনসমাজে প্রচার করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে খৃষ্টের দ্বাদশজন শিষ্যের অন্যতম সেণ্ট টমাস সম্বন্ধে কিছু লিখিতে চেষ্টা করিব। বারো জনের মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লেখার বিশেষ কারণ এই যে অসংখ্য লোকের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি যীশুখৃষ্টের লোকান্তরিত হওয়ার কিছুকাল পরেই ভগবৎ-নির্দেশে তাঁহার অমৃতময়ী বাণী প্রচারের জন্য ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার ভারতে আসা লইয়া মতদ্বৈধ বর্তমান। আবার ভারতে আসিলেও তিনি উত্তর ভারতে আসিয়াছিলেন কি দক্ষিণ ভারতে, তাঁহার কর্মস্থল কোথায় ছিল—ইত্যাদি বিষয়ে সকলে একমত হইতে পারেন নাই। উপরোক্ত সন্দেহ ও বাদানুবাদ সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করাও এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য।

টমাসের অন্য নাম ছিল ডিডিমাস। 'টমাস' অর্থে যমজ। ইহাকে জুডাস টমাস বলা হইত। জুডাস ইস্কেরিয়ট, যিনি কৃতঘ্নতা করিয়া সামান্য অর্থের লোভে যীশুখৃষ্টকে ধরাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি অবশ্য অন্য ব্যক্তি। সেইজন্য জন-লিখিত সুসমাচারে (John xiv-22) টমাস সম্বন্ধে বলা হইয়াছে 'জুডাস—যিনি ইস্কেরিয়ট নন'। ডঃ ফারকুহার (Farquhar) তাঁর *Apostle Thomas in North India* নামক প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে টমাসকে জুডাস টমাস বলা সমীচীন হইবে না। ডঃ বার্কিট (Burquit)-ও তাঁহার লিখিত Early Eastern Christianity নামক পুস্তকে এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। যাহা হউক টমাসের নাম সম্বন্ধে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

বাইবেলে সেণ্ট টমাস সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কোন ঘটনা পৃথক ভাবে লিপিবদ্ধ নাই। অপরের নামের সঙ্গে তাঁর নাম ম্যাথু (x 3), মার্ক (iii 18) এবং লুক (vi 15) উল্লেখ করিয়াছেন। জন-লিখিত সুসমাচারে টমাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য—যীশুর প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি, এমনকি প্রভু যীশুর সহিত তিনি মরিতেও প্রস্তুত—এই সব দেখানো হইয়াছে। যীশুখৃষ্ট যখন লাজারাসকে কবর হইতে উঠাইয়া জীবন দান করিবার জন্য জুডাতে যাইতে উদ্যত, তখন অন্যান্য শিষ্যেরা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কারণ ইহুদীরা তথায় তাঁহাকে মারিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, সে সময় টমাস গুরুভ্রাতাগণকে বলিয়াছিলেন, 'আইস, আমরাও তাঁহার অনুগমন করি, যাহাতে তাঁহার সহিত আমরাও মরিতে পারি' (John xi 16)।

পুনরায় যখন শেষ আহারের সময় যীশু শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে শীঘ্রই তিনি তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইবেন, এবং তাঁহার পরমপিতার গৃহে তাহাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন, তখন টমাস—যিনি আন্তরিকভাবে তাঁহার অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন—বলিয়া উঠিলেন, 'প্রভু, আমরা জানি না আপনি কোথায় যাইতেছেন। কেমন করিয়া আমরা সেই পথ জানিব?' তৎক্ষণাৎ তাঁহার উৎকণ্ঠা ও ভয় প্রশমিত করিয়া যীশু বলিয়া উঠিলেন, 'আমিই যে উপায়, আমিই সত্য এবং আমিই জীবন। কোন মানুষ আমার মধ্য দিয়া ব্যতীত সেই পরমপিতার সান্নিধ্যে পৌঁছিতে পারে না' (John xiv 2-6)।

যীশুর প্রতি এত ভক্তি থাকা সত্ত্বেও যখন অন্যান্য গুরুভ্রাতারা যীশুর পুনরুত্থানের (resurrection) পর তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের বিষয় টমাসকে বলিয়াছিলেন, টমাস তাহা বিশ্বাস করেন নাই। তিনি বলেন, 'যতক্ষণ আমি স্বচক্ষে তাঁহার হাতে পেরেকের চিহ্ন না দেখি এবং তাঁহার গায়ে আমার অঙ্গুলি স্থাপন না করি, ততক্ষণ আমি তাঁহার পুনরুত্থানের কথা বিশ্বাস করিব না।' আটদিন পরে শিষ্যেরা পুনরায় যখন সমবেত হইয়াছিলেন, তৎকালে টমাসও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। তখন যদিও দ্বারসমূহ অর্গলবদ্ধ ছিল, যীশু হঠাৎ তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, 'সকলের শান্তি হউক।' তারপর টমাসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'তোমার অঙ্গুলি দ্বারা আমার হস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখ এবং আমার গায়ে তোমার হস্ত স্থাপন কর। অবিশ্বাসী হইও না, বিশ্বাস কর।' টমাস বলিয়া উঠিলেন, 'হে জীবন-দেবতা, হে প্রভু, আমি বিশ্বাস করিতেছি'। যীশু কহিলেন, 'টমাস, যেহেতু তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ দেখিলে সেইহেতু বিশ্বাস করিতেছ, কিন্তু তাহারাই ধন্য যাহারা আমাকে দেখে নাই, অথচ আমাকে বিশ্বাস করে'। (John xx 20—29)

যীশুর এই মৃদু ভর্ৎসনায় তাঁহার পুনরুত্থান-ও দেবত্ব-বিষয়ে টমাসের বিশ্বাস দৃঢ় হয়। গির্জার পাদ্রীদের মতে অন্যান্য শিষ্যদের অন্ধ-বিশ্বাস অপেক্ষা এই ঘটনা খৃষ্টানদের খৃষ্টধর্মের মূলতত্ত্বসমূহে অধিকতর বিশ্বাস উৎপাদনে সহায়তা করে।

অন্ধবিশ্বাস না থাকিলেও টমাসের আন্তরিকতায় কাহারও সন্দেহ ছিল না। যতক্ষণ নিজে সম্পূর্ণ সন্দেহাতীত না হইতেছেন, ততক্ষণ অপরের কথায় তিনি আস্থা স্থাপন করিতেন না। এইজন্য তাঁহাকে 'doubting Thomas' (সংশয়ী টমাস) বলা হইত। যীশুকে অত্যন্ত আপনার মনে করিতেন, সেজন্য তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন না বা ভীত হইতেন না। জনের সমাচারে (xiv 21—23) লিখিত আছে, 'যে আমার উপদেশাবলী শুনিয়াছে এবং তাহা পালন করিতেছে, যে আমাকে ভালবাসে, আমার পরমপিতাও তাহাকে ভালবাসিবেন, আমিও তাহাকে ভালবাসিব এবং তাহার সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিব।' তখন জুডাস—যিনি ইস্কেরিয়ট ছিলেন না—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভু, ইহা কিরূপ যে আপনি কেবল-মাত্র আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবেন, এবং জগদ্বাসীর সমক্ষে নয়?' উত্তরে যীশু তাঁহার পূর্বকথার পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন, 'যদি কেহ আমাকে ভালবাসে, সে আমার উপদেশ পালন করিবে, আমার পরমপিতা তাহাকে ভালবাসিবেন, আমরা তাহার নিকট আসিব এবং তাহার সহিত বাস করিব।' উল্লিখিত জুডাসই সেন্ট টমাস।

সেণ্ট টমাসের ভারতে আগমন সম্বন্ধে মতামত

সিরিয়া, গ্রীস, লাটিন, আর্মেনিয়া, ইথিওপিয়া ও আরবে সেণ্ট টমাসের কার্যাবলীর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বারকিট্ তাঁর Early Eastern Christianity (P. 205)তে লিখিয়াছেন, 'টমাস সম্বন্ধে উপরোক্ত বিবরণীর মধ্যে সিরিয়ার বিবরণই আদি এবং অনেকাংশে সমর্থনযোগ্য।'

যীশুর অন্তর্ধানের পর তাঁহার শিষ্যেরা প্রভুর বাণী প্রচারোদ্দেশে বিভিন্ন দেশে গমন করেন। সিরিয়ায় লিখিত Doctrine of the Apostles গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে জেমস্ জেরুজালেম, সাইমন রোম, জন এফিসাস, মার্ক আলেকজান্দ্রিয়া, এন্‌ড্রু ফ্রিজিয়া, লুক ম্যাসিডোনিয়া এবং টমাস ভারতবর্ষ হইতে পত্রাদি লিখিতেন এবং ঐ সব পত্র গির্জায় গির্জায় পাঠ করা হইত। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে তাঁহারা ঐ সব দেশে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের কার্য-বিবরণী সম্বন্ধে একে অপরকে লিখিতেন।

সিরিয়ার বিবরণীতে আরও লিখিত আছে, যে জেরুজালেমে যীশুর শিষ্যেরা মিলিত হইয়া তাঁহারা কোন্ কোন্ দেশে প্রচারের উদ্দেশ্যে যাইবেন—তাহা নিজেদের মধ্যে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং জুডাস্ টমাসকে ভারতে যাইতে বলা হইল। কিন্তু টমাস বলিলেন, 'আমি দুর্বল, এ দায়িত্ব পালনে আমি অপারগ; অধিকন্তু আমি হিব্রু, ভারতীয়দের আমি কিরূপে শিক্ষা দিব?' টমাস যখন এইরূপ বাদানুবাদ করিতেছিলেন, তখন ভগবান যীশু আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, 'টমাস ভয় পাইও না। আমার কৃপা সর্বদাই তোমার উপর বর্ষিত হইবে'। উত্তরে টমাস বলিলেন, 'প্রভু, একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া আপনি আমাকে অপর যে কোন স্থানে যাইতে আজ্ঞা করুন, আমি ভারতবর্ষে যাইতে চাহি না।' এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে, এমন সময় দক্ষিণ হইতে হাব্বান নামে একজন বণিক তথায় উপস্থিত হইলেন। ভারতবর্ষের রাজা গুণ্ডাফার বা গুন্দনাফার একজন কৃতী কাঠের মিস্ত্রী আনিবার জন্য হাব্বানকে বলিয়াছিলেন। যীশু ঐ কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, 'আমার একজন ক্রীতদাস আছে, সে খুব ভাল মিস্ত্রী, তুমি তাহাকে কিনিয়া লইয়া যাইতে পার।' দরদস্তর করার পর মাত্র কুড়িটি রৌপ্যমুদ্রায় যীশু টমাসকে হাব্বানের নিকট বিক্রয় করেন। বিক্রয়-পত্র লেখা হইলে হাব্বানের প্রশ্নের উত্তরে টমাস জানান যে যীশুই তাঁহার প্রভু। অতঃপর তাঁহারা ভারতে আসেন এবং রাজা গুণ্ডাফার টমাসকে দেখিয়া ও তাঁহার কর্মদক্ষতার কথা শুনিয়া সুখী হন ও তাঁহাকে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিতে বলেন এবং ঐজন্য প্রচুর অর্থ দান করেন। টমাস ঐ অর্থ গরীব দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। কালক্রমে রাজাও নূতন ধর্ম গ্রহণ করেন। গুণ্ডাফার উত্তর ভারতে রাজত্ব করিতেন—পেশোয়ার বা পাঞ্জাবে। বহু অনুসন্ধানের ফলে পাঠানকোট, অমৃতসর, কাবুল ও কান্দাহার অঞ্চল হইতে গুণ্ডাফারের নামাঙ্কিত বহু মুদ্রা পাওয়া যায় এবং ১৮৫৭ খৃঃ 'তখত্-ই-বাহী'-নামক শিলালিপিতে গুণ্ডাফারের বিষয় লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐগুলি লাহোর যাদুঘরে রক্ষিত আছে। ডঃ ফ্লীট গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে রাজা গুণ্ডাফার খৃষ্টীয় ২০ বা ২১ অব্দে রাজত্ব শুরু করেন এবং খৃঃ ৪৬ অব্দে তাঁহার রাজ্য উত্তর ভারতে বহুদূর বিস্তৃত হয় এবং সেণ্ট টমাস এই সময়েই মারা যান। এ বিষয়ে বহু গবেষক একমত হইয়াছেন।

অন্যমতে রাজা মাজদাই-এর রাজত্বেই তাঁহার প্রচার-কার্যের সমাপ্তি ঘটে। এখন রাজা মাজদাই-এর রাজত্ব কোথায় ছিল এবং তাঁহার প্রকৃত নাম কি, ইহা লইয়া কোন গবেষকই এ পর্যন্ত স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে কয়েকজনের মতামত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

মঃ সিলভ্যাঁ লেভি মনে করেন যে 'মাজদাই' কোনও হিন্দু নামেরই ইরানিয়ান ভাষায় অপভ্রংশ মাত্র। টমাস সম্বন্ধে গ্রীসদেশে বর্ণিত ঘটনায় বাজাদিও বা বাজোদিও নামের উল্লেখ আছে। ডঃ ফ্লীট মনে করেন যে কণিষ্কের পরবর্তী রাজা বাসুদেবেরই উহা অপভ্রংশ। বাসুদেব মথুরায় রাজত্ব করিতেন।

'সিরিয়ান এ্যাক্টে' কথিত আছে যে রাজা মাজদাই টমাসকে বিদেশীয় ধর্মপ্রচার ও ধর্মান্তরিত-করণের জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। টমাসের ইতিমধ্যে বহু অনুচর হওয়ায় এবং শহরের মাঝখানে তাঁহাকে হত্যা করিলে জনসাধারণের মনে বিরূপ ভাবের উদয় হইবে, এই ভয়ে শহর হইতে দূরে কোনও পাহাড়ের উপর তাঁহাকে রাজাজ্ঞায় হত্যা করা হয়। মৃত্যুদণ্ডের কথা টমাস জানিতেন এবং মৃত্যুর কিছুপূর্বে তিনি প্রার্থনার জন্য কিছু সময় চান এবং প্রার্থনান্তে ঘাতকদের দায়িত্ব সম্পাদন করিতে বলেন।

সিলভ্যাঁ লেভি মনে করেন যে টমাসকে মথুরার নিকটে কোন স্থানে হত্যা করা হইয়াছিল। ডঃ ফ্লীট যদিও এই মত সমর্থন করেন, তথাপি তিনি বলেন যে গুণ্ডাফারের বিষয় যেরূপ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে, এ ক্ষেত্রে মাজদাইকে বাসুদেবে পরিণত করার ব্যাপারে ততখানি নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সে যাহা হউক, সিলভ্যাঁ লেভি ও ডঃ ফ্লীটের মত গ্রহণ করিলে অধিকাংশ খৃষ্টান সমাজের দাবি যে সেণ্ট টমাস মাদ্রাজের ময়লাপুরের অল্প দূরে এক পাহাড়ের উপর নিহত হইয়াছিলেন, তাহা শিথিল হইয়া পড়ে। অথচ ময়লাপুরের চার মাইল দূরে যে পাহাড়ের উপর টমাস নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে, উহার নাম সেণ্ট টমাস মাউণ্ট। বহুদিন হইতে এই নামে উহা পরিচিত। উহা হইতেই মাদ্রাজের সব চেয়ে বড় ও প্রধান রাস্তা মাউণ্ট রোডের উৎপত্তি। এবং ময়লাপুরে সমুদ্রের ধারে সেণ্ট টমাস চার্চ খুব বিখ্যাত এবং পুরাতন।

এই সব প্রচলিত প্রবাদকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আর এক দল গবেষক প্রমাণ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন যে টমাস উত্তর ভারত হইতে প্রচার করিতে করিতে একেবারে দক্ষিণে চলিয়া আসেন এবং ময়লাপুরে ঘাঁটি স্থাপন করেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও মতে সেণ্ট টমাস দক্ষিণ ভারতেই প্রথম আসেন এবং মালাবার উপকূলে অবতরণ করেন।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে যে টমাস কোন্ পথে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন—জলপথে না স্থলপথে? জলপথে আসিলে কি ভাবে ও কোন্ পথে আসিয়াছিলেন? মিঃ রাওলিনসন তাঁহার প্রণীত 'Intercourse between India and the western world from the earliest time till the fall of Rome' (1926) পুস্তকে এবং মিঃ ওয়ারমিংটন তৎপ্রণীত 'The commerce between the Roman Empire and India' (1928) পুস্তকে লিখিয়াছেন যে রোমানরা দক্ষিণ ভারত হইতে মুক্তা, মরিচ, হাতীর দাঁত, ময়ূর প্রভৃতি লইবার জন্য প্রায়ই জাহাজ লইয়া আসিতেন এবং তাঁহারা আলেকজান্দ্রিয়া, সুয়েজ ও লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া আসিয়া আরব সাগরে পড়িয়া দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূল মালাবারে আসিতেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে তাঁহারা

আরব সাগর হইতে বঙ্গোপসাগরের কূলে অবস্থিত মাদ্রাজের ময়লাপুর পর্যন্তও আসিতেন। ইহা মোটেই আশ্চর্য নয় যে সেণ্ট টমাস রোমানদের কোন বাণিজ্য-জাহাজে চড়িয়া প্রথমে দক্ষিণ ভারতে আসেন। মিঃ এফ্. এ, ডিক্রুজ তাঁহার St Thomas, the Apostle in India (1929) নামক পুস্তকে এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন।

ময়লাপুর খুব প্রাচীন শহর সন্দেহ নাই। পর্তুগালের বিখ্যাত কবি ক্যামোজ (Camoes)—যাঁহাকে পর্তুগালের সেক্সপিয়ার বলা হয়—তিনি তাঁহার রচিত The Lusiads-এর দশম খণ্ডে লিখিয়াছেন :

Here rose the potent city Meliapore
Named in olden time,—
rich, vast and grand,
In those days stood she far from shore,
When to declare glad tidings
over the land
Thome came preaching . ....

টমাস সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদের উপর ভিত্তি করিয়াই ক্যামোজ এই উক্তি করিয়াছেন। প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্বে ক্যামোজ ময়লাপুরে আগমন করিয়াছিলেন। উহার পূর্বে ময়লাপুর নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে ডঃ মেডলিকট্ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে মিঃ টলেমির (Ptolemy) মালিয়ারফা (Maliarpha)-ই ময়লাপুর।

খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে কোন লেখক ময়লাপুর নাম ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু টলেমির ভৌগোলিক মানচিত্রে বর্তমান ময়লাপুরকেই তিনি মালিয়ারফা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তখন ইহা সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত হইলেও কালক্রমে সমুদ্র উহার নিকটে আসিয়াছে। তামিলে 'ময়লাই' অর্থে ময়ূর। কথিত আছে দেবী পার্বতী ময়ূরের রূপ ধারণ করিয়া এখানে মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। ময়লাপুরের বিখ্যাত কপালীশ্বর শিবের মন্দিরসংলগ্ন স্থলবৃক্ষের কাছে একটি ছোট মন্দিরে ঐ চিত্র দেখানো হইয়াছে। হয়তো তখনকার দিনে এই স্থানে যথেষ্ট ময়ূর ছিল।

টমাসের মৃত্যু সম্বন্ধে আর একটি প্রবাদে কথিত আছে যে সেণ্ট টমাস যখন ময়ূর-অধ্যুষিত ময়লাপুরের কোন জঙ্গলে ধ্যান করিতেছিলেন, তখন কোন ব্যাধ ময়ূর মারিবার জন্য তীর নিক্ষেপ করিলে উহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া টমাসকে আঘাত করে, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

মিঃ জে কেনেডি তাঁহার রচিত The East and the West (1907) নামক পুস্তকে স্বীকার করেন যে সেণ্ট টমাসের নাম ময়লাপুরের সহিত জড়িত—ইহা অনেকখানি সত্য, কারণ বহু শতাব্দী পূর্বে মার্কো পোলো যখন এখানে আগমন করিয়াছিলেন, তখনও তিনি টমাসের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত গির্জা তথায় দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন নাই যে ময়লাপুরের গির্জা টমাসের কবরের উপর নির্মিত। তাঁহার ধারণা টমাস পার্থিয়া বা সিন্ধু উপত্যকায় শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে ময়লাপুরের নিকট সেণ্ট টমাসের কবর আবিষ্কার খৃষ্টান পাদ্রীদের কাজ।

আবার ডি আরসি (D. Arsy) তাঁহার Portuguese Discoveries পুস্তকে বলেন, 'সেণ্ট ক্রিসোষ্টমের মতে বহু প্রাচীন কাল হইতে রোমে সেণ্ট পিটারের গির্জা যেরূপ সম্মানিত হয়, পূর্বাঞ্চলে সেণ্ট টমাসের গির্জাও তদ্রূপ সম্মানিত হয়।' পর্তুগীজরা সেণ্ট টমাস মাউণ্টকে ময়লাপুরের পূর্বাঞ্চল বলিয়া নিরূপিত করিয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে স্মরণাতীত কাল হইতে এখন পর্যন্ত মালাবার উপকূল, সিলোন (লঙ্কা) ভারতবর্ষের সুদূর অঞ্চল এবং এমনকি আরব দেশ হইতেও বহু খৃষ্টান প্রার্থনা করিবার জন্য

ও পূজা দিবার জন্য ময়লাপুরের সন্নিহিত পাহাড়দ্বয়ে (যাহাকে খৃষ্টানরা সেণ্ট টমাস নাম দিয়াছে) আগমন করিয়া থাকেন।'

পূর্বে আমরা রাজা মাজদাই-এর কথা উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহাকে মথুরার রাজা বাসুদেবের অপভ্রংশ বলিয়া প্রচার করা হইয়া থাকে, কিন্তু একদল গবেষক মাজদাইকে মহাদেবের অপভ্রংশ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। দাক্ষিণাত্যে মহাদেবন্ নামের খুব প্রচলন। শেষোক্ত গবেষকগণ বলেন যে টমাস উত্তর ভারতে তাঁহার প্রচারকার্য সম্পন্ন করিয়া দক্ষিণ ভারতে আগমন করেন এবং তথায় রাজা মহাদেবনের সম্পর্কে আসেন। এই মহাদেবন্ই টমাসের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া শহরের কিছু দূরে টমাসকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। যে পাহাড়ের উপর তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে বলা হয়, উহার নাম Big Mountain এবং তামিলে উহাকে 'পেরিয়া মালাই' বলা হয়, 'পেরিয়া' অর্থে বড এবং 'মালাই' অর্থে পাহাড। উহা মাদ্রাজের Fort St George হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। উহার দুই মাইল দূরে মাদ্রাজের দিকে Small Mountain বা 'চিন্না মালাই' নামে একটি পাহাড় আছে। কথিত আছে টমাস প্রথমে ওখানে পলাইয়া যান এবং ওখান হইতে সুড়ঙ্গ পথে পেরিয়া মালাই যাইলে তথায় তিনি ধৃত হন ও বর্শার আঘাতে তাঁহার প্রাণ সংহার করা হয়।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজগণ পুরাতন গির্জার অনুসন্ধানে Big Mountain-এর অংশ বিশেষ খুঁড়িতে আরম্ভ করেন এবং খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাথরের উপর অঙ্কিত রক্তাপ্লুত একটি ক্রুস এবং কাষ্ঠের উপর অঙ্কিত মাতা মেরী ও শিশু খৃষ্টের একটি ছবি প্রাপ্ত হন। উহারা ঐ সময় সেখানে একটি শিলালিপি স্থাপন করেন। ঐ শিলালিপি পহ্লবী ভাষায় লিখিত। উহার পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কেহই বলেন নাই যে উহাতে ঐ স্থানে টমাসের মৃত্যু সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ আছে।

মাতা মেরী ও শিশু খৃষ্টের ছবিটি সেণ্ট লুক দ্বারা অঙ্কিত এইরূপ বলা হয়। তিনি নাকি ঐরূপ সাতটি ছবি আঁকিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি ছিল টমাসের সাথে।

সহজেই প্রশ্ন হইবে যে প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরাতন ক্রুসে তখনও কিরূপে রক্তের চিহ্ন থাকিতে পারে! আরও বলা হয় যে রক্তের চিহ্ন কেবল যে ক্রুসেই ছিল তাহা নয়, উহার পার্শ্ববর্তী স্থানেও ছিল। এ ছাড়া কাঠের উপর অঙ্কিত ছবি দেড় হাজার বছরের পরেও যে কি ভাবে মাটির নীচে ঠিক থাকিতে পারে, তাহাও সাধারণ বুদ্ধির অগম্য।

কথিত আছে যে St. Thomas Mount-এই টমাসকে কবরস্থ করা হয় এবং তাহার কিছুকাল পরে অধিকাংশ অস্থি মেসোপটেমিয়ার এডেসাতে (Edessa) স্থানান্তরিত করা হয়। এডেসা হইতে চিওসে (Chios) এবং তথা হইতে ওরটনা (Ortona)-তে উহা লইয়া যাওয়া হয় এবং উহা এখনও সেখানেই আছে।

এই প্রবন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, সেগুলি বিশেষভাবে চিন্তা করিলে ইহাই মনে হয় যে সেণ্ট টমাস যে ময়লাপুরের সন্নিকটস্থ পেরিয়া মালাই-এ নিহত হইয়াছিলেন, তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। ঐ সম্বন্ধে কোন বিবরণীকেই সংশয়াতীতভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে গবেষকগণ এখনও আশা করিতেছেন, হয়তো এমন কোন ঘটনা আবিষ্কৃত হইবে, যাহা দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইবে যে সেণ্ট টমাস দক্ষিণ ভারতে প্রচারকালে নিহত হইয়াছিলেন। এখন পর্যন্ত ইহার

কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই বা কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। কেবল কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়াই এতবড় ঘটনা প্রচার করা কতখানি যুক্তিসঙ্গত, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কেহ কেহ বলেন কিংবদন্তীও ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কারের অন্যতম উপকরণ, কিন্তু উহাই যে একমাত্র ভিত্তি তাহা মানিয়া লওয়া মুস্কিল। ডিক্রুজ লিখিত St. Thomas, the Apostle in India পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে যাইয়া সিন্দার বিশপ ও সেণ্ট টমাস গির্জার বিশপের Co-Adjutor মহামান্য এ এম টেক্সিরিয়া লিখিয়াছেন, 'রোম হইতে যে সব বণিক জাহাজে বাণিজ্যের জন্য ভারতের উপকূলে যাইত, তাহারাই হয়তো ফিরিয়া আসিয়া রোমে সেণ্ট টমাসের হত্যার সংবাদ দিয়াছে। ঐ জাহাজের নাবিকদের মধ্যে নিশ্চয়ই বহু ক্রীতদাস ছিল, তাহাদের পক্ষেও ঐ খবর দেওয়া স্বাভাবিক।' কিন্তু 'হয়তো' এবং 'নিশ্চয়ই' প্রভৃতি শব্দের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ গুরুতর ঘটনার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে কিনা চিন্তনীয়। ঐ বিশপ নিজেও উক্ত ভূমিকার শেষে স্বীকার করিয়াছেন, 'It will be a glorious day when the shadows of doubt that still hang in many minds over these hoary traditions at Mylapore—to us all so dear—are dissipated once and for all time'. অর্থাৎ ময়লাপুরের প্রাচীন কিংবদন্তী (যাহা আমাদের এত প্রিয়) সম্বন্ধে এখনও বহু লোকের মনে যে সন্দেহের ছায়া রহিয়াছে, সম্পূর্ণরূপে যেদিন তাহার নিরসন হইবে সেদিন একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন বলিয়া গণ্য হইবে।

সেণ্ট টমাস ভারতবর্ষে ধর্মপ্রচার করিতে আসিয়াছিলেন এবং সাফল্যের সহিত তাঁহার প্রভুর বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতে আমাদের কোন বাধা নাই। তিনি ভগবানের লীলাসহচর, তাঁহাকে আমরা অন্তর দিয়া শ্রদ্ধা করি এবং তাঁহাকে স্বাগত জানাই। স্বামী বিবেকানন্দও চিকাগো ধর্মমহাসভার অধিবেশনের পর ডেট্রয়েটে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, 'আমরা খৃষ্টের প্রকৃত মিশনরীদের চাই। যাঁহারা খৃষ্টের জীবনী আমাদের মধ্যে আনয়ন করিবে, তাঁহারা হাজারে হাজারে ভারতবর্ষে আসুন।'

কিন্তু অখণ্ড যুক্তি ও প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কেবল কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করিয়া আমরা স্বীকার করিতে রাজী নই যে সেণ্ট টমাস দাক্ষিণাত্যের ময়লাপুরে বা ভারতের কোন স্থানে নিহত হইয়াছিলেন।

মাতৃ-স্তুতি

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী, কাব্যশ্রী

সর্বজীবের বুদ্ধি তুমি মা,
হৃদয়ের মাঝে রহ,
স্বর্গ ও অপবর্গদা তুমি,
স্নেহ-ঘন-বিগ্রহ।

তুমি দ্যুতিময়ী দেবী মহীয়সী,
তুমি মাগো সনাতনী,
নিখিল জীবের আশ্রয়ভূতা
নমি তোমা নারায়ণী।

সন্তান-গত-জীবনা তুমি মা,
সতত ব্যাকুল-হিয়া,
সন্তানে তুমি করিছ পালন
স্নেহ-স্তন্য দিয়া।

এ নিখিল ভরি নানা রূপ ধরি
অধরা দিয়েছ ধরা,
তোমারে প্রণমি, চাহি গো জননি,
চরণ করুণা-ভরা।

সর্ব-শুভের তুমি বিধাত্রী,
তুমি মাতা কল্যাণী,
সর্ব-সিদ্ধি-প্রদায়িনী তুমি,
বর- ও অভয়পাণি।

তুমি ত্রিনয়না, নিখিল-শরণা,
ত্রিভুবন-আশ্রয়া,
তোমারে প্রণমি ওগো নারায়ণি,
চির-মঙ্গলালয়া।

সৃষ্টি-স্থিতি-শক্তি-স্বরূপা,
তুমি মা ত্রিগুণাধারা,
তুমি গুণময়ী, তুমি মা নিত্যা,
তুমি মা সারাৎসারা।

দীন-আর্তের পরিত্রাত্রী
সকল-আর্তি-হরা,
তোমারে প্রণমি, ওগো নারায়ণি,
মমতা-মধুক্ষরা।

'মা, মা' বলে ডাকিস কেন?

সেখ সদর উদ্দীন

'মা, মা' ব'লে ডাকিস কেন
ব্যর্থ পূজায় শূন্য মনে?
কণ্ঠে যারে বার ক'রে দিস্
থাকবে সে তোর চিত্ত-কোণে?

মায়ের পূজা করতে বসে
হৃদয় দিয়ে ডাকতে হয়,
সার্থকতা সেথাই ওরে,
নয়ন যেথা দৃষ্টিময়!

সোনা-রূপার অলঙ্কারের
নেইক' যেথা আড়ম্বর,
ভক্তি যেথায় মুক্তাহারে
সাজ করেছে মনের 'পর।

অশ্রু-কুঁড়ি অর্ঘ্য হ'য়ে
ঝরছে সেথা চরণ 'পর,
সেথাই তো রে মৃন্ময়ী মার
চিন্ময়ীতে রূপান্তর!

বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন

[তৃতীয় প্রস্তাব]

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

(১)

বিভিন্ন স্থানে ঠিক ধারাবাহিক ভাবে না হলেও রীতিমতো ঐতিহাসিক আলোচনা ক'রে বিবেকানন্দ পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে 'Materialism and spirituality in turn prevail in society'।[১] সমাজ-বিকাশের এইটিই হ'ল চিরন্তন ধারা—জড়বাদ ও আধ্যাত্মিকতার ক্রমান্বয় প্রাদুর্ভাবের মাধ্যমে মানব-সমাজের উন্নতি সঙ্ঘটিত হয়। উন্নতিই হ'ল সমাজ-জীবনের লক্ষ্য—'Progress is its watchword'। কিন্তু সে উন্নতি একটি সরল-রেখায় সম্ভবপর নয়, কারণ 'All progress is in successive rise and fall'[২]। বিবেকানন্দের মতে সমস্ত উন্নতিই ঘটে ক্রমিক উত্থান-পতনের পদ্ধতিতে। ইতিহাসে এর যথেষ্ট সমর্থন আমরা পাই।

ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে জড়বাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তখন চার্বাক দর্শনের বস্তুবাদ বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করেছিল। ভগবান বুদ্ধ আবির্ভূত হ'য়ে অধ্যাত্মবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। আবার প্রায় সহস্র বৎসর পরে আচার্য শঙ্করের আবির্ভাবের পূর্বে দেহাত্মবাদ ভারতবর্ষকে প্রায় গ্রাস করে; অবনতির যুগে বৌদ্ধধর্মের পরিচয় গ্রহণ করলেই তার সত্যতা অনুধাবন করা যায়।[৩] শঙ্করাচার্য উপনিষৎ-নির্দিষ্ট বেদান্ত-ধর্মের বহুল প্রচার দ্বারা দেশকে সেই সঙ্কট হ'তে রক্ষা করেন। আধুনিক কালে পাশ্চাত্য ভাব-প্রভাবের প্রথম পর্যায়ে জড়বাদ আমাদের দেশকে অধিকার ক'রে বসে। এই সঙ্কটে শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় অধ্যাত্মশক্তির আবির্ভাব ভারতীয় মনকে বিশ্লেষ হ'তে রক্ষা করেছে। আমাদের পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব, সারা পৃথিবীই এখন এক ইন্দ্রিয়ানুগ (Sensate) সভ্যতার কবলিত। তারই অবসান-কল্পে ঘটেছে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব।

মোটের উপর আমরা দেখছি যে ঢেউয়ের আকারে উন্নতি-অবনতি বা অধ্যাত্মবাদ-জড়বাদ সমাজ-জীবনে প্রাধান্য অর্জন করে। এর থেকেই বিবেকানন্দ তাঁর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করেছেন : আধ্যাত্মিকতাই প্রত্যেক জাতির প্রাণশক্তি, আধ্যাত্মিকতার সঙ্কোচে সমাজের পতন এবং তার বিকাশেই সমাজের উত্থান। শুধু তাই নয়, সভ্যতা আমরা তাকেই বলব যেখানে মানুষের মধ্যে দেব-ভাবের বিকাশ হয়—'Civilisation means manifestation of divinity in man'।[৪] 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থে এই সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে তিনি বলছেন :

> প্রত্যেক সমাজেই এমন এক দল ব্যক্তি থাকেন, যাঁহারা স্থূল বিষয় ভোগে আনন্দ পান না। ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুতেই তাঁহাদের প্রীতি। মাঝে মাঝে তাঁহারা জড় অপেক্ষা উচ্চতর এক সত্যের আভাস পান। ঐ সত্যের অনুভূতি লাভের জন্য তাঁহারা অবিরাম চেষ্টা করিয়া চলেন। আমরা যদি মানব-জাতির ইতিহাস পাঠ করি, তাহা হইলে দেখিব যে এইরূপ মানুষের সংখ্যা দেশে বৃদ্ধি পাইলে জাতির উন্নতি এবং যখনই তাঁহাদের সংখ্যা কমিয়া যায়, তখনই জাতির অধঃপতন ঘটে।

১ Paramkudi Lecture ২ Jnana-Yoga

৩ 'They (সহজিয়া) believe that *deha* or material human body is all that should be cared for.'—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী

৪ Conversation & Dialogues—Vivekananda

যে কোন সাধক বা মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করলে এর সত্যতা আমরা বুঝতে পারি।

বাল্যাবধি কতপ্রকার সুখ-সম্পদের মধ্যে তিনি ছিলেন, ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুদের নিকট তা বর্ণনা করেছেন,[৫] কিন্তু এতে তিনি তৃপ্তি বোধ করেননি। তিনি চাইলেন দেহ-মনের অতীত জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর পারে সুখ-শান্তি-নির্বাণ।[৬]

এই সকল জীবন থেকে বোঝা যায়, মানুষের মন কোন কোন সময় কিভাবে ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের জ্ঞান অর্জনের জন্য পিপাসু হ'য়ে ওঠে। এই রকম পিপাসু মানবের অন্তরের আলো মানব-সমাজে যুগ-যুগান্তের অন্ধকার কিরূপে দূর করে, তা সমগ্র বৌদ্ধযুগে অসাধারণ ব্যাবহারিক উন্নতি দর্শনে বোঝা যায়। এই দেদীপ্যমান আলোক-স্পর্শে বহু চণ্ডাশোক ধর্মাশোক হন, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল মানুষের সুপ্ত আত্মশক্তির জাগরণ ঘটে—জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই ঘটে তাই উন্নতি।

অতি আধুনিক যুগেও আমরা অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে নিদারুণ আধ্যাত্মিক অবনতি আমাদের দেশে দেখেছি। সাধারণের জীবনে স্থান পেয়েছিল একমাত্র ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ভোগ-সুখ। এর ভয়াবহ পরিণামের চিত্র সাহিত্যের মাধ্যমে আমরা পাই।[৭] কিন্তু উনিশ শতকেই ঘটল এর অবসান—একদিকে ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুত্থান, অপরদিকে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান সমগ্র জাতিকে নববলে বলীয়ান্ ক'রে তুলল। সেই আধ্যাত্মিকতার প্রবল প্লাবনে সব গ্লানি ভেসে গেল এবং গৌরবময় নবীন যুগের আবির্ভাব হ'ল।

৫, ৬ মহেশচন্দ্র ঘোষ—বুদ্ধপ্রসঙ্গ, গৌতমবুদ্ধের আত্মচরিত-অধ্যায়।

৭ বিমল মিত্র প্রণীত 'সাহেব-বিবি-গোলাম' নামক উপন্যাসে এর জ্বলন্ত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

সুতরাং বিবেকানন্দের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ যে 'প্রত্যেক জাতির প্রাণশক্তি আধ্যাত্মিকতার মধ্যে নিহিত, আধ্যাত্মিকতা বিলীন হইয়া বস্তুবাদের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে এই প্রাণশক্তি শুকাইতে থাকে।'

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সমাজ-বিকাশের ধারা সম্বন্ধে আমরা বিবেকানন্দের চারিটি সুস্পষ্ট অভিমত যা পেয়েছি তা হ'ল:

(১) সরল-রেখায় সমাজের বিকাশ ঘটে না,

(২) উত্থান-পতনের ধারা সমাজ-বিকাশের সুনির্দিষ্ট গতিপথ,

(৩) আধ্যাত্মিকতার আবির্ভাবই উন্নতি, জড়বাদের প্রাদুর্ভাবই অবনতি,

(৪) অতএব আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই সভ্যতার প্রাণশক্তি নিহিত।

সমাজ-জীবনের উন্নতি যে একটি সরল-রেখায় সম্ভব নয়—এ সিদ্ধান্ত শুধু বিবেকানন্দের নয়, এ মত পোষণ করেন বর্তমান কালের অনেক প্রখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী, যথা—সোরোকিনের মতে ঢেউয়ের আকারে সমাজের বিকাশ ঘটে থাকে।[৮] একে তিনি 'Theory of Rhythm' বলেছেন। মার্ক্স অবশ্য সরল-রেখায় উন্নতি-তত্ত্বে বিশ্বাসী। দেখা যায় যে উনিশ শতকের উন্নতি তত্ত্বপ্রণেতাগণ অনেকেই এই সরল-রেখায় উন্নতি-তত্ত্বের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। তার কারণ তাঁরা অনেকেই ডারউইন-প্রণীত জীব-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ-তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন অতিমাত্রায়। সমাজকে তাঁরা জীবদেহের অনুরূপ মনে করেছেন। প্রাণি-জগতের ক্রমবিকাশ ডারউইনের তত্ত্ব অনুযায়ী সরল-রেখায় উন্নতির পথে পর্যায়ের পর পর্যায়ে এগিয়ে চলেছে। এইজন্য তাঁরা সরল-

৮ Sorokin—Social and Cultural Dynamics. Cowell—History, Civilisation & Culture.

রেখায় সমাজ-বিকাশের ধারা দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

এঁরা যে এরূপ ভ্রান্ত মত পোষণ করেন, তার আরও কারণ এই যে—কোন একটি বিশেষ সমাজ-সংস্কৃতির স্তরে (Ideational, Idealistic অথবা Sensate স্তরে) সমাজ-জীবনের বিভিন্ন শাখায় সরল-রেখায় বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু এ রেখা অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঋজুভাবে বিস্তৃত নয়। পাশ্চাত্য সমাজ-জীবনের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে দীর্ঘকালব্যাপী পরিসংখ্যান সহায়ে অনুসন্ধান ক'রে সোরোকিন সুস্পষ্ট অভিমত দিয়েছেন :

There is no slightest doubt that if the time period is not too long, there are millions of socio-cultural processes with a linear trend during such a period Quite different is the situation, if the existence of a linear trend is asserted for an infinite time, or for a period that factually exceeds the duration of the given linear trend ..... When they are considered in a longer time-perspective, these linear trends are discovered to be finite and are replaced by new trends either different or opposite to the previous ones

—কিছুদূর পর্যন্ত যে প্রবণতা সরল-রেখায় অগ্রসর হ'তে দেখা যায়, কিছুকাল পরে তা হয় সম্পূর্ণ পৃথক্, হয়তো এর উল্টো প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। অতীন্দ্রিয় ভাবের যুগে (Ideational age) শিল্প-কলা-সাহিত্য সব কিছুর ওপর দেখা যায় অতীন্দ্রিয়তার ছাপ এবং তা বেশ কিছুকাল ধরে ক্রমবিকাশ-ধারায় ঋজু-রেখায় বিস্তৃত, কিন্তু তারপরেই দেখা যায় এসে পড়েছে উল্টো ভাব-ধারা। অতীন্দ্রিয়তার যুগে ধর্মই হয় সঙ্গীত-শিল্প-কলা-দর্শন-সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন, আর ইন্দ্রিয়ানুগতার যুগে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ-ভোগ এ সকলের আদর্শ।

বৈষ্ণব যুগের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যকে দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরে অনুশীলন করলে ধরা পড়ে এ সত্য। ভারতচন্দ্রের কালের আদিরসাত্মক সাহিত্য সেই যুগের জীবনযাত্রা, ভাবধারা, সমগ্র প্রবণতার অনুরূপ, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভাবপ্রবাহ তার বিপরীত। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সে যুগ কবিগান, হাফআখড়াই প্রভৃতির; সে যুগ তার পূর্ববর্তী মরণশীল ইন্দ্রিয়ানুগ কৃষ্টিরই (sensate culture) সাক্ষ্য দেয়। তার পরবর্তী কালে সঙ্গীত-রচনায় এবং সঙ্গীত-সাধনায় প্রাধান্য করেছেন (শুধু বাংলা দেশের দৃষ্টান্ত ধরতে গেলে) রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মসঙ্গীতকারগণ—যখন সঙ্গীতের ভাবধারার পরিবর্তন হয়েছে যুগচেতনা অনুযায়ী।

এমনি ক'রে বিভিন্ন শতাব্দীতে ব্যাপক অনুসন্ধান করলে দেখা যায় অতীন্দ্রিয়তা ও ইন্দ্রিয়ানুগতার আবর্তন ও বিবর্তন। দার্শনিক চিন্তাধারায়ও এই আবর্তন-বিবর্তন দেখা যায়—শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে তন্ত্র-মন্ত্র সহজিয়া সাধনা প্রভৃতির বিকৃত রূপের মধ্যে অনুসন্ধান করলে অবসানপ্রায় অতীন্দ্রিয়তা এবং স্থূল ইন্দ্রিয়ানুগতা পরিলক্ষিত হয়। আবার শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরবর্তী এক শতাব্দীতে ত্যাগ-বৈরাগ্য অতীন্দ্রিয় চিন্ময়-সত্য-সাধন দর্শন-চিন্তার ক্ষেত্রে প্রধান অবলম্বন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে দেখা যায়।

এরূপ স্থলে মৌলিক দর্শন-চিন্তা শুধু বস্তু-বাদী এবং অধ্যাত্মবাদ শুধু আর্থনীতিক কারণে দুষ্ট মস্তিষ্কের কল্পনা—এ মনে করা ভুল। বৈদিক যুগে কোন এক সময়ে উপাসকেরা ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের তুষ্টি সাধন করবার প্রয়াস পেয়েছেন, ধনজন-সম্পদ অর্জনের জন্য ইন্দ্রজাল অলৌকিক শক্তি-প্রয়োগের প্রচেষ্টাও করেছেন, কিন্তু উপনিষদের যুগে ব্রাহ্মর্ষিবৃন্দ 'কেবলম্ অমৃতম্' লাভকে পরম সম্পদ লাভ ব'লে মনে করেছেন।

এখন 'Theory of Rhythm' (তরঙ্গাকারে অগ্রগতি-তত্ত্ব) মানলে অতীন্দ্রিয়বাদ ও ইন্দ্রিয়ানুগতার ক্রমিক আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু 'Linear Progress' (সরল-রেখায় অগ্রগতি)-তত্ত্ব মানলে ভ্রান্ত গবেষকের মনে করতে হয়—অধ্যাত্মবাদ প্রক্ষিপ্ত বস্তু মাত্র, বাস্তব সত্য নয়। এখন কিছু সময়ের ব্যবধানে নিয়মিতভাবে বস্তুবাদের পুনরাবির্ভাব লক্ষ্য করেই 'Linear Progress' (সরল-রেখায় অগ্রগতি)-তত্ত্বে বিশ্বাসী মার্ক্সবাদী বস্তুবাদকেই একমাত্র সত্য-তত্ত্ব ব'লে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন। উপনিষদের যুগে এবং বৌদ্ধযুগে অধ্যাত্মবাদের যে প্রভাব, তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁরা বলেন যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এই অধ্যাত্মবাদ—'অধ্যাত্মবাদ শুধু মাত্র শাসক-শ্রেণীর দর্শনই নয়, সেই শ্রেণীর কাছে শাসনের হাতিয়ারও।' তাঁরা আরও বলেন যে আগামী-কালের নিঃশ্রেণীক সমাজে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদই হবে একমাত্র গ্রাহ্য দর্শনতত্ত্ব।

এখন এই যুক্তি অনুসরণ করলে আমরা এই সিদ্ধান্তেই পৌছাই যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজেই অধ্যাত্মবাদের স্থান, নিঃশ্রেণীক সমাজে তার স্থান নেই। ঠিক এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ ক'রে মার্ক্সবাদী গবেষক বলছেন যে প্রাগ্-বিভক্ত ভারতীয় সমাজে লোকায়তিক যে মতবাদ আবিষ্কার করা যায়, যা প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্য এবং আদিম অধিবাসীদের ধর্মানুষ্ঠান রীতি-নীতি অনুসরণ করে—তা বস্তুবাদী।[৯] তাহলে বস্তুবাদ শ্রেণী-সমাজে থাকতে পারে না, অথচ এই মত ইতিহাসের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। কারণ দেখা যায়, শ্রেণীবিভক্ত ভারতীয় সমাজের এক স্তরে সহজিয়া-সাধন তন্ত্র-মন্ত্রসাধন বৌদ্ধদের অধ্যাত্ম-দর্শন-প্রভাব কাটিয়ে বস্তুবাদী লোকায়তিক দর্শন-চিন্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষণ প্রকট করছে।[১০] 'Linear Progress' (সরল-রেখায় অগ্রগতি)-তত্ত্ব অনুসরণ ক'রে এই সকল পরস্পরবিরোধী যুক্তি ও সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এঁরা। অথচ অনুসন্ধান করলে সহজ-যান প্রভৃতি লোকায়ত দর্শন-চিন্তায়ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব দেখা যায়। অলৌকিক অতীন্দ্রিয় আনন্দপূর্ণ অবস্থাকেই এঁরা 'সহজ' অবস্থা বা 'সহজানন্দ' অবস্থা ব'লে মনে করেছেন।[১১] এ-কে পূর্বোক্ত মতবাদীরা শাসক-শ্রেণীর চাপানো চিন্তা ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন। এ মতের স্বপক্ষে যুক্তি কিছু নেই। লোকায়ত-দর্শন-চিন্তা যা প্রাগ্ বিভক্ত সাম্য-সমাজ-প্রসূত ব'লে এঁরা বস্তুবাদী ব'লে মনে করেছেন, তাদেরও মধ্যে অতীন্দ্রিয়তার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। সমাজ-বিকাশের স্বাভাবিক নিয়মবশেই নাথযোগীরাও যোগসাধনার ফলে—যে অবস্থা লাভ হয় ব'লে মনে করেন, তা অতীন্দ্রিয়-নির্বাণানন্দ অবস্থা ব্যতীত কিছুই নয়।[১২]

অধ্যাত্মবাদী শাসকশ্রেণীর দর্শনও আবার এই নিয়মবশেই মাঝে মাঝে বস্তুবাদের প্রবণ-

৯ ডাঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় ২৭শে কার্তিক, ১৩৬৬ সনের 'দেশ' পত্রিকায় 'এশিয়ার ধর্মজীবন' সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন, তাতে প্রমাণিত যে সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং চেতন-অচেতন সব বস্তু প্রাণবন্ত—এ বিশ্বাস আদিম অধিবাসীদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে, যা হ'ল অধ্যাত্মবাদের সূচনা।

১০ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লোকায়ত-দর্শনে সহজিয়া-মত, নাথ-পন্থ, তন্ত্র-মন্ত্র, যোগসাধন, কায়সাধন—এ সকলকে মূলতঃ বস্তুবাদী ব'লে প্রমাণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। অর্থাৎ শ্রেণীবিভক্ত সমাজেও সময়বিশেষে বস্তুবাদী দর্শনের উদ্ভব সম্ভব, অথচ মার্ক্সীয় নীতি অনুযায়ী শ্রেণীবিভক্ত সমাজের দর্শন-চিন্তা ভাববাদী বা অধ্যাত্মবাদী।

১১ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—বাংলার বাউল ও বাউল সম্প্রদায়।

১২ এ সম্পর্কে উদ্বোধনে 'ভারতের সমাজ সংস্কৃতির রূপায়ণে অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদ' শীর্ষক এক প্রবন্ধে ইতিপূর্বে বিশদ আলোচনা করেছি। এ ছাড়া ডাঃ কল্যাণী মল্লিক লিখিত 'নাথপন্থ' এবং উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত 'বাংলার বাউল ও বাউল ধর্ম' নামক গ্রন্থে এর পরিচয় পাওয়া যায়।

তার কবলিত হয়েছে দেখা যায়, তখন ধর্ম-চর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়েছে ভোগের উপকরণ-সংগ্রহ। তখন সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীত সবকিছুর অবলম্বন হয়েছে ইন্দ্রিয়ানুগতা এবং ধর্ম-দর্শন চিন্তা ও চর্চা এই ইন্দ্রিয়ানুগতার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে—দেখা যায়। উড়িষ্যার মন্দির-গাত্রেও এর সাক্ষ্য সুস্পষ্ট মেলে। 'Linear Progress' (সরল-রেখায় অগ্রগতি)-তত্ত্ব অনুসরণের ফলে মার্ক্সবাদিগণ এ বিষয়ে ভ্রান্ত হয়েছেন।

মোটের উপর ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যায় বরাবর সরল-রেখায় অগ্রগতি সম্ভব নয়। সোরোকিন গ্রীক-রোমান সংস্কৃতি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ যে আলোচনা করেছেন তার দ্বারাও এ তত্ত্ব প্রমাণিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করছি, সোরোকিন দেখাচ্ছেন, 'Creto-Mycenean culture'-এর যুগে—খৃষ্টপূর্ব ১২শ থেকে ৯ম শতাব্দীতে চিত্রশিল্পে ইন্দ্রিয়ানুগতার (Sensate) প্রভাব, তার পরবর্তী গ্রীক সভ্যতার আমলে—খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে অতীন্দ্রিয় ভাবের প্রভাব (Ideational), আবার খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে ইন্দ্রিয়ানুগতার লক্ষণ সুস্পষ্ট। কোন সভ্যতার অধঃপতনের কালে এর ছাপ সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সোরোকিন অনুরূপভাবে এই ছন্দের প্রবাহ দেখিয়েছেন। বাস্তব ইতিহাসই আমাদের 'সরল-রেখায় অগ্রগতি' তত্ত্বের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

(২)

এখন প্রশ্ন হ'ল—এই যে 'সরল-রেখায় অগ্রগতি বা উন্নতি'-তত্ত্বের যুক্তিগত ত্রুটি কোথায়? এর পেছনে যুক্তির দৌর্বল্যও প্রমাণ করেছেন সোরোকিন। এ সম্পর্কে সোরোকিনের 'Theory of limit and theory of immanent change'—এই দুটি তত্ত্বের আলোচনা প্রয়োজন। সোরোকিন বলেন, কোন উন্নতি বা অবনতি অনির্দিষ্ট কালের জন্য হ'তে পারে না। সব কিছু বিকাশের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। কোন কিছু বিকাশের প্রবণতা অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হ'তে পারে তখনই, যখন তার ওপর বহিঃস্থ অন্য শক্তির প্রভাব এসে পড়বার সম্ভাবনা আদৌ থাকে না। সুতরাং সোরোকিন বলছেন:

'A perpetual tendency in social processes is a mere complicated form of uniform and rectilinear motion in mechanics. Newton's law tells us under what conditions this is possible. In order for such to occur there must be absolute non-interference of any exterior forces, or absolute isolation from any environmental influence is essential. Otherwise definite movement in one direction is impossible, and friction and shocks of external forces would disturb the movement and eventually change its direction Through gravitational forces, for instance, linear movement becomes circular and elliptical.'

এই যে বস্তু-জগতের তত্ত্ব—সমাজ-জীবনও এর অধীনে, বিভিন্ন প্রকার বহিঃশক্তি তার গতিপথ পরিবর্তিত ক'রে দেয়। কোন একটি সুনির্দিষ্ট কক্ষপথের সীমা এইরূপে সুনির্দিষ্ট হয়।

'Social processes individually or in their totality, are not absolutely isolated from the outside cosmical and biological worlds nor from the pressure of the 'social processes'. They permanently and ceaselessly interfere with each other. Unless we postulate a miracle or an active Providence, it is quite improbable that all these innumerable forces would be negligible or constant at every moment, thus maintaining the direction of the processes unchanged. Such an assumption of a perfect and eternal balance of numerous cosmic, biological and social processes is equivalent to a miracle and contrary to all probability.'

বহিঃশক্তি প্রক্ষেপের জন্য কোন একটি বিশেষ ধারার বিকাশ কিছুকাল পরেই বাধাপ্রাপ্ত

হয় এবং অন্য ধারার আবির্ভাব ঘটে। এই কারণেই সব বিকাশের ধারারই সীমা আছে, সব উন্নতিরই অবসান আছে, সব অধঃপতনেরই শেষ আছে। মহাভারত-কার উত্থানপতনের এই বিশ্ব-বিধানটি অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করেছেন: 'সকল সঞ্চয়েরই পরিশেষে ক্ষয় হয়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়'।[১৩] এই সৃষ্টিতে বরাবর ঋজুরেখায় কোন গতিই সম্ভব নয়, একস্থানে না একস্থানে এসে রেখার শেষ প্রান্ত দেখা দেবে, পথ বক্রগতিতে ভিন্ন দিকে চলবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে—সমাজ-বিকাশের পদ্ধতি সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা না করলেও বিবেকানন্দ ঐতিহাসিক জ্ঞান-বলে যে সিদ্ধান্তে এসেছেন, তার বৈজ্ঞানিকত্ব আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন। উত্থান-পতনের ভেতর দিয়েই সমাজ-বিকাশের ধারা প্রবাহিত,—এই ভাবেই আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদ ক্রমান্বয়ে আবর্তিত হ'য়ে চলেছে।

সোরোকিন আরও বলেন যে সমাজের পরিবর্তনের কারণ অন্তর্নিহিত, এই অন্তর্নিহিত কারণের ওপর বহিঃশক্তি প্রক্ষিপ্ত হ'য়ে পরিবর্তনের গতিপথ ঘুরিয়ে দেয়।

'In regard to any socio cultural system, it changes by virtue of its own forces and properties. It cannot help changing, even if all its external conditions are constant The change is thus immanent in any socio-cultural system, inherent in it and inalienable from it. It bears in itself the seeds of its change'

কোন সচল ও সক্রিয় প্রতিষ্ঠান তার আপন ক্রিয়াশীলতার বলেই গতিবেগ প্রাপ্ত হয় এবং পরিবর্তিতও হয় এবং তা হতেই হবে। কারণ ক্রিয়াশীলতা প্রতিষ্ঠানটির যে রূপ দেবে, তা তার পূর্বাবস্থা হ'তে রূপান্তর এবং রূপান্তরিত প্রতিষ্ঠানটি যখন পুনবার চলতে থাকবে, তার নবরূপায়ণ ঘটবে। এই স্বাভাবিক অন্তর্নিহিত শক্তি ছাড়া অন্য কোন (বহিঃ) শক্তি দ্বারা পরিবর্তন বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ 'যা নেই' তার থেকে 'যা আছে' তা কখনও উৎপন্ন হ'তে পারে না, পরিবর্তনের ফলে সে নব-রূপ শূন্য থেকে প্রসূত হ'তে পারে না, বস্তুটির অন্তর্নিহিত স্বভাবের বা স্বরূপের মধ্যে প্রসুপ্ত থাকতে হবে তাকে। নতুবা একটি অতি জটিল সমাধানহীন ধাঁধাঁর মধ্যে আমাদের পড়তে হয়।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরা যাক—ভারতীয় পরিবার-প্রথার বর্তমান স্বরূপ (=ক) যে ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার কারণ শিল্পবিপ্লব (=খ), এবং শিল্পবিপ্লবের কারণ পাশ্চাত্য প্রভাব (=গ)। প্রশ্ন হবে: (গ)-এর কারণ কি? অর্থাৎ গ থেকে খ, খ থেকে ক, ক থেকে অন্য কিছু, এই একটি আদি-অন্ত-হীন কার্যকারণ-ধারা চলেছে, কোথাও এর শেষ পরিণাম বা প্রথম কারণ দেখা যায় না।

অর্থাৎ মানুষের এই সকল প্রশ্নের শেষ উত্তর কিছুই নেই, একটি প্রশ্নের উত্তরে আমরা শুধু আর একটি প্রশ্ন লাভ করছি। সেইজন্য সব সম্ভাবনা (Potentiality)-কে সেই পরিবর্তনশীল বস্তুটির মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকতে হবে। পরিবর্তন সেইজন্য অন্তর্নিহিত কারণবশতই ঘটবে। সোরোকিন সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন:

Any consistent theory of externalistic change does not solve the problem, but merely postpones the solution, and then comes either to a mystery in a bad sense of this term or to the logical absurdity of pulling the proverbial rabbit out of mere nothing.

বহু পূর্বে ভারতীয় দর্শনবেত্তাগণ এই কথা বলেছিলেন। অসৎ (non-existence) থেকে

১৩ মহাভারত—স্ত্রীপর্ব।

সৎ-এর (existence) উৎপত্তি হ'তে পারে না। তাঁরা বলেন যে এজন্য evolution বা অব্যক্ত সত্তায় সঙ্কোচ স্বীকার করবার প্রয়োজন আছে। অব্যক্তসত্তার ব্যক্ত রূপই বিকাশ। সমাজ-বিজ্ঞানের দিক থেকে এই তত্ত্বের গুরুত্ব সোরোকিন তাঁর Theory of immanent change (অন্তর্ব্যাপী পরিবর্তন-তত্ত্ব) দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত করেছেন। এ সম্পর্কে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ তাঁর 'ভারতের সাধনা'[১৪] গ্রন্থে যে কথা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য—

'Evolution (ক্রমবিকাশ)-এর সঙ্গে involution (ক্রমসংকোচ) স্বীকার না করিলে জীবতত্ত্ব ও ইতিহাসের প্রকৃত ব্যাখ্যা বা মীমাংসা পাওয়া সম্ভব নহে। ভারতীয় বিজ্ঞান- বা পরিণাম-বাদ উক্ত দুইটি তত্ত্বই স্বীকার করে, সেইজন্য কালতত্ত্ব ও মানবীয় উন্নতি সম্বন্ধে উহার সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত হইতে বিলক্ষণ'।

এই involution (সঙ্কোচ)-তত্ত্ব ও immanent change (অন্তর্ব্যাপী পরিবর্তন)-তত্ত্ব অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত। এই তত্ত্ব দুইটি স্বীকার করলে economic determinism (আর্থনৈতিক নিশ্চয়তা) রূপ ভ্রান্ত তত্ত্বের হাত থেকে সমাজ-বিজ্ঞানের মুক্তি ঘটে এবং সমাজ-বিকাশের পূর্ণ সত্য স্বরূপ আমাদের দৃষ্টির সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়। এ সম্পর্কে সোরোকিনের শেষ সিদ্ধান্ত:

'The above is sufficient to answer the problem of Dynamics Why a whole integrated culture as a constellation of many cultural subsystems changes and passes from one state to another. The answer is it and its subsystems—be they painting, sculpture, architecture, music, science, philosophy, law, religion, *mores*, forms of social, political, and economic organisations—change because each of these is a going concern, and bears in itself the reason of its change.'

কিন্তু তাই ব'লে বহিঃশক্তির প্রভাবও অগ্রাহ্য নয়। কারণ:

'The external circumstances may accelerate or retard, facilitate or hinder, reinforce or weaken a realisation of the immanent potentialities of the system and therefore its destiny'.

কিন্তু এর দ্বারা অন্তর্নিহিত পরিবর্তনের ধারা একেবারে রুদ্ধ হ'য়ে যেতে পারে না, কারণ অন্তর্নিহিত শক্তি প্রবলবেগসম্পন্ন, কিছুতেই তা রুদ্ধ হবে না—এই হ'ল অন্তর্নিহিত শক্তির স্বভাব ধর্ম।

কিন্তু প্রশ্ন হ'ল: Ideational, Idealistic এবং Sensate মাত্র এই তিনটি আকারে অবধারিত পরিবর্তন কেন ঘটে? এর উত্তরে বলতে হয় সে পরিবর্তনের অনন্ত রূপ সম্ভব নয়, তার কারণ পরিবর্তনের উৎস হ'ল একটি বস্তুর বস্তুসত্তা বা নিজ স্বভাব—যার গুণ (properties) সীমাবদ্ধ। এইজন্য তার রূপান্তর বা পরিণামকেও সীমাবদ্ধ হতেই হবে। এই সকল কারণেই সমাজ-জীবনের অতীন্দ্রিয়তা বা ইন্দ্রিয়ানুগতা এবং উভয়ের সংমিশ্রণে মধ্যবর্তী অবস্থা—এই তিনটি ছাড়া আর সম্ভাব্য রূপ নেই। এ হ'ল বাস্তব সত্য (empirical reality)। অতএব এগুলির মধ্যে একের পর অন্যকে ফিরে আসতে হবেই। দিন-রাত্রির আবর্তনের মতো এই আধ্যাত্মিকতা-জড়বাদের আবর্তনও অবধারিত।

এর কারণ আরও একদিক থেকে ব্যাখ্যা করা যাক। একটি ধারা যখন অন্য একটি ধারার দ্বারা অপসারিত হয়, তখন প্রথমোক্ত ধারা অব্যক্ত সত্তায় বীজাকারে থাকে এবং

১৪ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রণীত 'ভারতের সাধনা' পুস্তকখানি আজকের পাঠক-সমাজের কাছে অপরিচিত; কিন্তু বিবেকানন্দের সমাজ-চিন্তার উপর এই গ্রন্থখানি সর্বপ্রথম গবেষণা হিসাবে বিশেষ মূল্যবান্।

পুনর্বার তা প্রকটিত হয়, যখন অন্য ধারাটির বিবর্তিত হবার সময় আসে। ভারতীয় সাংখ্য-দর্শনে এইরূপ বিকাশ ও অব্যক্তসত্তায় পুনরাবর্তনের কথা পাওয়া যায়। সমাজ-জীবনেও এর সত্যতা পরিলক্ষিত হয়। জড়বাদের যুগেও বীজাকারে অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক প্রবণতা সুপ্ত থাকে, তার সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে না, আর অতীন্দ্রিয়তার যুগে সব মানুষ সমান উচ্চস্তরে উঠতে পারে না, কিছুটা ইন্দ্রিয়ানুগতা লুক্কায়িত থাকে। তাই পরে প্রবল হ'য়ে উঠে অতীন্দ্রিয়তাকে হটিয়ে দেয়। কোন যুগই তার পূর্ণস্বরূপে বিকশিত হয় না। বস্তুতঃ ভারতীয় চিন্তাধারায় এই প্রকল্পটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে যে কোন বিকাশই পূর্ণ হ'তে পারে না।

এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলছেন, 'Perfection means infinity, and manifestation means limit'—পূর্ণ মানে অসীম, বিকাশ মানে সীমা। এই কথার মধ্যে হেগেলের সঙ্গে বিবেকানন্দের চিন্তার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। হেগেল পূর্ণতাবাদী, তাঁর মতে সমাজ-সংস্কৃতি একদিন দোষশূন্য পূর্ণরূপে বিকশিত হবে। মার্ক্সও পূর্ণতাবাদী, তিনিও বলেন যে শ্রেণীবিহীন সমাজ আদর্শ সমাজ—দোষত্রুটিহীন পূর্ণ বিকশিত সমাজ। Theory of limit বা সীমাতত্ত্ব অনুযায়ী এ মত অবৈজ্ঞানিক। বিবেকানন্দের মতে ভাল মন্দ চিরদিন সব সমাজে থাকবে, শুধু তার রূপান্তর ঘটবে, কোন অবস্থায় অনেক মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটবে, কোন অবস্থায় ঘটবে না। প্রথমোক্ত অবস্থাকে Ideational (অতীন্দ্রিয়), পরবর্তীকে Sensate (ইন্দ্রিয়ানুগ), উভয়ের মধ্যবর্তীকে Idealistic (আদর্শবাদী) আখ্যা দেওয়া চলে। অতীন্দ্রিয়তার সমাজেও মন্দ কিছু থাকে বলেই পুনর্বার জড়বাদ প্রাধান্য লাভ করে।

অতএব দেখা যাচ্ছে বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত যে 'Materialism and spirituality in turn prevail in society' সম্পূর্ণ সত্য, আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদ এই দুইটি সুনির্দিষ্ট গতিপথে চক্রাকারে একে অপরকে অনুসরণ করে। সমাজ-সংস্কৃতির চলার এইটিই হ'ল সুনির্দিষ্ট কক্ষপথ।

There come periods in history of the human race when, as it were, whole nations are seized with a sort of world-weariness, when they find that all their plans are slipping between their fingers, that old institutions are systems are crumbling into dust, that their hopes are all blighted and everything seems to be out of joint.

Two attempts have been made in the world to found social life; the one was upon religion, and the other upon social necessity. The one was founded upon spirituality, the other upon materialism; the one upon transcendentalism, the other upon realism.

* * *

Curiously enough, it seems that at times the spiritual side prevails, and then the materialistic side, in wave-like motions following each other. In the same country there will be different tides.

(From 'Reply to address at Paramkudi'—*Swami Vivekananda*.)

গীতা-জ্ঞানেশ্বরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩১

তুমি কি মনে কর, আমার ভক্ত মরণের পর আমার সমান হইবে? যে অমৃতের মধ্যে বাস করে, তাহার মরণ কিরূপে হইবে? যে সময় সূর্যের উদয় হয় না, তাহাকেই রাত্রি বলে, তেমনি আমাতে ভক্তি বিনা যে কর্ম করা হয়, তাহাই কি মহাপাপ নহে? এইজন্য হে পাণ্ডুসুত, তাহার চিত্ত যখন আমার সমীপস্থ হয়, তখনই সে তত্ত্বতঃ আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়; একটি দীপ হইতে অন্য একটি দীপ জ্বালাইলে যেমন কোন্‌টি প্রথম তাহা জানা যায় না, তেমনি যে সর্বস্ব দিয়া আমাকে ভজনা করে সে মদ্রূপই হইয়া যায়, আমারই স্থিতি, আমারই কান্তি পায়, আমাতে নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়, কিংবহুনা—সে আমার জীবনেই জীবিত থাকে, হে পার্থ, এ বিষয়ে বারংবার তোমাকে আর কত বলিব? যদি আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর, তবে ভক্তি ভুলিও না। (৪৩০)

কুলের বিশুদ্ধতার আবশ্যক নাই, আভিজাত্যের শ্লাঘা করিও না, বিদ্যার অভিমান কেন বহন করিবে? রূপ-যৌবনের মদে মত্ত হইও না, ধন-সম্পদের গর্ব করিও না—এক আমাতে ভক্তি না থাকিলে এ সমস্তই ব্যর্থ হয়, কণাবিহীন শস্যের ঘনমঞ্জরী বা জনশূন্য সুন্দর নগর—ইহাতে কি কাজ হয়? শুষ্ক সরোবর, জঙ্গলে দুঃখীর সহিত দুঃখীর মিলন, কিংবা বন্ধ্যা ফুলে শোভিত বৃক্ষ যেমন নিষ্ফল, সকল বৈভব কুল জাতি-গৌরবও তেমনি ভক্তিহীন হইলে নিষ্ফল হয়, সর্ব-অবয়বযুক্ত শরীরে যদি জীবন না থাকে—তবে যেমন হয়, আমাতে ভক্তিবিহীন জীবনও তদ্রূপ, এরূপ জীবনকে ধিক্। উহা পৃথ্বীর উপর পাষাণের তুল্য নয় কি? কণ্টকময় বৃক্ষের ঘন ছায়া যেমন সজ্জন লোক সযত্নে পরিহার করে, পুণ্যও তেমনি অভক্তকে এড়াইয়া যায়, নিজ ফলের ভারে নিম্ববৃক্ষ যদি ঝুঁকিয়া পড়ে, তবে কাকেরই সুসময় উপস্থিত হয়। তেমনি ভক্তিহীন ব্যক্তিও পাপ কর্ম করিবার জন্য বাড়িতে থাকে, মাটির খাপরায় (পাত্রে) ষড়রস পরিবেশন করিয়া চৌরাস্তার উপরে রাখিলে যেমন কুকুরদেরই সুবিধা হয়, তেমনি যে ভক্তিহীন ব্যক্তি স্বপ্নেও সুকৃতি জানে না, তাহার জীবনে শুধু (সংসার)-দুঃখরূপ ভোজ্যই থালায় পরিবেশিত হয়। (৪৪০)

সুতরাং উত্তম কুলের প্রয়োজন নাই, সে অন্ত্যজ জাতিই হউক বা পশুর শরীরই প্রাপ্ত হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, দেখ, হস্তীকে কুম্ভীরে ধরিলে সে যখন ব্যাকুল হইয়া আমাকে স্মরণ করিয়াছিল, আমাকে প্রাপ্ত হইয়া কি তখনই তাহার পশুত্ব ঘুচিয়া যায় নাই?

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২

হে কিরীটী, যাহার নাম লইলেও পাপ হয়, সর্বাপেক্ষা অধম পাপযোনিতে যাহার জন্ম, সেই পাপযোনি প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় মূঢ় হইলেও যদি সর্বভাবে আমাতে দৃঢ়চিত্ত হয়, তবে তাহার প্রতিটি বাক্যই আমার নামোচ্চারণ, তাহার দৃষ্টি আমারই রূপ ভোগ করে, তাহার মন আমারই সঙ্কল্প (চিন্তা) নিরন্তর বহন করে, তাহার শ্রবণেন্দ্রিয় আমার কীর্তি-শ্রবণ ভিন্ন কখনও শূন্য থাকে না (সে সর্বদাই আমার কীর্তি শ্রবণ করে), আমার সেবাই তাহার সর্বাঙ্গের ভূষণ, তাহার জ্ঞান অন্য বিষয় জানে না, জ্ঞাতৃত্ব একান্তভাবে আমাকেই জানে, আমাকে এইভাবে লাভ করিয়াই সে জীবিত থাকে—অন্যথায় তাহার মরণ। হে পাণ্ডব, এইভাবে সমস্ত বিষয়ে, সর্বভাবে ভালবাসিয়া আমাকেই যে জীবনের সর্বস্ব করিয়াছে, সে পাপযোনি হউক, বেদাধ্যায়ী নাই হউক, পরন্তু আমার সহিত তুলনায় তাহার যোগ্যতা কম নহে, দেখ, ভক্তির বলে দৈত্যও দেবতাকে হীন করিয়াছে, ভক্তের মহিমা দেখাইতেই আমাকে নৃসিংহরূপ ধারণ করিতে হইয়াছে। (৪৫০)

সেই ভক্ত প্রহ্লাদ আমার জন্য সর্বদা বহু সঙ্কটে পড়িয়াছে, সেইজন্য হে কিরীটী, আমি যাহা দিতে চাহিয়াছি, সে সমস্তই প্রাপ্ত হইয়াছে, সে দৈত্যকুলজাত, পরন্তু শ্রেষ্ঠত্বে ইন্দ্রও তাহার সহিত তুলনার যোগ্য নহে, সুতরাং এখানে (অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্তির জন্য) ভক্তিই উপযোগী হয়, জাতি অপ্রমাণ। রাজাজ্ঞার অক্ষর (চিহ্ন) একটি চর্মখণ্ডের উপর পড়িলে সেই চর্মখণ্ডের দ্বারা সকল বস্তুই প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্যথায় (রাজমুদ্রাঙ্কিত না হইলে) স্বর্ণ বা রৌপ্যও প্রমাণ নহে, রাজাজ্ঞাই এখানে বলবতী, ঐ (রাজমুদ্রাঙ্কিত) চর্মখণ্ডের দ্বারা সমস্ত সামগ্রী কিনিতে পারা যায়, তেমনি যখন আমার প্রেমে মন ও বুদ্ধি ভরিয়া যায়, তখনই উত্তমত্ব ও সর্বজ্ঞতা আসিয়া যায়, অতএব কুল, জাতি, বর্ণ—এ সমস্তই অকারণ (বৃথা), হে অর্জুন, এ সংসারে একমাত্র আমাতে ভক্তিই সার্থক, যে কোন ভাবেই হউক না কেন, আমাতে মন প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে হইবে, আমাতে মন সমাবিষ্ট হইলে পূর্বের সমস্তই বৃথা হইয়া যাইবে, ছোট ছোট নদী নালা গঙ্গায় গিয়া না পড়া পর্যন্তই নদী নালা থাকে, গঙ্গায় পড়িয়া গঙ্গাই হইয়া যায়, অথবা কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে একত্র করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ না করা পর্যন্তই তাহাদের খদির চন্দন প্রভৃতি কাষ্ঠ বলা হয়, তেমনি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, স্ত্রী, শূদ্র, অন্ত্যজ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতি ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ তাহারা আমাকে প্রাপ্ত না হয়। (৪৬০)

লবণকণা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন জলেই মিশিয়া যায়, তেমনি সর্বভাবে আমাতে মিলিয়া গেলে জাতি, ব্যক্তি ইত্যাদি ভেদ লোপ পায়, পূর্ব ও পশ্চিমগামী নদনদীর অস্তিত্ব ততদিনই থাকে, যতদিন তাহারা সমুদ্রে আসিয়া মিলিত না হয়, তেমনি কোন এক ছলে আমাতে প্রবেশ করিলেই ভক্তের চিত্ত আপনা-আপনিই মদ্রূপই হইয়া যায়; পরশপাথরকে ভাঙিবার জন্য যদি লোহা তাহার অঙ্গ স্পর্শ করে, তবে স্পর্শ করা মাত্রই উহা সোনা হইয়া যায়, দেখ, প্রেমভাবে আমাতে চিত্ত অর্পণ করিয়াই কি ব্রজাঙ্গনাগণ আমার স্বরূপতা প্রাপ্ত হয় নাই? অথবা ভয়ের নিমিত্ত কংস, কিংবা নিরন্তর বৈরিতা করিয়াও কি শিশুপালাদি আমাকেই প্রাপ্ত হয় নাই? হে পাণ্ডব, আত্মীয়তার জন্য যাদবগণ, মমত্বের জন্য বসুদেবাদি সকলে আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন; হে ধনুর্ধর! নারদ, ধ্রুব, অক্রূর, শুক ও সনৎকুমার যেমন ভক্তি দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত

হইয়াছেন ; তেমনি গোপিকাদের প্রেম, কংসের ভয়-ভ্রান্তি, শিশুপালাদির বিদ্বেষপূর্ণ মনোবৃত্তি আমাকেই প্রাপ্ত করাইয়াছে, আমিই জীবের একমাত্র (ভোজ্য) আশ্রয় ; ভক্তি বৈরাগ্য বা বৈরভাব—যে কোন মার্গ অবলম্বন করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৪৭০)

অতএব হে পার্থ, দেখ, আমাতে প্রবেশ করিবার উপায়ের অভাব নাই, জীব যে কোন জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, আমাকে ভজনা করুক বা আমার বৈরিতা করুক—পরন্তু তাহাকে আমারই ভক্ত বা আমারই বৈরী হইতে হইবে ; যে কোন প্রকারে আমার চিন্তা করিলে আমার স্বরূপ নিশ্চিতভাবে তাহার অধিগত হইবে ; এইজন্য হে অর্জুন, পাপযোনিই হউক, কি বৈশ্য, শূদ্র বা অঙ্গনাই হউক, আমাকে ভজনা করিলে আমারই ধামে পৌঁছিবে।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৩৩

যে ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যে (ছত্রচামর) শ্রেষ্ঠ, স্বর্গ যাহার জায়গীর, যে মন্ত্রবিদ্যার গৃহস্বরূপ, যে পৃথিবীর দেবতা, তপের মূর্তিমান্ অবতার, যাহার জন্য সকল তীর্থের ভাগ্যোদয় হয়, যাহার মধ্যে যাগযজ্ঞ নিরন্তর বাস করে, যে বেদের বজ্রকবচ, যাহার দৃষ্টির সংস্পর্শে কল্যাণের বৃদ্ধি হয়, যাহার অবস্থার দৃঢ়তায় সৎকর্মের প্রসার হয়, যাহার সঙ্কল্পে সত্য জীবন প্রাপ্ত হয় (প্রতিষ্ঠিত হয়), যাহার অভয়বাণী অগ্নিকে আয়ু প্রাপ্ত করাইয়াছে এবং যাহার প্রীতির নিমিত্ত সমুদ্র তাহাকে আপন জল প্রদান করিয়াছে, যাহার চরণরজঃ বক্ষঃস্থলে পাইবার জন্য আমি লক্ষ্মীকেও দূরে সরাইয়া রাখিয়াছি এবং কৌস্তুভমণি নামাইয়া হস্তে ধারণ করিয়াছি, বক্ষের আবরণ তুলিয়া দিয়াছি, (৪৮০)

হে সুভদ্র, আপনার সৌভাগ্যের লক্ষণস্বরূপ অদ্যাবধি আমি যাহার পদচিহ্ন হৃদয়ে ধারণ করিতেছি ; হে মহাবীর অর্জুন, যাহার কোপ কালাগ্নি রুদ্রের বসতিস্থল, যাহার প্রসাদে বিনা-মূল্যে (অনায়াসে) সিদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, এইরূপ পুণ্যশীল পূজনীয় নিপুণ ভক্ত ব্রাহ্মণ যে আমাকে প্রাপ্ত হইবে, তাহা আর বলিতে হইবে কেন ? দেখ, চন্দনের অঙ্গানিল (চন্দনবৃক্ষ-স্পৃষ্ট বায়ু) নিকটস্থ নিম্ববৃক্ষ স্পর্শ করিলে, তাহা (সুগন্ধিত হইয়া) অযোগ্য হইলেও দেবতার মস্তকে (তিলকরূপে) শোভা পায়, তবে স্বয়ং চন্দন যে সেই স্থান প্রাপ্ত হইবে না, তাহা কেন মনে করিবে ? অথবা ইহার কোন সত্যতা কি কোন যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিতে হইবে ? (শরীরের জ্বালা) শান্ত করিবার আশায় শঙ্কর নিরন্তর অর্ধচন্দ্র মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন, তবে শীতলতায় (তাপ-প্রশমনকারিতায়) এবং পূর্ণতায় ও সুগন্ধে চন্দ্র হইতেও শ্রেষ্ঠ যে চন্দন, তাহা কেন সর্বাঙ্গে ধারণ করিবে না ? যাহাকে আশ্রয় করিয়া রাস্তার জল অনায়াসে সমুদ্রে গিয়া পড়ে, সেই গঙ্গার কি অন্য গতি হইতে পারে ? সুতরাং রাজর্ষি বা ব্রাহ্মণ—আমিই যাহার গতি, মতি ও শরণ, সে নিশ্চিতই আমাকে নির্বাণ লাভ করে, আমাতেই তার স্থিতি ; এইজন্য শত-জর্জর (শতছিদ্রযুক্ত) নৌকায় বাহির হইয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিবে ? শস্ত্রবর্ষণের মধ্যে অঙ্গাবরণ খুলিয়া নগ্নগাত্রে কিরূপে থাকিবে ? (৪৯০)

শরীরের উপর প্রস্তরখণ্ড পড়িতে থাকিলে কি ঢাল তুলিয়া ধরিবে না ? রোগ আক্রমণ করিলে ঔষধ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবে ? হে পাণ্ডব, যেখানে চতুর্দিকে দাবানল জ্বলিতেছে

সেখান হইতে কি বাহির হওয়া উচিত নহে? তেমনি উপদ্রবপূর্ণ মর্ত্যলোকে আমাকে ভজনা করিবে না কেন? নিজের অঙ্গে এমনকি বল আছে, যাহার ভরসায় আমাকে ভজনা না করিয়া গৃহের ভোজ্য-সামগ্রী নিশ্চিন্ত হইয়া ভোগ করিবে? অথবা আমাকে ভজনা না করিয়া বিদ্যা বা যৌবন হইতে জীবের কি সুখের ভরসা আছে? যত কিছু ভোগ্য বস্তু সব তো এই দেহের সুখের জন্যই, আর সেই দেহ তো কালের মুখের মধ্যেই পড়িয়া আছে, হে বৎস, এই মর্ত্যলোকের হাটে দুঃখের পসরা ছড়ানো রহিয়াছে, আর মরণরূপ বোঝা ক্রমাগত নামানো হইতেছে—সেই মৃত্যুলোকের হাটের শেষ সময়ে প্রাণী আসিয়া পৌছিল, এখন হে পাণ্ডব, এই হাটে জীবনের সুখপ্রদ কোন্ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা যাইবে? ভস্মে ফুঁ দিয়া কি দীপ জ্বালানো যায়? বিষের কন্দ বাটিয়া যে রস বাহির করা হয়, তাহাই অমৃত বলিয়া পান করিলে যেরূপ অমর হওয়া যায়—বিষয়ের সুখও সেইরূপ, উহা কেবল চরমদুঃখ স্বরূপ, পরন্তু কি করা যায়? মূর্খ লোকে উহা সেবন না করিয়া পারে না, নিজের মস্তক ছেদন করিয়া পায়ের ক্ষত বাঁধিলে যেমন হয়, মর্ত্যলোকের সমস্ত সুখও তেমনি। (৫০০)

এই মর্ত্যলোকে সুখের কথা কে শুনিয়াছে? জ্বলন্ত অঙ্গারের শয্যায় কি সুখনিদ্রা হয়? যে (মৃত্যু)-লোকে চন্দ্র ক্ষয়রোগগ্রস্ত, যেখানে অস্ত যাইবার জন্যই সূর্যের উদয় হয়, যে জগতে সুখের রূপে দুঃখই যাতনা দেয়, যেখানে কল্যাণের অঙ্কুর ফুটিতেই তাহার উপর অমঙ্গলের আবরণ পড়ে, মৃত্যু উদরের মধ্যে গিয়া গর্ভস্থ সন্তানকেও খুঁজিয়া বাহির করে, যাহা অসৎ (মিথ্যা) তাহারই চিন্তাকালে যমদূত আসিয়া জীবকে লইয়া যায়, কোথায় যায়—তাহাও জানিতে পারা যায় না, হে কিরীটী, সকল পথ খুঁজিয়া দেখিলেও সে স্থান হইতে ফিরিবার পদচিহ্ন দেখা যায় না, মৃতগণের কথাই যেখানকার পুরাণ-কথা, যাহার অনিত্যতার কথা ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বর্ণনা করিলেও শেষ হয় না, এইরূপ যে লোকের স্থিতি—সেই মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকাই এক কৌতুককর ব্যাপার। ইহলোক ও পরলোকের কল্যাণের জন্য যে গাঁঠের একটি কড়িও খরচ করে না, সে সর্বস্ব হানি হইতে পারে—এমন কার্যে কোটী মুদ্রাও ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না। বহু প্রকারের বিষয়বিলাসের পাশে যে বদ্ধ, তাহাকে মানুষ সুখী মনে করে, কামনার ভারে যে পিষ্ট হয় তাহাকেও সে জ্ঞানী বলে। যাহার আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে, বল ও প্রজ্ঞা লোপ পাইতেছে, বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজন বলিয়া মানুষ তাহারই পায়ে নমস্কার করে। (৫১০)*

বালক (সন্তান) বাড়িতে থাকিলে আনন্দে নাচিতে থাকে, ভিতরে যে তাহার আয়ু কমিতেছে, তাহাতে তাহার কোন দুঃখ হয় না, প্রত্যেক জন্মদিনে এইভাবে কালের অধীনতা স্মরণ হয়, তথাপি সকলে পতাকা উড়াইয়া উল্লাসে বার্ষিক জন্মদিবসের উৎসব পালন করে, 'মর' এই কথা বলিলে সহ্য করিতে পারে না, মরিয়া গেলে ক্রন্দন করে, পরন্তু প্রতি মুহূর্তে যে আয়ু চলিয়া যাইতেছে, মূর্খতার জন্য তাহা ভাবিয়াও দেখে না, সর্প যখন ভেককে গিলিতে যাইতেছে তখনও ভেক জিহ্বা বাহির করিয়া মক্ষিকাকে ধরে, তেমনি কিসের লোভ প্রাণিগণের তৃষ্ণা বাড়ায় কে জানে? অহো, কি ঘোর দুর্দৈব এই মর্ত্যলোকে সবই বিপরীত! হে অর্জুন, এখানে যখন দৈবাৎ জন্মগ্রহণ

* জয়াচেঁ আয়ুষ্য খাকুটেঁ হোয়। বলপ্রজ্ঞা জিরোনি জায়।
তয়াচে নমস্কারিতী পায়। বডিল ম্হণুনি॥

করিয়াছ, তখন সত্বর এখান হইতে পৃথক্ হইয়া বাহির হও এবং ভক্তির সাধনায় লাগিয়া যাও, যাহাতে আমার নির্দোষ ধাম পাইতে পার।

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪

তুমি তোমার মন মদ্রূপ করিয়া প্রেমের সহিত আমার ভজনা কর, সর্বত্র আমাকেই একান্ত ভাবে নমস্কার কর, যে আমাকেই ধ্যান করিয়া নিঃশেষে সমস্ত সঙ্কল্প জ্বালাইয়া ফেলে, তাহাকেই আমার নির্মল যজনকারী কহে, এইভাবে যখন আমার ধ্যানে সমৃদ্ধ হইবে, তখনই আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে, আমার অন্তরের কথা তোমাকে বলিতেছি, সকলের কাছে যাহা গোপন করিয়াছি—আমার সেই সর্বস্ব তোমাকে অর্পণ করিলাম—ইহা প্রাপ্ত হইয়া তুমি সুখ-স্বরূপ হইয়া থাকিবে। (৫২০)

সঞ্জয় বলিলেন, 'এইভাবে ভক্তকামকল্পদ্রুম, আত্মারাম পরব্রহ্ম শ্যামল শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ করিলেন, শুনুন্।' বৃদ্ধ (ধৃতরাষ্ট্র) এই সব কথা শুনিয়া—মহিষ যেমন বন্যার জলে বসিয়া থাকে—তেমনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন, সঞ্জয় মস্তক সঞ্চালন করিয়া একান্তে কহিলেন, 'অহো, অমৃতের বর্ষণ হইয়া গেল, অথচ (ইঁহার অবস্থা দেখ) ইনি এখানে থাকিয়াও নাই, যেন কোন প্রতিবেশীর গ্রামে গিয়াছেন, তথাপি ইনি আমাদের প্রভু, সুতরাং ইঁহাকে কিছু বলিলে বাণী কলঙ্কিত হইবে, কি করা যায়? ইঁহার স্বভাবই এইরূপ, পরন্তু আমার পরম ভাগ্য, এই কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ বলিবার জন্য ঋষিশ্রেষ্ঠ শ্রীব্যাসদেব আমাকেই নিযুক্ত করিয়াছেন, বহু আয়াসে মন স্থির করিয়া এইভাবে বলিতে বলিতে সঞ্জয় সাত্ত্বিক ভাবে এমন আবিষ্ট হইলেন যে আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না, চিত্ত চমকিত হইয়া স্থির হইল, বাক্য স্বস্থানে শুদ্ধ হইল, আপাদ-মস্তক শরীরে রোমাঞ্চ জাগিল, অর্ধোন্মীলিত চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বর্ষিত হইল, অন্তরে সুখোর্মির জন্য বাহিরে কম্প হইতে লাগিল, সমস্ত রোমকূপে নির্মল স্বেদ-কণিকা উৎপন্ন হইল—মনে হইল যেন মুক্তার মালায় শরীর আবৃত হইয়াছে, এই প্রকার মহাসুখের নিবিড় রসে তাঁহার জীব-দশা ডুবিয়া গেলে ব্যাস-নিয়োজিত কর্মে ব্যাঘাত হইল। (৫৩০)

শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিলে তাঁহার দেহস্মৃতি ফিরিয়া আসিল; তখন নেত্রের অশ্রু ও সর্বাঙ্গের স্বেদ মুছিয়া সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, 'শুনুন্'।

এখন শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যরূপ উত্তম বীজ এবং সঞ্জয় সাত্ত্বিক ভাবের সার, সুতরাং শ্রোতাগণের সিদ্ধান্তরূপ ফসল প্রাপ্তির সুসময়, অহো, কিঞ্চিৎ অবধান করুন, আনন্দের আর অবধি থাকিবে না (আক্ষরিক: আনন্দের রাশির উপর বসিবেন), কারণ দৈবযোগে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভাগ্য খুলিয়া গিয়াছে (আক্ষরিক: মালা লাভ হইয়াছে), তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিভূতির ঐশ্বর্য (স্থান) দেখাইবেন। নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছেন, 'আপনারা শুনুন্'। (৫৩৫)

ইতি শ্রীজ্ঞানদেব-বিরচিত 'ভাবার্থ-দীপিকা'র নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

বড়দিনের অনুচিন্তন

শ্রীচিন্তাহরণ সোম

বড়দিন। ২৫শে ডিসেম্বর। প্রচলিত মতে এটি প্রভু যীশুখৃষ্টের জন্মদিন। তার জন্মই আজ বড়দিন, কেবল দিনমানের সময়-বৃদ্ধির জন্ম নয়।

আজ থেকে প্রায় দু হাজার বছর আগে,—ইহুদীদের দেশ প্যালেষ্টাইনের ক্ষুদ্র শহর বেথ্‌ল-হেমে, দীন পরিবেশের মধ্যে, একদা যে দেব-মানবের আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁরই স্মৃতিপূত এই দিনটি।

যীশু ধনীর দুলাল ছিলেন না, অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত সূত্রধরের ঘরে তাঁর জীবন শুরু হয়, আর পরিসমাপ্তি নিদারুণ অবিচারের ক্রুশকাষ্ঠে, লৌহকীলকের আঘাতে।

কিন্তু তাতে কি? অনির্বাণ জীবন-দর্শনের যে আলো তিনি জ্বেলে দিয়ে গেলেন, আজও অর্ধজগৎ সেই আলোকে আলোকিত।

পরমেশ্বরের একটি বাণীরূপ এই যীশু। তাঁর কনিষ্ঠ এবং প্রিয় শিষ্য সন্ত যোহন্‌ বলছেন, 'আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে; বাণীই ছিলেন ঈশ্বর।' কথা কয়টির প্রকৃত তাৎপর্য ধ্যানগম্য।

তার কিছু পরই সন্ত যোহন্‌ বলছেন: সেই বাণী রক্তমাংসের দেহ ধারণ করলেন এবং আমাদের মধ্যেই বাস ক'রে গেলেন, (এবং আমরা তাঁর মহিমা প্রত্যক্ষ করেছি, সে মহিমা যেন একমাত্র ঈশ্বরাত্মজেরই) সত্যময় এবং করুণাময়।

যীশুর সেই বাণীরূপটি কি?

জাতিতে যীশু ছিলেন ইহুদী। সুপ্রাচীন কাল থেকে ইহুদীরা ধর্মপ্রাণ, আচারপরায়ণ এবং একেশ্বরবাদী।

ঐ ইহুদী-সমাজে কালে কালে মসি (Moses) প্রভৃতি বহু ঈশ্বরানুবিষ্ট ভাববাদী জন্মেছেন এবং সুষ্ঠু ধর্মানুগত জীবন যাপনের সহায়ক নানাবিধ নিয়ম-নীতির কথা বলেছেন এবং ইহুদী-সমাজকে তা গ্রহণ করিয়েছেন। ঐ নিয়মগুলির মধ্যে আছে সুবিখ্যাত Ten Commandments—বা দশটি আদেশ, যা প্রত্যেক ইহুদীর অবশ্যপালনীয় এবং খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীদেরও মান্য।

নিয়ম-নীতি খুবই ভাল এবং সুপালিত হ'লে উপকারীও বটে। কারণ যেমন রাষ্ট্রনীতি, তেমনই ধর্মনীতি সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনকে উচ্ছৃঙ্খল হ'তে দেয় না, বিধি-বদ্ধ ক'রে তাকে সৌষ্ঠবযুক্ত ও শান্তিময় করে।

কিন্তু নিয়ম-পালনের মধ্যে একটি দোষ ক্রমে ক্রমে দেখা দিতে পারে এবং দেখা দেয়ও। সেইটি হচ্ছে অতিমাত্রায় আচার-পরায়ণতা, যা বিচারের পথকে রোধ ক'রে অত্যুগ্র দৃঢ়তায় জীবনকে শক্ত, কঠিন, কঠোর, নীরস ক'রে দেয় এবং আত্ম- ও পরপীড়নের যন্ত্রবৎ হ'য়ে উঠে। অতি-আচারী লোক 'বাই' গ্রস্ত হ'য়ে নিজ ও অপরের প্রতি নিষ্ঠুর হতেও দ্বিধা বোধ করে না, পরন্তু ঐরূপ হওয়া ও করাকেই ধর্মাচরণ মনে ক'রে আত্মশ্লাঘায় উন্নাসিক হ'য়ে পড়ে। নীতি মান্‌বার ঐটি ঘোর বিপদ। যীশু যখন স্বয়ং প্রচার শুরু করেন, তখন ইহুদী-সমাজেও আচার-পরায়ণতা ঐ প্রকার উগ্র রূপ ধরে যথার্থ ধার্মিকতার স্থান গ্রহণ করেছিল। ধর্মের নামে নিষ্ঠুর পীড়নের খেলা চলছিল সমাজে; এবং ইহুদী সমাজপতি ও পুরোহিতেরা তাকেই ধর্ম ব'লে বিনা বিচারে মেনে নিয়েছিলেন, অন্যকে দিয়েও মানাচ্ছিলেন।

যীশু-কথিত ধর্মনীতি ঐ অচলায়তনে হানল প্রথম আঘাত। যীশু কিন্তু নীতিগুলিকে আঘাত

করেননি। নীতিগুলিকে তিনি গ্রহণই করেছিলেন এবং সঞ্চার করেছিলেন তাতে নূতন প্রাণ, নূতন তেজ, নবীন অর্থবোধ ও অনুভূতি। আঘাত দিয়েছিলেন তিনি আচার-পরায়ণতার নিষ্প্রাণ নিশ্চেতন নির্বোধ যূপ-কাষ্ঠটাতে, যাতে সমাজ ও জীবনের প্রাণশক্তি নিত্য বলি যাচ্ছিল।

কবীর দুঃখ ক'রে বলেছেন, 'ক্ষেত রক্ষা করতে দিলাম বেড়া, এখন সেই বেড়া-ই যে ক্ষেতকে খায়।'

যীশু স্বীয় সমাজের আচার-নিষ্ঠার ঐ ক্ষেত-খেকো বেড়াটাতেই জোর আঘাত হেনেছিলেন।

যীশুর 'Sermon on the Mount' নামক বিখ্যাত শৈলোপদেশের মধ্যে তাই দেখি একস্থানে তিনি বলছেন :

ভেবো না যে, আমি এসেছি নীতি-নিয়ম বা ভাববাদীদের উপদেশ-বাণী ধ্বংস করতে, তা নয়, আমি ধ্বংস করতে আসিনি, এসেছি পরিপূর্ণ করতে।

কারণ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যাবৎ আকাশ ও পৃথিবী শেষ না হ'য়ে যায়, তাবৎ নিয়মের একটি কণাও নষ্ট হবে না—পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত না হওয়া পর্যন্ত।

এখন ঐ যে পরিপূর্ণ রূপ নেওয়ার কথাটি, ভেবে দেখতে হয়। ঐ দিয়ে যীশু কি বুঝাতে চেয়েছেন? তাঁর নিজের কথার মধ্যেই তা স্পষ্ট হ'য়ে আছে। এর দু-একটি উদাহরণ দিই :

ঐ 'শৈলোপদেশে'ই পুরোনো নীতির কথা তুলে যীশু বলছেন :

তোমরা শুনেছ, প্রাচীনেরা ব'লে গেছেন, 'হত্যা করবে না; এবং হত্যাকারী অবশ্যই বিচারের বিপদে পড়বে।' কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কোন লোক বিনা কারণে তার ভ্রাতার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, তাকেই বিচারের বিপদে পড়তে হবে; এবং যে কোন লোক তার ভাইকে 'রাকা' বলে গালি দেবে তাকেই বিচারের ও সাজার বিপদে পড়তে হবে, যে কেউ তাকে বলবে 'ওরে মূর্খ' নরকাগ্নিতে দগ্ধ হবার বিপদ ঘটবে তারই।

অর্থাৎ যীশুর মতে শুধু নরহত্যায় কোনক্রমে বিরত থাকলেই ধর্ম করা হবে না, কারু প্রতি বিনা কারণে ক্রোধ প্রকাশ করলে বা গালি দিলে এমনকি 'মূর্খ' ব'লে কাউকে সামান্য মাত্র অবজ্ঞা করলেও ধর্মহানি হবে।

কি করতে হবে তা হ'লে?

যীশু বলেন : যজ্ঞবেদীতে উৎসর্গ করার জন্য কোন বস্তু এনে হঠাৎ যদি মনে পড়ে যে তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভ্রাতার কোন অভিযোগ আছে, তাহলে ঐ উৎসর্গের জিনিসটিকে বেদীর কাছে রেখে দিয়ে ফিরে যাও, আগে গিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে মিটমাট ক'রে ফেল, তারপর এসে তোমার নৈবেদ্য উৎসর্গ কর।

সুতরাং যীশুর মতে হত্যা করবে না—এই নৈতিক আদেশটির পরিপূর্ণ রূপ হ'ল শুধু হত্যা-বিরতিতে নয়, যে কোন রকমে অন্যের মনে যাতে আঘাত লাগতে পারে, বা দুঃখ জন্মাতে পারে, এমন কোন কাজ একেবারেই না করাতে।

যীশু বলছেন : তোমরা শুনেছ, প্রাচীনেরা বলেছেন, 'ব্যাভিচার করবে না।' কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কোন ব্যক্তি সকাম দৃষ্টিতে কোন নারীর দিকে তাকায় ইতিমধ্যেই সে অন্তরে অন্তরে ব্যভিচার ক'রে ফেলেছে।

তখন তবে কি করতে হবে? অতি কঠোর যীশুর মন্তব্য : যদি তোমার ডান চক্ষু দোষ ক'রে থাকে, তাকে উপড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দাও, কারণ তোমার সমগ্র দেহ নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চাইতে তোমার একটি অঙ্গ ধ্বংস হ'য়ে যাক; তাইই হবে তোমার পক্ষে লাভজনক।

অর্থাৎ দৈহিক ব্যভিচার থেকে কোনক্রমে বিরত থেকে বাহ্য ধার্মিকতার ভান দেখিয়ে,

মনে মনে পাপ করাতে ধর্মপালন হয় না। সবার আগে মনটাকেই শুদ্ধ রাখতে হবে, কেননা পাপকার্যের ঐটাই যে হ'ল সূতিকাগার।

এইভাবে এই প্রসিদ্ধ নৈতিক আদেশটি পরিপূর্ণ রূপ নেবে তখনই, যখন মনের কোণেও পাপ-সঙ্কল্প উঁকি দেবে না।

এইরূপ আরো উদাহরণ দিয়ে দেখানো যায়, পরিপূর্ণতা বলতে যীশু প্রত্যেকটি ধর্মনীতির একটা সুপ্রসারিত এবং সুগভীর প্রয়োগের কথা কিভাবে নব-উদ্দীপনার প্রাণশক্তিতে সন্দীপিত ক'রে বলেছেন।

স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে যারা পার্থক্য বোধ করতে পারে না, সে ধরনের লোকের মনে এখানে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে, —এত আইনকানুন, নীতি-নিয়ম মান্‌বই বা কেন? এ-প্রশ্নের উত্তরও যীশুর উক্তিতে রয়েছে।

যীশু তখন পূর্ণোদ্যমে নিজের ধর্ম-নীতি প্রচার ক'রে যাচ্ছেন। বহু লোক, বিশেষ ক'রে সমাজের দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, নিম্নস্তরের লোকে, তাঁর সরল সোজা ধর্মোপদেশের মধ্যে একটা অনাস্বাদিত-পূর্ব মুক্তির—অথচ একটা সুগভীর সত্য ও নীতির সন্ধান পেয়ে দলে দলে তাঁর কাছে এসে ভিড়ছে। তাঁর বিরুদ্ধবাদী, আচারী সনাতনপন্থী গোঁড়া ধার্মিক ও পুরোহিতেরা কিন্তু নিশ্চিন্ত নেই। তাদের মধ্যে ভয় ঢুকেছে যে, এই-বার বুঝি-বা সমাজে তাদের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি দূর হ'য়ে যায়। তারা পাকে-প্রকারে যখনই সুযোগ পাচ্ছে তখনই যীশুকে জব্দ করবার, লোকের সমক্ষে হেয় ক'রে দেবার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে।

একদিন তাদেরই একজন—এক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, লোকের সামনে যীশুকে কিছু অপ্রতিভ করবার জন্যে নিতান্ত বিনীত ভঙ্গিতে প্রশ্ন ক'রে বসলো: আচ্ছা প্রভো, আমাদের নৈতিক আজ্ঞাগুলির মধ্যে কোন্‌টি সবচেয়ে বড়?

উত্তরে যীশু তৎক্ষণাৎ বললেন: তুমি প্রভু পরমেশ্বরকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত আত্মা দিয়ে, সমগ্র মন দিয়ে ভালবাসবে। এইটিই হচ্ছে প্রথম এবং সর্বপ্রধান আজ্ঞা।

আর দ্বিতীয় যে আজ্ঞাটি, তা-ও এরই মতো। সেটি হচ্ছে—তুমি নিজেকে যেমন ভালবাসো, তোমার প্রতিবেশীকে তেমনি ভালবাসবে।

এর সঙ্গেই যীশু যে মন্তব্য করলেন, তার থেকে 'কেন নিয়মনীতি মানব?' এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তিনি বললেন: এই দুইটি আজ্ঞারই উপর নির্ভর করছে আর যত কিছু নৈতিক আজ্ঞা এবং ভাববাদিগণের উপদেশাবলী।

অর্থাৎ মনপ্রাণ দিয়ে পরমেশ্বরকে ভালবাসা এবং মানুষকে ভালবাসা—এই হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য ও সার সাধনা। আর ঐ দুইটি সমধর্মী কাজকে সহজ সুগম করবার জন্যেই আর যত কিছু নিয়মনীতি, আইনকানুন। ঐ দুইটি কাজ জীবনে হাসিল করতে পারলেই পৃথিবীতে স্বর্গ-রাজ্য স্থাপিত হ'তে পারে, এবং মানুষ সহজ আনন্দে, অব্যাহত শান্তিতে বাস করতে পারে।

ঈশ্বরের বাণী-বিগ্রহ যীশুখৃষ্ট নিজের আচরণ দিয়ে আদর্শ জীবনের উদাহরণ দেখিয়েছেন এবং নিজের প্রাণ দিয়ে ঐরূপ জীবনের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন ক'রে গেছেন।

আজকের এই বড়দিন, সত্যই বড়দিন, বৎসরের বহুদিনের মধ্যে একটি মহান্ দিন, কারণ এদিন যীশুর স্মৃতি-সমৃদ্ধ।

আজ বড়দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'ঋষি-কৃষ্ণ'র অনুচিন্তনে তাঁকেও ভুলতে পারছি না, তাঁর প্রদর্শিত উদার সমন্বয়-ভাবের ভিতর দিয়ে 'ঋষিকৃষ্ণ'র কথা বুঝবার চেষ্টা সহজ হয়েছে, কারণ 'সব শেয়ালের এক রা'।

সমালোচনা

Atomic Weapons in World Politics by Sailendra Nath Dhar, Published by Das Gupta & Co, Private Limited, Calcutta Pp 234+10. Price Rs. 10.

মারণাস্ত্রের নৃশংসতায় এ্যাটম বা হাইড্রোজেন বোমার তুলনা নাই। কোন যুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার করিলে শুধু যে যুদ্ধকামী দেশেরই ক্ষতি হইবে তাহা নয়, সর্বমানবের সর্বাত্মক ধ্বংসেরও সূচনা হইবে। এমন একটি সাংঘাতিক অস্ত্রকে লইয়া জাতিতে জাতিতে যে রেষারেষি চলিতেছে, তাহা যে মানব-সাধারণের সভ্যতার জয়যাত্রা ব্যাহত করিবে—এই ব্যাখ্যানই এই পুস্তকের উপজীব্য।

রাজনীতি ও সমাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ঐ হাইড্রোজেন বোমার ভবিষ্যৎ প্রয়োগনীতি মানবকে কিভাবে ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, সুধী লেখক নানান্ উদাহরণ ও উক্তি সংগ্রহ করিয়া তাহা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ঐ বোমাকে লইয়া জাতিতে জাতিতে ঠাণ্ডা লড়াই কিরূপ জঘন্য পরিণতির পথে আগাইয়া চলিতেছে, তাহারও ভয়াল চিত্র লেখক আমাদের সুমুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন—দেখিতে পাই। দশটি বিভিন্ন অধ্যায়ে এই সমস্যার বহুমুখী বিচার করিয়া শেষে ঐ দানবীয় শক্তিকে কিভাবে মানবের কল্যাণে লাগানো যায়, সেই বিষয়েও লেখকের সুচিন্তিত অভিমত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গ্রহণীয়।

ঐ দানবীয় শক্তির ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীর কথা চিন্তা করিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নেতা উহাকে সর্বতোভাবে সংবরণ করার কথা বলিয়াছেন, এমনকি কিছুদিন আগেই যখন ক্রুশ্চেভ আমেরিকায় গিয়াছিলেন, তখনও তিনি ঐ প্রসঙ্গে শুধু ঐ মারণাস্ত্রকে নষ্ট করার কথাই নয়—প্রত্যেক দেশ হইতে হিংসার প্রতীক সৈন্যদল অপসারণ করিবার কথাও বলিয়াছেন। লেখক এই বিষয়টিকে যে এইভাবেই চিন্তা করিতে হইবে—এরূপ ইঙ্গিত যথেষ্ট দিয়াছেন। সেদিক দিয়া বিচার করিলে লেখকের এই পুস্তক সত্যই সময়োপযোগী হইয়াছিল (১৯৫৭ খৃঃ এই পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হয়)।

এই পুস্তকের লেখক অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়াও এ্যাটম-শক্তির ধ্বংসাত্মক রূপের যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও তথ্য আহরণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে বলিয়াছেন: 'Beating swords into ploughshares, however, has never before been felt to be a more urgent necessity than now, because never before have the alternatives signified a greater or more awe-striking difference for the fate of human civilization.' (p 222, ll 24-28)—তাহাতে আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে। তবে একমাত্র ভবিষ্যৎই বলিতে পাবে—এই মত গ্রহণ করিয়া মানুষ বাঁচিবে, না ইহার বিপরীত কিছু করিয়া পৃথিবী হইতে মানব তাহার অস্তিত্ব মুছিয়া দিবে।

পুস্তকটির ছাপা ও বাঁধাই রুচিসম্মত, প্রচ্ছদপটে সমুদ্রবক্ষে আণবিক বিস্ফোরণের চিত্রটি বাস্তববাদী। পরিশিষ্টে অণুসংক্রান্ত ঘটনাপঞ্জী বিশেষ প্রয়োজনীয়। সমাজের কল্যাণকামী সকল সুধীকেই আমরা পুস্তকটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। —মহানন্দ

মন ও মানুষ ঃ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিঃ-৬। মূল্য—সাত টাকা। পৃঃ ৪৩৭।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ-প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থের মতো এই বইখানিও প্রথম দৃষ্টিতেই পাঠকের মনোহরণ করে। কন্যাকুমারীর 'বিবেকানন্দ-রকের' ফটো-সম্বলিত প্রচ্ছদপটটির নয়নাভিরাম সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবার পর বইটি পড়তে পড়তে মন আরো তৃপ্তিতে ভরে যায়। স্বামী অভেদানন্দজীর কথোপকথন ও চিন্তাধারার সম্যক্ আলোচনার মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মননশীলতার সার্থক পরিচয় ফুটে উঠেছে এই গ্রন্থে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের মধ্যে স্বামী অভেদানন্দজীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আজীবন জ্ঞানচর্চা। তাঁর সারা জীবনের অধ্যয়ন ও মননের পটভূমিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিন্তাধারার আদানপ্রদানের ইতিহাস রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনের একটি প্রধান দিক। এ গ্রন্থে সেই ইতিহাসের অনেক মূল্যবান্ উপকরণ রয়েছে। মূলতঃ শঙ্করাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদের অনুগামী হলেও ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য অপরাপর চিন্তাধারার প্রতি অভেদানন্দজীর শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও অধিকারের পরিচয় লক্ষণীয়। তাছাড়া আমেরিকায় এবং ভারতবর্ষে স্বামী অভেদানন্দের জীবনের নানা ঘটনা, বিশেষতঃ আমেরিকার বিভিন্ন মনীষীর সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনার বর্ণনা পাঠকের কাছে এই মনীষী মহাপুরুষের মানস পরিচয় তুলে ধরতে সাহায্য করেছে। সবার উপরে ফুটে উঠেছে তাঁর দিব্য ব্যক্তিত্ব।

এই বিরাট পুরুষের সংস্পর্শে এসে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ যে সম্পদ আহরণ করেছিলেন, তা 'মন ও মানুষ' গ্রন্থে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে সাজিয়ে দিয়েছেন। যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-সহচর অভেদানন্দ (কালী তপস্বী)-কে জানতে চান, অথবা যাঁরা উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণের এক ভারতীয় মনের অনুভবসিদ্ধ অধ্যাত্ম-আলোচনায় উৎসাহী—তাঁরা সকলেই এ গ্রন্থপাঠে উপকৃত হবেন। গ্রন্থের পরিশিষ্টে স্বামী অভেদানন্দজীর বাংলা ও ইংরেজী রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় সন্নিবিষ্ট। অভেদানন্দ-গ্রন্থ-সংগ্রহে বইটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান্ সংযোজন।

মাঝে মাঝে বানানভুলের আতিশয্য দেখা যায়। পরবর্তী সংস্করণের জন্য এ বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। **—প্রণবরঞ্জন ঘোষ**

এষণা (কবিতার বই) **ঃ** শ্রীবিভা সরকার প্রণীত, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৩৯, মূল্য আড়াই টাকা।

অনেকগুলি সুন্দর ও মধুর কবিতায় পূর্ণ বইখানি কয়েক বছর আগেই প্রকাশিত, কিন্তু বাঙালী পাঠক-সমাজে অপরিচিতই থেকে গেছে। শোনা যায়, বাংলা কাব্য থেকে নাকি আদর্শবাদ ও লিরিকের যুগ চলে গেছে। বাইরের স্রোত পালটে গেলেও অন্তঃস্রোত থেকেই যায়। যাঁদের এখনও আদর্শবাদ ও লিরিক ভাল লাগে, এ বইখানি তাঁদের মনে এনে দেবে আনন্দ উৎসাহ—প্রেরণা।

প্রথমাংশ 'স্মরণে'—দশটি পাতায় আছে দেশের স্মরণীয়দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। দ্বিতীয়াংশ 'মন-মর্মর'—প্রায় ১০০ পৃষ্ঠা, এখানেই কবির মনের ব্যথা বেদনা আশা আকাঙ্ক্ষা আকুতি ভাষা খুঁজছে। শেষাংশে 'গাথায়' (৩০ পৃঃ) আছে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কয়েকটি কাহিনী কেন্দ্র ক'রে নারী-হৃদয়ের অভিব্যক্তি।

'মন-মর্মর' অংশটি বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এ অংশটুকুর নতুন দ্বিতীয় সংস্করণ সমাদর করবার লোক এখনও বাংলা দেশে আছে বলেই মনে হয়।

শিল্পপীঠ-পত্রিকা (১ম বর্ষ ১৯৫৯) : রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ, বেলঘরিয়া হইতে স্বামী সন্তোষানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত , পৃষ্ঠা ৯৬।

আজকাল শিক্ষাব অঙ্গ হিসাবে বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করা প্রায় সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অবশ্যকর্তব্য বলিয়া পবিগণিত হইতেছে। ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে দুইটি দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। প্রথম : প্রতিষ্ঠানটিব বিশেষ উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় : সাহিত্যিক মান। আলোচ্য (ইংরেজী ও বাংলা) দ্বিভাষিক পত্রিকাটিতে শিল্পবিজ্ঞানের ৮টি প্রবন্ধের সহিত কয়েকটি সাহিত্যিক প্রবন্ধ কবিতা ও রস-রচনা সে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছে। প্রচ্ছদপটে যন্ত্রশিল্পের পটভূমিকায় তিনটি কীর্তনিয়াকে তিনটি বিদ্যার্থী মনে কবা কঠিন।

সমাজ-শিক্ষা (পত্রিকা)—সম্পাদক শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্তী, লোকশিক্ষা পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগনা।

এই শারদীয়া সংখ্যাটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও কয়েকটি প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, যথা : নঈতালিম ও বয়স্কশিক্ষা, সমাজ-শিক্ষার একটি প্রস্তাবনা, উৎসবের রূপান্তর। নব-সাক্ষরদের রচনাগুলিও সুখপাঠ্য, তবে সেগুলিতে কি ধরনের টাইপ ব্যবহার করা উচিত—এ সম্বন্ধে গবেষণা প্রয়োজন। এ জাতীয় পত্রিকায় বেখাচিত্র, চিত্র-সাহায্যে গল্প একটি নতুন দিকের সূচনা করতে পারে। আলোক-চিত্রগুলি পরিষদের বিভিন্ন কর্ম-প্রচেষ্টাব সাক্ষ্য দিচ্ছে। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক

Srimad Viṣṇu-tattva-Vinirnaya of Sri Madhvacarya—English translation by S S Raghavachar, published (1959) by Sri Ramakrishna Ashrama, Mangalore, Pp 98 + xxi Price Rs 3 00 Foreword by Swami Adidevananda.

দ্বৈত-বেদান্তের দৃষ্টি হইতে বেদ ও উপনিষদের দর্শন কি—তাহা শ্রীমধ্বাচার্যের 'বিষ্ণু-তত্ত্ব-বিনির্ণয়' গ্রন্থে স্পষ্ট এবং শক্তিশালী ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। তিনটি পরিচ্ছেদে ৪৬৪টি অনুচ্ছেদে 'দ্বৈতবাদ' প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে শাস্ত্রেব প্রামাণ্য, শ্রুতির তাৎপর্য আলোচনার পর অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া জীব জগৎ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে পঞ্চভেদ স্থাপন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নারায়ণের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব (সমতীতক্ষরাক্ষরম্) এবং তৃতীয়ে নারায়ণ বা বিষ্ণু নির্দোষ এবং অশেষসদ্‌গুণভূষিত, ইহাই প্রমাণ করা হইয়াছে।

শ্রীমধ্বাচাযেব সংস্কৃত অনুচ্ছেদগুলিব পর ব্যাখ্যামূলক অথচ সংক্ষিপ্ত অনুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, বিশেষ শব্দের অর্থ বা টীকা—পাদটীকায় সংযোজিত। অনুবাদকের ভূমিকা (১০ পৃষ্ঠা) এবং স্বামী আদিদেবানন্দের মুখবন্ধ বিষয়প্রবেশের সহায়ক।

World Teachers on Education—edited by T S. Avinasilingam and K Swaminathan, published (1958) by Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya, Coimbatore Dist Pp 187 + v Price Rs 4·00

কোয়েম্বাতুর জেলায় অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে গত বৎসর প্রকাশিত শিক্ষা সম্বন্ধে পুস্তকখানির একটি স্থায়ী মূল্য আছে, কারণ দশটি অধ্যায়ে প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষাদর্শের একটি সমাবেশ এখানে পাওয়া যায়। শিক্ষা সম্বন্ধে উপনিষদ্ ও গীতার বাণী, বুদ্ধ ও খৃষ্টের উপদেশ, তিরুক্কুরল ও কোরানের নির্দেশ, সর্বশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি এবং গান্ধীজীর চিন্তাধারার নির্বাচিত অংশ বিভিন্ন অধ্যায়ে বিষয়ানুযায়ী অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত। গ্রন্থখানি শিক্ষাব্রতিগণের নিত্যসহচর হইবার দাবি রাখে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

বেলুড় মঠঃ বাংলা দেশের বিভিন্ন শাখা-কেন্দ্রের মারফৎ রামকৃষ্ণ মিশন বর্তমানে বর্ধমান, ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং মেদিনীপুর জেলার মোট ১৩৪টি গ্রামে সেবাকার্য চালাইতেছেন।

গত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে মিশন নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরণ করিয়াছেন :

দ্রব্য	পরিমাণ
চাউল ও আটা	৭০৩ মণ
ডাল	১৭৮ „
আলু	৭৩ „
গুঁড়া দুধ	১১,১৪৩ পাউণ্ড
পাউরুটি	৯৮০ „
নূতন ধুতি ও শাড়ী	৬,৮৪৯ খানি
„ কম্বল	৩,০৮১ „
„ জামাকাপড়	১,৬৪৩ „

আরও প্রায় ২৩,০০০ টাকা মূল্যের নূতন কম্বল ও কাপড় বিতরণের জন্য পাঠানো হইয়াছে।

(১) **আসানসোলঃ** গত বন্যা ও ঘূর্ণিবাত্যায় বিপন্ন নরনারীর মধ্যে সেবাকার্য করিবার জন্য আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের লইয়া একটি শক্তিশালী কমিটি গ্রহণ করিয়া অক্টোবরের মাঝামাঝি হইতে আশ্রমের দুইজন কর্মীর তত্ত্বাবধানে সাতিনন্দী গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া সেবাকার্য আরম্ভ করেন। এই গ্রামে ৯টি গৃহ নির্মাণের জন্য বাঁশ-দড়ি-খড় এবং ধুতি-শাড়ী বিতরণ করা হয়। ক্রমে এই সেবাব্রত বর্ধমান জেলার সদর ও কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত বন্যাবিধ্বস্ত ভেদিয়া, চানক, গুস্করা, মাহাতা, লাখুড়িয়া, ভেরেণ্ডা, পালিগ্রাম ও গদিষ্ঠা প্রভৃতি ইউনিয়নের ৯৪টি গ্রামের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। উক্ত গ্রামগুলির ৩৫০০ পরিবারের মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরিত হয় :

চাউল, ডাল, লবণ, চিঁড়া, গুড়, আলু, সাবু, নূতন ধুতি, শাড়ী, কম্বল, চাদর, থান কাপড়, জামা প্যাণ্ট, পুরাতন কাপড়, মাল্টি-ভিটামিন ট্যাবলেট।

পূর্বোক্ত গ্রামগুলির কয়েকটি যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য পাইতেছিল, কিন্তু দুর্গম গ্রামগুলিতে কোন সাহায্যই পৌছায় নাই। বহু গ্রামে কর্মীদিগকে বুকজল ভাঙিয়া গিয়া সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। ঐ সকল গ্রামে কোন নৌকা বা যাতায়াতের অন্য উপায় ছিল না। কোন কোন গ্রামে দরিদ্র জনগণ প্রায় ৩দিন অনাহারে থাকিবার পর মিশনের কর্মীদের মারফৎ প্রথম খাদ্য-সাহায্য পাইয়া অভিভূত হইয়া পড়ে। সেবাকার্যের সংবাদ পাইয়া দূরদূরান্তরের গ্রাম হইতে নিঃস্ব-দরিদ্র গ্রামবাসীরা একটুকরা গায়ের কাপড় ও একমুঠা চাউলের জন্য মিশনের সেবাকেন্দ্রে ছুটিয়া আসিতে থাকে। ইহাদের কাহারও কাহারও মাথা গুঁজিবার আশ্রয়টুকুও আজ নাই। রান্না করিবার পাত্রের অভাবে তাহারা শুধু চিঁড়াগুড়ই সাহায্য চায়, আর চায় একখানি গায়ের কাপড়, কোন রকমে যাহাতে লজ্জা নিবারণ করা যায়। শিশু ও নারীদের অবস্থা অবর্ণনীয়।

এই সেবাকার্য পরিচালনা করিবার জন্য ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত নগদে ও দ্রব্যাদিতে মোট ৪৫,০০১ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং ব্যয় হইয়াছে মোট ৩৭,২৭১ টাকা।

বর্তমানে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বাসভবন কোগ্রামের অনতিদূরে 'নূতন হাটের' সেবাকেন্দ্র হইতে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত—যে সকল

চাষীর কিছু জমি আছে, তাহাদের—গম, আলু, পেঁয়াজ ও রবিশস্যের বীজ দেওয়া হইতেছে। এই সেবাকার্য ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলিবে:

(২) **নরেন্দ্রপুর** (২৪ পরগনা) : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম কর্তৃক বন্যার্ত-সেবাকার্যে ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর, ডায়মণ্ডহারবার ও বারাসত মহকুমায় এবং মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমায় ২,১৭৬টি পরিবারকে চাল ও আটা, দুধ, কম্বল ও জামাকাপড় দেওয়া হইতেছে।

ইউনিয়ন অনুযায়ী	গ্রামের নাম
বড়াল :	বনহুগলি, হোগলকুড়িয়া, ডিঙ্গলেপোতা, জয়ানপুর
পানাকো :	চিয়েরী, বাগেশ্বর
নালুয়া :	কৃষ্ণচন্দ্রপুর, ছত্রভোগ, সইদল
কুঁকড়াহাটি :	ঢেকুয়া, হরিণভাসা, বড়মোহনপুর
ফারতাবাদ :	মহামায়াপুর, আতাবাগান
রাজপুর মিউনিঃ :	এলাচি, রামচন্দ্রপুর,
বেড়গুম :	কৃষ্ণনগর, বেড়গুম লক্ষ্মীপুর, বুচলিয়া, নিমতলা
চখাল (সাগর) :	সুমতিনগর, মৃত্যুঞ্জয়নগর

(৩) **সারদাপীঠ** (বেলুড়) : রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ হইতে হাওড়া জেলার নিম্নলিখিত অঞ্চলে বন্যাপীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

বালি থানা : নিশ্চিন্তা বস্তি।

ডোমজুড় থানা : বাদামপুর, মহিষগোট, রাজাপুর, দক্ষিণবাড়ী, জাবতাপোতা, চক্‌হরি, সাদাৎপুর।

উলুবেড়িয়া থানা : করাতবেড়িয়া, গোয়ালবেড়িয়া, রাজপুর, কমলাচক, কালীব চক্, ধরমতলা, বড়গ্রাম ও জগদীশপুর।

উপরি-উক্ত গ্রামসমূহে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি বিতরণ করা হইয়াছে :

চাল, ডাল, আলু, তেল, আটা, চিঁড়া, ছোলা, গুড়, বার্লি, পাঁউরুটি, দেশলাই, কম্বল, ছোটদেব নূতন জামা, বীজ ধান।

এতদ্ব্যতীত ১৪০৪জনকে কলেরা ও টাইফয়েড প্রতিষেধক টীকা এবং ১১৯ জনকে ঔষধ ও পথ্য দেওয়া হইয়াছে। সেবাকার্য এখনও চলিতেছে।

কার্যবিবরণী

রেঙ্গুন : রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটি ব্রহ্মদেশে সুপরিচিত। ১৯০১ খৃঃ এদেশে রামকৃষ্ণ সেবাসমিতি স্থাপিত হয়। ১৯০৫ খৃঃ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ হইতে এখানে প্রচারোদ্দেশ্যে আসেন। ১৯২১ খৃঃ সমিতি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বোটাটোউঙ্গ প্যাগোডা রোডের পার্শ্বে সোসাইটির নিজস্ব ত্রিতল ভবন অবস্থিত, পার্শ্বে অতিথি-ভবন। ১৯৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। সোসাইটি-পরিচালিত বিভিন্ন কর্মের বিস্তার ও তাহার পরিচিতি :

৭টি ভাষার বিভিন্ন বিষয়ের ২৩,১৭৭ গ্রন্থসমন্বিত ফ্রি লাইব্রেরি, আলোচ্য বর্ষে ৩০,৭৫৮ (পূর্ব বর্ষে ২৫,৮৮৪)-টি পুস্তক পঠনার্থে দেওয়া হইয়াছিল। পাঠাগারে ইংরেজী, বাংলা, বর্মী, হিন্দী, তামিল, তেলুগু ভাষায় ২৩টি দৈনিক এবং ১২৫টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। গড়ে দৈনিক পাঠক-সংখ্যা ২২৫ ('৫৭ খৃঃ ২০০)।

গীতা, ভাগবত, উপনিষৎ ও মহাপুরুষ-বাণী অবলম্বনে ৭৬টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, শ্রোতৃসংখ্যা গড়ে ২২। এতদ্ব্যতীত শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিষয়ক আলোচনাও উল্লেখযোগ্য। ১৬টি শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখানো হইয়াছিল। বুদ্ধ-জন্মতিথিতে বিশেষ উৎসবানুষ্ঠানে আশ্রমে আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। বিভিন্ন ধর্মের আচার্যগণের জন্মদিনগুলিও যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

বারাণসী ঃ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা-বর্ষ ১৯০০ খৃঃ হইতে জাতিধর্মনির্বিশেষে আর্ত মানবের সেবাব্রত।

১৯৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত সেবাশ্রমের কর্মধারা : (১) ১১৫টি শয্যা-সমন্বিত সাধারণ হাসপাতাল (অন্তর্বিভাগ): আলোচ্য বর্ষে ৩,৩০৯ রোগী ভরতি হয়। অস্ত্র-চিকিৎসা : ৬৭৬। গড়ে দৈনিক ১০২টি শয্যায় রোগী ছিল।

(২) বৃদ্ধ, অসমর্থ পুরুষ ও নারীর আশ্রয় ভবন : ভবন দুইটিতে যথাক্রমে ২৫ পুরুষ এবং ৫০ নারীর স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে, কিন্তু পুরুষ-বিভাগে ৯ জন এবং মহিলা-বিভাগে ২২ জন আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, অর্থাভাবে অধিক ভরতি করা সম্ভব হয় নাই।

(৩) সাহায্য : ১০৮ জন দরিদ্র ও অসহায় নারীকে সাহায্য বাবদ টাকা ২,২৫৭৮৭ এবং ২৮জন স্কুলের বিদ্যার্থীদিগের বেতন, বইপত্র, খাদ্য ও পোষাকের জন্য ১,১৩১ টাকার উপর ব্যয় করা হয়। এতদ্ব্যতীত ৫৪৯ জনকে সহস্রাধিক টাকা সাময়িক সাহায্য প্রদত্ত হয়। মোট ২২৭ জনকে কম্বল, ধুতি ও জামার কাপড় দেওয়া হয়।

(৪) সাধারণ চিকিৎসালয় (বহির্বিভাগ): আলোচ্য বর্ষে শিবালা শাখাকেন্দ্রের রোগীসহ মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা : নূতন ৬৬,২৯৫, পুরাতন ২,২৮,০০৯। গড়ে দৈনিক রোগী ৮১০, অস্ত্র-চিকিৎসা (ইঞ্জেকশন সহ) মোট ৪৬,১৪৬।

(৫) দৈনিক ৭০০ (বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, শিশু, রুগ্ণ) জনকে দুধ দেওয়া হয়।

(৬) প্যাথলজি এবং এক্স্-রে ও ইলেক্ট্রো-থেরাপি বিভাগে যথাক্রমে ১১,৪১৩ ও ১,৪৬০টি পরীক্ষা করা হয়।

জলপাইগুড়ি ঃ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই আশ্রমের সেবাকার্য প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রচার।

চিকিৎসা-বিভাগে দাতব্য ঔষধালয় (হোমিও-প্যাথি ও এলোপ্যাথি) এবং মাতৃসদন ও শিশু-মঙ্গলকার্য পরিচালিত হয়। আলোচ্য বর্ষে দাতব্য ঔষধালয়ে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ২০,১৫৬ (নূতন ৬,২৫৫)। মাতৃসদনে ১৩৩ জন প্রসূতি ভরতি হইয়াছিলেন। ৫০,৩৩৫টি শিশু ও ১০,১২০ জননীকে দুগ্ধ বিতরণ করা হইয়াছিল।

আশ্রম-ছাত্রাবাসে ১৫জন ছাত্র ছিল, তাহাদের স্বাস্থ্য, পড়াশুনা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। সমাজের অনুন্নত নিরক্ষরদের জন্য হরিজন ও নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। পাঠাগার হইতে পাঠকগণকে বিনা চাঁদায় সদ্গ্রন্থ পড়িতে দেওয়া হয়। পাঠাগারে ২৮ খানি পত্র-পত্রিকা নিয়মিতভাবে আসে।

আশ্রমে প্রতি রবিবার ধর্মবিষয়ক পাঠ ও আলোচনা হয়। আলোচ্য বর্ষে ৩৬টি আলোচনা-সভা ও ৮টি বক্তৃতা হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং অন্যান্য পুণ্য জন্মতিথিও পাঠ এবং আলোচনা দ্বারা উদ্‌যাপন করা হয়।

আশ্রমে যে মন্দিরটি নির্মিত হইতেছে, অর্থাভাবে তাহার কার্য এখনও শেষ হয় নাই। এতদর্থে আশ্রম-কর্তৃপক্ষ ধর্মপ্রাণ দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাইতেছেন।

আলমোড়া ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীর

স্বামী বিবেকানন্দের একান্ত ইচ্ছা ছিল—হিমালয়ের শান্ত মৌন পরিবেশে এমন একটি আশ্রম স্থাপিত হয়, যেখানে সাধুরা সাধন ভজন ও শাস্ত্রাধ্যয়ন করিবে। ১৯১৬খৃঃ স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের প্রচেষ্টায় আলমোড়ার উপকণ্ঠে 'শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীর' নামক আশ্রমটি গড়িয়া উঠে। শহরের কোলাহল হইতে দূরে তুষার-মণ্ডিত পর্বতশ্রেণীর পটভূমিকায় এই আশ্রমটির আকর্ষণে প্রতি বৎসর বহু সাধু ও ভক্ত এখানে আসেন এবং কিছুকাল বিশ্রামে ও তপস্যায়

কাটাইয়া যান। ২৫ জন সাধুর এবং ১০ জন (ভক্ত) অতিথির থাকিবার স্থান আছে। পূর্ব হইতে পত্রাদি লিখিয়া যাইতে হয়।

কয়েকটি বন্ধুর সাহায্যে ও চেষ্টায় আশ্রমে জলাভাব ও বৈদ্যুতিক আলোকের অভাব দূরীভূত হইয়াছে। গ্রন্থাগারে ৪,০০০ পুস্তক আছে। গ্রন্থাগার-ভবনের উপর প্রার্থনা, সভা, ক্লাস প্রভৃতির জন্য একটি হলঘর নির্মাণের চেষ্টা চলিতেছে। এতদুদ্দেশ্যে আশ্রম সহৃদয় দেশবাসীর নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইতেছেন।

বেলঘরিয়া: (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা ষ্টুডেন্টস্ হোমের ১৯৫৮খৃঃ কার্যবিবরণীতে প্রতিষ্ঠানটির বিস্তৃতি ও উন্নতি পরিস্ফুট। কলেজের ছাত্রগণ যাহাতে জীবন গঠনের সর্ববিধ সুযোগ পাইতে পারে, তাহার জন্যই ইহার প্রতিষ্ঠা। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণের সমস্ত খরচ আশ্রম হইতেই দেওয়া হয়।

এই ছাত্রাবাস অনেক পরিবর্তন ও বিপর্যয়ের পর বর্তমানে বেললাইনের ধারে ৩৬একর-পরিমিত ভূমিতে স্থায়ী রূপ লাভ করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষের শেষে মোট ৮৬জন বিদ্যার্থীর ৫৪জন ছিল 'ফ্রি' এবং ৭জন আংশিক খরচ দিত। ১৯৫৮খৃঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। এম-এ পরীক্ষায় গণিতে একটি ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়। বি-এ, বি-কম ও বি-এস-সিতে ৫জন অনার্স পায়, আই-এস সিতে ২৩জনের সকলেই উত্তীর্ণ হয় এবং ২জন সরকারী বৃত্তি লাভ করে।

এখানে উপাসনা-মন্দিরে প্রার্থনা, নিয়মিত সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা, স্বাস্থ্যচর্চা, খেলাধুলা, ঝিলে সন্তরণ, বিদ্যার্থিগণের নৈতিক মানসিক ও শারীরিক উন্নতির বিশেষ সহায়ক।

১৯৫৮খৃঃ জুলাই মাসে শিল্পমন্দির বা ত্রৈবার্ষিক জুনিয়ার কোর্স ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগ খোলা হইয়াছে। এখানে ৫৪০ ছাত্র সিভিল (L C E.), মেকানিক্যাল (L M E) ও ইলেকট্রিক্যাল (L E E) ইঞ্জিনিয়রিং শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। বর্তমানে প্রথম বর্ষে ১৮৭জন ছাত্র ভরতি হইয়াছে।

স্মরণোৎসব

কোয়ালপাড়া: ১৩১৮, ৮ই অগ্রহায়ণ জয়রামবাটী হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত এই আশ্রমটিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোর পার্শ্বে শ্রীশ্রীমা নিজের ফটো রাখিয়া স্বহস্তে পূজা করিয়া ইহার প্রতিষ্ঠা-কার্য সম্পন্ন করেন। এই ঘটনা স্মরণ করিয়া গত ৮ই অগ্রহায়ণ ঐ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' ও 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ করা হয়। সন্ধ্যা-রাত্রিক ও ভজনের পর শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলা কীর্তন করেন শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল। বহু ভক্তের সমাগমে উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার

নিউ ইয়র্ক: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র দুর্গাপূজা উপলক্ষে ১১ই অক্টোবর কেন্দ্রের উপাসনাগৃহে পূজা করেন স্বামী নিখিলানন্দের নবাগত সহায়ক স্বামী বুধানন্দ, ঐদিনই তিনি তাঁহার প্রথম ভাষণ দেন, বিষয়বস্তু ছিল: শক্তি-রূপে ঈশ্বরের উপাসনা। এতদুপলক্ষে ভারতীয় সঙ্গীত এবং স্তোত্রাদিপাঠের ব্যবস্থাও ছিল।

প্রতি রবিবারে বেলা ১১টায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়:

অক্টোবর: শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি, *শক্তি-রূপে ঈশ্বরের উপাসনা, 'অহং'কে নিয়ে কি করতে হবে? পাশ্চাত্যের জন্য রামকৃষ্ণ ও বেদান্ত।

নভেম্বর: *সাধক রামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজ্ঞান, ধর্ম ও মূল্যবোধ, ঈশ্বর নয়—আমিই ভাল, * আণবিক যুগে ধর্ম, আধ্যাত্মিক সাধনারূপে ভালবাসা (ভক্তিযোগ)।

প্রতি মঙ্গলবার রাত্রি ৮৷৷টায় ধ্যান ও রাজযোগের* এবং প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮৷৷টায় উপনিষদের অধ্যাপনা হয়।

[তারকা চিহ্নিতগুলির বক্তা স্বামী বুধানন্দ]

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র ঘোষ

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি গত ২৫শে নভেম্বর ৮২ বৎসর বয়সে ভক্ত সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র ঘোষ মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা ঠনঠনিয়ার বিখ্যাত ঘোষ-বংশের শঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের প্রপৌত্র এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচর স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজের ভ্রাতা ছিলেন। বেলুড় মঠের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ, তিনি পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করি।

পরলোকে চারুবালা সান্যাল

গত ১৩ই নভেম্বর ভক্ত শ্রীললিতচন্দ্র সান্যালের পত্নী চারুবালা সান্যাল কিছুদিন রোগভোগের পর ৬১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। এই ধর্মশীলা মহিলা পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। তাঁহার আত্মা শ্রীশ্রীঠাকুরের অভয়পদে চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উদ্বাস্তু-সেবায় খৃষ্টীয় সম্প্রদায়

আমেরিকার প্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানী ডক্টর ট্রুপের নেতৃত্বে 'চার্চ ওআর্ল্ড সার্ভিস' নামক সংস্থার একটি প্রতিনিধিদল গত ২৩শে অক্টোবর কলকাতায় এসে এই অঞ্চলের উদ্বাস্তু-সমস্যা পর্যবেক্ষণ করছেন, কতকগুলি উদ্বাস্তু-শিবির ও কলোনি তাঁরা এর মধ্যে দেখে এসেছেন, এ সম্পর্কে তথ্যাদি পাঠ করেছেন, এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের পুনর্বাসন মন্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন। এ সবের ওপর ভিত্তি ক'রে তাঁরা একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা রচনা করবেন।

ইতিপূর্বে ডঃ ট্রুপ ইওরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্য এলাকায় এরূপ কাজ করেছেন। এই অঞ্চলের তথ্যাদি সংগ্রহ ক'রে 'চার্চ ওআর্ল্ড সার্ভিসে'র কাছে তিনি দাখিল করবেন, এবং এই কাজ সমাপ্ত করবার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়কে প্রথমতঃ ৫০ হাজার ডলার পাঠিয়ে সাহায্য করবার অনুরোধ জানাবেন।

এই প্রতিষ্ঠান প্রথম থেকেই এই অঞ্চলের উদ্বাস্তুদের অবস্থার ওপর নজর রেখে এসেছেন। অন্যান্য খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতা পাওয়া গেলে উদ্বাস্তুসমস্যার সমাধানে কেন্দ্রীয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সকল প্রচেষ্টার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ ক'রে তাঁদের প্রচেষ্টাকেও এক সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

এই পরিকল্পনার আংশিক দায়িত্ব থাকবে ন্যাশনাল ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিল অব্ ইণ্ডিয়া, বৃটিশ কাউন্সিল অব্ চার্চেস্, ডিভিশন অব্ ইণ্টার চার্চ এইড অব্ দি ওআর্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চেস্—নামক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর।

যুক্তরাষ্ট্রের ৩০টি প্রোটেষ্টাণ্ট এবং দুর্গত-সহায়ক গোঁড়া খৃষ্টীয় প্রতিষ্ঠান এই 'চার্চ ওআর্ল্ড সার্ভিসে'র অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন ৬০টি দেশে এঁদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত। এই প্রতিষ্ঠান থেকে ভারতবর্ষে ১ কোটি ৯০ লক্ষ ডলারের খাদ্যদ্রব্যাদি পাঠানো হয়েছে।

[আমেরিকান রিপোর্টার থেকে সংকলিত]

বিজ্ঞপ্তি

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর ১০৭তম শুভ জন্মতিথি আগামী ৬ই পৌষ, ২২শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে, উদ্বোধনে ও অন্যত্র বিশেষ পূজানুষ্ঠান সহকারে উদ্‌যাপিত হইবে।

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৬১তম বর্ষ

(১৩৬৫-মাঘ হইতে ১৩৬৬-পৌষ)

“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত”

সম্পাদক

স্বামী নিরাময়ানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

বার্ষিক মূল্য পাঁচ টাকা প্রতি সংখ্যা ৫০ ন.প.

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(মাঘ-১৩৬৫ হইতে পৌষ-১৩৬৬)

লেখক-লেখিকাগণ ও তাঁহাদের রচনা